

**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**  
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

Record No. : KLM LGK 2007	Place of Publication : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
Collection : KLM LGK	Publisher : কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লিমিটেড
Title : বিপ্লব	Size : 7" x 9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number : ১/২ - ৪ ১/৬ - ৫	Year of Publication : ১৯৪৬ - ১৯৪৭, ১৯৪৮
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : বিপ্লব	Remarks :

C D Roll No. KLM LGK
----------------------

চিত্রালী—



চিত্রিতঃ  
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

মোহ-মুক্তি

মূল্যঃ  
দ্বিচালী প্রেস





## সাধাসিক সূচীপত্র

## জ্যৈষ্ঠ—কাৰ্ত্তিক

1081

ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ-ପ୍ରଥମ ଅଞ୍ଚ

2nd 2nd

92.  $\frac{1}{2} \sqrt{2}$  (11/11/11)

259

কলিকতা শিল্প ম্যাজিস্ট্রেট কারিগরি  
দফতর  
১৮/৫/৫৭, চান্দার লেন, কলিকতা-৭০০০০৭



॥ मङ्गलार्चनम् ॥

শ্রীসুবোধ দাস

: परिचायक :

গ্যারান্টি নিউজপেপার্স লিমিটেড

ফোন :  
৩২৪

৯, রামমঙ্গল রোড, কলিকাতা

ଶାସନ :  
ଭାରତୀୟ

ভারিট



# বিশ্বাসিক সূচীপত্র

১৩৪২

বিশ্বাস সূচী

জ্যেষ্ঠ

পরী পাঠাপারের আদর্শ (প্রবন্ধ)

শ্রীহরিহর শেঠ

রাজবন্দী শ্রীমুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পত্র

গবেষণা (ব্যঙ্গচিত্র)

আমাদের নিবেদন

শ্রীশৈলবালা ঘোষজামা

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

বৈঠকী (রস-রচনা)

শ্রীকেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছই দিক (কবিতা)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কড় (কবিতা)

শ্রীমদগোপাল সেনগুপ্ত

কুম (কবিতা)

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

কুমের বরষায় (উপহাস)

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কপে যুগে প্রিয়া তোমারে বেশেছি ভালো (কবিতা)

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

চিরন্তনী (কবিতা)

শ্রীসুবোধ রায়

সুরাতনের পুনরাগমন (উপহাস)

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

বিজ্ঞানের নূতন দৃষ্টি (প্রবন্ধ)

শ্রীপ্রমোদকুমার সেন

অপরাধের মুক্তারাম বাবু (গল্প)

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

হারালো যা' হারাবার (কবিতা)

শ্রীসরাসী সাধুবা

বক্তৃতার বিদ্যায় (নক্সা)

শ্রীস্বরেন্দ্র নাথ

ইরাকে (সমগ কাহিনী)

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

চাই শিক্ষা (প্রবন্ধ)

জন্ম গল্প ওয়াদি

বীমা প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)

শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গান ও স্বরলিপি

নজরুল ইসলাম ও শ্রী ১৯২২ ঘটক

আর্টের আটচালা

বিরূপাক্ষ শর্মা

রূপচর্চা

শ্রীমিলন মিত্র

রেডিও ভাষ্য (প্রবন্ধ)

শ্রীমধুসূদন শীল

ছায়াছবির ছায়াবাকী

শ্রীনিতাই বোদ

ম্যাডাম বাটারফ্লাই (অপেরা চিত্র)

ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জি

চিত্রগল্প ও চিত্রকর (প্রবন্ধ)

শ্রীকমলা চ্যাটার্জি

বেলাধুলা

শ্রীকপাচাখা

সম্পাদকীয়

শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস

"খেয়ালী" প্রেস ছইতে



## আম্বাচ

মেঘবৃতে বন্ধ-বন্ধবধু	...	১	বীমা-প্রসঙ্গ ( প্রবন্ধ )	...	৬৫
ঐশ্বাকনাথ শাস্ত্রী	...	২	ঐত্বর্গ্যমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৬৬
প্রাচ্যপথে ( ভ্রমণ কাহিনী )	...	৬	সাহিত্যিকা ( পুস্তক-পরিচয় )	...	৬৭
শ্রীমদ্বৃতি রক্ষিত	...	৭	শ্রীমদ্বোধ রায় ও শ্রীবিখপতি চৌধুরী	...	৭০
পূর্বাতনের পুনরাগমন ( উপজ্ঞাস )	...	১১	আর্টের আউচালা	...	৭১
শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	...	১২	বিক্রপাক শর্মা	...	৭২
মায়াদুগ ( কবিতা )	...	১৬	দয়িত ( কবিতা )	...	৭৩
শ্রীরেণুকা ঘোষ	...	১৬	শ্রীঞুচরণ মুখোপাধ্যায়	...	৭৫
নারীর প্রেম ( গল্প )	...	১৭	বেলাধুলা	...	৭৫
শ্রীবাণী মিত্র	...	১৭	শ্রীকৃপাচার্য্য	...	৭৬
হৃৎধের বরষায় ( উপজ্ঞাস )	...	২৬	রূপছায়া	...	৭৭
শ্রীমুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৬	শ্রীমিলন মিত্র	...	৭৭
মানসী ( কবিতা )	...	৩৪	রামান নোভারো ( জীবনকথা )	...	৮৭
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ	...	৩৪	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৮৭
বাতাহা ( গল্প )	...	৩৫	সম্পাদকীয়	...	৮৮
শ্রীপ্রভু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৬	প্রাবল		
প্রতীকমানা ( কবিতা )	...	৩৬			
শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী	...	৪০	আমাদের পাঠ্য	...	৮৮
প্রাচীন ভারতে রাগ ও রাগিণী	...	৪০	অধ্যাপক বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	৮৮
শ্রীশান্তিমুখা ঘোষ	...	৪১	মহ পাঠিনী ( কবিতা )	...	৮৮
মেজবাব চিঠি	...	৪১	অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়	...	৮৮
শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	...	৪১	অমরাগ ( কবিতা )	...	৮৮
গৃহ বাজা ( গল্প )	...	৪১	শ্রীমদ্বোধ রায়	...	৮৮
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক	...	৪১	প্রাচ্যপথে ( ভ্রমণ কাহিনী )	...	৮৮
বৈদেশিক বাস্তা	...	৪১	শ্রীমদ্বৃতি রক্ষিত	...	৮৮
শ্রীপ্রমোদ সেন	...	৪১	বীমা প্রসঙ্গ	...	৮৮
পঞ্চ-প্রদীপ	...	৪১	শ্রীত্বর্গ্যমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৮৮
শ্রীসমাদী সাধুধা	...	৪১	ধারকায় ( কবিতা )	...	৮৮
ইরাকে ( ভ্রমণ কাহিনী )	...	৪১	শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	...	৮৮
শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	...	৪১	নব-জন্ম ( গল্প )	...	৮৮
মনেট ( কবিতা )	...	৪১	শ্রীবিদ্য কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	...	৮৮
শ্রীমদ্বৃতি রক্ষিত	...	৪১	পূর্বাতনের পুনরাগমন ( উপজ্ঞাস )	...	৮৮
শ্রীমদ্বৃতি রক্ষিত	...	৪১	শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	...	৮৮

বাল এলো ( কবিতা )	...	৩২	রূপছায়া	...	৮৯
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক	...	৩২	শ্রীমিলন মিত্র	...	৮৯
হৃৎধের বরষায় ( উপজ্ঞাস )	...	৩৩	সম্পাদকীয়	...	৮৯
শ্রীমুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৩৩	ভাষ		
শ্রাবণ ( কবিতা )	...	৩৩			
শ্রীবিজ্ঞানকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৩৩	ভারতচন্দ্র—সঙ্গীত পণ্ডিত ( প্রবন্ধ )	...	৯০
ইরাকে ( ভ্রমণ কাহিনী )	...	৩৩	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	...	৯০
শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	...	৩৩	ইরাকে ( ভ্রমণ কাহিনী )	...	৯০
হিস-টেশন ( গল্প )	...	৩৩	শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	...	৯০
কথা ও স্বর ( কবিতা )	...	৩৩	কথা ও স্বর ( কবিতা )	...	৯০
শ্রীপ্রভাত কিরণ দত্ত	...	৩৩	শ্রীমদ্বীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	...	৯০
বৈদেশিক বাস্তা	...	৩৩	বিরহাবসানে ( কবিতা )	...	৯০
শ্রীপ্রমোদ সেন	...	৩৩	শ্রীজীবনানন্দ রায়	...	৯০
কাব্যের জন্ম ( প্রবন্ধ )	...	৩৩	দাহ ( প্রবন্ধ )	...	৯১
শ্রীমদগোপাল সেনগুপ্ত	...	৩৩	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী	...	৯১
বাস্তবী মন্দিরে ( কবিতা )	...	৩৩	আর্টের আউচালা	...	৯১
শ্রীঅমলেন্দু অধিকারী	...	৩৩	শ্রীসত্যানন্দ শর্মা	...	৯১
পঞ্চ-প্রদীপ ( ওর প্রেমিক )	...	৩৩	জন্মদিনে ( কবিতা )	...	৯১
শ্রীমনোজ রায়	...	৩৩	শ্রীমদ্বোধ রায়	...	৯১
গান	...	৩৩	হৃৎধের বরষায় ( উপজ্ঞাস )	...	৯১
শ্রীমদ্বোধ রায়	...	৩৩	শ্রীমুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৯১
আর্টের আউচালা	...	৩৩	গল্পের গুটি ( গল্প )	...	৯১
বিক্রপাক শর্মা	...	৩৩	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস	...	৯১
সাহিত্যিকা	...	৩৩	সিমলা-শৈল ( প্রবন্ধ )	...	৯১
শ্রীরঞ্জন রায়	...	৩৩	শ্রীমতী চিত্ত মজুমদার	...	৯১
বেলাধুলা	...	৩৩	চর্যল দুর্জয় ( গল্প )	...	৯১
শ্রীকৃপাচার্য্য	...	৩৩	শ্রীমদ্বিজ্ঞান নাথ বর্মা	...	৯১
শোক সংবাদ	...	৩৩	কবি-প্রশান্তি ( কবিতা )	...	৯১
শ্রীমদ্বৈরাগ্য ঠাকুর	...	৩৩	শ্রীশান্তিমুখা ঘোষ	...	৯১
হেমেন্দ্র লাল রায়	...	৩৩	সাহিত্যিকা ( পুস্তক সমালোচনা )	...	৯১
মতোজ প্রসাদ বসু	...	৩৩	শ্রীগোপালবিন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৯১
নিবারণ শঙ্কর	...	৩৩	পূর্বাতনের পুনরাগমন ( উপজ্ঞাস )	...	৯১
মনোরমা দেবী	...	৩৩	শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	...	৯১



সীমা প্রসঙ্গ	৫৮	দোতানা (গল্প)	২২
শ্রীতুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়		শ্রীবিদ্য রক্ষা ভট্টাচার্য্য	
পঞ্চ-প্রদীপ—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও বিচার বুদ্ধি	৬০	নবজন্ম (কবিতা)	২৩
(শ্রীঅরবিন্দ)		শ্রীসন্ন্যাসী সাধুগণ	
অমুবাদক—শ্রীমহাকাল প্রসাদ মুখোপাধ্যায়		চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে নয়তা (প্রবন্ধ)	৩১
প্রেক্ষাগৃহ (গল্প)	৬৩	শ্রীযামিনী কান্ত সেন	
শ্রীকুশল রায়		মানসী (কবিতা)	৩৮
বৈদেশিক বাস্তব	৬২	শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী	
শ্রীপ্রমোদ সেন		চিরন্তন (কবিতা)	৩৮
জন্মচর্চা (কবিতা)	৭৩	শ্রীজীবনানন্দ রায়	
শ্রীঅমর নাথ চট্টোপাধ্যায়		বলিরান (গল্প)	৩৯
কুলন-পূর্ণিমা (কবিতা)	৭৩	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসিক	
শ্রীঅমর নাথ চট্টোপাধ্যায়		আধুনিক মননধারা (প্রবন্ধ)	৪৭
খোলাধূলা	৭৪	শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র রায়	
শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য		বৃক্কের ভাষা (কবিতা)	৪৭
অমাদের কাব্য (কবিতা)	৭৮	শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দাস	
শ্রীঅমলা রতন ভট্টাচার্য্য		ভূপ (কবিতা)	৪৭
রূপ ছায়া	৭৯	শ্রীশান্তিস্বপ্না ঘোষ	
পরাগ পাল		শিকার কাহিনী	৪৯
আমার কি মনে হয় (জিন হারলো ও ব্রুক্স গেন্ডলু সংক্ষেপে)	৮৭	শ্রীপ্রকৃষ্ণ চন্দ্র বড়ুয়া	
মানসের আভাস		সন্ধ্যা-মায়্যা	৪৯
সম্পাদকীয়	৯৩	অধ্যাপক শ্রীবিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
আশ্রিন		শ্রীশ্রীধামরক্ষা কথা	৬০
বাংলার মুন্সী তুর্গাপুত্রা (প্রবন্ধ)	১	শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	
অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী		অমৃত (কবিতা)	৬৪
প্রাচ্য পথে (অমণ কাহিনী)	৭	শ্রীস্বপ্নীকনাথ দত্ত	
শ্রীবসন্তকুতি রক্ষিত		কল্পনা জগতের জীবজন্তু	৬৫
গান	১৮	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	
শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু		মনের কথা মুখে (রঙ্গ কবিতা)	৭১
গ্রীক, ল্যাটিন ও বাংলা ভাষা (প্রবন্ধ)	১৯	শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত	
শ্রীসুপ্রী শীল		মোহিনীর মোহ (গল্প)	৭৩
		শ্রীমহেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	

সিদ্ধর প্রেম (কবিতা)	৮১	কান্তিক	
শ্রীমদা দে		হসান্তের পত্র (প্রবন্ধ)	১
সাহিত্যে কণ্টক (প্রবন্ধ)	৮৩	শ্রীমুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	
শ্রীস্বপ্নীকনাথ সান্যাল		রূপসৃষ্টি (প্রবন্ধ)	৭
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে (প্রবন্ধ)	৮৫	শ্রীবসন্ত কুমার আচা	
শ্রীপ্রমোদকুমার সেন		ইরাকে (অমণ কাহিনী)	১২
কৈলাস ও হরগৌরী সংবাদ (রস-রচনা)	৮৯	শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	
প্রতুলানন্দ রচিত ও বিচিত্রিত		অমমুচা (কবিতা)	১৬
বর্ণ সীতা (কবিতা)	৯৬	শ্রীমকশচন্দ্র চক্রবর্তী	
শ্রীশীমা দেবী		দুঃখের বরষায় (উপজ্ঞাস)	১৭
মৃত মহরে (প্রবন্ধ)	৯৭	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	
কুমার মুণ্ডিক দেব রায় মহাশয়		বিপদায় (গল্প)	৩৪
চির প্রিয় (কবিতা)	১০২	শ্রীগুপতি ভট্টাচার্য্য	
শ্রীঅমিয়া সেন		ভূঁইচাপা (কবিতা)	৪০
স্বাস্থ্য-বিরোধ (কবিতা)	১০২	ছোট মরণ	
শ্রীমতীলক্ষ্মীমোহন বাগচী		শ্রীতীর্থী চরণ মিত্র	
অমিত্রীয়েব ফাসাদ (রস-রচনা)	১০৩	পঞ্চ-প্রদীপ—নারীর জলনা (গল্প)	৪৪
শ্রীকেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		অমুবাদক শ্রীস্বপ্না ও কুমার গুপ্ত	
অগমণী (ব্যঙ্গ কবিতা)	১০৮	বিরহ (কবিতা)	৪৮
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ		শ্রীস্বপ্নীকনাথ চট্টোপাধ্যায়	
পঞ্চ-প্রদীপ (সাদে পাঁচটার ট্রেপে)	১১০	পুরাতনের পুনরাগমন (উপজ্ঞাস)	৪৯
মোহাম্মদ মোদাক্সের		শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	
ভারতের বহির্বাণিজ্যের ধারা (প্রবন্ধ)	১১৫	প্রহ (কবিতা)	৫৩
অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন		শ্রীবাণী গুপ্ত	
মহিশাসুর মর্দিনী (গীতি-নিবন্ধ)	১১৯	বৈদেশিক বাস্তব (প্রবন্ধ)	৫৪
বাকীকুমার		শ্রীপ্রমোদ সেন	
রূপছায়া	১২৬	বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য	৫৮
শ্রীমিলন মিত্র		গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য	৬২
		শ্রীবিনয় দত্ত ও শ্রীস্বপ্নীকনাথ ঘোষ	
		প্রাচ্য পথে (অমণ কাহিনী)	৬৪
		শ্রীবসন্তকুতি রক্ষিত	
		পূর্ণ পাত্র (কবিতা)	
		শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী	

মাটির প্রদীপ ( গল্প )	৭১	পলেট গডাড	৭০
শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য	...	লিঙ্গিয়ান হার্ভে	৭১
বীণা প্রসঙ্গ ( আলোচনা )	৭৬	ভাঙ্কিনিয়া ক্রস্	৭২
শ্রীতুর্গাষোহন মুখোপাধ্যায়	...	ডিকি মুর	৭২
সাহিত্যিকা ( পুস্তক পরিচয় )	৭৮	সিসিলি কোর্ট নিজ	৭২
শ্রীস্ববোধ দায়	...	শীলা ম্যানোরাহ্	৭৩
আর্টের স্টিচালা	৭৯	আন্স সাধারণ	৭৪
বিরূপাক্ষ শর্মা	...	মিঃ বি. এন. সরকার	৭৬
রূপভাষা	৮১	একটী সাধারণ ভ্যালুত্	৭৭
শ্রীমিলন মিত্র	...	ভ্যালুতের আভাস্তরিক গঠন	৭৭
মেটো ও অ্যারিস্টটল	৯০	ভ্যালুত্ হোল্ডার	৭৮
শ্রীনিভ্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	বায়ুশূন্য কাচপাত্র	৭৮
সম্পাদকীয়	৯৩	ভ্যালুতের গ্রীড্	৭৯
		আয়নার মধ্যে কল্পরূপি	৮২
		অলিম্পিক প্রবেশ-পথ ( পশ্চিম )	৮২
		অলিম্পিক দাতার প্রতিযোগিতার কেন্দ্র	৯০
		দলীপ সিং, কে গাঙ্গুলী, নূর মহম্মদ	৯১
		ভি, পাল, জাভিন, ডেভিস্, রসিন্	৯২

## বাণ্যাসিক চিত্র সূচী

### জ্যোতি

### আবাস

উষা ( জিবর্ণ )	১	নিরতি ( জিবর্ণ )	১
শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু	৫১	শিল্পী—শ্রীস্বপন পাল	১
মহামেরা	৫২	মীতা বেঙ্গা ওহা	২
মহামেরার নবীকুল	৫২	নগর প্রথম	৭
আমার	৫৩	লোপ বুড়ী	৭
বসোয়ার খাল	৫৪	গ্রাম তরুণী	৮
বসোয়ার খালের অপর দৃশ্য	৫৪	ব্যাঙ্কে লাক্ষা শিল্পী পরিবার	৯
জন্ম গল্ফুওয়াঙ্কি	৫৬	অরুণ মন্দির	১০
জন্ম গল্ফুওয়াঙ্কির হস্তশিল্পি	৫৮	ওল্ট অরুণের তোরণে প্রহরী মূর্তি	১১
গোস্ মুর	৬৮	হিটলার	১২
জিন্ পার্কার ( এক বর্ণ )	...	সন্ধিচক্ৰি সমূহের বহুঃসং	১০
গ্রেটা গাস্কে	...	সামুদ্রাতা নাজেহাল	১১
থ্যাডিস্ কে	...	সংবাদপত্র মিছিল	১২
কানন-বালা	...		
কারল কাম্বাড	৬৯		

ষ্টার্লিন্	৫৩	জেনেটিক্সটার ( একবর্ণ )	৮৮
লিট্‌ভনক্	৫৪	গ্র্যাট—লার	৮৮
অল্‌ড্রাস্ হামলি	৫৪	ক্রস্‌বি—বেনেট	৮৮
খালের ধারে	৫৮	কার্ল—ক্রস্	৮৮
হেজুর বংশান	৬০	রামন নোভাভোর	৮৯
আরবদিগের কুটার নিদ্রাণ	৬১	শ্রীঅশোক বসু	৯০
অর্থবিগের জলপান	৬২		
শেখের ভোজ	৬৩	প্রাচীন ( জিবর্ণ )	১
ইস্রায়েলী ( জিবর্ণ )	...	শিল্পী শ্রীঅশোক বসু বন্দ্যোপাধ্যায়	১
অলিম্পিক স্টেডিয়াম	৭৫	রাজপুত্রীর বন্দিদের একাংশ	৮
এন্স, দজ	৭৬	মরকত বুদ্ধ	৯
রায়চৌধুরী	৭৭	মো-মোতা খাতা	১০
প্রেমলাল	৭৭	গ্রাম মৃত্য	১২
সিয়াম্	৭৭	গ্রামের ধান ক্ষেত	১৫
মজিদ, দ্যানটাড	৭৮	কুর্দ গৃহ	৪৪
ওদ্রাধার ব্যাঙ্কটার	৭৯	নদীতে পান-বোটি	৪৫
মেটোর মৃত্যু পরিচালক	৮০	কুর্দ দল	৪৫
পলমুনি	৮০	কুর্দবিগের গ্রাম	৪৬
জেনেট গেনর ( একবর্ণ )	৮০	নদী পথে	৪৭
আন্স ভোরশাক	৮০	দেয়াঘাট	৪৮
জেন্‌স্‌ রনডেল্	৮০	মাত্র বেহ ( জিবর্ণ )	...
কুবি কিলার	৮০	শিল্পী হাওয়ার্ড প্রাডলার ক্রীটি	...
নাইট লাইফএর দৃশ্য	৮১	সিনর মুসোলিনী	৬০
টিকার্ডে কটেজ	৮১	গুজ-জুজুর ভয়ে পৃথিবী কম্পান	৬১
আনোন্‌টেন্ ও গ্যারী কুপার	৮২	সেনাপতি চ্যাংকাইসেক	৬২
ওদ্রায়েন্ উইলিয়াম্	৮২	চীনের মহা প্রাচীর	৬২
ইন্‌ভিটেশন টু টি ওয়াল্ট্‌জ	৮৩	হিটলারের ছুই মূর্তি	৬৩
ডিক্‌ পাওয়েল্	৮৩	মিঃ লয়েড জর্জ্	৬৪
বেটি ফারনাম্	৮৩	রসিদ	৬০
জেন্‌স্‌ কাগনি	৮৪	লক্সী নারায়ণ	৬০
ফ্রেয়ার টেভা	৮৪	নাসিম	৬০
ফডি ভাঙ্গি	৮৫	নাইট	৬১
কেটি গ্যালিয়াম্	৮৫	রমনা	৬১
আন্স ভোরশাক	৮৫	সোশিস	৬১



সুশীল চাটার্জি	৮১	টোফিন	৮১
মুখ মহম্মদ	৮১	বাগদাদের নবীকুল	৮১
লীগ বিজয়ী মহমেডান পোটিং	৮২	" নোসেচু	৮২
ডেভিস	৮২	নবীতে শুফা	৮২
অলিম্পিকের ১নং প্রাচীর পথে	৮২	সাধারণ দৃষ্টি	৮২
" ২নং "	৮৩	দি মল	৮৩
লীগ বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক	৮৩	১০১ নং টানেল	৮৩
হানিদ	৮৩	তাল পাহাড়ের নিম্ন-দৃষ্টি	৮৩
বিনেজ নাথ ঠাকুর	৮৬	বি কুইন্স ফল	৮৬
হেমেন্দ্র লাল রায়	৮৭	সামার হিল টেশন	৮৭
সত্যেন্দ্র প্রসাদ বসু	৮৭	চ্যাড উইক ফল	৮৭
নিবারণ দাশগুপ্ত	৮৮	বর্ধায় সিমলা	৮৮
মনোরমা দেবী	৮৮	প্রপেক্ষিত হিল	৮৮
মিস্ রোজ	৮৮	ভাইস রীগাল লজ	৮৮
আস্টাইড অ্যাল উইন	৮৮	ইলিসিয়াস হিল	৮৮
নরমা শিয়ারার	৮৮	উৎকলিতা (পূর্ব পৃষ্ঠা)	৮৮
নেলসন এডি	৮৯	শ্রীঅরবিন্দ	৮৯
দোলবের্স দেলরিও	৮৯	মুগোলিনী	৮৯
বিলি সিউয়ার্ড	৯০	জুভার সিংহ	৯০
ম্যাঙ্ক ইভান্স	৯১	স্তর স্তামুয়েল হোর	৯১
জুডি কেলী	৯২	হাইলে সেলাসি	৯২
ম্যাডলিন কারল	৯৩	ইছদি নিকিউনের দৃষ্টি	৯৩
জেন বাম্ফটার	৯৪	অলিম্পিক ষ্টাডিয়ামের দৃষ্টি	৯৪
ফ্রান্সেস ড্বেক	৯৫	এমস	৯৫
গ্রেটা গার্ডো	৯৬	নল	৯৬
শ্রীমতী উমাশশী	৯৬	আন সাধারণ (পূর্ব পৃষ্ঠা)	৯৬
আনা রেন ও গ্যারী কুপার	৯৭	চার্লস বরার ও রুডেন্স কলবার্ট (পূর্ব পৃষ্ঠা)	৯৭
মার্লিন ডিয়েট্রিচ	৯৭	আইডা মুগিনো ও লীন ওভারমান (পূর্ব পৃষ্ঠা)	৯৭
মে ওয়েষ্ট	৯৭	ইন্দিরা দেবী (পূর্ব পৃষ্ঠা)	৯৭
লরেটা ইয়ং ও হেনরি উইলকিন্সন	৯৭	সোসেশন হাটোর	৯৭
শরৎচন্দ্র বসু	৯৯	বেটা ফারনেন্স	৯৯
		পেথি সিম্পসন	৯৯
		আনাস্টোন	৯৯
		মেয়ী কারলিসলী	৯৯

## ভাঙ্গ

পার্ব ও পার্বসারথী (ত্রিবার্ণ)

শ্রীমতী শ্রীমতীনাথ চক্রবর্তী

ডু লেটন	৮২	ভিনাসের জন্ম	৩৩
ই, ব্রাউন	৮২	রমণী (ত্রিগুহের মূর্তি)	৩৪
পলি ওয়ার্ড	৮৩	যমুনা (কনারকের মূর্তি)	৩৫
লিলি ভ্যানিটা	৮৩	প্রসাধন—অজস্রার চিত্র	৩৫
জিম ডুর্ভট	৮৪	চিত্তাশীল	৩৫
জুডি কেলী	৮৫	সময়ে রাগিনী	৩৬
কানন বালা ও রাধারাণী	৮৬	অসি-মৃত্যু	৩৭
জিন হারলো ও রাক্স গেল	৮৭	দেব সন্ধ্যা	৩৭
লোরাইন ব্রীজ	৮৮	আসর বর্ষায় (ত্রিবার্ণ)	৪০
রিচার্ড বার্বেলমেস ও হেলেন ম্যাক		শ্রীমতী শ্রীমতীল পাল	
মে ওয়েষ্ট ও পল ক্যান্ডন		শিকার দলের কয়েকজন	৪১
কানন বালা		উজ্জ্বল পর্দা	৪২
তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী		অবসর বিনোদন	৪৩
		পশিমধো গ্রামা দর্শক	৪৪
		শিকার পরীক্ষা	৪৪
		পূর্বকালে কল্পিত ভিমির ও সমুদ্রাধ	৪৫
		কালনিক সাগর পুরোহিত	৪৫
		নগকথার একটি শৃঙ্গবৃত্ত অথ	৪৬
		অমিশ্রাবী ষাঁড় ও ডাগনের সহিত যুদ্ধ	৪৬
		পূর্বকালের এক বীভৎস জন্তু	৪৬
		কালনিক উভে ডাগন	৪৭
		হারকিউলিস কর্তৃক জলজন্তু বধ	৪৭
		চীনা ডাগন	৪৭
		ভিমির গায়ে নৌকা বাধা	৪৭
		নগকথার রাজকন্যা (ত্রিবার্ণ)	৪৯
		শ্রীমতী শ্রীমতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
		ওয়েষ্ট এককের পাটচী চূড়া	৪৯
		" " প্রবেশ তোরণ—বিশাল নাগ ফণা	৪৯
		পাথরে উৎকীর্ণ—এককর	৪৯
		জানালার রেলিং ও অপর্যাপ্ত মূর্তি (ওয়েষ্ট এককর)	৪৯
		বেয়ন—এককর থম (একবর্গ)	৪৯
		ইস্কালেপিয়াস	৪৯
		ডাকনি	৪৯
		দক্ষিণ পবনের ফুলের সহিত প্রেম চর্চা	৪৯
		পম্পের কতকগুলি দৃশ্যের বর্ণনা	৪৯



অগমদীনী সংকলন আউটী ব্যঙ্গ চিত্র	১০৮ ও ১০৯	আবিসিনিয় বাহিনীর সৈন্যরা	...	৫৬	
বসিন কারেলোফ	...	১২৬	মাণ্টাথীপে বটিন রণতরী	...	৫৭
আনো ডার্লিং	...	১২৭	বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যের কয়েকটা ছবি	...	৫৮-৬২
বেটা ফারনেনস	...	১২৮	মুগমুর উপর প্যাডোণা	...	৬৪
কৃষ্ণ স্বামীর একটি দৃশ্য	...	১২৮	কাথোজ প্যাডোণার তিন মুখ	...	৬৫
ফ্রেড ম্যাকমারী ও ম্যাক ইভান্স	...		কাথোজ রাজ প্রাসাদ	...	৬৬
“লাইট আউট পোর্টের” নায়ক নায়িকা	...		কাথোজ রাজ সিংহাসন	...	৬৭
জুন ল্যাও	...	১২৯	মুখের পৈনের রাজবাড়ীর একটি মন্দির	...	৬৮
ম্যারিন ও সুলতান	...	১২৯	রাজ বাড়ীর মন্দিরভাস্কর্য	...	৬৯
দীপাঙ্ক ভট্টাচার্য ও কানন বাল্য (১৯৬৪)	১৩০	জ্যোৎস্না গুপ্তা	পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	৬৯
“ভাগ্য চক্রে” কৃষ্ণচন্দ্র ও অমর ময়িক প্রভৃতি	১৩১	বেটা ফারনেন্স	...	৬৯	
		হারিয়েট লেক	...	৬৯	
			দুর্গাদাস বানার্জি	...	৬৯
			বেটা ফারনেনস	...	৬৯
			২		
			মউরিন ও সুলতান	...	৬৯
			১৩		
			১৪		
			পূর্ণ পৃষ্ঠা		
			পূর্ণ পৃষ্ঠা		
			৫৪		
			৫৪		



## পরিচালক—চ্যাপনাল নিউজপেপার্স লিমিটেড

সম্পাদক—শ্রীমুনোজ নাস্ক

প্রথম বর্ষ

আমাত—১৩৪২

দ্বিতীয় সংখ্যা

## মেঘদূতের যক্ষ-যক্ষপু

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্তভাষ্য, এম্-এ, পি-আর-এস্

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনে বিলাসপুর ঘাইতে পথে ভারিয়া (বা ধবিয়া) ষ্টেশন পড়ে। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩৮৬ মাইল। এই ধবিয়া ষ্টেশন হইতে শতাধিক মাইল দূরে “সারগুজা” ষ্টেটের অন্তর্গত “লক্ষ্যপুর” জমিদারীতে “রামগড়” পাহাড় অবস্থিত। মহাকবি কালিদাসের “মেঘদূত” যে “রাম-শিরির” উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা এই রামগড়েরই নামান্তর মাত্র। রামগড় পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে এখনও একটি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চে মন্দিরটি অবস্থিত। শ্রীরাম-চন্দ্রের মন্দির বলিয়াই উহা সাধারণের নিকট পরিচিত। বর্তমানে মন্দিরটির অবস্থা অতি ভীর্ণ হইলেও এখনও প্রতি বৎসর এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বহুদিন যাবৎ এই রামগড় পাহাড়টি শুষ্ক জনক-ভন্ডার আন-পুণ্যোদকপূত জীর্ণক্ষেত্রে বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ১৯৩৩ বৎসর হইল প্রবৃত্তবর্ষদ্বয়গণের চেষ্টায় ঐ পাহাড় সম্বন্ধে বহু নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধুনা বিশ্ব-সমাজে রামগড় পাহাড় সুপরিচিত হইলেও

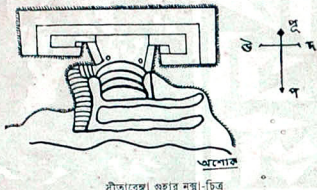
সাধারণ ঐ সকল তথ্যের বিষয় বিশেষ কিছুই অবগত নহেন বলিয়া এখানে রামগড় সম্বন্ধে ছই চারিটি কথা বলিতে হইতেছে।

রামগড় পাহাড়টি উত্তর দক্ষিণে লম্বান্বিতাবে শৃঙ্খলাকারে অবস্থিত। উহার অনেকগুলি শিখর; তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শিখরটি সর্বোৎকৃষ্ট দক্ষিণে। পাহাড়টির উত্তরভাগের পশ্চিমদিকস্থ চানুগায়ে দুইটি গুহা দৃষ্ট হয়। এই গুহাগুলি দেখিতে হইলে প্রায় ১৮০ ফিট লম্বা একটি সরু ‘ট্যানেল’ের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অবশ্য ‘ট্যানেল’টির ছাদ ছাউ উচ্চ যে হাতীতে চড়িয়াও অন্যায়সে উহার মধ্যে প্রবেশ করা যাইতে পারে। এই জন্ত ‘ট্যানেল’টির নাম হইয়াছে “হাতীগোল”। পশ্চিমদিকে (যেখানে ‘ট্যানেল’টি) আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেখানে পাহাড়ের চানুগি দেখিতে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকার। ঐ চানুগ সম্বন্ধে নিবিড় অরণ্যালী সমান্তর উপত্যকা, ও উহার পশ্চিমে পুনরাব পাহাড়ের শ্রেণী সমান্তরভাবে অবস্থিত। উক্ত অর্ধচন্দ্রাকার চানুগায়েই উল্লিখিত দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়। গুহা দুইটিই কেন উত্তরাংশে অবস্থিত গুহাটির নাম “সীতাবেন”



দক্ষিণদিকের গুহাটির নাম “জোপীমারা”। প্রথমে সীতাবেঙ্গা গুহার কথাই আলোচনা করা যাক।

সীতাবেঙ্গা গুহার প্রবেশ করিবার পথের সমুখে কয়েকসারি পাথর হইতে সুদীর্ঘা বাহির করা লম্বা লম্বা রক আছে। এই রকগুলির উপরিভাগ বেশ সমতল—প্রায় সমতল বলা চলে। রকগুলি দেখিতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকার, ও গ্যালারির মত ধাপে ধাপে ক্রমনিম্ন হইতে ক্রমান্বয়ে কোঁদা হইয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য গবেষক পণ্ডিত এগুলিকে গুহা প্রবেশের ধাপ বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণ অসম্ভব আবাদিগের নিকট সমস্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, প্রথমতঃ—প্রবেশ-পথের সমগ্র সম্ভবতঃ ব্যাপিগা একরূপ বিরাট সোপান রচনার (grand staircase) কোন বিশেষ সার্বভৌম ছিল বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ—প্রবেশপথের সমুখস্থ ছাড়াইয়াও আরও অনেকটা দক্ষিণে এই রকগুলি বিস্তৃত হইয়া আছে; সেই অংশ—হইতে গুহামধ্যে প্রবেশের কোন উপায়ই নাই। তৃতীয়তঃ—এই রকগুলির উত্তরপাশে প্রথমে পশ্চিম হইতে পূর্বে ও পরে উত্তর হইতে দক্ষিণে কয়েকটি বাজ কাটা আছে। এগুলিকে জলনিষ্কাশনের উপযোগী পয়ঃপ্রণালী বলা চলে না; কারণ ছাড়াইগের দ্বারা গুহার ভিতরের জল বাহির হইবার কোন উপায় নাই (১)। পাশ্চাত্যের উচ্চাভিগের সাহায্যে জনসাধারণ বাহির হইতে ভিতরে ও ভিতর হইতে বাহিরে অনায়াসে যাওয়া আসা করিতে পারে। অতএব, রকগুলিকে ধাপ না বলিয়া এই খাঁজগুলিকেই ধাপ বলা সম্ভব। রকগুলিকে সমুখের অভিমুখোপযোগী রঙ্গরঙ্গ নির্মাণের উপযুক্ত সমতল ভূভাগ (plateau) যথেষ্টই আছে, আর এই রক বা গ্যালারির ধাপগুলিতে পঞ্চাশ বা ততোধিক দর্শকের বসিবার স্থান সম্ভবান অনায়াসেই হইতে পারে।



সীতাবেঙ্গা গুহাটি দৈর্ঘ্যে ৪৬ ও প্রস্থে ২৪ ফিট। ভিতরে তিন দিকে তিন সার রক গুহাপায়ে কোঁদা আছে। এই রকগুলি উচ্চতায় ২৮ ফিট ও বিস্তৃতিতে ৭ ফিট—সমুখদিকের কিছু নীচু ও পশ্চাদ্ভাগে কিছু উঁচু। সোকা কথায় এই রকগুলিও গ্যালারির কাজ করিত—হুই তিন সার লোক এই রক গুলিতে বসে বসিতে পারিত। পিছন দিক উঁচু বলিয়া পিছনের সারের লোকেরা কোন অমুবিধাই ভোগ করিত না। ইহা ছাড়া গুহাটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রবেশপথের দুইপাশে মেঝের উপর দুইটি সরু অথচ গভীর গর্ত খোঁদা আছে। এই গর্তে হুইটি দণ্ড প্রবেশ করাইয়া গুহাঘরে পরদা খাটান বাইত বলিয়া মনে হয়।

গুহাটি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কতিপয় ব্যক্তনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাকে গ্রীক আদর্শে নির্মিত ভারতীয় রঙ্গালয় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। নানা কারণে, এ সিদ্ধান্ত এখন অতল বলিয়া তাঁহারাও পরিভ্রান্ত করিয়াছেন। বরং ইহাকে প্রাচীন আদর্শে নির্মিত বাটি ভারতীয় রঙ্গালয়ের নৃপপ্রায় নির্দল বলা বাইতে পারে (২)। সমস্ত গ্রীষ্ম ও শরতে দর্শকগণ বাহিরের রক-গ্যালারিতে বসিয়া সমুখে মুক্ত বায়ুতে অঙ্কুরিত অভিনয়াদি দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতেন। আর যখন বর্ষা নামিত, অথবা হেমন্ত ও শীতের শীতল বায়ুর প্রকোপে বাহিরে বসি হুঁসোরা হইত—তখন দর্শকগণ গুহাভ্যন্তরে প্রাশ্রয় হইতেন ও গুহাপাথল্যধী গ্যালারি-রকে বসিয়া রসোপভোগ করিতেন। প্রবেশপথের দুই বাহিরে গর্ত দুইটিতে হুইটি

(২) “কার্য্য: শৈলগুহাকারে। বিজুনিম্ন ভিমগুপঃ”—(ভরনাসীতাংশ ২৮১)

দণ্ড প্রবেশ করাইয়া বৃষ্টির ছাট ও শীতল বায়ু নিবারক আরণ্য গাটান হইত। আর সঙ্গে সঙ্গে উহা যবনিকারও কাজ করিত।

এই সীতাবেঙ্গা গুহার ভিতরের দেওয়ালে একটি প্রাচীন উৎকর্ষী লিপি দৃষ্ট হয়। প্রায়তঃস্বপ্ন-সমাজে ইহা শাস্ত্রী স্থপরিচিত। দুইটি সারিতে লিপিটি লিখিত। প্রত্যেক সারিটি ৩ ফিট ৮ ইঞ্চি করিয়া লম্বা ও প্রত্যেকটি অক্ষরের মাপ গড়ে ২৪ ইঞ্চি করিয়া। প্রবেশপথের উত্তরাংশে দ্রিক ছাদের নীচে পাছাড়ের গায়ে লিপিটি বর্তমান। দুইটি সারিরই শেষ অংশ যেন কোনরূপ বজ্রলেপ (সিমেণ্ট) দ্বারা লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রায়তঃস্বপ্ন Bloch সাহেব বহু চেষ্টা করিয়াও এই সিমেণ্ট উঠাইয়া লেখটির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই জ্ঞান লেখটির কয়েকটি অক্ষর গুর অস্পষ্ট, শেষের কয়েকটি ত একবারেই লুপ্ত। লেখটি রাশ্ট্রী লিপিতে লিখিত। ইহার পাঠ (৩)—

১ম সারি—অধিপত্যং হ্রদং। সভাবগরু কবয়া

এ রাতয়ং.....

২য় সারি—হুলে বসতিয়া। হাসাবাহুল্যতে।

কুম্ভকন্তং এবং অংগং (ত).....

Bloch এর পাঠ্যসূচী লেখটির অর্থবাদ নিয়ে প্রশস্ত হইল—

(১) সভাবগরু কবিগণ স্বয়ংকৃত উজ্জীপিত করেন, বাহায়া.....(‘রাতয়ং’এর অর্থবাদ Bloch দেন নাই; কারণ প্রথম সারির শেষভাগের কতগুলি অক্ষর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই লুপ্তভাগের উদ্ধার ব্যতিরেকে ‘রাতয়ং’এর অর্থোদ্ধার তিনি সম্ভব মনে করেন নাই।

(৩) পাঠান্তর—১ম সারি: ‘ভা’ স্থলে ‘ভা’ (M. Boyer) Bloch ‘ভা’। ‘ক’ স্থলে ‘র’ (Cunningham)। ‘রা’ স্থলে ‘তি’ (Cunningham)

দ্বিতীয় সারি—আলোকচিত্রে ‘হা’ কে ‘হি’ বোধ হয়, কিন্তু ইংরেজি পাছাড়ের ফাট মাত্র, প্রকৃত লিপি নহে। ‘ক’ স্থলে ‘ত’। শেষোৎ অস্পষ্ট।

কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন—রাত্রাং—রাত্রিতে।)

(২) বাসস্তী (পূর্ণিমায়া) দেল উৎসবে যখন হাভ (সঙ্গীতাদি) অমৃত হইতে থাকে, তখন জনগণ নৈজ নিজ গলদেশ) এইরূপে কুম্ভকীত মালো অলঙ্কৃত (করেন)।

কুম্ভকন্তং = কুম্ভকন্তীত = কুম্ভকন্তীত (অথবা কুম্ভকন্তীত)।

হুলে বসতিয়া = দেলে বাসস্তাং। ইহা Bloch সাহেবের ব্যাখ্যা। কিন্তু ‘হুলে বসতিয়াকে’ অনায়াসে ‘হুরে বসস্তা’ রূপেও পরিণত করা যায়। তখন প্রথমিলীর উদ্দেশ্যে রচিত প্রেমিক কবির উক্তি বলিয়া এই লেখটিকে গ্রহণ করা বাইতে পারে (৪)।

ইহা ত গেল সীতাবেঙ্গার কথা। এইবার জোপী-মারা গুহার একটী আলোচনা করা যাক।

জোপীমারা গুহাটির ভিতর এত কাণ্ডকারখানা কিছুই নাই। কয়েকটি সমতল রক মাত্র আছে। এগুলি সীতাবেঙ্গার রকের মত চান্দ্র গ্যালারি-রক নহে—বিশ্রামোপযোগী সমতল রক। জোপীমারা গুহাও একটি শিলালিপি আছে। উহার পাঠ নিয়ে প্রবৃত্ত হইল—

(১) শুভকৃ নম (I)  
(২) দেবদর্শিকা (I)  
(৩) শুভকৃ নম (I) দেবদর্শিকা (I)  
(৪) তং মণিধং বল (লু) ন শ্রেয়ে (I)  
(৫) দেবদর্শিনে নম (I) লুপদং (II)  
M. Boyer উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—  
(১) শুভকৃ নম।

(৪) “Prof. Lunders.....shows that caves of ancient India were not entirely for ‘anachorites, but often served quite different purposes as the abode of dancing girls and their lovers.’”

Bloch, Archaeological Survey of India Report, 1903-4, P. 127.

কেহ কেহ তাহাও বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।



(২) দেবদাসী।

(৩) স্তম্ভিকা নারী দেবদাসী।

(৪) 'টুপপের (মহো) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) তাহাকে কামনা করিত।

(৫) দেবদত্ত নামক রূপদক্ষ (৫)।

এই দুইটি লেখাই অশোকের সময়ের ( খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের ) ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত হইয়াছিল।

(৬) এই "রূপদক্ষ" শব্দটি লইয়া বড়ই গোলমাল আছে। Boyer সাহেব ইহার অর্থ করিয়াছেন—তক্ষ। Blochএর কল্পিত অর্থ—চিত্রকর। রঙ্গীন্দ্রনাথ ও

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, উহার অর্থ—শিল্পী। কিন্তু আমাদের মনে হয় "রূপদক্ষ" অর্থ "অভিনেতা" বা "নট" হওয়াই সম্ভব। নীতাবেঙ্গার রঙ্গমঞ্চ, জোণীমারার নৈপথ্য, দেবদাসীর সহিত প্রেম

প্রভৃতি কতগুলি বিশেষ বিশেষ কারণে প্রভাবিত নট-রূপ অর্থ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। নীতাবেঙ্গা ওহাটিকে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ বলিয়া

স্বীকার করিলে জোণীমারাকে উহার নৈপথ্য বলিয়া গ্রহণ করাও বিশেষ অসম্ভব হইবে না। কারণ, ওহাটি যে বিশাখাপাণ্ডবী ভাবে লিখিত—ইহা পূর্বেই বলা

হইয়াছে। স্মৃতি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী মহাশয়ও আমাদের শিষ্যস্বর্গে নানাসিদ্ধ হইয়াছেন—

"পুটপুট বিত্তীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত কোন নটীর প্রেম-কবিত্ব কোন 'রূপদক্ষ' নটের কাম-কথার উল্লেখ্যাকারী, হোটেলাগবুদের অন্তর্ভুক্ত সমস্তজারাকো

রামগড় পর্বতে অবস্থিত এক প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের ভগ্নাবশেষ....." ঐদেবদাসী নামক পুস্তকের

লিখিত "শকুন্তলায় নাত্যকলা" পুস্তকের

সূচিকা—অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী এম্ এ, পি-আর-এস লিখিত—পৃঃ ১১। এই তিন ছত্র লেখ

কর্তা প্রাক্তরের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হয়—

দত্তা স্যো কানো তালপ শ' অত্বে বলিয়া। 'ক' অক্ষরটি তাল্পক—অশোকের কালসী অক্ষরশাসনে ইহা

বলিয়া প্রকৃতবিদগণ অস্বাভাবিক করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রচলন খ্রীষ্টাব্দ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে লেখণ পাইতে থাকে, ও গুপ্ত শাসন সময়ে

উহা একরূপ সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই

সময়ে নির্জন প্রদেশে পর্বতগুহা মধ্যে একজন অপূর্ণ লিপিদর্শনে সাধারণ জনগণের দ্বারা যে নানাবিধ

পাওয়া যায়। 'ই' কারের প্রভাবে 'ক' এর বিচ্ছিন্ন কষ্টা উচ্চারণ তালব্য বৈধা হইয়া পড়ে।

সুনীতিবাসু ইহার সংস্কৃত অর্থবাদ করিয়াছেন এইরূপ—

স্তম্ভিকা নাম। দেবদাসিকা।

তাম্ অকামাচ্ছিত্তি (?) বাৱণসেয়ঃ।

দেবদত্ত নাম রূপদক্ষ।

[ অথচ "অকামাচ্ছিত্তি" পদটি তিনি সংস্কৃত কাম ব্যাকরণে পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমরা জানি, "অচাকমত" বা "অচকমত" পদই ব্যাকরণ

সম্মত।] ইহার ইংরাজী অর্থবাদও তিনি করিয়াছেন—

Satanuka by name, a handmaid of the Gods (= temple-dancer); her loved he of Banares, Devadina (?) by name, skilled in

forms (= painter, or sculptor? skilled in figures or, accountant? )

[ "রূপদক্ষ" কথাটি লইয়া বিজ্ঞত বিচার আদার Presidency College Magazine, Vol XII,

No. II, pp. 176-204 ও "ন্যায়র" ৩৪ বর্ষ ১১শ, ১২শ, ও ১৩শ সংখ্যায় করিয়াছে। সে বিচার এখানে

সম্পূর্ণ অব্যক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ]

সুনীতিবাসু তাহার সুরঙ্গিম গায় ("The Origin and Development of the Bengali Language.")

মধ্যে এই লেখটি ধরিয়াছেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই "রূপদক্ষ" শব্দটির প্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শব্দটি

পেয়ে কবি খুব গৃহীত হইয়াছে, ওরিস্টা শব্দের প্রতিভা হিমাতে বাঙলায় ইহার প্রয়োগ করেন। অথচ ইহার সাময়িক

অঙ্কত করনার উদয় হইত—তাহাও বিচিত্র বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ লোকে ঐ লিপি দেখেযোনি

বিশেষের কীট্রি প্রচার করিয়াছিল—এরূপ অস্বাভাবিক ও বোধহয় বিশেষ অসম্ভব হইবে না। স্তম্ভিকা

ও দেবদত্ত—ইহারা দেবেযোনি বিশেষ (৬)—কোনও কারণে, শাপদত্ত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়; আর

সেই ঘটনা চিরবর্ষীয় করিয়া রাখার জন্ত এই অজ্ঞাত কবির নিকটের বৈশ্বকামিনী লিপিবদ্ধ

করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।—এইরূপ নানাবিধ জনশ্রুতি হইতে কয়েক পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল।

খ্রীষ্টাব্দ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাকবি কালিদাস এই জনশ্রুতি শ্রবণে উহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'ন

প্রতিবাদ আমরা পূর্বেই প্রবন্ধরূপে করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে। "নৃপদক্ষ" শব্দটি "রূপদক্ষ" শব্দের প্রতিশব্দ নাও হইতে পারে।

নিম্নাংশে "নৃপাকর্ম" প্রসিদ্ধ বস্তু। নৃপাকর্ম বলিতে বুঝায়—রঙ্গশিল্পের বা রঙ্গমঞ্চের সমুদয়ভাগের কার্যকার্য।

"নৃপাকর্ম" বলিতে এই কার্যে দক্ষ—"নৃপাদক্ষ"কেও বুঝাইতে পারে। তবে যেদিক দিয়াই হউক না কেন,

দেবদত্তের সহিত রঙ্গমঞ্চের নিকট সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। Bloch "নৃপ" স্থানে "বান" পাঠ

গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন—স্তম্ভিকা নারী দেবদাসী বালাগণের জন্ত শয্যা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

জোণীমারাকে নৈপথ্যগৃহ কল্পনা করিলে অর্থটি বেশ সম্ভব মনে হয়। গুহা মধ্যে যে সকল Fresco চিত্র

দৃষ্ট হয়, Blochএর মতে তাহা দেবদত্তেরই অধিকৃত। যাহাই হউক বর্তমান প্রবন্ধে এ সকল অবাস্তব বিচারের

কোন প্রয়োজন নাই। নীতাবেঙ্গাওহাটস্থ হইতে যেটামাত্র পাওয়া যায় যে, দূরে অবস্থিত প্রাণমণ্ডীর চিত্তায় কবির স্বভাবের গুরুভারাক্ষত দ্বারা উজ্জীর্ণ

হইয়া উঠিয়াছে, ইতাবি। আর জোণীমারার গুহায় শিল্পলেখ এই দুই চিত্রাবৃত্ত প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর নাম

সমাজে বকে ধারণ করিয়া আছে—দেবদত্ত ও স্তম্ভিকা।

(৬) "দেবদাসী" বলিতে আজকাল শুধু মন্দিরের

বলিয়াই আবাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। পরে মহাভারতের শিখণ্ডী উপাখ্যান (৭) ও ঐরামচন্দ্রের বনবাসকালে

উক্ত রামগিরিতে অবস্থান প্রভৃতি নানাবিধ উপাখ্যানের মার আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের পরস্পর শিশুণ ও

স্বকীয় অসম্ভাব্যার্থী প্রতিভা, মনোমুগ্ধকারিণী কল্পনা ও অতুলনীয় কবিরশক্তির বলে "মেঘদূত" নামক

খণ্ডকাব্য রচনা করেন। তাঁহার প্রিয়বিরহী বন্ধ এই "দেবদত্ত" ও তাঁহার "তরী" শ্রীমা শিখরিশন্য,

অলকাবাসিনী, বিরহিণী বন্ধবৎ এই দেবদাসী "স্তম্ভিকা" ('তহ' হইতেই তরীর কল্পনা); আর মেঘদূত

প্রেরিত নিখিল বিরহিদ্বয়ের প্রতিজ্ঞানুগ এই সন্দেহ

নষ্টকীকেই বুঝায়। যে সকল রমণীকে শিশুকাল হইতে দেবতার গ্রীতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিয়া

রাখা হয়, তাহারা—"দেবদাসী" নামে পরিচিত। প্রাক্তরে দেবতার উৎসর্গসম্বন্ধে নৃত্যগীতি ও গোপনে

গণিকাভিহী ইহাদিগের মূখ্য অবলম্বন। দক্ষিণভারতের দেবদাসীরাষ্ট্র বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু "দেবদাসী" শব্দের যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিলে "দেবতার দাসী"—

দেবেযোনি বিশেষের স্ত্রী—এরূপ অর্থও সম্ভব হইতে পারে।

(৭) শিখণ্ডীর জন্ম হয় খ্রীষ্টাব্দে। পিতা রূপদ উহার স্ত্রীকল্প যোগেণ করিয়া দর্শনগতির কল্পার সহিত

শিখণ্ডীনার (বা শিখণ্ডীর) বিবাহ দেন। রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ায় দর্শনগতি রূপনের বিরুদ্ধে

অভিমান করেন। সেই সময়ে শিখণ্ডীনার ছাত্রের বাণিত হইয়া স্থাপক নামক কুবেরাজের যক্ষ

শিখণ্ডীনার স্ত্রীর স্বয়ং গ্রহণ করিয়া নিজেই পুষ্ক শিখণ্ডীকে প্রদান করেন। বিপদ কাটিয়া গেলে নিজ

নিজ রূপ পরিবর্তন করা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। হঠাৎ কুবের স্থাপককে অস্বাভাবিক আনিয়া সমস্ত

ব্যাপার জানিতে পারায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ন, ও তাহার অভিপ্রাণে স্থাপক শিখণ্ডীর মৃত্যু পর্যন্ত স্ত্রীকল্প থাকিতে

রাখা হ'ন। মহাভারত, উদযোগপর্বে—১২০-১১৪ অধ্যায়।



উক্ত উৎসর্গ শিলালবের ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নাই। অবশ্য এ কমন গ্রন্থযোগ্য হইবে কিনা, তাহার বিচার ভবিষ্যৎকালের উপর অর্পণ করা যাইতেছে।

রামগড়ের বৈশিষ্ট্য তিনটি—(১) উহা সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র বাসস্থান, (২) উহার সীতাবেন্দুগুহা প্রাচীন ভারতীয় রম্যকালের একটি অপূর্ণ নিদর্শন।

ও (৩) উহার জ্যোতীর্ষ্যগুহা ভগবতের শ্রেষ্ঠ ঋণ কাব্য মেঘবৃতের উৎপত্তির অমূল্য উপাদান। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম দুইটি বৈশিষ্ট্য সর্বসম্মত। তৃতীয়টি অবলোককের কখনো প্রস্তুত; কিন্তু উহা অলীক বা অসত্য হইবার কোন কারণ নাই।

## প্রাচ্যপথে

### শ্রীমদ্রত্ন রক্ষিত

#### শ্যাম

[ ১ ]

যাত্রী

প্রায় (Pray) থেকে শ্রাম ট্রেই ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেস গাড়ীখানা ছাড়তে যখন আর দেবী নেই, তখন চোখে পড়ল, একটি মেয়ে আর একটি মহিলাকে দু'হাত তুলে বাঙ্গালী ধরণের নমস্কার করে' বিদায়-অভিবাদন জানালে হিসমুখে। মেয়েটি চীনা নয়, মালাই নয়, জাপানী নয়—বাঙ্গালীও নয়। পরে দেখেছি, শ্রাম নবনারীর অভিবাদন-প্রথা ঐ ধাঁচি বাঙ্গালী ধরণেরই। বস্ত্রায় দেখেছি, মালায়ে দেখেছি, মধ্য ও বৃহত্তর চীনে দেখেছি,—বাংলার এই বিশিষ্ট অভিবাদন-প্রথাটি আর কোথাও নাই। জাপানী অভিবাদন-পদ্ধতির মাথুর্গ ও আন্তরিকতা মুগ্ধ করেছে; কিন্তু বাংলা থেকে এত দূরে, তার এই সহজ প্রথাটি ও তার আন্তরিকতা অজ্ঞানের কাছে বড়ই মিষ্টি লাগল। পরে জানলাম, বাংলার সঙ্গে শ্রামের মিল আরও অনেক জায়গায়।

কলিকাতা থেকে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালাম্পুর, ও পিনাঙ পর্যন্ত পুণ্য এবার নুতন নয়। এখান থেকে এবার আরম্ভ হ'ল আবার নুতন পথ, নুতন দেশ, নবতার

এইবার হুজুগ পেনাঙ জীবনের সমুদ্রগর্ভী মাগুরের প্রধান ভূভাগের

মাছঘ, নবতার মন্দির—নব অশ্বশাসন, নব রীতি, নব সাধনা ও আকৃতি।

জলের পাশে স্থল না থাকলে সৌন্দর্য্য সীমা হারায় না, স্থলের উপর জল ধরা না দিলে সুনদের প্রতিবিম্ব পড়তে পায় না। সমতল ভূমির মাঝে টুকরো কিম্বা বিরতি পাহাড় মন্দিরের মত মাথা উঁচু করে ক'রে না থাকলে, ভূমির মহীয়ান ভাবটুকু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠে না। রবার পাড়ের ঘন আবাদের মাঝ দিয়ে, স্বর্গাসন্নত গাড়ীখানি শ্রাম ও মালয় রাজ্যের সীমানা, পেজ বেসার ছাড়িয়ে চলল। শুষ্ক-বিভাগের এবং ছাড়পত্র বিভাগের প্রাথমিক অস্থান হ'য়ে গেল। গ্রামল ক্ষেত এবং নারিকেল কুঞ্জের পর চুনাপাথরের অস্তুর আকারের শৈল, কখনও বা ঘন বৃক্ষরাজিপুর পাহাড়গুলি অতিক্রম করে চলেছে।

কেমন যেন বহু মিল আছে,—কেমন যেন একটু ভিন্ন। ভূমণ্ডলের ভূ হাজে একটাই,—রাষ্ট্রগুলো ভিন্ন।—কোথাও পাশাপাশি, কোথাও মাঝে একটু পাহাড়, বা বনানী বা বানিকটা জলধারা; রাজ্যের পাশে ভিন্ন রাজ্যের ভূমি আরম্ভ। এমনি দেখে কোথায় কয় জায়গারই বা পার্থক্য বোঝা যায়? দেশে দেশে অনেক মিল আছে—জাতিতে জাতিতে নেই; মাছঘে মাছঘে মিল আছে—ধর্ম্মে ধর্ম্মে নেই; ধর্ম্মে ও ভাবের

যেখানে মিল আছে ভাষায় তা নেই। ভাষারও যেখানে মিল হয়েছে, জ্ঞানার অমূল্য, জীবনের প্রয়োজন গুলিতে যেখানে কত মিল রয়েছে,—আচার রীতি-নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ ও অশ্বশাসনে সে মিল নেই। অমিলের মাঝে রয়েছে কত মিল, মিলের মাঝে প্রতি জীবনেরও কত অমিল!



মণ্ডর প্রথম

মাটির সঙ্গে মাটি, জলতরঙ্গের সঙ্গে জলতরঙ্গ আকাশের সঙ্গে আকাশ যেখানে মিশে রয়েছে,—অবিভাগী মাহুয়ের মাঝে সে মিলটি কিসে অসম্ভব হ'য়েছে, কি আশ্রয় করে কি অশ্রবল করে এই অমিল চলছে? রাজ্যসীমা, ধর্ম্মসীমা, সমাজসীমা এবং শিক্ষা ও সংস্কার তরুণির আশ্রয়স্থল এবং ভাষার চরুশ্রী প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে এই মিলনের পথ অবরোধ করে। আকাশ, জল, মাটি এবং মাহুয়ের অস্তুরতম আকৃতির মাঝে যেখানে পার্থক্য বা সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানেও রুচিম সীমা করা হয়েছে। পৃথিবীতে রুচিমতাই কি চিরদিন জয়-মুক্ত থাকবে? কেন মাহুয়ের সঙ্গে পৃথিবীর সলল মাহুয়ের মিলনের সলল পথ স্থগন থাকবে না? মাহুয়ের মাঝে যে মিলটুকু বা যতটা মিল এবং সঙ্গ স্বাভাবিক, তা ক্ষিরে আসবে বা সমুদ্র হবে কত দিনে—কেমন করে—কোন্ পথে?

পাহাড় চিরে ঘন জঙ্গলের পাশ দিয়ে পথ ক'রে গাড়ী চলে। কোথাও বা মাঠ, প্রান্তর ও তালবৃক্ষবিছান বেখে মনে হয় যেন আমাদের বাংলারই বোলপুর অঞ্চলের দিকে চ'লেছি। প্রজ্ঞাতে শ্রাম উপমাগরের প্রশান্ত নীলস্র শোভা কোথাও বা সৌহবর্ষ হতে দুষ্টির সামনে প্রসারিত হয়। মাগুরতীরবর্তী শ্রাম-নিবাস ছয়দিন সঘর

ছাড়িয়ে, প্রচুর বানকুতের মাঝ দিয়ে, গ্রাম পঞ্জীর পাশ দিয়ে গাড়ী চলে। পুরাতন স্থিতি-বিজড়িত পেচাবুড়ি অতি-ক্রান্ত হ'লে চুনাপাথরের অস্তুরতরঙ্গ পাহাড়গুলি এবং দূরে ব্রহ্মদেশ ও শ্রামের সীমান্তে টেনাসেরিম পর্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। রাজবুড়ির পর, শ্রামশ্রীরের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন 'নগর প্রাচীর' অতি অমনোহর ও সুবৃহৎ খণ্ডীকৃতি প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দিরটি চোকের সামনে এনে, গাড়ীখানি ষষ্ঠ রাসের সেতুর উপর দিয়ে

যেয়ে পৌঁছাল ব্যাকুলে। শ্রামের কত প্রাচীন সঘর গুলির নামেও ভারতের ছাপ রয়েছে। ব্যাকুলের আগে অব্যাহার ছিল প্রাচীন রাজধানী, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম রাজশক্তির আক্রমণে সে নগর বিলুপ্ত হয়। অব্যাহার



লোপ বড়ি

সরিকবর্তী লোপবুড়িও শ্রামের অতীত গৌরব-চিহ্ন বুকে ধারণ ক'রে আছে। গ্রাম ও সঘর কোথাও এক নয়। পঞ্জীর সন্ধান

রিক্ততা ছাড়িয়ে, জনবহুল, পথবহুল, গ্রামরাজ্যের রাজধানীর মধ্যে একেবারে এসে পড়ল। গ্রামধানীতে ঐক্য-বিলাস ও দারিদ্র্য উভয়ই বর্তমান।

[ ২ ]

ব্যাঙ্ক

জোকায়ীয়া মেনাম (নদী) তীরে গ্রামরাজ্যের বর্তমান রাজধানী এই ব্যাঙ্ক সহরটি গ্রাম উপসাগর তীর হ'তে ৩৫ কিলোমিটার। গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগ বাস-বাণিজ্য এই ব্যাঙ্ক বন্দর হ'য়ে যায়। সাগরগামী বড় জাহাজগুলো এবং কোন বড় জলযানই অবশ্য এ পর্যন্ত আসতে পারে না। কিছু দূরে মোহানার গথ যে বিশিষ্ট বার (barb), তার ওরিকেই এদের সীমানা।

এশিয়ার পূর্ব দক্ষিণ অঞ্চলের দশলক্ষ বসতির এই রাজধানী ও তার সহরতলি পুরাতন ও নতুন অসুপরি সমাবেশে আকীর্ণ। বহু মন্দির বা ফায়া, বহু সিমেমা ও বহু নাচবর সমাকীর্ণ এই মহা নগরীতে কতকালের এই আর একটি মানব সভ্যতার ধারা ধরা দিয়ে আছে। অতি বিচিত্র বস্ত্র এই মানব সভ্যতা! কত কালের, কত বিভিন্ন প্রান্তের, কত ভাবের, কত প্রয়োজনের যাত-প্রতিযাত, কত সংস্কার, শিক্ষা ও অশিক্ষিত দিয়ে এই সভ্যতা সংস্কৃতির সৃষ্টি। নিম্নত সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও পরিবর্তন দিয়ে এই সভ্যতার অভিব্যক্তি ঘটে চলেছে। মানব সমাজের মাঝে কোথাও কোন সভ্যতা একেবারে নিত্যমূল্য মৌলিক ও অমিশ্রিত আছে কি?—ইতিবাচক হ'য়েও নেই। প্রত্যেক সভ্যতায় আজ অজ্ঞাত সভ্যতার কিছু না কিছু সমিশ্রণ।

ব্যাঙ্ক ও তার অধিবাসীদের দেখলে এই কথাই মনে হয়। একদা ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে বিপুল ও ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন হয়েছিল এই গ্রাম-অধিবাসীদের। ধর্মের ও নানা আদর্শ বাদের কাছ থেকে নিজেছিল, সে যুগে অদের সঙ্গে এদের রক্তের সম্পর্কও ঘটে নাই কি? আজ সে দুই পথই বন্ধ হয়ে গেছে। কাঁচের সভ্যতার প্রভাব এ জাতির উপর কম পড়েনি। প্রদেশ তার বিস্তৃত সীমান্তসংলগ্ন প্রতিবাসী।

ইন্দোচীন বা চীনও তাই। চীন-অধিবাসী, ইন্দোচীন অতিক্রম ক'রে আজ এদেশকেও প্রাবিষ্ট ক'রে ফেলেছে। রক্তের সমিশ্রণ এ দিক দিয়ে হয়ে পড়েছে এবং চলেছে সুগুরু। এই সঙ্গে তার ভাবও কি বাদ গিয়েছে? এদিকে ব্রহ্ম ও মালাই রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপর দিকে ফরাসী সাম্রাজ্যের ইন্দোচীন। একদা জাঙ্গান প্রভাব ও মঙ্গলের নিদর্শনও রয়ে গেছে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতাও তার পরশকাঠি মুলিয়ে চলেছে, কিন্তু ন দিক দিয়ে, কত না প্রত্যাকভাবে এবং অলঙ্কারে।



আধুনিক গ্রাম তরুণী

গ্রাম নরনারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি,—মনে হয় যেন কতকালের কত রকমের সভ্যতা ও সংস্কার সেখানে অন্তর্নিহিত ও ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তাদের মন্দির, ভিক্ষু ও পূজাপাঠ দেখি, গৃহ দেখি, বিপনী-সজ্জা দেখি, শিল্পকার্যের নিদর্শন দেখি, রাজগৃহ, কাউন্সিল-ভবন ও সেনাবাস দেখি, পোষাকপরিচ্ছদ, জীভনীতি ও নৃত্যকলা দেখি, ভাষার পরিবর্তিত রূপগুলি, সঙ্গীত

ও গান,—কতরকমের ছাপ প'ড়েছে এ জগতে,—কোনটি তাদের একেবারে নিজস্ব সম্পদ? যে জাতি আজ যে দেশের অধিবাসী, একদা সে জাতি হয়ত ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে পুষ্ট হয়ে এসেছে। যে খমের বংশের রাজদণ্ড এসকল অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছিল তা কি আজও আছে? কোন একটি দেশের



ব্যাঙ্ক লাক্স-শিল্পী পরিবার

সুসুপ্রসারী ইতিহাসের কোন অংশটিকে বাদ দিতে পারব? আজও তা দেখা যাচ্ছে, যে এখানকার ধর্মের আদর্শ ও শিক্ষার আদর্শ লগ্না হচ্ছে বিভিন্ন স্থান হ'তে, রণনীতির অহুতরণ অপর আর একটি দেশ হ'তে, বাস-বাণিজ্যের বাস্তবতা রয়েছে ভিন্নতর শক্তিশাল্যের কসায়ত, রাজনীতি ও রাজশাসনের আদর্শ নিয়িত কোন গোপন কেন্দ্রসমূহের প্রভাব হ'তে। আমরা যাকে জাতীয় সভ্যতা ধরি, তা হ'চ্ছে একটা সমিশ্রণ। এই সমিশ্রিত সভ্যতারও বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য স্থানে স্থানে আছে দেখা যায় সত্য। যদিও জাতির নিজস্ব সভ্যতা ব'লে বস্তুটি ক্রমান্বয়ে পড়ছে জটিল ও অপ্রণয়োগ্য।

ও অটু অগ্রণ  
( ৩ )

যেমন সর্পক, বড় সহরের মধ্যে একদা প্রাচীন স্ট্রাব ছিল, মন্দির ও রাজবাড়ী। তারপর এখন হয়েছে মিউজিয়াম, শিল্পকলাভবন, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, চিড়িয়াখানা, বোটানিকাল গার্ডেন, নগরোদ্যান, জোড়া ও বস্ত্র

প্রোগ্রাম, নাট্যশালা, স্টেশন, হাসপাতাল, ব্যাঙ্কগৃহ প্রভৃতি কত কিছু। আজ এ সকলেরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানব-প্রগতির এমন একটা সময় গিয়েছে যখন মন্দির ও রাজ-বাড়ীকে কেন্দ্র ক'রে সহরের সকল কিছু দানা বেঁধে থাকত, এবং শুধু সহর কেন জাতির শিক্ষায়তন ও সভ্যতাও পড়ে উঠেছে সেখানকারই বিশিষ্ট প্রভাবমত! আজ যদিও তেমন নয়, মধ্যযুগে ধরাপুষ্টে সর্পক এমন একটা কাল গিয়েছে,

যেখানে দেখা যায় প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাদের স্বরূপ মন্দিরগুলিকে (মসজিদ, গির্জা ব, ফায়া) আশ্রয় করেই সকল শিক্ষা শিল্পপ্রতিভা, ধনরত্ন ও লোকশ্রদ্ধা কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে।

আজও পৃথিবীর সর্বদেশে নতুন মন্দির নির্মাণ আর হয় না এমন নয়, কিন্তু মন্দিরের সে ঐশ্বর্য আর নাই,—মন্দির প্রতি জাতির অন্তরস্থলে যে স্থান অধিকার করেছিল আজ আর তা নাই। একে একটি জাতির অন্তরস্থল মনে ক'রে, তার সাধারণারূপে, তার শ্রেষ্ঠ-আদর্শরূপে, তার সকল শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন হয়ে, তার শ্রেষ্ঠতর আশ্রয় ক'রে যে অগ্রগম মন্দির-কমলগুলি ফুটে উঠত, আজ আর তা নতুন করে কতিং সম্ভব। মনে হয় মাহুঘের মন প্রাচীন থেকে মরে গেছে, সে স্থর সে ছাড়িয়ে চলেছে। শুধু



আজও আমরা দেখবার সুযোগ পাচ্ছি কিছু, মানব-ইতিহাসের সেই যুগ যখন ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী তার অন্তরের সর্বজনীন অগ্রগতির নিয়মিত ধারাটিকে স্বয়ং মন্দির-গুলি স্থাপন করেছিল।—কোথাও অনবদ্য, কোথাও অর্ধভগ্ন, কোথাও বা ধ্বংসস্থ পমাজ—মহাকালের অমোঘ করতাল-গত। আজও হয়ত স্মৃতিহং দেবায়তন নির্মাণের অর্থ

আছে, যা আমাদের ভারতের মন্দির-শিল্পের মাঝে চোখে পড়ে না। এখানকার মন্দিরের নানারকম, উচ্চাচ ও পরিপার্শ্বের স্তরবিভাবে স্থখা ও এমন নৈপুণ্য আছে যা থিঙ্কা, মসজিদ ও মন্দিরদেখা চোখকে মুগ্ধ না করে পারে না। ভারতের মাদুরা, মথুরা, আনু, কোণারক, ফতেপুর সিকরি আগরা ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানের খোদকারি



ওহাই অরণ্য বা অরণ্য মন্দির

কোথাও সংগ্রহ হ'তে পারে, কিন্তু সে আগ্রহ, সে ঐকান্তিকতা, সে নিষ্ঠা ও সে প্রাণ-স্পন্দন কোন জাতির মনে পাওয়া যাবে না। মানুষ আজ সংহতভাবে, ভিন্নতার ভাবের সাধনায় রত। দেবতার আসন পাতা হলে এবার কি মানুষের ধর্ম-মন্দিরেই হবে না?

গ্রাম সভ্যতার জটিলময় ব্যাকরণের স্তম্ভমোহর 'ওহাই অরণ্য' আজও প্রায় অক্ষয় ও অবিদ্যুত।

মেগাম (চৌকাইদা) তীরে, ব্যাক্ক সহরের 'অপর পাদে' শ্যাম-মন্দির ও মঠের শীর্ষস্থানীয় 'ওহাই অরণ্য' প্রতি দর্শকের মনে একটি বিশেষ আনন্দ-স্বপ্নের স্থিতি অঙ্কিত করে রাখে। শ্যামের মন্দির-শিল্পে এমন এক প্রকার নবত্ব

ও পঙ্ক্তিকারি শিল্পের দিক দিয়ে এখানকার শিল্প শ্রেষ্ঠ মনে হবেনা নিঃসন্দেহ, তবে মন্দিরের নানা আকারের গভন, তার চূড়া, এবং প্রবেশদ্বার বা ভোরণের নবত্ব সভ্যই বড় মুগ্ধ করে। আমাদের দেশের পূর্বে ও মন্দির-শিল্পী শ্যামে এলে প্রচা শিল্পকার অনেক নূতন মাল-মসলা পাবেন সন্দেহ নেই। একই সহরে মন্দির পঠনের এত বিভিন্ন রূপ এখানে ছাড়া আর কোথাও দেখি নাই।

সহরের চলচ্ছলতার পরপারে অবস্থিত এই মঠের মাঝে অনেকগুলো বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। 'ওহাই অরণ্য'-সংলগ্ন মন্দিরটিতে যেখানে মনে হ'ল, যেন বহু শতাব্দী অতীতে এসে প'ড়েছি। হয়ত ভারতে বহু মন্দিরে কোন



ওহাই অরণ্যের ভোরণ অরণ্য মন্দির

দিন এমনই কোন দৃশ্য সত্যচরিত সজ্জিত হ'ত। বেলীর উপর কাষায়বর-পরিস্রিত এক পুরোহিত বা আচার্য্য বসে পুঁপি পাঠ করতেন, আর ধর্ম বা পুণ্যলাভেচ্ছ ক'রে ক'টি মানুষ তজ্জিতের স্তন্যে। সমুদ্রে বিশাল স্তম্ভ বৌদ্ধ মূর্তি।—প্রাণীপ জলে, ধূপ পুষ্প গন্ধে ভরা।

এখানেও কথা আমাদের অসম্ভব হ'ল। একদিন যাদের সঙ্গে ধর্ম হয়ত মিল ছিল, ভাষায় আজ তারা পৃথক। কত কথা স্তন্যেই জ্বল-জ্বলতে এবং জানাতে—কত কথা বলতে। সঙ্গীর মারফৎ দুগুণিতমস্তক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত, মনের ক'টা কথাই বা আদান প্রদান হ'ল। মঠ ঘুরে বাধ্য-ভারাক্রান্ত মনে চলে এলাম। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবপ্রকাশের সেতুটি আজও নির্ম্মাণ হয়নি। এ পৃথিবী কবে আরম্ভ হবে? সভ্যতার সকল গৌরব আজও ম্লান হয়ে আছে, এই অক্ষমতার ও অসহায়তার দ্বারা।

## পুরাতনের পুনরাগমন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবাহন ও বিসর্জন

এখনবান্ধের সহিত মেয়ের বিবাহ হিতে পারা কজার পিতারা সৌভাগ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। রূপে, বিজ্ঞায়, ধনে চরিত্রে—সকল বিষয়েই সে বাঞ্ছনীয় পাত্র। কাজেই এ পর্যন্ত তাহার বিবাহের জ্ঞা প্রস্তাব কম আঁসে নাই। কিন্তু সে বিবাহ করিতে অসম্মত ছিল; বাড়ীর সেই কষ্ঠা; বা তাহার ইচ্ছার বিকল্প কোন বিধয়ে জিদ করিতেন না; ভগিনীরা তাহার ছোট; বড় ভগিনীপতি মনোজ কাহারও কোন কথায় থাকিতে

ভালবাসে না; এই সব কারণের সমন্বয়ে এতদিন তাহার বিবাহ হয় নাই। চেষ্টা করিয়া অনেকে হতাশ হইয়াছিলেন। ঘটক ঘটকীরা আসা বন্ধ করিয়াছিল। এবার শব্দরবাজী যাইয়া মাধবীই প্রথম ঘটকঘটকীগণকে সন্ধান দিল—তাহার দাদার বিবাহ হইবে—মেয়েটি স্বন্দরী আর ভাল ঘরের হওয়া চাই, টাকাকড়ির কোন কথা নাই। ঘটকঘটকীরা সোংসাংহে সখক সন্ধান বাহির হইল—ভাত ছড়াইলে কি কখন কাকের অণ্ডাব হয়?

মা'র কাছে কেহ কোন সম্বন্ধের কথা বলিলে তিনি তাহা মাধবীর কাছেই পাঠাইয়া দিতেন। মনোজ ব্যঙ্গ করিয়া জীকে বলিত, 'তুমি যে দেখছি, দাদার বিয়ে উপলব্ধ করেই মন্ত মুকলী হয়ে উঠলে।' মাধবীর



শাক্তী বধুকে সত্য সত্যই কল্লার মত দেখিতেন—  
তিনি এক কাজে মাদবীর সহায় হইলেন।

মাদবীর শাক্তী ভূমিয়া বলিলেন, “বেশ করেছেন,  
বোন। ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে না দিয়ে কি আপনি  
যেতে পারেন? তা’ হ’লে আমি এখন আর বোমা’কে  
নিয়ে যা’ব না—দাদার বিয়ের পর যা’বেন। কিন্তু এর  
মধ্যে যদি বিয়ে না হয়, আশিনে আমি নিয়ে যা’বই  
বাড়ীতে মা আসবেন; যা’ব আমার না গেলে হ’বে  
না; এখন থেকে তাঁকেই সব করতে কন্থাতে হ’বে।”

কথাটা প্রচারিত হইবার পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই একদিন  
মদ্যাহ অতীত হইতে নাহিহে মালতীকে সঙ্গে পাইয়া  
তাহার শাক্তী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা’র তখনও  
“স্বপ্নাকের” আয়োজনও হয় নাই। তিনি বেহাইনেক  
বধু করিয়া হইলেন। তখনও তাঁহার রন্ধন হয় নাই  
ভূমিয়া বেহাইন অত্যন্ত চিন্তার ভাব দেখাইয়া বলিলেন,  
“শরীরকে অমন করে” পাত করবেন না; ওতে পুণ্য  
হয় না।”

মা স্বাভাবিক মুখ হাসি হাসিলেন।  
বেহাইন বলিলেন, চলুন, রান্না চড়া’বেন। একেত  
ভুনি, সিদ্ধ আর ভাত ছাড়া কিছু রান্না না, তা’ও আমার  
বেলা গড়িয়ে গেলে।”

মা রান্না চড়াইলে নিকটে বসিয়া বেহাইন বলিলেন,  
“তনুভূম এক দিনে প্রমথ বিয়ের মত করেছেন; তনু  
বড় আনন্দ হ’ল। আহা, বো না হ’লে কি ঘর মানায়?  
এখন বলছেন—পুতী যা’বেন; দেখবেন, বো এলে  
আর যেতে ইচ্ছা হ’বে না।”

মা বলিলেন, “ও কামনা আর করবেন না।”  
“কেন করব না? সংসারে থেকে কি ধর্ম কর্ম হয়  
না?”

“পকে থেকে কি পরিকার থাকা যায়? মন যখন  
বলছে, ‘যাও’ তখন আর থাকতে নাই।”

প্রমথ যখনই আমার বাড়ীতে গিয়েছে, আমি  
তনুই বলেছি, “বিয়ে কর, মা’কে বান্দন দিয়ে যা’ব।  
আগে ত্রে—তা’র পর নাতি নাভিনী—গেয়ার উপর  
গেঁদা পড়লে তিনি আর পালাতে পারবেন না।”

মা কেবল হাসিলেন।

মুখবন্ধের পর বেহাইন আসল কথা পাড়িলেন,  
“আমার নাভিনীটিকে নিতে হ’বে, বেহান।”

তাঁহার বড় মেয়ের মেয়ে লজ্জাবতী ওরফে ‘লিজী’  
কয় বৎসর হইতে তাঁহার কাছেই ছিল। তাহার পিতা  
মুসোফ—নোমুখালি হইতে দিনাজপুর, জগন্নাথগুড়ী  
হইতে মেদিনীপুর নানা জিলায় ঘুরিয়াছেন; মেয়েটিকে  
হালকাশনে লেখাপড়া, শিল্পকার্য, সঙ্গীত ও চালচলন  
শিখাইবার জন্ম কলিকাতার মামার বাড়ীতেই রাখিয়া  
ছিলেন। বেহাইন তাহার সঙ্গে প্রথমথানার বিবাহের  
প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “নিজে  
জিনিষ বলে বলছি না—মেয়েটি দেখতে ভাল—আপনার  
মেয়েদের মত না হইলেও সুন্দর; লেখাপড়া জানে;  
গান বাজনাও শিখেছে; প্রমথ তাঁকে দেখেছেন।  
আপনি দেখুন—অপচন্দ্র হ’বে না।”

মা সংক্ষেপে বলিলেন, “সে ত আমার ভাগ্য।”  
“একি বলেন, বেহান? নাভিনীর ভাগ্যে থাকে,  
তবেই আপনার বো হতে পারবে। কবে দেখবেন,  
বলুন। আমি এসে নিয়ে যা’ব।”

“আমি আর দেখব কি, বেহান? প্রমথই দেখুক।”  
“সে কি হয়? কেন, আমার বাড়ীতে কি পায়ের  
খুঁচা দিতে-মসি?”

“সে কি কথা বলেন? আমি বলছি, আমার দেখবার  
কোন দরকার নাই। মালতী ত দেখাচ্ছেই—প্রমথ মত  
করলেই হ’ল।”

মালতী বলিল, “সে তার আমার রইল। তুমি  
একবার দেখেই না যা।”

“তোদের পর কি আমার আমাকে দেখতে হবে?”  
বেহাই বলিলেন, “তা’ হবে না?”

বাড়ী হইবার সময় বেহাইন বলিয়া গেলেন, “কাল  
পরণ্ডে যে দিন হয়, যা’বেন। যেতে হবেই।”

তাঁহার চলিয়া যাওয়াই মা মাদবীকে সংবাদ পাঠাইয়া  
দিলেন। এই বড় মেয়েটির সঙ্গে তাঁহার মতের আশ্চর্য  
সাদৃশ্য ছিল; তাই তিনি সকল বিষয়ে তাহার পরামর্শ  
গ্রহণ করিতেন।

মাদবী পরদিনই মা’র কাছে আসিল, সব শুনিয়া  
বলিল, “সে মেয়ে ত কতবার দেখেছি! সেই যে সে  
বার মালতীর সঙ্গে খিচুটোর যা’বার পথে এসেছিল,  
মা! সেই ময়ূরকণ্ঠী রঙ্গের শাক্তী পরা—মাখার কাপড়  
নাই। বস্ত্রা ত তখনই বোল সন্তের কম মনে হয় নি।”  
মা জিজ্ঞাসা করিলেন “দেখতে ভাল?”

“বন্ধ নয়। রঙের জলুস না থাকলেও দর্শ্য বাটে;  
তবে বা’র কতটা স্বাভাবিক আর কতটা ক্রিমে পাউভারে  
মানুষে ঘরে ঘরে তা বলেতে পারি না। কিন্তু—”

“কিন্তু বলজি ক’ন?”  
“সে মেয়ে ঐ মালতীর ভক্তরবীর ধরণের—পাটো  
কথা কহিতে ছুটো ইংরাজী কথা বকে—টেনিস খেলে—  
পুরুষ মাদবীর সঙ্গে বসে চা খায়।”

মা চূপ করিয়া রহিলেন।  
মাদবী বলিল, “দেখতেই ত মনে হয়, চঞ্চল।”  
মা একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, “কিন্তু—”  
মাদবী হাসিয়া বলিল, “এবার যে, মা তুমি ‘কিন্তু’  
বলছ? কি হয়েছে?”

“বেহান বলে গেছেন, মেয়ে প্রমথের দেখা; আর  
মালতী বলেছে, দাদার মত করবার ভাব তা’র।”  
“সে ভ, মা, বুঝি ভাল হয়; দাদা যদি নিজে  
পছন্দ করে, তোমার আমার আর কোন দর্শনীয় থাকে  
না। তবে আমার মনে হয়, দাদা এখনও কোন মত  
প্রকাশ করে নি—করলে গুঁরা এতদিন চূপ করে  
থাকতেন না।”

মা মেয়ের কথাই বুঝিলেন। প্রমথনাথের—একমাত্র  
ছেলের বো চঞ্চল হইবে মনে করিয়া মা’র বুকের মধ্যে  
একবার মনে একটু ক্র-কর করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু  
তিনি সে ভাবটা অতিক্রম করিলেন। তিনি বলিলেন,  
“আমি ত বলে দিয়েছি, প্রমথ মত করলেই হ’ল।”

“সে ত বাটেই। তবে তাঁরা জির করলে তোমাকে  
দেখতে যেতেই হবে; তাঁদের ঘরে মেয়ে দিয়েছ।”  
“যদি আমার যেতে হয়, তাকে বাছা, সঙ্গে যেতে  
হ’বে। আমি একা যেতে পারব না।”

মাদবী হাসিয়া বলিল, “তোমার চিরকালই সমান  
গেল। আমি সঙ্গে যা’ব কেন? এই যে পুতী বাছা,  
আমি কি সঙ্গে যা’ব?”

“বালাই!—একথা বুঝে আনিস নে, মাদবী। জন্ম  
এয়ারী হয়ে বর সংসার কর। আর সেখানে কি কেউ  
একলা থাকে? সে যে জগবন্ধুর ক্ষেত্র—তিনি সেখানে  
আছেন।”

“তিনি বুঝি এখানে নেই?”  
“আছেন বই কি? তবে আমার অধম, সকল স্থানে,  
সকল সময় তাঁকে অহুত করতে পারি না; তাই তীর্থে  
যাওয়া। পুতী ত এখন কাছেই বলা চলে—তোদের  
যখন ইচ্ছা হ’বে গিয়ে বেড়িয়ে আসবি।”

“দাদা কোথায় গেছে?”

“বোধহয়, মালতীদের বাড়ীতেই গেছে—কাল মালতী  
যেতে বলে গিয়েছিল।”  
“একবারেই দেখছি ‘ভক্তবৃষ্টি’ করিয়ে দেবে। দাদা  
এলে আমিই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব; দেখি, কি বলে।”

“তা’ই করিস।”  
প্রমথ নাথ ফিরিয়া আসিলে মাদবী জিজ্ঞাসা করিল,  
“দাদা, তুমি মালতীদের বাড়ী গিয়াছিলে?”

প্রমথনাথ উত্তর দিল, “হাঁ।”  
“মালতী যেতে বলে গিয়েছিল কেন?”  
“তা’রা অল্পিরের চিড়িয়াখানা দেখতে যা’বে বলে।”

“সে জন্ম তোমায় কেন?”  
প্রমথনাথ হাসিয়া বলিল, “বোধহয়, চিড়িয়াখানার  
যা’বার অর্গেই দাদাকে দিয়ে দেখা আরম্ভ করবে বলে।”

মাদবীও হাসিয়া বলিল, “সে ভাল।”  
“তা’দের একখানা মোটর, তাই আমার খানার জন্ম  
যেতে বলেছিল।”

“কে কে গেছে?”  
“মালতীর মেজ যা’, তাঁর মেয়ে, বড় ভক্তদের মেয়ে,  
শাক্তী, মালতী, তা’র বড় ভক্তরবীর খোঁস, বড় ভক্ত  
পেঁ, তাগনী।”



“ভাগনী কোন্টি—যে সেই যে বার খিয়েটার দেখতে  
বাঁবার সময় এখানে এসেছিল ?”

“হাঁ।”

“বেশ মেয়েটি, লেখাপড়াও শিখেছে না ?”

“এখনও পড়ছে।”

“এত লোক ধরল কেমন করে ?”

“তোমাদের সে গুণে ঘটি নেই। একখানা গাভীতে  
কতজন কালীঘাটে যাওয়া চলে ?”

“আমরা—যাঁরা কালীঘাটে যাই, তাঁরা হনুম,  
সেকেন্দ—ওরা হাল আমলের মেয়ে; ওরাও কি  
পানাপানি করে যায় ? ঘামলে যে জিম, পাউডার সব  
যুয়ে বাঁবে ! তোমার গাভীতে কে কে ছিল ?”

“মালতী, তাঁর ভাগুরী, মালতীর খোকা আর তাঁর  
ভাগনী। মালতীর খিও ছিল।”

“সামনে তোমার কাছেও বুদ্ধি একজন বসেছিল ?”

“ভানিয়ে কি ধরে ?”

“সামনে কে বসেছিল ?”

“মালতীর ভাগনী”—বলিতে প্রমথনাথের কেমন  
একটু বাধ-বাধ করিল; কারণ মালতীর জেরাটা তাহার  
পক্ষে একটু সম্বন্ধজনক মনে হইয়াছিল।

মালতী হাসিয়া উঠিল; বলিল, “ওর সম্বন্ধই ত  
তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে মালতীর শাওড়ী এসে-  
ছিলেন। তা’ ভালই হয়েছে—ভক্তদুটি পর্যন্ত সারা—

ধরকনে পাশাপাশি মোটর টাঁকিয়ে যাওয়া হয়েছে।”

লক্ষ্যায় প্রমথনাথের কর্ণমূল রক্তাভা ধারণ করিল।

মালতী বলিল, “বাঁচা গেল—আর খোজাও ছিঁ করতে  
হ’বে না।” সে মাকে বলিল, “তা’ হ’লে ভূমি খুব  
শীগগিরই ছুটা পাবে, মা।”

প্রমথনাথ বলিল, “তুই কি যে বকিস !”

মালতী শুধু হাসিতে লাগিল।

প্রমথনাথ চলিয়া গেল।

মালতী তখন মাকে বলিল, “এরা পাকা লোক—  
কেমন করে কাজ উদ্ধার করতে হয়, তা’ খুঁই জানে।  
ঐ বাঁশেই বিয়ে হ’বে।”

মার মুখখানা একটু গম্ভীর দেখিয়া মালতী বলিল,  
“ভূমি ভাবছ কেন, মা ? ও যাঁর হাঁড়ীতে যে চাল  
দিয়েছে।”

মা আর কিছু বলিলেন না।

মালতী যখন বাড়ী ফিরিয়া যায়, তখন তাহাকে  
গাভীতে তুলিয়া, দিতে যাইবার সময় প্রমথনাথ বলিল,  
“দেখ, মালতী, তোরা ও সব পাগলামী করিস না। আমি  
বিয়ে করব না।”

মালতী বলিল, “পাগলামী আমরা করছি না—ভূমিই  
করছে। সংসারটা কি ছারেখারে দেবে—জীবনটা  
ব্যর্থ করবে ? কেন তা’ করবে ?”

“আরও কথা—বিয়ে যদি করতেই হয়। ওখানে  
হ’বে না।”

“কেন ?”

“আমি জানি, মা ওদের চালচলন পছন্দ করেন না।”

“মা ত পা বাড়িয়েই আছেন—তাঁর পছন্দের কথা  
আর ধরবার দরকার হ’বে না। আমরা জানি, তোমার  
পছন্দ আর মার পছন্দ মিল হ’বে না বলেই ভূমি  
বিয়ে করনি। কিন্তু এখন আর সে কথা থাকছে না।  
ভূমি যেমন বিয়ে করে স্বামী হ’বে, তেমন বিয়েতে আমরা  
কেউ অমত করব না, বরং খুশীই হ’ব। তোমার  
যখন আমরা হ’বে না, তখন মালতীর শাওড়ীকে ক্ষম করে  
কাজ নাইহু।”

প্রমথনাথ ভাবিতে লাগিল—আশা আর আশঙ্কা  
তাহার তখন মনে শরতের আকাশে মেঘ ও সৌর্যের  
মত যেন খেলা করিতে লাগিল।

মা বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন, সে তাহারই অপ্রীতির  
আশঙ্কায় বিবাহ করিতে চাহে নাই এবং হয়ত সেই জন্তই  
তিনি তীর্থবাসে যাইতেছেন—মনে করিয়া এক একবার  
তাহার চিত্ত এই প্রস্তাবিত বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর  
হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ভাবটা স্থায়ী হইতেছিল  
না; আশা তাহাকে বলিতেছিল, মা ত গৃহে থাকিয়াই  
একসঙ্গে সন্তানসিঁনি—কিন্তু দিন হইতেই তীর্থবাসী হইবার  
কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু মালতী ও কথাটা বলিল কেন ?

এইরূপে বিবাহের সমর্থক ও বিরোধী বুদ্ধিগুলি তাহার  
মনে গভীরত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কোন  
বুদ্ধির বিমূঢ়তা অপেক্ষা না রাখিয়া মালতীকে মধ্যে  
রাখিয়া একদিকে মালতীর শাওড়ী আর এক দিকে  
মালতী বিদ্রোহের সব ব্যবস্থা শেষ করিলেন। প্রমথনাথের  
ভাবনা শেষ হইবার পূর্বেই তাহার গাভীরিয়া শেষ হইয়া  
গেল—তাঁহার পর, তিন দিনের ব্যবধানে, আঘাচের  
প্রথম ভাগেই বিবাহ হইয়া গেল।

বধু, “খুঁদা পায়ে লম্বা” করিয়া ঘরে আসিলেই মা  
বলিলেন “বৌমা, সব বুঝে নাও; আমরা বেতে আর  
বিলম্ব নাই।”

ভূমিয়া মালতীর শাওড়ী অত্যন্ত বিস্মিতভাবে দেখাইয়া  
বলিলেন, “সে কি কথা, বেহান! এরাই মধ্যে যাবেন  
কি ? কত আদরের ছেলে প্রমথ—তাঁর বৌ এল, তু’  
দিন তা’কে নিয়ে ঘর করুন।”

মা স্বাভাবিক মুহূর্ত্ত হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ঘর সংসার  
বৌমার। যে দিন কপাল পুড়েছে, সে দিন থেকেই  
কেবল প্রাণটা যায়নি বলে থাক। তাঁর উপর প্রমথ  
ছিল—তাঁর ভার দেবার লোক পাইনি; মালতী আর  
মাধুরী তখনও আইনুড়; তাদের বিয়ে প্রমথ দিয়েছে;  
বৌমাও ঘরে এসেছেন—এইবার আমরা ছেড়ে দিতে  
হ’বে।”

মালতীর শাওড়ী বেহাইনের ত্যাপ ও আশনার  
সংসারান্তিকি তুলনা করিয়া মনে মনে যে লজ্জিত হইলেন  
না, এমন নহে; কিন্তু সেই লজ্জা গোপন করিবার জন্তই  
বলিলেন, “তা’ত বটে, কিন্তু ছেলে মেয়ে যখন পেটে  
হয়েছে, তখন তাঁদের উপর যে কর্তব্য, তা’ও ত  
অবলোকা করা যায় না ! ওরাই যে দেবতার অংশ। এই  
দেখুন না, ছেলেপুলে হ’তে, রোগে মারতে,—মেয়েদের  
মা’র কাছই চাই।”

মা বলিলেন, আমি যখন সংসারের সব ভার বৌমা’কে  
দিয়ে গেলাম, তখন সে সব এখন তাঁকেই করতে হ’বে।”

মালতী লজ্জাবতীকে বলিল, “ভুলছ ত, বৌদিদি,  
আমাদের করতে কর্তব্যই হ’বে; নতুবা পোহাতে  
হ’বে।”

মালতীর শাওড়ী বলিলেন, “ভূমি আর ওকে বৌদিদি  
বলে ডেক না; ছোট বোনের মত দেখবে, শিক্ষা দেবে।”

মালতী বলিল, “মা, আমরা সেকেন্দ হয়ে গেছি—  
আমরাই বরং একালের চালচলন শিখব।”

“তোমার ত কত নতুবা ! ভূমি ত প্রায় বাপের বাড়ী  
রাত কাটাও না।”

“কি করি, মা, শাওড়ী তাঁর সংসার আমাদের ঘাড়ে  
চাপিয়ে দিয়েছেন; যা’ ছেলে মাছ, একটা কাজ করতে  
বলে শতবার জিজ্ঞাসা করতে আসে—কি রকম করে’  
করবে। ঠিক মাধুরীর মত—এমন সরল যে রাগ করতেও  
পারা যায় না। যা’ দেখছি, তা’তে মাধুরীর নতুবাও  
বৌদিদিকে পোহাতে হ’বে না। মালতী ত ওঁর নামার  
বাড়ীর—আপনার লোক।”

মা বলিলেন, জগবন্ধু যখন ডেকেছেন, তখন তিনি  
আমায় আমার শেষে রথযাত্রার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণে গমন  
করিবেন।

অগত্যা প্রমথনাথকে মা’র জন্ত বাড়ী দেখিতে পুরীতে  
মাইতে হইল। ভয়ায় সে সমুদ্রের কাছে একখানি ভাল  
বাড়ী পাইল এবং সেখানি বিক্রয় হইবে জানিয়া কিনিয়া  
ফেলিল—ভাবিল, হইবার পর বাড়ীখানার কিছু পরিবর্তন  
ও পরিবর্তন করাইয়া লইবে; তাহা হইলে তাহারও  
সময় সময় আসিয়া থাকিতে পারিবে। মা’কে ছাড়িয়া  
থাকিতে হইবে, এ কল্পনা তখনও তাহার পক্ষে  
কষ্টের ছিল।

রথের পূর্বে মা পুরী যাত্রা করিলেন। রথ দেখিবেন  
বলিয়া মালতীর শাওড়ীও তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন।

বিবাহের পর পক্ষপাল মধ্যেই লজ্জাবতী সংসারের  
গৃহিণী হইয়া বসিল।



## স্বাভাবিক

শ্রীমতী রেজুকা ঘোষ

ওগো, আজকে আমার মন ভোলালো কোন সে মায়াসুগ !  
 হে মোর তরু, হে মোর লতা, বলতে পার কি গো ?  
 শিউলীঝরা বনের পথে  
 উষার কণক কিরণ রথে  
 তাঁর হাসির আঁবীর ছড়িয়ে গেল কোন সে মনোহর  
 তাঁর রঙে রঙে রাঙিয়ে গেল অসীম নীলাশ্বর—  
 সে যে, বিজয়-কেতন উড়িয়ে গেল ছড়িয়ে আলোরশি  
 ধরার কানে বললে হেসে,—‘তোমায় ভালবাসি’;  
 বাজলো কানে শঙ্খধ্বনি,  
 পরশ দিল পরশমণি,  
 মোর ফুটলো সোনার পাপড়ী ‘যেলি’ জীবন-শতদল ।  
 শুধু দেখতে তারে পেলাম নাকো পেলাম পরিমল ।  
 ওগো, সেইতো আমার পরম ব্যথা গোপন হাহাকার  
 অশ্রু-মায়ায় আবছা ঢাকা পাখার কাগার !  
 তাইতো আমার মর্মলীনা  
 বাজছে নিতি বেদন-বীণা,  
 মোর কায়াবিহীন ছায়ার ব্যথা মর্মে নিতি জাগে,  
 এই অরূপ অসীম মাঝে হৃদয় রূপের সীমা মাগে ।  
 তাই, উদাস হয়ে খুঁজছি কোথা জীবন নদীর পার ?  
 বুঝি, নিষ্ঠুর মরণ স্পর্শ আমার করবে অধিকার ।  
 শেষ বিদায়ের তিমির রাতে  
 নিষ্ঠুর মায়া-মৃগের সাথে  
 ওরে, হবেনা কি মিলন আমার শেষের পরিচয় ?  
 শুধু, শূন্যতাতে শিশবে কিরে ধরার অভিনয় ?

## নারীর প্রেম

শ্রীশ্রী মিত্র

“যেমন তেমন চাকরী, যিহাজত”—ইহাই বাঙ্গালীর  
 —অর্থাৎ এতদূর বাঙ্গালীর বহুমূল সংস্কার। কিন্তু স্বাধীন  
 অফিসে, রাইবার ঠিক সময়ে এই বিভ্রান্ত সাজাইয়া দিবার  
 জন্ত যত আয়োজন তাহা যেমন জীকে করিতে হয়,  
 তেমনই এই বহুমূল সংস্কারের জন্ত যত অনুরোধ ঘটে তাহাও  
 জীকেই সহ্য করিতে হয়। স্বাধীন চাকরীয়া—বেতনও  
 বহুমাত্রা নহে, চাকরীর দৌলতে তাহাকে কখন দিল্লী  
 কখন লাহোর, কখন বোম্বাই, কখন মাদ্রাজ যাইতে হয়;  
 তাই যখন অনেকে আমাকে “সৌভাগ্যবতী” বলেন, তখন  
 মনে মনে দুঃখের হাসি না হাসিয়া পারি না। বয়স  
 যখন অল্প ছিল, তখনও আমি এই বিদেশে থাকায় পরম  
 পরিতোষ পাই নাই। শান্তভী, নন্দ প্রভৃতি লইয়া “ঘর”  
 আমাকে করিতে হয় নাই বলিলেই চলে বটে, কিন্তু সে  
 বয়সে বাঁহার সজ বড় সমস্যায়ে পাওয়ায় পূর্ণ তৃপ্তি হয় না  
 বলিয়াই বিদেশে তাহার সঙ্গে যাইতে আনন্দ—বিশেষে  
 তাঁহাকে কতটুকু পাইতাম ? তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক  
 চাকরীয়া—প্রতি দিন নির্দিষ্ট সময়ে সাড়ে নয়টা বাজিলেই  
 অফিসের জন্ত বাজা করিতেন—কিরিতে প্রায় সন্ধ্যা  
 হইত; তাহার পর অফিস হইতে আসিত একরাশি  
 কপোজ, সেগুলি পড়িয়া তাহাদের “সঙ্গতি” করিতে  
 ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত। আমি থাকিতাম—একা।  
 আর দেশ দেখা ? তাহার আকর্ষণ কম দিন থাকে ?  
 তাজমহল বা জুমা মসজিদ, সোণার মন্দির বা পুস্তর হ্রদ—  
 এসবই বায়বোপের ছবির যত জট চলিয়া গেলেই ভাল  
 লাগে। এখন এই “বেদের টোপ ফেলিয়া” থাকায় আরও  
 অসুবিধা হইয়াছে, ছেলেদের লইয়া—তাঁহাদের পড়ানার  
 সুব্যবস্থা বাঙ্গালার বাহিরে হয় না। স্বাধীন মধ্যে মধ্যে  
 বলেন, “না হয়, তুমি আর এখন ভাবে ঘুরো না;  
 কলকাতায় একখানা বাড়ী নেওয়া হ’ক; ছেলেদের  
 নিয়ে তুমি সেখানে থাক।” এই প্রস্তাবটা করিবার সময়  
 তাহার মুখে আত্মহারা কোন চিহ্ন দেখা যায় না; আর

তাহাতেই, সে প্রস্তাব আমার মনে এতটুকু আগ্রহের  
 সঞ্চার করিতে পারে না। শতের বৎসর বয়সে “বালিকা  
 বধু” না হইলেও “নব বধু” হইয়া আসিয়াই যে  
 লোকটির—নিতান্ত নির্ভরশীল লোকটির—সব ভার  
 লইতে হইয়াছে এবং তাহার পর এই চৌদ্দ বৎসরের  
 মধ্যে সে ভার নামাইবার অবসর পাই নাই, সহসা  
 তাহার ভার তাহার উপর ফেলিয়া দিলে তাহার  
 অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা আমি যত বুঝি তত—  
 সে অসম্ভব।

বিবাহিত জীবনের চৌদ্দ বৎসরের শেষভাগে চাকরীর  
 জোয়ারে নৌকা ভাসিয়া আসিয়া লাগিয়াছে মাদ্রাজের  
 কূলে।

মাদ্রাজ আমাদের স্থিতি অধিক দিন নহে;  
 কেন না, স্বাধীন ছুটির বন্দোবস্ত করিয়াছেন; হয়মাস  
 পরেই এক বৎসরের জন্ত ছুটি লইবেন। কিন্তু এই  
 দীর্ঘ একটি বৎসর কাটবে কেমন করিয়া সেই ভাবনা  
 ইহার মধ্যেই ভাবিতেছেন। তিনিও ভাবিতেছেন আর  
 আমার বড় মেয়ে শান্তিও ভাবিতেছে। সে বলে,  
 জানানোমুহু হইতে কখন বাঁহাকে ছুটি সন্তান করিতে  
 দেখে নাই—সে তাহা কল্পনাও করিতে পারে না।

আমি স্থির করিয়াছিলাম, যখন এতদূর আসিয়াছি,  
 তখন এই সুযোগে দক্ষিণ ভারতের তীর্থভূমি দেখিয়া  
 যদি পারি, কলকাতা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসি। স্বাধীন কখন  
 আমার কোন প্রস্তাবে “না” বলেন না, এবারও বলেন  
 নাই। কেবল ভাবনা—ছেলে মেয়েদের কাহার কাছে  
 রাখিয়া যাইবে ? সে সমস্যার সমাধান তিনিই করিয়া  
 দিলেন—তাহারাও সঙ্গে যাইবে। তিনি বলিলেন,  
 “ছেলেরা হয়ত ইচ্ছা করলে দেখতে পাবে, কিন্তু শান্তির  
 তা’ হ’বে কিনা, কে জানে ?”

ওনিয়া হাসিয়া বিলম্ব, “তুমি কি ভাবছ, এখনও  
 মেয়েরা ঘরের কোণে থাকবে ? রাষ্ট্রায় কি পরিবর্তনকে  
 হাওয়া পাও না ?”



তিনি আপনার অজ্ঞাত লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিলেন, “সংস্কার, তবু, সংস্কার।”

“এই যে একটি বছর ছুটি পাবে, এর মধ্যে সংস্কার বদলে ফেলতে হবে। কাল যেমন তেমনি চলতে হবে ত?”

“সত্য ত হবে; কিন্তু পারব কি?”

“খুব পারবে”

স্বামী আসিয়া বলিলেন, “তা’হলে শুষ্কগিরীর ভারটা তোমার নিতে হবে।”

“সেত নিজেই আছি। কিন্তু—শুষ্কও সেকলে!”

“তবেই ত।”

২

সমুখে “বড় দিনের ছুটি”—ছুটির আরম্ভ যে দিন তাহার পূর্বদিন আমরা রামেশ্বরে উপনীত হই এমনই করা গেল। রামেশ্বর স্বামীর চাকরীর এলাকায়—সুতরাং সে পর্যন্ত “রথ দেখা করা বেড়া” হিসাবে উহার হইবে “ইনসপেকশন,” অর্থাৎ কার্য পরিদর্শন আর আমাদের হইবে দর্শন, তীর্থদর্শন ও দেবদর্শন। তাহার পর রামেশ্বর হইতে বৃহৎকোটাতে বাইয়া সমুদ্রের বাহ পার হইয়া লক্ষা।

পথে মাছুরা—তথায় স্বামীর পরিদর্শন কার্য তিন দিনের পূর্বে সমাপ্ত হইবে না; সেই জন্ম তথায় সেই কয়দিন থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু মাছুরার মত নগর তিন দিনে “চোপের রেখা” দেখা বাতীত কিছুই হয় না। স্বামী সকালে ও বৈকালে আমাদিগকে লইয়া বাইবেন—আর মধ্যাহ্নে আমরা ভূতা সহায় করিয়া যাইব। ইহাই ব্যবস্থা ছিল। যদিও আমি স্বামীকে বলিয়াছিলাম, “আমিও সেকেলের,” তবুও এ কালের হাওয়া আমাকে যে স্পর্শ করে নাই, এখন নহে। যেমন বাহাকে সুবতীও বলা যায় না, প্রৌড়াও বলা চলে না, তাহাকে আমরা বলি “মধ্যবয়সী,” তেমনি আমি মধ্যকালের! বিবাহের পর হইতেই বিশেষ—বাস্তালায় সে কালে যেমন “পদার্পী” ছিল, তাহা রাখি নাই; কিন্তু একেবারে এ কালের চালও গ্রহণ করিতে পারি নাই—নারী ও শান্তির কাছ হইতেই হইলে এ কালের চাল একেবারে বর্জন করিতে

হয়। সুতরাং ভূতা সঙ্গে লইয়া সहर দেখিতে যাইতে কোন সন্ধ্যা বোধ করিনা।

মাছুরায় আসিয়া মনে হইল, মন্দিরট সহরে অবস্থিত নহে—সাহরও মন্দিরের অংশ; সহরখানি মন্দিরের ছায়ায় অবস্থিত। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির দেখিলে কালী-ঘাটের কালীমন্দির যেমন ক্ষুদ্র মনে হয়, মাছুরার মন্দির দেখিলে পুরীর মন্দির তেমনিই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। আমরা ছেলোময়েয়ার মন্দির ও সহর-শুস্ত্র “মণ্ডপম” দেখিয়া বলি, বিশালই অভিজুত হইয়া যাইতে হয়! তাহাই বটে।

দেখিতে দেখিতে কখন বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছিল, বৃষ্টিতে পারি নাই; হাতখড়ির দিকে চাহিয়া যখন বেলা কত দেখিলাম, তখন বাসায় ফিরিবার জন্ম ব্যস্ত হইলাম; কেননা স্বামীর আফিস পরিদর্শনের পর ফিরিবার সময় হইয়াছে।

যখন সহরে অর্ধাং মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পলালাম তখন বিজালয়গুলিতে ছুটির দণ্ডা বাজিয়াছে; ছেলেরা ও মেয়েরা বীমভাঙ্গা জলস্রোতের মত বিজালয় হইতে রাস্তায় আসিয়া পড়িতেছে এবং যোতের বেগে জল যেমন নানান্দিক ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি নানান্দিক হইতেছে।

পাড়ী যখন বেগে চলিতেছে, তখন দেখিতে পাইলাম বাঙ্গালী মহিলায় বেশে একজন—আমারই মত “মধ্যবয়সী” একটি মহিলা বিজালয় হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এই দূর মস্তদেশে বাঙ্গালীর মেয়ে দেখিয়া যত না বিস্মিত হইলাম, তত বিস্মিত হইলাম—বাঙ্গালীর বেশধারিনীকে দেখিয়া। কলিকাতায় আমরা এক স্থলে পড়িতাম—নামটিও ভুলি নাই, আকৃত ভুলির কেমন্ করিয়া? ষোল বসর পূর্বের দেখা যেন ষোল দিন পূর্বের বলিয়া মনে হইল। বিষয়ে যেন কোন দ্বন্দ্বিত হইয়া পড়িলাম—অনিয়মে ডাকিতেও ভুলিয়া গেলাম। পাড়ী অনেকটা পথ চলিয়া আসিয়াছিল, ফিরাইয়া যখন বিজালয়ের সমুখে উপনীত হইলাম, তখন সে চলিয়া গিয়াছে। আমি নামিয়া পলালার ভূতের নিকট

হইতে তাহার গৃহের সন্ধান লইবার চেষ্টা করিলাম—তাহাকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ধীর করিলাম, পরদিন আসিয়া তাহাকে ধরিব। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, পরদিন রবিবার, স্থল হয়ত বন্ধ। মনকে প্রবোধ দিলাম, স্বামীকে বলিলে তিনি একটা উপায় করিতে পারিবেন।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, “কাকে বুজু মা?”

বলিলাম, “এখনই এখানে একজনকে দেখেছিলাম; আমার সঙ্গে স্থলে পড়তেন। বোধ হয়, এই স্থলে মাষ্টার হয়েছেন।”

“এত দূরে!”

“আমরাই কি কাছে আছি?”

“আমরা ত বেড়াতে এসেছি।”

“কিন্তু উনিও এসেছেন চাকরীতে।”

“বাবা যে পুরুষ মানুষ মা।”

মনে মনে হাসিলাম, মেয়েরও সেকালের সংস্কারে মন রঞ্জিত; বলিলাম, “মেয়েরা কি চাকরীর জন্ম আসতে পারে না?”

শান্তি নির্লাক হইল।

পাড়ীও বাসায় আসিয়া ঠাড়াইল।

স্বামী তখন ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে যখন কথাটা বলিলাম, তখন তিনি আশ্বাস দিলেন, সন্ধান করিয়া দিবেন।

তাহার পর আমরা সকলে আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম—নদীর দিকে।

৩.

কিন্তু অযিমার সন্ধান পাইতে পর দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না। কারণ, আমরা যখন নদীর পারে রাস্তায় হাইতেছিলাম, তখন আমাদের বড় ছেলে সহসা “বলিয়া উঠিল, “না, দেখ একজন বাঙ্গালীর মেয়ে।” হয়ত মন্দির হইতে ফিরিবার সময় আমি যে একজন বাঙ্গালীর মেয়ের সন্ধান করিয়াছিলাম, তাহা তাহার মনে ছিল বলিয়াই, নহেত এই বাঙ্গালীবিরল স্থানে বাঙ্গালী মহিলার পরিচিত বেশ দেখিয়াই সে সেদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট

করিল। চাহিয়া দেখিলাম, সেই বটে; তাহার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক—দুই জনে কথা বলিতে বলিতে বাইতেছেন; গমন সতর্কতা বাজ্ঞ। তাহার “বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন, এই সময়ের মধ্যেই আমরা পরস্পর সম্মুখী হইলাম এবং আমি উদ্ভূসিত কণ্ঠে ডাকিলাম, “অনিমা।”

সে মুখ তুলিয়া চাহিল। স্বর্য়গ্রহণের সময় পূর্ণগ্রাসে যেন যেমন মলিন দেখায়, তাহার মুখ তেমনিই মলিন—যেমন রক্তশূন্য পাখুবর্ণ দেখাইল। তাহার দৃষ্টিতে কি ভীতিভাব? সে কোন কথা বলিবার পূর্বে বামহাতের তর্জনী আপনার গুণ্ডাবরে স্থাপিত করিয়া আমাকে কথা বলিতে নিষেধ করিল। তাহার দক্ষিণ বাহু সহগামী পুরুষের বাহুবদ্ধ ছিল।

আমাকে কোনকথা বলিতে নিষেধ করিবার যে কোন কারণ থাকিতে পারে, তাহা আমি অহমান করিতেই পারিলাম না; নিষেধ না মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি, এখানে?”

সে কোন কথা বলিবার পূর্বে তাহার সঙ্গী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে বাঙ্গাল্য কথা বলছেন, পুণিমা? বুলিলাম,” তিনি দৃষ্টি-শিক্তীনা। অযিমা বলিল, “আমরা একসঙ্গে স্থলে পড়িছিলাম।” তিনি বলিলেন, “পরিচিত বাঙ্গালী কারও সঙ্গে ত দেখা হয় না! ওঁকে আমাদের বাঙ্গাল্যর যেতে বলনা—পুণিমা!”

অযিমার মুখে ভীতিভাব বাজিয়া গেল—যেন শরতের আকাশে ধূসর মেঘের উপর আবার মেঘ আসিয়া পড়িল। আমার বিষয় বাড়িতেছিল। ইনি কে? অযিমাকে ইনি পুণিমা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন কেন? আমি অল্পক্ষণের জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইনি কে?”

উত্তর হইল, “আমার স্বামী।”

তাহার স্বামী বলিলেন, ওঁর সঙ্গে কে আছেন?

অযিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “স্বামী আর ছেলেরা।”

তাঁহার মুখ প্রশ্নর হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি







“হয়ত, তোমার আশঙ্কার ভিত্তি নাই।”

“তবে শুন। যে কথা আর যে বাখা অতি গোপনে বুকে রেখে এই—এত দিন—বিশেষে আত্মীয় স্বজন সবাইকে মন থেকে মুছে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা নিয়ে আছি, সে কথা আর সেই বাখা শুনে যদি তোমার মনে ঘৃণার উল্লেখ হয়, তবুও ঘৃণা না করে, আমাকে দয়া করবার চেষ্টা করে—এই আমার অনুরোধ—এই আমার ভিক্ষা।”

“আমিও কখন—বিশেষতাহার স্বরে যে কাতরতা ছিল, তাহা আমাকে ব্যথিত করিল। মনে হইল—আর উনিয়া কাখ নাই। সে আমার কেহ নহে—জীবনের পাশ্চাত্য ত্যাগের সহিত পরিচয় হইয়াছিল—উত্তরের জীবনব্যস্ত কোথাও পরস্পরকে স্পর্শ করে নাই; তবে তাহার কথা জানিবার জন্য আমার এই অস্বাভাবিক কৌতূহল কেন? কিন্তু আমার স্বামী যেমন দার্শনিকোচিত ভাবে কৌতূহল বন্ধনের কথা বলিয়াছিলেন, আমি তেমন ভাবে কৌতূহল দলিত করিতে পারিলাম না। আমি যখন এই কথা ভাবিতেছি, ততক্ষণে অশ্রুমা তাহার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনিম্না বলিতে লাগিল :—

“তুমি জান, দিদি আর আমি—আমরা এক সঙ্গে স্থলে পড়তাম। আজ বলতে বাধা দেখি না, বাল্যকাল হ’লেই দিদির উপর আমার ঈর্ষা ছিল। সে ঈর্ষার কারণ—দিদির রূপ। তোমার নিশ্চয়ই দিদির মনে আছে?”

আমি বলিলাম, “হুব আছে; কাগ ও আমি একে তার অসামান্য রূপের কথা বলছিলাম।”

অনিম্না বলিল :—

“সেই রূপের জন্য সকলেই দিদির ভালবাস্ত—এমন কি মাও যেন তার সেই ছুটিমুঠে মেয়েটির সঙ্গে আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে একটি ক্ষুণ্ণ হ’তেন। তার পর যত দিন যেতে লাগল, তত দিদির রূপ যেন হৃদয়ের কুঁড়ি যেমন পুষ্ট হয়ে সেসে মুটে উঠে—তেমনই হ’তে লাগল।

“যখন আমার ম্যাট্রিকুলেশন প্রার্থীতে পড়ি, তখনই তুমি স্থল ছেড়েছিলে। সেই সময় আমরা একবার পাটনায় গাই। সেখানে বাবার সঙ্গে একজন ভ্রাতৃলোকের পরিচয় হয়। তিনিও ব্রাহ্ম—পোষ্ট বাটার। তাঁর বড় ছেলে তাঁর আগের বছর বি, এ, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন এবং এবং এম, এ, পাড়িয়ে আর বিলাত যা’বার জন্য তুমি পা’বার চেষ্টা করছেন। তাঁকে কলিকাতাতেই থাকতে হ’ত। পরিচয়ের ফলে আমরা যখন কলিকাতায় ফিরে এলাম, তখন থেকে তিনি আমাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসতে লাগলেন। এই ‘মধ্যে মধ্যে’—অল্প দিনের মধ্যেই ‘যখন যখন’ হয়ে উঠল। তাঁর কারণ তখনও আমরা সুস্থিতি; কিন্তু ক্রমে মনে হয়েছিল যে, আমি রোজই বৈকালে—কলেজ থেকে ফিরে তাঁর আসার জন্য প্রতীক্ষা করতাম। তিনি যে দিন আসতেন না, সে দিন যেন কেমন শূন্য মনে হ’ত। তিনিও প্রায়ই আসতেন। তাঁর আসবার কারণ বরা পড়ল যখন তিনি তুমি গেলেন এবং তাঁর বাবা সহসা এক দিন কলিকাতায় এসে বাবার কাছে প্রস্তাব করলেন—তিনি বিলাতে যা’বার পূর্বেরই দিদির মনে করে যেতে চান। কথাটা যখন শুনলাম, তখন বুকের মধ্যে যে বাখা বেজে উঠল—তা’তেই বুঝলাম, আমি তাঁকে ভালবাসি এবং আমার ভালবাসা আমারও অজ্ঞাতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

“কথাটা নিয়ে বাড়ীতে আলোচনা হ’ল। মা বললেন, ‘মন্দ কি? ছেলে যুব ধারাল—ও আপনার পুত্র আপনি করে নিতে পারবে।’ বাবা কিন্তু বললেন, ‘ধারাল বলেই আমার বেশী ভয়—বিলাতে যাচ্ছে, যদি সেখানে কুসংসর্গে নিশে তব রক্ষা থাকবে না—আর যদি তা’ও না হয়—পাশ করতে না পারলে—তা’র পর? ঘরে এমন কিছুই নাই যে, এসে ছুঁনি ও ঢালাতে পারবে।’ শেষে স্থির হ’ল, দিদির মনের ভাবটা জানিয়েও মন্দ হয় না। দিদি সব কথা—আমারই সঙ্গে—ভুলেছিল। সে বললে, ‘কেন? নিজ কাক্ষ্যার্থে ত্রুটি না হয়ে—বিয়ে করা কেন?’

দিদির মনে ছিল, তা’র যে রূপ; তা’তে তাঁর অনেক রূপ সম্বন্ধ জুটবে।

“দিদির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ’ল না। তিনি বিলাতে চলে গেলেন; যা’বার সময় দিদির একখানা পত্র লিখে এসেছে—‘তুমি যদি আমার জন্য অপেক্ষা কর, তবে যেসব, আমি তোমার গুণগুরু হয়েই ফিরে আসব। সেই আশা নিয়েই আমি বিদেশে যাচ্ছি।’ পত্রখানা প’ড়ে দিদি হাসল—সে হাসিতে উপেক্ষাই মুটে উঠেছিল।

“দিদি যা’ মনে করেছিল, তাই হ’ল—দিদির বিয়ে স্বামীর জন্য প্রার্থীর অভাব হ’ল না, হ’বার কথাও নয়। রক্তারসে ভরাষ্ট্রান শঙ্খিনে দিদির দেখে বড় ব্যাধির ‘সেন সাহেবের’ বড় ছেলে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠাল। তখন ‘সেন সাহেবের’ অর্থের ব্যাধি এত বেশী যে, হাতে অনেক অস্বাভাবিক টাকা প’ড়ে যায়। তোমাদের সমাজে কৌলিন্যপ্রথা আগে ভালই ছিল, এখন অপব্যবহারে আর তেমন নাই; আমাদের সমাজে কাক্ষ্য-কৌলিন্যই সমাজের সর্বনাশ করছে। সেই কাক্ষ্য-কৌলিন্যের জন্য সে সম্বন্ধ আসতেই বাবা ও মা মনে করলেন—যেদের সৌভাগ্য। দিদিও যেন মনে করলে, তার মত রূপসীরা উপযুক্ত সম্বন্ধ বটে। ছেলেরই সম্বন্ধে কাক্ষ্য সমান নেওয়া কেউ প্রয়োজন মনে করলেন না; সে মাত্র মাস দুই পূর্বে বিলাত হ’তে এসেছিল—আবার যা’বার কথা।

“বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু দিদির স্বামীর আর বিলাতে যাওয়া হ’ল না। দিদির রূপই হ’ল—দিদির ও তাঁর সর্বনাশের কারণ। আমরা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—পরিব বললেও বলা যায়। যাকে ‘সোয়াইট’ বলে, তা’তে শিবির স্বযোগে কখনও পূর্বে হয়নি; কাজেই আগে দিদির অনেকেই দেখে। এখন নানা অস্থানীয় দিদির যেতে হ’ত—আর সে যেখানেই যেত, সেখানেই তাঁর রূপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সেই সব প্রশংসার দৃষ্টি দিদির স্বামীর অন্তরে সন্দেহের ও শঙ্কার আশ্রয় জন্মাত। কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ সন্দেহজনক থাকে—তা’রা কিছুতেই স্বীকৃতি নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে

পারে না। দিদির স্বামী সেই দলের। সে ‘কিন্তু কি করবে ভেবে পেত না। শেষে তাঁর সন্দেহ দিদির উপর অত্যাচারে পরিণত হ’তে লাগল।

“দিদির প্রকৃতির পরিচয় তুমি স্থলেই কতকটা পেয়েছ। সে অন্যায়া কখন সহ্য করতেন—তা’র প্রতিবাদ করত; বরং বাধা পেলে তাঁর জিব প্রবল হয়ে উঠত। তাঁর প্রতিবাদে ও জিদে তাঁর স্বামীর সন্দেহ আরও প্রবল হ’তে লাগল; যাত প্রতিযাত ব্যাপারটা জটিল হ’লেই চলল।

“তা’রপর—কাপুরুষেরা যা’ করে, তাই হ’তে লাগল। আপনাকে সবল মনে করে দিদির স্বামী জীব উপর অত্যাচার আরম্ভ করলে—অকারণে তিরস্কার, সন্দেহ প্রকাশ—এই সব হ’তে লাগল। দিদি কিছুই বিনা প্রতিবাদে সহ্য করত না। জীবন নরক হ’ল। শেষে একদিন একটা পাটি হ’তে ফিরে তাঁর একটা কথায় দিদি বললে, ‘তোমার মত লোককে আমি পুত্র অর্থন মনে করি।’ স্বামী জেগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দিদির একটা ধাক্কা দিলে—দিদি পড়ে গেল, একটা টেবিলে বেগে তাঁর কপাল কেটে গেল।

“শব্দ শুনে বাড়ীর লোক সেখানে জড় হ’তে না হ’তে দিদি উঠে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এসে ট্যাক্সী ভেঁকে বাপের বাড়ীতে চলে এল; তখনও তাঁর কপালের কাটা থেকে রক্ত পড়ছে—কাপড় জামা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে।

“মা তার ক্ষত স্থান দুইয়ে দিলেন। দিদি কিছুতেই ডাক্তার ডাকতে দিল না; বললে, ‘ডাক্তার ডাকলেই সে চলে যা’বে।’ সে তাঁর লজ্জার কথা আর কারও কাছে প্রকাশ করতে পারবে না।

“কিন্তু তাঁকে অধিক দিন লজ্জার যন্ত্রণা ভোগ করতে হ’ল না। সে যে রাজিতে সেই বাখা নিয়ে—স্বপ্নমান-বিকল দ্বন্দ্বের মার কাছে এসেছিল, সেই রাজির শেষেই তাঁর জর হ’ল এবং তিন দিন পরে সেই জর ছাড়ল—মৃত্যুর নিশ্চিন্ততায়।”

দেখিলাম, অনিমা কাঁদতেছে। আমি বলিলাম, “কি দুঃখের বিষয়।”



সে বলিল, “হাঁ।” যে জুল সংসার শোভাময় করবে আশা ছিল, সেই জুল সূতাভার পূর্বেই শূন্যে চিতার আঙনে মিশিষ্ট হ’ল।”

৩

আপনার চঞ্চল হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া অশ্রুমা বলিতে লাগিল :—

“দিবির মৃত্যুর পরও আমি পড়তে লাগলাম এবং বি, এ, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা আমার ভাগ্যে ঘটল। বিবাহের জন্ত বাবা ও মা কোন আয়োজন করলেন না; কারণ দিদির সম্বন্ধে দারুণ অভিজ্ঞতা তাঁদের মনে বিয়ের নামে শঙ্কার উদ্ভব করত। আমিও সে জন্ত বিনত হ’লাম না। কারণ আমি ভালবাসেছিলাম। দিদির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও আনন্দের আদার আমার সে ভালবাসা রূপে প্রকাশিত হ’ল।”

কথাটা বলিতে অশ্রুমা যেন একটু লজ্জাহত করিল। তাহার পর সে বলিল :—

“যাকে পা’বার আশা থাকে না—আশা করা যায় না, তাঁকে ভালবাসা কি অসম্ভব?

আমি বলিলাম, “অসম্ভব! দুইই সম্ভবই। নীরার কথা ত তুমি জান। হিন্দু আমরা—দেবতাকে ভক্তি করি ভালবাসি, দেহ করি—সে কি অসম্ভব হ’তে পারে? স্বজন্ম মাধুর্য্য-রসের কথা তুমি বৈষ্ণব কবিতার জানতে পারবে।”

অশ্রুমা বলিতে লাগিল :—

“এম, এ, পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করলাম। সেই সময় সংবাদ পড়ে শিক্ষয়িত্রীর জন্ত বিজ্ঞাপন দেখলে আবেদন করতাম।

“এই অবস্থায় এক দিন ওনলাম, তিনি বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন। বা’ ওনলাম, তা’তে অল্প সংবরণ করতে পারলাম না—পরীক্ষার জন্ত অভিরিক্ত শ্রমে তিনি দৃষ্টি হারিয়েছেন। বুঝলাম, তিনি যে দিদির বসে গিয়েছিলেন,—‘তুমি যদি আমার জন্ত অপেক্ষা কর, তবে দেখবে আমি তোমার উপযুক্ত হয়েই ফিরে আসব। সেই আশা নিয়েই আমি বিদেশ যাচ্ছি।’—সে কথা তিনি

ভুলেন নি। কিন্তু অদৃষ্টের কি উপহাস! দিদি তাঁর জন্ত অপেক্ষা করেন নি—কিন্তু দিদির বিবাহে কি অভিসম্পাত এসেছিল! আর তিনি—কি আশা নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কি হয়ে এসেছেন! সে রাত্রি আমি কেঁদে কাটলাম।

“তারপর? আঙনের শিখা যেমন পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে, তাঁকে দেখবার আগ্রহ আমাকে তেমনি আকৃষ্ট করতে লাগল। সে আকর্ষণ আমি অতিক্রম করতে পারলাম না। তিনি পিতামাতার কাছে বাবার আগেই কলিকাতায় যে দূর আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠেছিলেন, একদিন একা তাঁর বাড়ীতে গেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা হল।”

বলিয়াই অশ্রুমা নিশ্চল হইল। বুঝলাম, সে আপনাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে আপনাকে সংযত করিয়া আমার বলিতে লাগিল :—

“কৃত গিয়ে কি বলেছিল জানি না; আমি যেতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘পুণিমা, তোমার কি দয়া—আমাকে দেখতে এসেছ।’

“আমার দুই চক্ষু জলে ভরে এল।

“তিনি বললেন, ‘আমি আর কারও উপযুক্ত নই। তুমি যদি মনে মনেও আমাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাক, আমি তা’ থেকে তোমায় মুক্তি দিচ্ছি।’

“চোখ মুছে তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম—যেন শাল-বৃক্ষ বজ্রধাতে দগ্ধ হ’য়ে গেছে। কোন জানি না আপনাকে সামলাতে পারলাম না—বললাম, ‘যে নারী আপনাকে সেবা করবার—আপনার ভালবাসা লাভ করবার সুযোগ পা’বে, সে ভাগ্যবতী।’

“দেখলাম তাঁর মুখে আনন্দের রীষি প্রকাশ পেল—তারপর সে মুখ জাইয়ের মত পাণ্ডুর হ’য়ে গেল। তিনি বললেন, ‘না—না! যে ম’রে গেছে, তাকে কে আপনার জীবন দিতে পারে?’

“আমি বললাম, ‘দেওয়া যে ভাগ্য বলে মনে করে, সেই তা দিতে পারে।’ আমি—কেমন করে সে এসব কথা বললাম, তা আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না।

“তিনি বললেন, ‘এই অপদার্পের—এই জীবনমৃতের ভার কি তুমি নিতে পার? তোমার নিজের জীবন কেন ব্যর্থ করবে?’

“আমি বললাম, ‘জীবন ব্যর্থ করব না—সার্থক করব। কেবল আপনার অসুখমতি অপেক্ষা।’

“তিনি আমার হাতের সন্ধান হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমি হাত ধরলে আমার হাতখানি মুখে তুলে কি আগ্রহে চুমু খেলেন! আমার মনে হ’ল, আমার জীবন সার্থক।

“সকল স্থির করে’ বাড়ীতে ফিরে এলাম। এসেই এই মাহুরায় যে আবেদন করেছিলাম, তাঁর উত্তর পেলাম আমি এখানে স্থলর অধ্যক্ষের চাকরী পেয়েছি। মনে হ’ল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন! আমি তাঁকে নিয়ে সেই দূর বিদেশ যাব। বাবাকে মা মাকে এসব কথা বলতে সাহস হ’ল না—বললাম, বৌদিবিল। বাপা তাঁর কাছে শুনে বললেন, সে কি হ’তে পারে? শেষে বৌদিদির বিশেষ অস্থির হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন।

“সাত দিনের মধ্যে রেজেষ্টারী বিবাহ করে—আমি ঘাটীকে নিয়ে এখানে চলে এলাম। সেই যে তাঁর সঙ্গে সাফা, সেই তখন হ’তে আমার মরে গেছে—তার স্থানে আমার এসেছে পুণিমা।”

ওনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অদৃষ্টের উপহাসই বটে! দেখিলাম, অশ্রুমা আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “স্বপ্নে আছ ত?”

সে বলিল, “হাঁ। স্বপ্নেই আছি। কিন্তু যতদিন থাকে, তত আশঙ্কা হচ্ছে, যদি আগে আমার মৃত্যু হয়। তবে—কে স্বামীর ভার নেবে? আর যদি তিনি সব কথা জানতে পারেন, তবে তিনি আমাকে কি বলবেন—তিনি কি আমাকে ঘৃণা করবেন না? আমি কি উত্তর দিব তাবিয়া পাইলাম না। অশ্রুমা বলিল, “তুমি কি আমাকে ঘৃণা করবে?” আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম, “না।”

“না? কিন্তু এ কি প্রতারণা নয়?”  
“যে প্রেম মৃত্যুকেও জয় করতে পারে, সে প্রতারণাও

জয় করে। সে আঙনের মত বাঁকে স্পর্শ করে, তা’কেই পবিত্র করে।”

অশ্রুমার মুখে যেন স্বস্তির আনন্দ স্ফুটয়া উঠিল। সে বলিল, “তুমি সত্যই তা’ই মনে কর।”

“হাঁ।”  
অশ্রুমা আমার দুইখানি হাত তাহার হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, “তোমার কথায় আমার বুকের উপর হ’তে বোকা নেমে গেল। আমি যে তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ, তা’ বলতে পারি না।”

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া—সে যে মনের কথাই বলিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।  
হাত-বাঁড়ীটা দেখিয়া সে বলিল, “দেবী হ’য়ে গেল। তিনি উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন। আজ আসি।”

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, “অশ্রুমা—পুণিমা, আমরাও চলে যাব। যদি স্বামীর কাছে আমার কখনও মাহুরায় আসি সন্ধ্যাগ্রে তোমাকে খুঁজে নেব।”

সে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

পরিশ্রম শেষ করিয়া স্বামী যখন আসিলেন, আমি তখনও অশ্রুমার কথাই ভাবিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, “তোমার বাক্যবী ত এসেছিলেন—যে রহস্য ভেদ করবার জন্য অকারণ কৌতুহলে ব্যস্ত হয়েছিল, তা’ ভেদ করতে পারলো?”

আমি বলিলাম, “নিশ্চয়। কিন্তু সে লীর্ষ কথা।”

“হিসাব দেখে দেখে জালাতন হয়ে গেছি। তুমি বল

ব্যপারটা কি—তুমি।”

তখন আমি সবকথা বলিলাম।

ওনিয়া স্বামী বলিলেন, “উপন্যাসের মত বটে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিন্তু আমি যে বলেছি, অশ্রুমা অন্যায় করে নি, তা’ কি ঠিক?”

“এ সব বিষয়ে তুমি জুল করতে পার না। যে প্রেম তা’কে এই ভাবে প্রয়োচিত করেছে, নারীর সেই প্রেম যে নারী দেহ, সেও ধন্য এবং যে পুরুষ পায়, সেও ধন্য হয়।”



# হুগোব বন্ধুত্ব

উপন্যাস

শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(৩)

রাণীমার কয়েকটি সন্তান জন্মবার পূর্বেই গর্ভে, এবং দুইটি জন্মিয়া এক মাসের মধ্যেই মারা পড়ে। তাহাদের অবস্থা খুবই ভাল। তাই, সন্তানের কামনাও যতখানি ছিল, প্রয়োজন হয়ত তাহার অনেক অধিকই ছিল।

যে কোন নারীর পক্ষে সন্তানের কামনা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার; সেই হিসাবে হরিদাসী যে, ভাগ্যবতীকে লইয়া লালন পালন করিতেছিল তাহার নিগূঢ় কথাটি, বাহা নারী জন্মের একটু সহজ-সত্য এবং যে-কথা একটু চিন্তা করিলেই বৃষ্টিতে পারা যায়, তাহা লইয়া বোধ হয়, তাহার সমাজের সহিত বিরোধের কোন কারণ ছিল না। সে যদি নীচ জাতি না হইয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা হইত, এবং সেই সঙ্গে দরিদ্র না হইয়া অবস্থাগর হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চতুর্দিকে বহু বহু পড়িয়া যাইত।

নারীর পক্ষে সন্তান-কামনা নিত্যস্ত সাধারণ। ইহাতে সমাজ-আহা উচ্চ করে না; বাহার সন্তান হইল না তাহার ভজ দাবী তাহার ভাগের লিখন এবং সেই লিখন গণ্ডন করিতে শূদ্রানী দরিদ্রকন্যা চাঁদে হাত দিবে? এই ছিল সর্ব সাধারণের মনের কথা; কিন্তু ইহার অধিক কিছু রাণীমার মনে সঞ্চিত হইয়াছিল। নহিলে তিনি অনেকগুলি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হরিদাসী আসিয়া ব্যাহিরে বসিয়া আছে। কিকে দিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলে নিশ্চয়ই রাজা বাবু অগ্রসর হইতেন না। এবং সূর্য-সমকক এতটা লজ্জাও তাহার গটিতে প্রাপ্ত না।

২৬

হরিদাসীর পালিত কন্যার সংবাদ যেদিন রাণীমার কাছে পৌঁছিল, সেদিন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। সংবাদ আসিবার পূর্বে হরিদাসী স্বয়ং কেন আসিল না? কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তখনও যে, হরিদাসী শিওট সঙ্গে করিয়া তাহার পরামর্শ এবং অহুমতি ভিক্ষা করিতে একদিন আসিবেই আসিবে। যতই দিন যাইতে লাগিল, অভিমান তাহার মনে পুঞ্জিত হইয়া পল্লত-প্রাণ হইল এবং অবশেষে তিনি হরিদাসীর দৃষ্টি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। মন কঠোর হইয়া পড়াইল।

হরিদাসীর মনেও এই সকল কথা যে একেবারেই স্থান পায় নাই তাহা নাহে। সন্তানের ক্ষুধা তাহার মনে হয়ত নিশ্চিত কথা মৃতকল্প হইয়া কোথায় যে বাস করিতেছিল তাহা সে নিজেই কোনদিন জানিত না; কিন্তু যেদিন ভাগ্যচক্রে সমাজোক্ত শিশু হইয়া তাহার হাতে অনন্ত-উপার হইয়া আসিয়া পড়িল, সেদিন সেই স্তম্ভ ক্ষুধা পক্ষী-শাবকের মতই প্রকাণ্ড হাঁ বাহির করিয়া তাহাকেই গিলিয়া বসিল; অগ-পশাৎ বিবেচনার কোন শক্তির যেন আর রহিল না। শুধু তাই নয়, সে সমাজের কথা চিন্তা করিল না; কেন না সমাজের বিরোধ যে যেন মনে মনে জানিতই; তাই ভয়ে, সে কথা মনে স্থান দিল না। সমাজের চেয়ে সে রাণীমাকে আরো অধিক ভয় করিল, কেন না সে যেন মনে মনে জানিত রাণীমার গ্রাস হইতে ভাগ্যবতীকে উদ্ধার করা তাহার সাধের অতীত হইবে। তাই সে ঘুরে ঘুরে ফিরিতেছিল। আজও তাহার মনে একটা দীর্ঘের সন্দেহ ক্ষণে ক্ষণে ছায়াপাত করিয়া যাইতেছিল; রাণীমাই সকল চক্রান্তের মূল; তাহার সহিত চাতুরীর খেলাই খেলিতেছেন এবং তাহারই নামাতে আজ

বাখা—১৩৪২]

শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হুগোব বন্ধুত্ব

সে তাহার অতি নিকটেই আসিয়াছে। ইহার পরের ব্যাপার, সে যেন যেন মনে জানিয়াছিল যে, তিনি ভাগ্যবতীকে দেখিতে চাহিবেন।

এই ভয়ে হরিদাসী যেন কাটা হইয়া গিয়াছিল। সে অস্তর হইতে দেহতার নিকট এই প্রার্থনা বারম্বার উচ্চারণ করিতেছিল :—ঠাকুর, আমার ভাগ্যবতীকে আজ রক্ষা কর! ঠাকুর, তুমি ভিন্ন আমার আর অস্ত্র সূত্র্য নাই যে!

কিছুক্ষণ সময় উত্তীর্ণ হইবার পর রাণীমা বলিলেন, বাবু রাতে সন্তিই তুমি ঘরে ছিলি?

হরিদাসী বলিল, তোমার পা ছুঁয়ে দিবা করিতে বল, করচি না!

রাণীমা হাসিয়া বলিলেন, সে আর একটা বড় কথা কি এখন তোমার কাছে হরিদাসী? বাবুনের মেয়ে ত গের ঘরে আছকাল।

হরিদাসী ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

কথা কহিসনে যে? রাণীমা এবার একটু তড়া দিলেন।

হরিদাসী বলিল, কি বল্বেবা মা! আমার তোমার কাছে আসেই আসা উচিত ছিল; না এসে যে দোষ ঘরটি, সেই লজ্জার মরছি!

রাখ রাখ, আর ঘোমটার মধ্যে খেঁচটার নাচ খোঁতে হবে না। বলিয়া রাণীর ভাণ করিয়া তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া রাজা বাবুর সঙ্গে কথা আশ্রয় করিলেন। হরিদাসী বাহিরের বসিয়া সেগুলি যেন দিলিত লাগিল।

ঘরে গিয়া রাণীমা হরিদাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়া কথা কহিলেন, ও, অতো গুলো টাকা কোথেকে তোমাদের দেবে? বাবুর পেটে খেতে কুলেয় না, বাবুর উপর তোমাদের টাকার জুলুম দেখলে পা জলে যাবে।

রাজাবাবু হাসিয়া বলিলেন, রাজ্য-শাসনের তোমরা কি বোঝ? ও মেয়ে মাছ, ওর গায়ে তো হাত তোলা হেন না.....ওকে টাকার মারেই মারতে হবে।

তার থাকিই বা কি রইল তুমি, আমি হলে তোমার জন্মবার প্রভু নিজেকে টাকা জরিমানা করে দিতুম। মেয়ে মাছের গায়ে হাত তোলে এত বড় স্পষ্ট ওর!

তুমি দেখলে, একটা কথা কইলে না! এ অপমান আমার নয় না; তাই ওকে ভিতরে ডাকিয়ে নিলুম। রাজাবাবু বলিলেন, তাই বিচার অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। এখন তোমার হাতে বিচারের ভার; দেখি, তুমিই বা কি কর।

রাণীমার দুইচক্ষু জল-জলে হইয়া উঠিল; বেশ, তবে আমি বিচার কহি; প্রকৃষ্টিএর মাইনে থেকে পঁচিশ টাকা কেটে, হরিদাসীকে মাসে পাঁচ টাকা করে দেওয়া হবে, ঐ টাকাকে বাবুনের মেয়ে প্রতিপালিত হবে।

আর হরিদাসী যে অপরাধ করলে? রাজাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

মজিলপুরে গিয়ে? সেখানে কি তোমারা দেখতে গিয়েছিল? তা' যদি প্রমাণ হয়, নিশ্চয় ওর দোষ সাব্যস্ত হবে, তার জন্তে শাস্তি নিতেই হবে; আমি দাবী, ওকে যে শাস্তি দেবে সে ও শীকার করে নেবে। আর মটর চক্রবর্তীর বৌটা যে বেখোরে মারা গেল?

তার জন্তে দাবী ঐ হরিদাসী? তারা ডাক্তার পর্যন্ত ডাকলে না, টাকা খরচের ভয়ে! চমৎকার বিচার কিন্তু তোমাদের.....

রাণীমা অধৈর্য-ভরে, ঘর হইতে বাহির হইতে হইতে বলিলেন, চলে যেওনা, এগুলি আমুছি আছি...

রাজাবাবু মুহু হাসিয়া বলিলেন, এত ব্যস্ত হ'চ্ছে কেন? বিচার কি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে?

হরিদাসী বাহিরে বসিয়া দাপ্তার-কলহ শুনিতেছিল। যে-কথা স্পষ্ট ভাবে তাহার মনে আসে নাই, সহজ বোধে তাহার একটা নিদারুণ মর্শ, তখন মনের মধ্যে বেশ একটু সাড়া দিয়া গোলামাল করিতে শুরু করিয়াছিল।

২৭



রাজার রাজ্যের বৃত্ত হইলে সর্বাঙ্গের কতি হয় উলু বড়েরই। সে ভয় পাইতেছিল যে, রাধিয়ার কাছে রাজ্যবাস্য পরাজিত হইলে ক্রোধ-বলি নূতনতর বিস্মৃত লইয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিবে।

রাধিমা ক্রতপরে ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর শব্দ করিয়া টাকা কয়টা রাধিয়া বলিলেন, এই নগদ হরিদাসীরা ফাইন...

ওর কান্না, তুমি দেবার কে?

দীপ-শিখার মত রাধিয়ার দুই চকু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, আমিও যে ওর জাতেরই মেয়ে মাহুয় কিনা! বিনা দোষে পুরুষের হাতে লাঞ্ছনা; ও যে আমক, তাই ওর যে আমি কপড়া করছি, তোমাদের অবিচারের প্রকৃষ স্বীকার করে আমাদের অক্ষমতার অক্কেল সেলাদি মিছি—এই...

রাজা বাবু মাছ ঘরিতে ভালবাসিতেন, পাখী স্বীকার করিতেন, বহু বান্দবদের সঙ্গে ইয়ারকিতে সমরক্ষেপ করিতেন। আর, রাধিমা, তাঁহার নিমসঙ্গ অবসর কবিতা এবং মতল পড়িয়া যে কাটাটেন তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতায় গেলে, প্রতি রাতেই থিয়েটার দেখিতে যাইতেন। অতবধি অকৃত্রিম স্ফুট তাহার মধ্যে কিছু প্রবল ভাবেই বুদ্ধি পাইয়াছিল; তাহার উপর নিমস্হানকার জ্ঞান মনে একটা অভিনাও ছিল; হয়ত স্বামী সেই কারণে অবহেলা করিতে স্মর করিয়াছেন।

এবিক হরিদাসী বুঝিল যে, ব্যাপার ক্রমেই ওভরর দাঁড়াইতেছে। রাজ্যরাধিয়ার মধ্যে নিরোধ কিছু স্থায়ী হইবে না; কিন্তু কলহের উত্তাল তরঙ্গে তাহার কপাল ধরিয়া যাইতে পারে। তাই সে, আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সরিয়া পড়িল। অন্যর হইতেও সোজা বাহির হইয়া যাইতেছে বলিয়া প্রভুসেও তাহার গতি রোধ করিল না।

রাধিয়ার হাতে আরো ছইট টাকা ছিল, তাহা তিনি হরিদাসীকে ফেরা দিতে আসিয়া অবাক হইলেন। মনে করিলেন, কোন বিশেষ প্রয়োজনে সে বাহিরে...

গিয়াছে, এখনি ফিরিয়া আসিবে। হরিদাসী যে না বলিয়া চাঙ্গিয়া যাইবে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

অবশেষে হরিদাসী যখন আর ফিরিল না, তখন তিনি মনে মনে রাগ করিলেন। যাহার জজ কোমর রাধিয়া রপে উজ্জ্বল হইয়াছিলেন, সেই যদি সূর্য্যোপে উজ্জ্বল দেয় তাহা হইলে ক্রোধ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

৪

হরিদাসীর ঘরে ফিরিয়া, মান করিয়া এক মুঠা রাধিয়া বাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে অসময়ে আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার মনে কোন উত্তেজনা হয় নাই। জমিদারের পেয়ালা ঘর পর্য্যন্ত আসিয়া দেখা দিলে, হয়ত চিন্তার কারণ হইত। হরিদাসীর যে-কাল তাহাতে তাহার সমগ্র অসময় ছিল না; আহার-নিদ্রা স্বা সহিত না। হরিদাসীর মা তাহা যে না জানিত তাহা নাহে, তবুও হরিদাসীর অতিরিক্ত তৎপরতায় মনে মনে রাগই করিত। কেহ ডাকিলে হরিদাসী তিলমাত্র সময়কোষ না করিয়া প্রস্তুত হইত; হয়তো ভাল করিয়া বাওয়াই হইল না। বৃদ্ধা পিসু পিসু করিত; দ্বুঠো শান্ত হয়ে থেয়ে না পেলে... শরীর ভোত উজ্জ্বল কেনন করে, বলি ছুড়ি?

হরিদাসী হাসিত, বলিত তোমাকেও ত মা এখনি ক'রে খাটতে দেখেছি, তবুও তখন বাবা ছিল; বাবাও ত কামাতো; কিন্তু আজকে যে সংসার একেবারে আমার মাথার। তার উপর, ভাগ্যদরীকে দেখাইয়া বলিত—এই মা-লক্ষী আবার অবতীর্ণ হয়েছে! বাবা! বামুণ জাত; যে-সে তো নয়; একেবারে পোকেরা সাপ; সেবার কট হয়েছে কি কৌল কেও উঠেছে—রকম আছে? পল্লী এক পাড়ে যাবে না?

মা রাগ করিয়া বলিত, চুপকর ছুড়ি, কখন কি-কণে কি-কথা, যে বলিম—কি হ'তে, কি হ'য়ে বসে! আজকালকার দিনে, আর কেউ কিছু মানতে চায় না।

সেদিন ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর, ভাগ্যদরীকে বুকের কাছে লইয়া হরিদাসী ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুমে তার কোন মতেই স্মৃতি হইতেছিল না। বার বার করিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভাগ্যদরীকে বুকের মধ্যে ঝুড়াইয়া ধরিতেছিল, যেন তাহার হারাণ নিধিকে আবার পুণ্ড্রা পেছে; সে পাওয়াও যেন দীর্ঘ দিনের জ্ঞান, সে শুধু কণেকের, কণিকের—কোথা দিয়া কেনন করিয়া ফসকাইয়া, পিছলাইয়া যাইবে, কে বলিতে পারে?

সকাল সঁকাল শোয়ার জজ শেখরতে তাহার ঘুম জাগিয়াছিল; অতদিন ভাগ্যদরী আগে উঠিয়া তাহার বুকের উপর চড়িত গিয়া পড়িয়া পড়িয়া যায়। তাহারে জাগাইবার জজ কচি হাত দিয়া মুখে ঢাপড় মারে। অবশেষে কাদিয়া হরিদাসীকে জাগায়। হরিদাসী শিশুর বুদ্ধি দেখি মনে মনে অবাক হইত। উঠিয়া ছাপল ছুইতে দেরি করিলে শিশু উঁউ করিয়া আতুল দিয়া ছাপল দেখাইয়া দিত। হরিদাসী আশ্চর্য হইয়া বলিত, ওমা! কি বুদ্ধি তোমার? কেন তাও, তোমার বুঝি কিদে পেয়েছে? ঘরে যাই! এই যে! চই কয়ে ছুপ কয়ে বুঝত; কৃষা নিবারণের জজ বা হাতের বুড়া আতুলটি মুখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিদাসীর গতি-বিধি নিরীক্ষণ করিত!

কিন্তু আজ সে এখানে উঠে নাই, তাই হরিদাসীর উদ্ভিত মনে চাহিল না। সে শুইয়া শুইয়া পূর্ণ দিনের দটনা শ্রম করিয়া মনে মনে লজ্জা বোধ করিল। রাধিকাকে সে একেবারেই না বুঝিয়া এতদিন অবিচার করিয়া আসিয়াছে! 'তৈ তিনি ভ' ভাগ্যদরীকে কাড়িয়া লইবার একটা কখন, একটা ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করিলেন না? শুধু একটা অভিনা; সে তো সম্পূর্ণ আলোচনা জিনিষ। এতবড় একটা ব্যাপার, সত্যিই উচিত ছিল হরিদাসীর তাঁর আশ্রয়ে গিয়া ঠাণ্ডান। যদি সেই হাতের আশ্রয় সে লইত, তাহা হইলে কি ঐ দর জঙ্কবতী, কি প্রভুসিংহের সাধা থাকিত তাহার কেশ স্পর্শ করিবার! হরিদাসী মনে মনে অশ্রুতপ্ত হইল। নিজেকে সাধনা দিয়া বলিল, আনাদের মত হীন, দরিরঙ্গের সে দরকার রোজই; ওদের আশ্রয়, ওদের সাহায্য নৈলে কি আমাদের একদিন চলে? তুল হ'য়ে থাকে, পা-ব'রে মাগ চাইলে রাধিমা নিশ্চয় দয়া করবেন।

সকালের আলোর সহিত হরিদাসীর মনে এই কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, সে কাল না বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে; আজ যদি না যায় তাহা হইলে রাধিমা বড় রাগ করবেন।

সে, পলায়নের ওজুহাতে কি কথা বলিবে, তাহা মনে মনে আতুড়ি করিতে লাগিল। যখন আসল কথাটি বলা সম্ভব হয়, তখন মিথাকে জোড়াটাড়া দিবার মাধা বাধার আর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু মাহুশের জীবনে, বিশেষ করিয়া দীন দরিরঙ্গের জীবনে সত্য কথা প্রকাশ করিবার শক্তি কোথায়, সাধা কোথায়? তাই হরিদাসী, উদ্ভিত-বসিতে, এবিক-বদিক করিতে করিতে; মিথার উপর মিথ্যা সাজাইয়া যেন তাসের কোন্না গড়িতে লাগিল; কিন্তু কোন বানোনা কথাই টিক হয় না। একটা দমকা বাতাসের তেলায় হতমুদ্র করিয়া পড়িয়া যায়।

অবশেষে সে সমস্ত জিনিষটাকে চাপা দিয়া ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ শুধরাইয়া লইবার মতলব আঁজিয়া তখনকার জজ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, ভাগ্যদরীকে লইয়া গিয়া রাধিয়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিবে।

মতলবটা উপর হইতে দেখিতে মন্দ নয়। হয়ত ফলও সুন্দর হইতে পারে; কিন্তু একটা সমুদ্র ভয়ের কথাও ছিল। সেটি হরিদাসীর মর্মে যেন ব্যাধার মত চিড়িক মাখিয়া উঠিতেছিল। অশ্রুরে ভিতর হইতে এক একবার যেন সাধবান-বাণী উঠিতেছিল, দেখিস যেন মূল হাওয়া না হ'তে হয়!

ভাবিতে ভাবিতে ঠিক ঐ কথাই, ঐ ব্যাপার আসিয়া সে আর কিছুই যেন আগাঠেতে পারেনা। সম্পূর্ণ দেবিলে মাহুশ যেমন সাত হাত পিছাইয়া আসি, সে



টিক তেমনি করিয়া পিছাইয়া আসিতেছিল। যদি, যদি, যদি—হরিণী যেন খাড়া গিয়া জাগিয়া উঠিয়া অপনাক্রমে প্রশ্ন করে, কি যদি? কিসের যদি? যদি অকস্মাৎ রাণীমার ভাগ্যধরীকে পানল করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে! তাহার চিন্তার খেই হারাইয়া যায়; হরিদাসী কাঠের মুঠির মত বসিয়া থাকে।

এমনি করিয়া সকালে বাইবার সমষ্টি বহিয়া গেল; মনে হইল, বাগেগে যাক, নাবার-খাবার সময় গেলে পরে মাহুকে বিস্তৃত করা হবে। তাহার পরে দুপুরের রৌদ্র, বজ্রাশ্রমে এই সময় বিশ্রাম করেন।

অপরাত্নে বাইবার জঙ্গ সে প্রস্তুত হইয়া উঠিল। ভাগ্যধরীকে মেলায় কেনা টুকটকে লাল রংএর জামা পরাইল, চোখে কাজল দিয়া দিল; পাটের উপর কসাইয়া দূর হইতে নিরীক্ষণ করিল, তাহার কোথাও, কোন অংশে রাজ-রাণীর লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা।

অবশেষে হরিদাসী মনে মনে হাসিয়া বলিল, শেখ-কালে কি পাগল হব আমি? ও যদি রাজরাণীই হবে তো মরতে হাড়-মুঠির ঘরে আসবে কেন?

এই শেষ কথাটা তাহার অনেকদিন জোর আনিয়া দিল। সে সহজ চক্ষে তাহারা দেখিল, রাজার ছেলেই রাজা হয়; রাজার মেয়েই রাজ-রাণী হয়। ভিখারী রাজা হইয়া রাজ সিংহাসনে করে বসে? বিধাতা-পুরুষের ইচ্ছাতেই যখন সব হয়, তখন তাঁহার নিজের সহিত নিজের এই ঘোর চক্রান্ত করিবার প্রয়োজন কি? আর, ভাগ্যধরীর কপালে যদি রাজ-রাণী হওয়াই থাকে তো সেই ভবিষ্যৎ বণ্ডন করা কি তাহার শাখার মধ্যে! বৃথা বাধ বাধিয়া নদীর জল আটকাইবার ক্ষুদ্র চেষ্টা মাহুকে; বর্ষার প্রবল বজ্রার জল দেশ-বিদেশ ভাসাইয়া অবশেষে সেই সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

ভাগ্যধরীকে কোলে করিতেই আছে; ঘরের টুক টুক করিয়া একটা টুকটুকি পড়িল। হরিদাসী এক পাও আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অকস্মেৎ আশ্চর্য্য তাহার চতুর্দিকে পৃথিবী যেন চুলিয়া উঠিল। সে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আবার ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

হরিদাসীর মা আশিয়া তাক দিল; কৈ সেজেগেজে বসে রইলি যে হরি?

টুক বেকুরার সময় টুকটুকি পড়লো, তাই ভাবছি আজ আর যাবো কিনা; হরিদাসী কহিল।

বানিকটা বসে যা; আজকে হাত আজাড় আছে; আবার হয়ত দুঃখস পাবিনি।

হরিদাসী কথার উত্তরও দিল না; একপাও নড়িল না। তাহার মার কথায় কোণায় যেন শোঁতা ছিঁদ। শুধু সমস্ত অন্তর জুড়িয়া কান্দিবার আবেগ যেন তাহাকে বেড়িয়া ধরিল। তাহার মনে হইল, সমস্ত সংসার যেন তাহার কোল হইতে ভাগ্যধরীকে ছিনাইয়া লইবার জঙ্গ প্রবল চক্রান্ত করিয়াছে। তাহার মাও সেই চক্রান্তের মধ্যে জড়িত!

(৫)

ভাগ্যধরীকে দেখিয়া রাণীমা একটা উপেকার হাসি হাসিলেন; ভাল কি মন্দ কিছুই বলিলেন না। ইহাতে হরিদাসী অনেকটা সাহস সঞ্চয় করিল; কিন্তু সে, মনের ভাব কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিল না। মুখে বলিল, একে নিয়েই যখন এত গোল, মনে ক'রেছিলাম, রাণীমার পায়ের কাছে কোলে নিয়ে বসলো, মা তুমি এত ভাব এক থেকে নাও। বাড়ীতে কত কুতূহল বেরাল পোষ মাছে, এটাতে মাহুকের বাচ্চ! তোমার দয়া হ'লে এ একদিন রাজরাণীও হ'তে পারে।

রাণীমা মুহূর্ত্ত হাস্য করিয়া, কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, সবই কপালেই খেলা, হরিদাসী। তোমার ঘরে গণমান ওকে যখন শৌছে দিয়েছেন, তখন দুই ওকে মাহুয় কর; টাকা পয়সায় কুলোতো না পারলে, আসি আমার কাছে, যা দরকার হবে, নিয়ে যাস।

হরিদাসী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তখন তাহার মনে রাণীমার প্রতি অস্বাভাবের অশ্রোচনা বোঝা দিল এবং সেটাকে সহজে প্রকাশ না করিয়া বলিল, তোমার মা দেবতা!

অনন কথা বলতে সেই হরিদাসী, কানে শুন্নে লাগে হয়; তোরাও মাহুয়, আমরাও মাহুয়; তাদের খেতে

খেতে হয় ব'লে যেমন অনেক দুঃখও আছে, আবার অভাবকে স্বপ্নও আছে।

হরিদাসী দুঃখকে চিনিত; কিন্তু স্বপ্ন কোথায়! তাহার মূখ সে আজ পর্য্যন্ত দেখে নাই, তাই কথাটা সম্পূর্ণ দৃঢ়তায় মনে পড়িতে পারিল না। রাণীমার মুখের দিকে কাঁচ ফাল্ বসিয়া চাহিয়া রহিল।

রাণীমা ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন! এবং ফিরিয়া গোটা কয়েক টাকা মাটিতে রাখিয়া বলিলেন, ওই নে, তোমার টাকা, কালই পেতিম, হঠাৎ পালিয়ে গেছি কেন?

হরিদাসী প্রশ্ন করিবার আগে ভয়ে ভয়ে বলিল, এতগুলো যে না?

রাণীমা বলিলেন, বাকি তোমার মেয়ের লো—

হরিদাসী জিত কাটিয়া বলিল, ও কথা ব'লে না মা, আমরা ওকে দেবতা ব'লে মাহুয় করি, ও যে মানুষের মেয়ে, ওয়ে—

কথা দিয়া নিজের মনের ভাব, সে আর প্রকাশ করিতে পারিল না!

রাণীমা বলিলেন, কি খাওয়াস? ভাত দিচ্ছি নাকি?

হরিদাসী বলিল, না রাণীমা, এখনো ধাত হয়নি, ছাগলের দুধ, গরম ক'রে দি। দিনে বারবার করে ছাগলটা দুই; ছাগলটাকে ঘাস খাওয়াই; ফেণ খাওয়াই।

তাতে বেশ করিস, তবে দুধটা গরম করিসনে; যদি জ্বাভের কথা মানুষেই হয়ত আগাগোড়াই বিচার করা ভাল। কিন্তু তোরা আর কতদিন দুধ পাইয়ে রাখতে পারবি? চামুচো আমি তোকে একটা গাই দিতে পারি; কিন্তু তোরা খাওয়াবি কি?

তা রাণীমা, সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি; একটা ছোট ছোঁড়া রাখবো, সেই চরাবো; আমি, কি না হোলেমত কিছু ঘাস তুলতে পারি; আর কিছু বিচিরিল জোপাও হ'তে পারে; কিন্তু সেতো পরের কথা—

আগে তো বাচুক!

রাণীমা হাসিলেন, আচ্ছা শুক ব'লেবো।

হরিদাসী প্রশ্নম করিয়া টাকা করটা খাচলে বানিতে বানিতে চলিয়া যাইতেছিল। রাণীমা বলিলেন, মধ্যে মধ্যে এনে, দেখিয়ে নিয়ে যাস; আর যদি কিছু দরকার পড়ে, চাইতে কিছুবাধ করিসনে।

হরিদাসী সমস্ত পথ অত্যন্ত এসার মনে গেল। আজ রাণীমাকে সত্যি তাহার দেবতা মনে হইল। মনে মনে আশ্বস্ত করিল; এমনি কপালের দোষ, গঙ্গার তীরে বসে তেওয়ারি ছাতি কাটাইল! না, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি, অপরাধ নিওনা, বলিয়া বারবার রাণীমার উদ্দেশ্যে প্রশ্নম করিল।

ভাগ্যধরীকে দেখিয়া বৌরাণী যে বিচলিত হন নাই তাহা নহে; তাহার চিন্তার মধ্যে বহু মূঢ় সন্তানের শোক নিমেষের জঙ্গ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাকে যে কি করিয়া নিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া পরে বিশ্বাসের আর তাহার অবধি রহিল না। সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।

সহজ-বুদ্ধির বলে এ কথা তাহার নিকট স্বপ্নমুখ হইয়াছিল।



আহা! বিধবা! জননীর মুখ কোল পূর্ণ করিবার  
সে যে কি আকাঙ্ক্ষা, তাহা তো তিনি ভাল করিয়াই  
জানেন। ভগবান তাহা পূরণ করিয়াছেন; কিন্তু একি  
লীলা ভগবানের! পাকে পদ্মদল? হাড়িমুটির  
ঘরে ব্রাহ্মণের সন্তান! রাণীমা ছুই হাত কপালে  
ট্রেকাইয়া বলিলেন, ঠাকুর অপরাধ নিওনা, তোমার  
সমালোচনা করছিনে; কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়!  
এই আশ্চর্য্য বোধ হওয়ার মধ্যে কয়েকটি গোপন  
কথা ছিল! তাহার মধ্যে সব চেয়ে বড়, পৃথিবীর এত  
স্থান থাকিতে হরিলাসীর ঘরই তোমার মনে পড়িয়াছিল!  
একটা গোপা অভিমান ভগবানের উপর! না হইবেই বা  
কেন? মাছের চেতনায় হয়ত ভগবানকে ভয় করে;  
কিন্তু চিত্তের নিবিড়তর, গভীরতর প্রদেশে তাঁহাকে  
পদম আশ্রয় মনে করে; ভালবাসে। ঠিক ছোট  
ছেলের পিতার প্রতি যে ভাব; বাবা বন্ধন, তিরসার  
করেন, মারেন হয়ত; তাই সে সর্বদাই দূরে দূরে; কিন্তু  
সেই বাবার পীড়া হইলে সন্তান আশ্রয় হইয়া যায়,  
বাইতে পরেনা; শুইয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটায়!  
তাই ভগবানের প্রতি অভিমান করা মাছের নিতান্ত  
স্বাভাবিক!

সন্ধ্যার পূর্বে হরেন্দ্রনারায়ণ মাহাল হইতে কিরিলেন,  
আসিতে আসিতে রাণীকে ছাদে দেখিয়াছিলেন তাই  
সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।  
রাণী বলিলেন, ইস, আজ আমার বড় সৌভাগ্য  
দেখি!  
কেন বল ত?  
একবারে উপরে উঠে এলে যে?  
পাশে বসিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, কেন দোষ  
হয়েছে? কতক্ষণ তোমায় দেখিনি বলত?  
তাত্ত কি ভ্রমাদের মন...  
রাণীকে বাধা দিয়া বলিলেন, সত্যি শ্রামা, আজ  
কণ্ডা নর; আজ মনটা ভারি খোশমেজাজে আছে,  
মনে হচ্ছে কি করি...বুঝতে পারছি সেকালের রাজারা

কেন হঠাৎ বর দিয়ে বসতো; আজ যা চাইবে আমি  
তোমায় দেব,—শ্রামা, বরং রুখ—আজ আর আমি ছোট  
জমিদার নাই, সাগরারথার যেন রাজচক্রবর্তী—কি  
চাও, বল?  
বৌ-রাণী বলিলেন, আজ যে আমার কিছু চাইবার  
মন করছেন! আজ আমাকেও যেন বিসিয়ে দিতে  
ইচ্ছে হচ্ছে; কিন্তু তোমার মত খোশ মেজাজে নয়;  
পরম দুঃখে!  
কিসের দুঃখ, শ্রামা?  
তা আমি আজ কিছুতেই তোমাকে বল'ব না।  
কেন?  
নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, তাহ'লে।  
বেশ, অজানি ব'লে।  
ব'লবো, যদি সেদিন বলার ইচ্ছে হয়; আজ নিজের  
বন্ধনেই নিজেকে ব্যস্ত করা সম্ভব নয়।  
রাণী রাজার হাত ধরিয়া বলিলেন; কিন্তু তুমি একটা  
কথা দাও আমাকে। রাজা হাসিয়া বলিলেন; কি  
মুদ্রিল, আরে! তাই দেওয়ার জগে ত' সাদা-সাদি  
করছি এতক্ষণ—উ, মেয়ে গুলো কি ইন্ডিয়ট—  
রাণী রাগের ভাপ করিয়া বলিলেন, এইবার কণ্ডা  
ক'রবো তোমার সঙ্গে।  
রাজা। অপরাধটা কি শুনতে পাই?  
রাণী। আমি বোকা হ'তে পারি, নির্দোষ হ'তে  
পারি; কিন্তু আমাদের জাতকে গাল দেবার তুমি কে?  
রাজা। এই রে! নভেলের মধ্যে দিয়ে বন্-  
ভেজিম চুকচে! সর্কনাশ! আর দেশটাকে ঠাণ্ডা  
ধাক্কাতে দেবে না!—শ্রামা, লম্বীটি, আর গুচ্ছের নভেল  
শিলো না; এতে ইচ্ছাকাল পরকাল কবুকের হয়ে যাবে।  
রাণী। তবে কি ক'রবো সমস্ত দিন শুনি?  
রাজা। তা' তো বহুদিন পূর্বেই, তোমাকে একদিন  
অতি সমারোহের সঙ্গে ব'লে দেওয়া হয়েছে যে, শ্রম-  
স্বপনে, আহা! বিহারে এই হরেন্দ্র চৌধুরীকে চিন্তা  
করবে, তা ছাড়া অজ কোন চিন্তা সতী নারীর পাপ!

রাণী হাসিয়া বলিলেন, বটে! ঈশ্বর চিন্তা?  
রাজা হাসিয়া উত্তর দিলেন, ওতে কারুর মানা নেই;  
ওঁ বৃশ্বেভিক্ ছাড়া!  
সে কি! রাণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ওদের  
ঈশ্বর চিন্তা করতে মানা? এমন দেশ, এমন দেশের  
মাছ আছে নাকি!  
আছে শ্রামা, আছে। আর ওরা যে একেবারে  
বাঁজে কথা হুল তাত না।  
রাণী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, যাগপে  
নকল্পে ওদের কথা। আমি ব'লছিলাম, তুমি আমার  
উপর রাগ ক'রোনা কিন্তু.....  
কিসের জগে শুনি?  
এরমধ্যে তুলে গেলো? আচ্ছা! ভোলানাথ-মাছ  
কিন্তু—  
ও—ও, মনে হয়েছে; ই্যা, এবার ঠিক মনে  
হয়েছে—  
রাণী ছাড়িবার পাত্র নন, বলিলেন, আমি জানি,

তোমার মনে নেই; ও শুধু চালাকি ক'রে তোমার  
ইন্ডিয়টকে, বোকা বুঝাচ্চ!  
হরেন্দ্রনারায়ণ অপ্রসন্ন হইলেন।  
রাণী বলিলেন, চল, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে,  
হয়ত খাওনি অনেকক্ষণ, নিচে গিয়ে তোমার খাবার  
ব্যবস্থা করিগে।  
না, এখন খাবনা, আর একটু ব'স শ্রামা, আজ  
তোমাকে বড় ভাল লাগছে!  
ওমা! রাণী বলিলেন, আমার হ'লো কি আজ,  
দেবতা দেখছি কোন্ কীকে একেবারে প্রসন্ন হ'য়ে  
উঠেছেন; ভয় করে কিন্তু!  
কেন শুনি?  
তাও শুনবে? মেয়ে মাছের স্বখ-দুঃখের সে  
একটা অতিশয় তুচ্ছ, অতিশয় ছোটকথা! স্বপ্নের পর  
যে অকারণে দুঃখ আসে, তাই ভয় করে।  
রাজা হাসিয়া বলিলেন, পাগলী! (ক্রমশঃ)





## মানসী খ্রীষ্মলচন্দ্র ঘোষ

অবাস্তবের এক মোহময় বিরাট স্বপ্ন মোর,  
তুমি নাই তবু গড়িয়াছি রূপ মর্শ্বের নিকতনে;  
তুমি নাই, তবু তোমারে বেসেছি ভালো!  
এই ধরণীর বুকে,—

কোথাও দেখেছি উলস চাহনি, কোথাও আঁতর আঁখি,  
লীলা-চঞ্চল তরীতরুর তপস্বী স্বন্দর—

দেখেছি লাভ; যধুর হাত সরস বিধাধরে,—  
করিয়া চান সারা যৌবন পথে  
বড়িয়াছি তব মানসী-মুগ্ধতানি।

তুমি কোন্‌ ঘর আবাকশ-কাননে ধরার চুলাগী মেয়ে—  
পজীর স্বপ্ন-স্বপ্নে রচিছ প্রেমের মালাখানি;  
নহে সে মাটির ফুলে,  
সে ফুল ফুটিছে কবির মর্শ্ব-কানন সৌরভিয়া  
গন্ধ তাহার চুটে চলে যায় গৃহে ও গৃহান্তরে।  
সেখায় তোমারে দেখিয়াছি প্রিয়া মুখিয়া ধরার খুলি  
চুপ স্বপ্নের ছন্দ-বোহুল নিঃসঙ্গী দ্বন্দ্বকালে  
দেখেছি তোমায়, দেখেছি তোমায়,—সে দেখা নিখা  
নহে!

কবি রসিকের লক্ষ-মুগের চরণ-চিহ্ন-আঁকা  
ফুলায় মধু প্রেমের স্বরপ-গুপে  
দেখেছি অতীত কুরাশার মাসে তোমারে তিলোত্তমা,  
প্রবাহ নিত্য বংশের ধারা পুরাতনী অত্যাশে  
দেখিয়াছি আর বাসিয়া ফেলিছি ভালো!  
আজিও হে সুন্দরী—  
চিরকুমারের রক্ত-কাননে মহিমান্বিতা রূপে  
তুমি নাই তবু তোমারি সাধনা চলে।

এই পৃথিবীর কোনো প্রান্তরে আছে তুমি নিশ্চয়,  
আমারি মতন অবাস্তবের প্রাণ-স্বপ্ন-লীনা—  
পূজিতেছ তব রক্ত-দেউলে মনোহর প্রিয়তমে;  
তুমি আর আমি দু'জনার মাঝখানে  
সীমাহীন ব্যবধান।

কান পেতে শুনি মুক্তিকা-বুকে বিচিত্র কোলাহল,  
জীর্ণ এ মর্শ্বতলে—  
ভেসে আসে কত জন্মন-রোল, কতনা মিষ্ট হাসি!  
প্রেম-বাণিজ্য চলে দিকে দিকে জুঁব নির্মল লীলা,  
সংঘমহারা বার্ষ প্রেমিক করিতেছে হা হতাশ  
সর্বক যাবার তাদের উঠিছে অশ্রুতির খাস;  
কাজ নাই পরিচয়ে—  
কাজ নাই মোর করিতে চিত্ত সন্দেহ-সম্মল।

পেয়েছি তোমারে তাবের মাঝারে সেই মোর সাধনা  
সমিয়া বিরর অশীম রিক্ততাকে;  
তোমারে কহেছি চুপে চুপে সখি, স্বগত উক্তি কত?  
করিয়া স্থাপিত কাব্যলাকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।  
আমার এ পরিচয়—  
অবাস্তবের মাঝারে ঘটেছে হে মোর স্বপ্ন-সীতা।  
শব্দ খটী কীসর বাজিছে কতনা ছন্দে পানি,  
চিরকুমারের রক্ত কাননে মহিমান্বিতা রূপে—  
তুমি নাই তবু তোমারি সাধনা চলে।

## বাতাহা

### জীপ্রভুল বন্দ্যোপাধ্যায়

আকিস হইতে গৃহে কিরিয়া মনটা কেমন যেন হইয়া  
গেল। জীর মনের দিকে চাহিয়া দেখি, সেখানে যেন  
এই মেঘজমিয়াছে, বলিলাম ব্যাপার কি?

হী, শকুন্তলা—হাসিবার বার্ষ প্রয়াস করিয়া, যাদু  
কিরিয়া বলিয়া গেল, “বাতাহে! কি আবার ব্যাপার—  
কিছু নয়।”

গলার টাইটেতে একটা টান্‌ দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া  
সোঁতে তাক করিয়া ছুড়িয়া আনুয়া ফেলিয়া দিয়া  
চোরচোঁতে বলিলাম মনে হইল—অবস্থা সুবিধার নহে।

হীট আবার, প্রায় নুতন বলিলেই হয়—মাত্র দুই  
বৎসর বিবাহ করিয়াছি—এক একবার মনে হয় তাহার  
মশুপ চিনিয়া ফেলিয়াছি—আবার এক এক সময় এমনই  
বিচির গোল পড়িয়া যাই, যখন, শুধু এইটুকু মনে  
লাগে, “জী-চরির সতাই দুজেন্দ্র,” শকুন্তলাকে কিছু  
মাত্র চিনিতে পারি নাই। কিসে যে সে কে রুই ও মস্ক  
হয়, কোন্‌ অহেতুকী কারণে যে তাহার শোক উধাশিয়া  
উঠে, টিক করিয়া বলা অত্যন্ত শক্ত!

চুপ করিয়া বসিয়াই ছিলাম। শকুন্তলা আসিয়া  
মনেই যান হাসি হাসিয়া বলিল—“বেশ লোক যা হোক  
—ঠার চুপটি কোরে বসে আছ? জলে যে চা দিয়েছি।  
বলিলাম—“উঠি”  
“উঠি নয়, ওঁ।”

প্রায়ের জামাটা খুলিয়া লইতে লইতে শকুন্তলা বলিল  
—“তোমার আবার কি হ'ল?”  
“কিছুই নয়—সম্পূর্ণ স্বস্থ, ভাল মাহুয়।”  
“বটে—! কোন দিন এমন ভাবে থাক কিনা? আজ  
আমি সত্যি বলছি কিছু হয়নি আমার—, তবু তুমি মন  
প্রায় কোরে ভাবতে বসলে কেন?”

মুহুর দিকে চাহিয়া দেখি শকুন্তলা তাহার মুখ  
চোখের ভাব শুলাকে সজীব করিয়া তুলিবার জন্ত কতই

না প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে! আর থাকিতে  
পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম।

ও ঠিক বোধহয় বৃশ্চিতে পারিলনা, একটু কেমন  
যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল।

শকুন্তলা চায়ের পেয়ালাটা লইয়া চলিয়া যাইতেছিল,  
ডাকিয়া বলিলাম—“জামার পকেট থেকে সিগারেটের  
বাস্তা দিয়ে বাওত শক্ত, আর উঠতে পারছিনে।”

সিগারেটের বাস্তুটা হাত হইতে লইতে গিয়া হঠাৎ  
খোয়াল হইল, বাস্তুটা না লইয়া হাতটা চাপিয়া ধরিতেই  
পাশে ও বসিয়া পড়িয়া বলিল—“ভারি দুঃস্থ, মাহুয় যা  
হোক তুমি।” বলিলাম, “সেটা ঠিক—কিন্তু কি ব্যাপার—  
কোন কিছু টিটি পড়ল—?”

ও আমার কথা শুনিয়া, বিলু বিলু করিয়া হাসিয়া  
কোলে মাথা শুঁজিয়া দেয়।

হাঁপ ছাড়িয়া নিশ্বস্ত হইলাম—তবু মনের কোনে  
কেমন যেন আশঙ্কিত ঘুরিয়া বেড়ায়, মনে হইল তবে হয়ত  
কাহারও সহিত মনোমানিয়া খটিয়া থাকিবে—কিন্তু  
তাঁহাই বা কি করিয়া সম্ভব! এ বাড়ীতে এমন তো  
কেহই নাই যাহার সহিত মাজার কাপড় জড়াইয়া  
কৌদল করিবার প্রয়োজন হইতে পারে—। তাবিলাম,  
দূর হউক আমার অত মাথা ব্যথা করিয়া লাভ কি!  
মাহুয়ের মন সর্দাইই যে মৃদঙ্গ বাজাইয়া আনন্দ করিবে  
এমনতো কিছু লেখাপড়া নাই।

হাসি ধামিলে শকুন্তলা বলিল, “তুমি বড় কেমন  
কেন—ইয়ে—”

“কি-য়ে?”  
সে মুখ ফুটিয়া না বলিলেও—কথাটা যে  
না বুঝিয়াছি, এমনও নহে। আসল কথাটা হইতেছে  
আমি একটু বেশী মাত্রায় শান্তিপ্রিয়—তাঁহার উপর  
শকুন্তলা আমার নুতন প্রেমসী। আজ যদি সে আমার  
পুরাতন জী হইত, তাহা হইলে আমিও হয়ত এতখানি



দুর্ভাবনার বোঝা মাথায় লইতে রাজী হইতাম কিনা সন্দেহ। এসব কথা নাকি খুলিয়া বলিতে নাই, বলিলে চাণক্য-নীতিতে ভুল হয়, আর হল্যাহল ছাড়া একবিন্দু স্বাধাও উঠে না।

বলিলাম ও যেন কিছু বলিতে চায়। আমিও শুনিতে অনিচ্ছুক নহি; পাছে আগ্রহ দেখাইলে ভণিতার মাত্রা বাড়িতে পারে এই ভয়ে নির্ভীকার হইয়াই রহিলাম।

শেষটা শব্দস্থলা আর থাকিতে পারিল না—

নিজই বলিল—“ওকে দেখেছ?”

বিস্মিত হইয়া বলিলাম “কাকে?”

“তুমি তা’হলে দেখনি?”

বলিলাম—“কাকে বল?”

“বাতাহাকে”—

“বাতাহা!”

শব্দস্থলা আমার কথার উত্তর না দিয়া অসংলগ্ন ভাবে বলিল—“বড় গরীব ও।”

এতক্ষণ পরে আসল ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলাম। শব্দস্থলার একটা ব্যতিক্রম আছে, বাড়ীতে ভিখারী মানুষ হাঙ্গির হইলে তাহার আর রক্ষা নাই। ভিক্ষার মাত্রা বাহা হৈ পায তাহার চতুর্দণ্ড দুর্ভোগ তাহাকে ভুগিতে হয়। চৌদ্দ পুরুষের পরিচয় দিয়া, তাহার সংসার-স্বখ-দুঃখের সবটুকু জানিয়া লইয়া শব্দস্থলা তবে এক একটি সৌকর্য বিদায় দিয়া থাকে।

সত্যই ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত! এমনতো কত লোকই আছে কে আর এমন করিয়া পরের জন্ত উৎকর্ষ প্রকাশ করে! বিশেষতঃ গরীব ভিখারী সম্প্রদায়, বাহাদুরের কোন মূল্য মাহুষ সমাজে আছে বলিয়াই কাহারা মনে হয়না।

বাহা হউক, আজ একটর আকর্ষণ হইয়াছে— শুনিলাম নাম তারবাতাহা।

বলিলাম—“এতো তোমার নিত্য বিনের—ওকে যত্নে করে-বিন্দয় কোরে দাও।”

শব্দস্থলা উত্তর দিল—“বিন্দয় কোরে দেব?”

কোথায়? ওরবে ছুটি পা-ই খোঁড়া—কত কষ্টে এতটুকু পথ যে চলে তা যদি জানতে!”

মুখিল! আমার সব মূহুহু—এই সব উৎপাত হইয়া হইয়া স্বল্পে চাপিলেই, আমি অত্যন্ত অশ্রুবিধায় পড়িয়া বাই। শব্দস্থলা এটুকু হহাত ভাল ভাবেই জানে, বলিলাম, “কি কোরতে চাও তবে?”

ও উত্তর দিল “বল কি কোর্স—, এই ঘুরঘুরি অন্ধকার বাত্বার রাতে কোথায় যাবে ও?”

“তবে থাক।”

থাকিতে বলিলাম বটে কিন্তু মন্দটা আমার আরও খারাপ হইয়া গেল। বাহিরে মাত্র একখানি বসিবার ঘর, পাখামত অসুব্যাপজ দিয়া সাজাইয়াছি, তাহার উপর আমারও একটা ব্যতিক্রম আছে—ময়লা বা অপরিষ্কার দেখিলে সর্দীশ কেন্দ্র যেন করিতে থাকে। বাতাহা সেই ঘরটি অধিকার করিয়াছে, না জানি আজ সে আমার কতখানি সর্দীশ করিয়া ছাড়িবে। শব্দস্থলার উপর বিলক্ষণ রাগ হইল!

( ছুই )

বনমালী কি একটা কাজ যাইতেছিল, একবার অপ্রয়োজন্যে আমার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার সম্মিত দৃষ্টি বিচলিয়া হইয়া গেল। বনমালী আমার ঢাকার, আমার কোর্স ভালরকমই জানে। হহাত মূনিবের মুখের ভাবটা ভাল করিয়া দেখিবার লোভলক্ষণ করিতে পারে নাই—লোকটা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া ভ্রত সুরিয়া বাইতেছিল, আশ্বে ডাকিলাম—“বনমালী?” বনমালী আসিয়া দাঁড়াইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—“লোকটা কি কোরছে রে।”

সে সম্বোধিত হইয়া বলিল—“ওয়ে পড়ে আছে বার, মধ্য একটা মুন্স বয়েসী হয়। না বয়েস, ‘বনমালী’—ও এখনেই থাক আমার রাত্তার—কি বলি?” বলিলাম—“তাই থাক না—”।

বলিলাম—“আজ্ঞা, ছুই যা।”  
রাতে আহা-বাহারের পর শব্দস্থলা কাছে আসিয়া বলিল—

আমি বলিষ্টাটকে তোয়াজ করিয়া আরামদায়ক করিয়া লইয়া বলিলাম, “বাহিরে কি স্বল্প উঠেছে শব্দ?”

শব্দস্থলা উত্তর দিল—“ঘুম—”

মুখলারো রুগি নামিল—মেঘের গুরু-গছীর ডাকে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলি বোধহয় কক্ষভ্রাত হইয়া যাইবে বলিমা মনে হয়, কোথায় যেন একটা বাজ পড়িল। ও আমাকে সভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ ওজিয়া দেয়।

বলিলাম “ভয় পেলে নাকি?”

শব্দস্থলা মুখ হুলিল—বাতাহার চোখের পাতা দুটি যেন অত্যন্ত ভার হইয়া উঠিয়াছে, যেন মনে হয় সে এই রহস্যময় বিশ্বের নাজী ধরিয়া বসিয়া আছে, সেখান-কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন অতি ক্ষুদ্র ভয় ভাবনা—অতি অকিঞ্চিৎকর স্নেহ মমতা সে বুকে দিয়া অহুহু করিতেছে। আমি বলিলাম—“শ্রীকান্তটা একটু পড়না—শুনি শব্দ।” শব্দস্থলা উত্তর দিল—“আজ আর পারছি নে—আর একদিন পড়ব। তার বদলে একটা গল্প বলি শোন—”

গল্পটা যে কি স্নায়ুস্ত তাহা বুঝিলাম।

হাসিয়া বলিলাম—“সে গল্পতো জন্মেনা শব্দ, তোমার ওপরবের গল্প হাজার একটা শুনিতে, কিন্তু আরব্য উপজাসের মত তো মোটেই নয়, বরং একঘোরে, সকলের ইতিহাসই ঐ এক! সংসার চলনা, তারি কষ্ট—জিকুল কেউ নেই—এই—ত?”

“তা নয়—গল্পটা অত্যন্ত মর্শাস্থিক—এমন গল্প তুমি বোধহয় শোন নি।”

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, কিছুক্ষণ পরে শব্দস্থলা অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—

“হারাতার কোন এক দেহাতে ওর বাড়ী। বাড়ীতো তারি—দুখানি মেটে ঘর—সামান্য কয়েক বিঘা জমি, এক জোড়া মেঘ ছিল ওর সখল। চাষী মাহুষ, ক্ষেত-খারার শেষে যা জুটত তাতেই চলে যেত বাপ-বোটার ছোট বেলায় মা মরে গিয়াছিল, মায়ের কথা ওর মনেও নেই! ভাল, বুড়ো বাপ আর জোয়ান ছেলে বাতাহা—এ ছাড়া জিকুলে খানখান বসতে কেউ নেই। \* \* \* বেশ

স্বপ্নেই দিন কাটিছিল, দুটি লোকে খেতে পরতে কতই বা আর লাগে—! বাপ বুড়ো পরমেশ্বর লোক বড় ভাল ছিল না। অত্যন্ত বদমেজাজী, হাতে হুঁচার টাকার ছিল—বাতাহা সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে বিকলে মেঘের পিঠে চড়ে বাড়ী ফিরত। বাপ তখন পাড়া বাড়তে বেরায়, বাতাহা আটা মাখতে বসে, আবদুর কোথা বানায়, না হোক হুঁচারটে পুড়িয়েও দেয়। এমন কোরে স্বপ্নে দুঃখে দিন কাটে।

“বাতাহার বিয়ের ঠিক হ’ল। বুড়ো পরমেশ্বর বড় গুণ লোক, পাশের গায়ের কোন এক অবস্থাপন্ন লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা দিয়ে সব ঠিকাকর করে এল একদিন। তারপর একদিন বিয়েরও হ’ল, বউটি ছোট, ছেলেরামহু, নাম তার লছমণী।

“বিয়ের পর ততদিন না গোঁয়া হয় ততদিন ওদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সখ্য থাকেনা।

আমি বলিলাম “গোঁয়া কি?”

শব্দস্থলা—একটুখানি ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল—  
“তারি ছুই—চুপ কোরে শোন—যা বলি—”  
বলিলাম—“বল—”

“গোঁয়া যখন হ’ল তখন বাতাহার বয়স প্রায় আটশ।

সেই দিন প্রথম সে টের পেলে লছমণী জন্মাদ। শব্দস্থলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল—“বাতাহার মনে বড় দুঃখ হ’ল। তার সব চেয়ে বড় দুঃখ—বাপ নিজে দেখে শুনে কিসের লোভে এমন এক বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল!—এমনি কোরে কিছু দিন যায়। নিজের মনে কেবল দ্বন্দ্ব আর বিক্ষোভ। মনে হল—ওর, জীবনটা বৃষ্টি সতিই পলু হয়ে গেল। লছমণীয়ার দুটি অঙ্গ অধি যেন তার চোখ দুটিতে বাসা বেঁধেছে—সামনে ও পেছনে শুধু গাঢ় অন্ধকার! পরমেশ্বরের সঙ্গে ছেলে বাতাহার বড় মন কষাকষি চলতে লাগলো—বুড়ো বাপ ছেলেকে বা তা’র লে পাল দেয়, লাঠি নিয়ে, তেড়ে বসতে আসে। একদিন সতিই পরমেশ্বর ছেলেকে লাঠি পেটা কোরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।



“চারী মজুর লোক, অত কিছুর ধারধারে না, যখন যে প্রসক্তি দেখা দেয় সেইটাই হয় প্রবল, বাতাহার মনে প্রতিহিংসা জেগে উঠল—ও কোরলে কি জান?”

“কি?”

“সেদিন দুপুর রাতে নিজের হাতে ঘরের চালে আত্মন ধরিয়ে দিয়ে যে দিকে চুচোখ যায় বেরিয়ে পড়ল। তারপর আজ এতদিন কেটে গিয়েছে, আজ ও বুড়ো, পশু; দেশ মুখো আর হয়নি!”

আমি বলিলাম—“এখন একটি পাখকে তুমি জায়গা দিলে—! আর তার জন্মে তোমার ভাবনারও অন্ত নেই?” শব্দগুলো উত্তর দিল—“আমি বা তুমি কি আর বেশী শান্তি দেব? ঘটনার চক্র বার হাতে তিনিই সে তার নিয়েছেন।

“বাংলা দেশে এসে বাতাহা গভীর খাটরে যায়—মাটি কাটার কাজে লেগে গেল। এমন কোন এক কাজে টেনে কোরে মাটি কাটা কুলীর দল চলেছিল পূর্ব মুখো। গ্রায় শ’দেড়েক কুলি,—সব্ধে প্রত্যেকের এক একটি বস্তার মোট মোটরা—তাতে আছে হুঁ-এক-বানা অতি জীর্ণ কাপড়—ভাত রাঁধার কড়াই, একটা বরুতল,—একটা লোটা,—আর প্রত্যেক লোকের সঙ্গে অন্তত পাছ তার পাছ কোরে বড় বড় বাঁশের লাঠি—জাতটার লাঠির সব বজ্র বেশী। টেনে মাছধরে স্থান সন্ধান একেতো হয়না তার উপর লাঠির বোঝা। এক পাড়াতে যদি এক জন উঠেলা সব লোকই সেই গাড়ী-বানাতেই তৈলে ‘উঠে পড়ে, ফলে দুর্ঘটতির পরিসীমা থাকেনা। কত লোকের যে লাঠির ভঁতো খেয়ে চোখ যায়,—নাক যায়,—কত লোক যে চেপটে মরে, তার আর ইয়ত্তা হয় না।

“টেন চলে। যাত্রীদল গান ধরে—কেউ কেউ স্বগড়া বাধা, একটা কুস কুসকে কাণ্ড।

“বাতাহা স্থান কোরে নিয়েছিল দরজার পাশটিতে, সেখানে একটু খানি জায়গার মধ্যে দশজন চাপাচাপি করে দাঁড়িয়ে, তাদের পায়ের নীচে বাতাহা চুপটি কোরে বসে—লোক চলেতে ফিরতে হাত পা মাড়িয়ে দেয়, ও

ক্ষীণ প্রতিবাদ করে—সে কথায় কেউ কর্পণাতও করে না।

“এত কঠেও মাহুখ আরাম খোঁজে—দেহ এলিয়ে আসে। এক সময় গুর ছুটি চোখের পাতা জুড়ে ঘুম তার মাঝা পরশ বুলিয়ে দিল—সেই ঘুম তার যৌবন ও জরার মাঝখানের মস্ত প্রকাণ্ড এক যবনি।

“যখন বাতাহার চৈতন্ত হ’ল তখন ও রেলের ইস-পাতালে—ছুটি পায়ের অসহ যখন, মাথার ভেতরে হাতুড়ি পিঠিছে, এ যেন এক স্বপ্ন।

“ইদাদপাতালের মেথরের মুখে শুন্দো—চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে ও পড়ে গিয়েছিল—

“ছুটি মাস পরে অনেক কঠে প্রাণে বেঁচে গেল, কিন্তু পা ছুটি সম্পূর্ণ তখন একেজো হয়ে গিয়েছে। তার পর থেকে এই ভিক্সে কোরে পেটে ঢালানোর পালা শুরু, কেউ দেয়, কেউ দেয় না,—তিরিশ বছরের পাথরে তৈরী ভীম—পনোরো বছরের মধ্যে কঙ্কালশার প্রেতমূর্তিতে পরিণত হ’ল। দেহে কিছু নেই, মনে হয় কোনও রকমে প্রাণটুকু ধুক ধুক কোরছে, ঐ হাড় গোড় বের করা মুখের মাধ্যম তার শুধু চোখ ছুটি, কপালের উঁচু পাউন্ডের মধ্যে সেই চকচকে চোখ দুটা। বিশ্বগ্রামী জ্বা নিয়ে বসে আছে—শুধু ছুটি পেটে ঘেঁরে বেঁচে থাকার ভাঙনায় অক্ষম দেহটাকে টেনে নিয়ে বেড়ায়।”

তারে ঘুম ভাঙিভেই দেখি, শব্দগুলো শিরেরর কাজে ধাঁড়াইয়া আছে,—কি যেন বলিতে চায়।

বলিলাম—“আমায় কিছু বলবে?”

“বাতাহা আর নেই—”

“সে কি? কোথায় গেল এর মধ্যে—?”

কথটা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই—মুহূর্তে বুঝিলাম

বাতাহার বোধহয় মৃত্যু হইয়াছে।

ভাড়াভাড়ি উট্টিয়া পড়িলাম—বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি—সত্যি বাতাহার মৃত্যু হইয়াছে। বোধহয় শব্দগুলো একটি টাকা দিয়াছিল—সেটি হাতের মুঠায় তখনও আশঙ্ক।

গত রাজে বনমালী তাহাকে যে ভাত দিয়া গিয়া—কোন সন্দেহ ছিল? এই যে মহানিন্দার পূর্বে নাথা রাখিবার একটুখানি স্থান—অতি জীর্ণ মেছ-পরশ একাশ্রু আপনার জন হইয়াও ত সকলে পায় না!—একি

আমি শুদ্ধ হইয়া ভাবি,—বাতাহার সহিত আমার শব্দগুলার বাহু-জন্মের চরম আত্মনা?

—:—

## প্রতীক্ষনান

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী

পটব্রহ্মণি পরি ক্ষেপ্তি কহে হাসি,  
“সঙ্গী পাইয়াছি রাধু, চলিলাম কাশী,  
সন্কার গাড়ীতে আজ। ভাবিলাম ভাই,  
বাবা বিশ্বনাথ ছাড়া অজগতি নাই।  
তাই করিলাম স্থির”—কোলে কাদে ছেলে,  
রাধুর কোলের লাগি বাহু ছুটি মেলে।  
পূর্ণ ইতিহাস এর—সেবারের জন্ম,  
ক্ষেত্রিনী একবারে গিয়েছিল মরে।  
রাধু না থাকিত যদি, শিশু পুত্র তার—  
সে যাত্রায় হয়েছিল রক্ষা করা ভার।  
সেই হ’তে রাধু তার মা হইতে বাড়া,  
কাটের না একদিনও ছেলেটিরের ছাড়া।  
ক্ষেত্রিরে বসিতে বলি’ রাধু কহে “বেশ,  
একবারে ছেড়ে যাবে সোয়ামীর দেশ?”  
কী যেন বলিতে গিয়া আঁধি ছুটি তার  
ঈষৎ নমিত হলো, কণ্ঠ হলো ভার,  
কাঁপিল অধর তার; বহু কঠে কানি’,  
কহিল “তোমার সাথে যাবে নাকি বাঁশী?”  
“আরে না-না!”—কহে ক্ষেত্রি—“ছছতার তরে,  
যাইতেছি, ছেলেটির দিয়ে গেল তোরে।  
পনোরোটা দিন যাত্রা—রবে মোর ছেলে,  
আপন মায়ের মেছ-জেড়ে হেসে খেলে!”  
এক বলি আরামের ছাড়িয়া নিশাশ

রাধুর কোলেতে দিয়া কহিল—“বিশ্বাস,  
বিশ্বাস দিদির বাক্য”; রাধু গুঠে কানি,  
বাঁশীরীরে আপনার বক্ষপুটে বাঁধি।  
...কাশীধামে মহামারী-বিশ্চিকা আসি’  
একদিনে ক্ষেত্রি আর সঙ্গীটিরের গ্রাসি’—  
পাশ হইল না;—হায়! যাত্রীদল শেষে,  
যে যেমন ফিরে গেল, আপনার দেশে।

...দিন গেল মাস গেল গুলিল বসন্ত—  
ভাবে রাধু ক্ষেত্রি রিদি ফিরিলনা ঘর—  
মায়ার শিকল কেন দিয়ে গেল বাঁশী?  
বাঁশীরীরে বুকে টানি রাধু গুঠে কানি’।  
গ্রামে যদি কোন দিন কারও বাঁশী পায়  
রাধু ভাবে এলো দিদি; আশা আশঙ্কায়  
বুক তার উঠে কেঁপে, ভাবে বার বার  
এক দিদি ফিরে নিতে রক্ত আপনার।  
জীবনের মর্ম্মল উপাড়িয়া দিয়া,  
বাঁচিরে সে কোন স্থানে, কোন শক্তি নিয়া?  
হায় রে পাথরে গড়া পাথান-প্রতিমা,  
মাছধরেও সহিবার রহিয়াছে সীমা!  
ভাবে রাধু...তবু ক্ষেত্রি যদি আসে ফিরে  
তখন কিরূপে দিবে তার বাঁশীরীরে।



## প্রাচীন ভারতে রাগ ও রাগিণী

### শ্রীশান্তিশ্রুশ্রমাচাৰ্য

কলাশিল্পের অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতের বহুবিধ ছিল। বৈদিক দশবিধ সংস্কারের প্রত্যেককর্তীতেই গীতবাহকের প্রচলন দেখা যায় অর্থাৎ জম্বকাল হইতে মুচ্য পর্য্যন্ত যে সংস্কার কৰ্ত্তার দ্বারা জীবনটিকে বিভক্ত করা হইয়াছিল, গীতবাহক তাহার প্রত্যেককর্তীতেই অঙ্গীভূত ছিল। বর্তমান কালের শাস্ত্রানুগ, হস্তশিল্প প্রভৃতির অমুঠানে সেই বিলুপ্তমান অতীত কালেরই একটি ক্ষীণ আভাস পণ্ডা যায় বাহা বহুগুণ বৃদ্ধার পরে একটি সংস্কারে পরিণত হইয়া প্রচলিত হইতেছে।

বৈদিক দশবিধ সংস্কারের প্রধান সংস্কার বিবাহ; ইহাতে যজ্ঞের অমুঠান করিতে হয়। এই যজ্ঞে সামগণ্য করিবার নিমিত্ত একজন উপদ্রাভা থাকিতেন এবং অমুঠান গাথা গাহিবার জন্ত গায়কের প্রয়োজন হইত। ইহা একজন অথবা বহুজন একত্র হইয়াও গাহিতেন। ইহাদের সহিত সম্ভারত সমন্বিত সমস্ততী বীণা থাকিত। মুচ্যকালে প্রেতপট, ভবরূপ বা মুচ্যভবরূপ নামক এক প্রকার বায়ু বাসিত হইত এক্রপ উল্লিখিত আছে। জম্বাবাসেও নানা প্রকার গীতবাহকের প্রচলন ছিল। জীবনের এই প্রধান দশবিধ সংস্কার ব্যতীত অপর সকল প্রকার উৎসবেও গীতবাহকের অমুঠান চলিত।

যজ্ঞে গায়কগণ বীণা বাজাইয়া মুচ্য করিয়া যজ্ঞ গাহিতেন এক্রপ বলা হইয়াছে। মন্দিরা বাজাইয়া মুচ্যের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। মন্দিরা, বগ্ননী বা কবরতালকে তৎকালে আঘাতি বলা হইত। বৈদিকযুগে নানা প্রকারের বীণা প্রচলিত ছিল। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী মরালবাহিনী বাদ্যে বীণা-বাহিনী। পরবর্ত্তী কালের দেববির মহতী বীণা ও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশের চিরপ্রসিদ্ধ! ভৃগুধারী নটরাজ, শিব-তাণ্ডব ও পার্শ্বতী-লাভ একাধারে এই ক্রু-প্রাণ এবং মুচ্য-কোমল-মুচ্যের প্রবর্ত্তক। জয়

রাগের মধ্যে পঞ্চ সংখ্যক রাগ শিববজ্র-বিনির্গত এবং অপরটি পার্শ্বতী মুচ্য-নিঃসৃত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভরত, হম্বস্ব প্রভৃতির মতে এই ছয় রাগ যথা :—ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘ ইহা ভিন্ন মালব, মারঙ্গ, প্রভৃতি নাম গুলিও এই ছয় রাগের উল্লেখ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। নাট্যশাস্ত্রকার হম্বস্ব এবং ভরত প্রভৃতির মতে প্রতি রাগের পঞ্চ সংখ্যক রাগিণী বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু সোমেশ্বর, কলানাথ প্রভৃতির মতে প্রতি রাগের রাগিণী ষষ্ঠ সংখ্যক, এবং ছয় রাগ যথা :—শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ ও নটনারায়ণ। যটুত্রিংশ-রাগিণী যথা :—ধানসী, মালসী, রামকিরী, সিদ্ধুতা, আশাবলী, ভৈরবী, বেলাবলী, পুরবী, কানাদী, দাদবী, কোভা, কেরারিকা, গান্ধারী, শুভগা, পৌরী, কৌমারিকা, বেলোয়ারী, বৈরাগী, তুতী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঙ্গরী, গুজরী, বিভাষা, মাদুরী, দীপিকা, সেনাকারী, পাখিভা, বরাভী, মোহহাটী, নাটিকা, ভূপালী, রামকেশী, গড়া, কামোদা এবং কলাগী—। নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন রাগালাপের জন্ত বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে।

গীত দুই প্রকার—মার্গ ও গ্রাম্য। বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাহা গীত হয় তাহাই মার্গ-সঙ্গীত এবং স্ব-অজ্ঞ সাধারণের যে গীত গাহিয়া থাকে তাহাই গ্রাম্যসঙ্গীত।

শাস্ত্রদেব প্রাচীন ভারতের পঞ্চ-নাট্য দীক্ষাকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—লোমট, উষ্ট, শঙ্কর, অশ্বিন ও কীর্ত্তির। ইহা ভিন্ন ভরত, কল্পপ, মল্ল, শর্দূল, যটক, কোহলাচাৰ্য, বিশাখিল, দাসল, অম্বতর, বায়, বিশ্বাস্ব, অর্জুন, আভুনের, নারদ, ভৃগুস, নাট্যগুপ্ত, স্বতি, গুণ, বিদ্যুদ্রাজ, কেশবরাজ, রাহুল, নাক্তকুপাল, ভোক্তরাজ, পরমর্দী, সোমেশ্বরদীপতি, রজট, উমাপতি, লোহিতভট্ট প্রভৃতির নামও সঙ্গীত-শাস্ত্রকার হিসাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

বৈদিক যুগে নানা প্রকারের বীণা এবং বাজাদি প্রচলিত ছিল বীণা, বাগী, সম্বতরী, কাণ্ডালবীণা, তুতুরী, তলপ, তুদুতি, ভূমি-তুদুতি, সিঙ্গা, তথুস প্রভৃতি বায়বহুল ভারতীয় প্রাচীন প্রসিদ্ধ বাদ্যক যন্ত্র। এই গুলির অধিকাংশই বৃক্ষাদির শাখা-পল্লব দ্বারা নির্মিত হইত। তুতুরক বা তানপুরা—ইহার ধ্বনি-কোষ অর্থাৎ ধ্বনি অলম্ব্য নির্মিত। সঙ্গীত বিজ্ঞান শ্রুতিপুত্র তুতুরক গর্ভ এই যন্ত্রের উদ্ভাবক এইরূপ কথিত হয়। কণ্ঠোল-বীণা চণ্ডাবাদি জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইত। তুতুরী কুচু জাতীয় শৃঙ্গ যন্ত্রবিশেষ। ইহা মাস্তুলিক কর্ম্মেও বেহেমদিবের ব্যবহৃত হইত।

বৈদিক যুগে গীতবাহাদি সমন্বিত বহুবিধ ছিল। প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ হইতে তৎকালের যে সকল চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় অজ্ঞাত শিল্পকলার সহিত সঙ্গীত শাস্ত্রেরও যথেষ্ট অমুঠান চলিত। সমাজে ব্যবহারিক কলা-শিল্পের মধ্যে বীণাবাদন ও

পুরস্কীর্ণের একত্রে মাস্তুলিক ক্রিয়াবিসহ শাস্ত্র-সঙ্গীত নিত্য প্রচলিত ছিল।

নব যুগে উপহার স্বরূপ বীণাবাদন প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে গীতবাহাদি বিশিষ্ট-ভাবেই আপনার স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগেও তাহা অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই, বিভিন্ন চিত্রে তাহার বিচিত্র বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভগবান ভরতমুনি নাট্যবেদ রচনা করেন। নাট্য শাস্ত্রের প্রথম ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি বেদ চতুঃস্তরের মধ্যে গুণবেদ হইতে বাক্য সমূহ, সামবেদ হইতে গীতভাগ, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ষবেদ হইতে বস গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সজ্জ, ক্রমত, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ঠৈবত, নিষাদ এই সপ্ত স্বর। সাক্ষিষ্ঠ আকারে যথা :—সা, ঙ, গা, মা, পা, নি। একত্রে এই সপ্তস্বরকে একটি পূর্ণ স্বরগ্রাম বলা হয়।

## মেজদা'র চিঠি

### শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

#### ঘাটের বাঁধন

সারা রাত নৌকা চলছে—পরিশ্রমে ঠাঁড়ি মাঝি গুরুত্ব। ভোদের আলোয় দেখা গেল নৌকা খোদোনে ছিল, সেইখানেই আছে। বাগদার কইই সার। গম্বুয যত দূরে ছিল, সে ব্যবধান চুলমাত্রও কমেনি। ব্যাপার এই যে, তাড়াতাড়ি ঘাটের বাঁধন বোঝা হয় নি, আর অন্তরে বোঝা যায়নি নৌকা ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল চিন।

কোথায় যেন এ গরুটা পড়েছিল। তখন হাসি এসছিল—বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু আমাদের জীবনধারা খোলাচলা করলেই ধরনের একটা সন্দেহ মনে আসে নাকি? গরু পঞ্চাশ বছরের কথাই ধর। আমার তো হয়। সেখি তদধীর আরোহীকল্পী জনগণ নিঃশ্রিত—যারা বা জাগরিত তারা নিদ্রাত্তর। তরুণী ঢালাবার ভার

বাদের হাতে তারা হয়ত ঘাটের বাঁধন খুলতে ভুলেছে। কিছা.....

মোট কথা ঘাট ছেড়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারিনি। খোদোনে সুরক করেছিলাম, আজ অনেক পরিশ্রমেণর প্রায় সেইখানেই রয়ে গেছি। কথা কম হয়নি, আলোজন আড়ম্বরের কটী ধরে কার সাধ্য? কিন্তু বা ছিল সাধ্য তা আজও সম্পূর্ণভাবে অনাস্বস্ত। কেবল তাই নয়; তা পেতে হলে গোড়া থেকেই চেষ্টা করতে হবে—এ সন্দেহকেও মন থেকে কাটাতে পারছি না।

পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অধিষ্ঠিত—যে গ্রহসন নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম তার পাজ-পাজীর বাইরের চেহারা হয়ত বদলেছে—বিষয়-বস্তুর ও বক্তব্যের বিবর্তন হয়েছে কি? যে মনোবৃত্তি সেদিন



আমাদের দেশ-মঙ্গল-চিন্তার মূল জল সেচন করেছিল, বহুক্ষেত্রে বহুজনের কাছে তার পরিচয় আজও মিলছে না কি? ইংরেজিতে বলে যে, দেশের শাসনতন্ত্র দেশ-বাসীর যোগ্যতার ও সভ্যতার পরিচায়ক। চাওড়া ও পাণ্ডার মিল দেখে যদি ছুটো কথা কেউ বলে, ধমক দিয়ে তুমি তারকে ধুপ করতে পারো—রাষ্ট্রবিক্রম “না” করতে পার কি?

কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে রাজনীতির তর্ক করছি না—তার খাটের বঁধন কোন মাত্রাতে অচল হয়ে আছে, সে আলোচনা তাই স্থগিত রাখলুম। না—শিক্ষার কথাও বিন্দু করে বলবার আবার সময় নেই—সাধও নেই। আমি জানি তুমি নিজেই উদাহরণ প্রমাণ সমভিষাহারে একদা আমার কাছেই ছাড়ির হবে।

[একটা কথা—এদেশে মেয়েরা কবে থেকে গ্র্যাডুয়েট হতে আরম্ভ করেছে বলতে পারো? (ছেলেদের কথা আমি জানি) পঞ্চাশ বছরেরও উপর বোধ করি? অবৈতনিক নিরগ্রাধমিক থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাসে আজ তাদের কেন এত ভিড় লেগেছে সে খবরটা আমরা দিতে পারো?]

আর তোমার বৈশেষ্য-স্বপ্ন ও যৌবন-বিলাস সাহিত্য? আমাদের নব-সাহিত্যের পোড়ার যুগে এটার বা প্রোণাঘাতাও অনেকটা জায়গা জুড়ছিল। কোথাও বা তবু কোথাও বা তথ্য—অম্বাবা, অম্বকরণ ও অম্বসরণের বিপুল আরোহণ। তার প্রয়োজন আমি অস্বীকার করছি না। বলতে চাই যে, একতর শিল্পীর অভাব ছিল—তাদের সংখ্যা একটা আঙুলের পর্কেই গোণা যায় বঁদির আত্মপ্রকাশের সাধনা আজ জাতির জীবনবৈদ্য। তোনাকে অর্থ করতে চাই এরা ব্যতিক্রম। আমরা যে ঘাটে জিঁবুস আজও দেখানো।—

তোমার উত্তর প্রের আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি বলবে “সাহিত্যে আবার গন্তব্য কি অগ্রসর বল কাকে? যে পারে, সেই শুধু পারে—অজ্ঞে ইত্যরে জনাঃ।” অথচ! স্বীকার করেও অস্বীকার না করে পারছি না এই জগৎ যে, সাধারণ সামান্য আদর্শের বদল হয়নি। অধিকন্তু

সাহিত্যের নামে শিল্পজনের চক্রবর্তী আত্মপ্রকাশের গ্রামাভ্যন্তরীণ দায়ক এবং তার ওজস্বী দিনে দিনে অবস্থা হয়ে উঠছে!

নিম্নের পরিচয় আত্মপ্রকাশের দুইই সাধনায়। এ সাধনা যে পরিপূর্ণ আত্মনির্ভরতায়, বলিষ্ঠ নিম্নস্বতায়, যে প্রবল সত্যবোধে ও সত্যপ্রকাশের অকুণ্ঠ নীতিকতায় বাবে বাবে দেশে বিদেশে বিরাত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার পরিচয় তুমি আজ ক’জনের রচনায় দেখেছ? সকলে পারে না, আমি জানি; অনেকের শ্রম সুস্পষ্টরূপে ব্যর্থ—তাও মানি। কিন্তু কোথায় সে আদর্শ-সিদ্ধি—কোথায় সে নিরন্তর সাধনা? সে ব্যর্থ শ্রমের গৌরব ক’জনের?

সত্যই আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি। সে ছুৎ—সাহিত্যের বাজার-চলিত ক্রোড়ের কাটতিতে নয়—বাজার-চলিবা মোটাবার ব্যাপারী চিরকাল থাকবেই—সম্প্রদায় তাদের প্রয়োজন তুমি অস্বীকার করতে পারো না। আমার ছুৎ—আদর্শের অপঘাতসমূহ।

এ অপঘাতের—আদর্শহীনতার স্বরূপ জানো? পক্ষীরাও আজ আত্মবিস্ময় পাড়ী টানছেন। আমার ধারণা—বিরাতের আবির্ভাব হয় কালবৈশাখীর মত অবহাওয়া পরিষ্কার করতে, নব আদর্শ ও নব সাধনার ধারা ধার-মধ্যে পরিপূর্ণ হতে পারে। সে আবির্ভাবের দিন থেকে ঘাটের মাছ কুল হারাবার ছুৎস্রব দেখে—অকুল ধাবার ছুৎসা পোষণ করে—সাধারণ মাছ অদ্বুত কর্ণের স্রোতে নিজের কাছেই অসামান্য হয়ে যায়। মাছের গতি-ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়—অনেক সময় একেবারে অলক্ষ্যে, অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে।

অনেকের জীবনে কুল হারান চলে না—অনেকের হয়ত সে সাধনা বিঘ্নন। কিন্তু সে আকৃতিক তুমি এড়িয়ে চলতে পারো না—ভিতরে ভিতরে মাছ চঞ্চল হয়ে উঠে—অদ্ভুত বাণী, অস্পষ্ট চিহ্ন করে চোখে ভেসে উঠে, বা স্পষ্ট করে পাবার অনিশ্চয়তাও ঘরোয়া জীবনের ধ্বলভেদে চেয়ে মূল্যবান মনে হয়। সেদিন আত্মপ্রকাশ

নয়, আত্মপ্রকাশের সাধনা না করে তুমি থাকতে পারো না।

এই পরম আকৃতি, আত্মার এ চঞ্চল্য—মহত্বের এ ছুৎসা—সাহিত্যের অগ্রসারের লক্ষ্য নয় কি? অজ্ঞান জাতির নব জাগরণের সন্ধিক্ষণে সাহিত্যের এ অগ্রসার তুমি লক্ষ্য করেছ কি? আর তোমার দেশ—বাইরের হাওয়া লেগে শাড়ীর ঝাঁচল আর উজীরে বৃষ্টি দোলা লেগেছে—প্রাণে নাও, মনেও নয়। তার প্রমাণ, কোথায়? প্রচার-পত্র থেকে তুমি এসেছিলে বাস্তব-পন্থায়, কিন্তু সে কি চলা? তোমার বাস্তব-পন্থা প্রচার-পন্থার ভাবলুতরই নামান্তর নয় কি? তুমি realist নও, বিস্তী sentimental

বন্ধিন, মাইকেল, বিকোন্সন, রবীন্দ্রনাথের পরে………?

না—খামলুম। তুমি হয়ত রাগ করছ—তোমার নব দেহতাদের কাঠের পা নিয়ে কিন্তু সত্যিই আমি বিজ্ঞপ করছি না। আমি শুধু বলছি যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে—ঘর্ষ-কর্ষে—শিক্ষায় সাহিত্যে তোমার নোকা বেয়েছে, কিন্তু ঘাটের ধারে তোমাদের আসন আজও অচল।

আমার কি সন্দেহ হয় জানো? ঘাট ছেড়ে সত্যিই এগিয়ে চলো না। নিরুদ্ধ হওয়া দূরে থাক—কুলকে

দৃষ্টির বাইরে রাখতে এদের আরো সাহস নেই। এগিয়ে যাবার মালসাট এদের বত বন্ধী, ঐতিহ্যের, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের আশ্রয়ান তার থেকে রতি পরিমার্ণও কম নয়।

ঐতিহ্যের অন্ধ অম্ববৃত্তি, বৈশিষ্ট্যের অম্বসরণ যে ধর্ম বলে জানে, তার সঙ্গে কোন বিরোধ চলো না, যদি সে আদর্শ-নিষ্ঠা সভ্য হয়। তবে অগ্রসারের কথা কেন? ঐতিহ্য আর বৈশিষ্ট্যের শুটার মধ্যে শুণ্ড থাকাই তো তাদের পক্ষে পরম শুভ, আরামপ্রদ।

জাপানী বিদ্যায়ত্নের গল্প তুমি পড়ছ? পাতলা কাগজের টানা দিয়ে জাহাজ বাঁধা। চলা যেই স্ক্রক হল রঙীন কাগজের আলগা বঁধনও খঁসল। চলতে গেলে, ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের লুতাভ্যন্ত এমনি করে পায়ে পায়ে ছিড়ে যায়—ঘাটের বঁধন না খুলে, না ছিড়ে কুল ছাড়া যায় কি?

তাই তো সন্দেহ। এরা চলতে চায় না। এ শুধু চলার ভাণ—অকুল ধাবার বাস্তব-সমারোহ।

কিন্তু এই ভাণ দিয়ে কাকে আমরা ঠকাতো চাই? অপরের কথা জানি না, নিজেদের বোধ করি আমরা নিঃশেষে ঠকাতো পেরেছি।





## প্রবাসী

### শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

আগামী কাল চরণদাস গৃহযাত্রা করিবে। গৃহে ত অনেকই যায়,—কলিকাতার বেস সপ্তাহান্তে শনিবারে একবারে খালি বলিলেই চলে। একটা দশ মিনিটের গাড়ী হইতে আরম্ভ, সেই দশটা চলিবে শেষ। এই এতগুলো গাড়ী বোঝাই করিয়া কোরাগিরি হস্তবিলম্বিত ছোট্ট পুঁচিলিটার বুক তরিয়া কত যে যায় ইলিশ মাছ, আর ফল-ফুলেরী, সাগু-বাঁশি আর সাবান-আলতা, তার হিসাব রাখে কে?

সেই পাড়াগায়ের পথ,—নিজ্ঞান মাঠ ঘাট, মিষ্টি-মুখরিত খোপ-ঝাড়; আর তাহারি মাংসখান—দিয়া চলিয়াছে বুদ্ধ-কপিত, কণ-পুলকিত দেহখানি, মনের ভিত্তর জাগিয়া আছে ছদ্মনিদের বিরহিনী বধুর শিত-শিউ আনখানি,—যে বধু হয়ত প্রতীক্ষামান্য বায়বায় বাতায়ন বুলিয়া চাহিয়া দেখে, পথের কুকুরটা কেন বেউ বেউ করিয়া উঠিল। ঐ না কার পায়ের শব্দ!...

চরণদাসেরও বউ আছে। পথিকবধু হয়ত টিকি-অগ্নি ধারাই দিন গুলিয়া অপেক্ষা করিয়াছে। চরণ বাইতেছে, একথা সে চিঠি লিখিয়া জানাইয়া রাখিয়াছে। একথানা চিঠি নর, দশখানা। কাল সে নিশ্চয়ই রওয়ানা হইবে।

কেন ত? তার আবার এত কাব্যকাহিনী কেন? ব্যাপার এমনি বা কি ভুলতর?

কিন্তু মলিকতলার মনে এ ব্যাপার কিঞ্চিৎ গুরুতরই বটে। এই এক বৎসর ধরিয়া বায়ান্ন সপ্তাহের প্রত্যেক সোমবারে চরণ বলিয়াছে সে বাড়ী যাইবে আসিবে ননিবার। কাল একবারে নিজস্বই হইবে। এতদিন যায় নাই শুধু সদাগরী আপিসের বড়বাবুর কারসাজিতে।

হয় সোমবারটি ছুটি দেন নাই, না হয় রবিবারে খানিকটা ডিউট দিয়া রাখিয়াছেন। কিংবা মাহিনা পাওয়া যায় নাই ঠিক সময়। শুধু হাতে কি যাওয়া চলে?

চলে না। তার প্রমাণ যথেষ্ট পাইলাম। রাত্রি নাটার সময় নীচেতলার ঘরে থাইতে বসিয়া দেখি চরণের কঠোর পিঁড়িখানি পাতিয়া বসিয়াছে শব্দর।

—আরে চরণ কোথায়? সে কি খাবে না?

—পাউক সেই রকমই। কাল যে বাড়ী যাচ্ছে—

২২০ থেকে ১৫৫ পর্যন্ত দু হস্তার ছুটি নিয়েছে।

—কিন্তু আজ থেকেই যে মেসের খাওয়া বন্ধ করতে হবে তার মানে কি?

জাঁজাইয়া সরাসরি চরণের ঘরে ঢুকলাম। দেখি সাগা মেয়ে জুড়িয়া ছজ্ঞাঝরে পড়িয়া আছে—একটি আলতার শিশি, এক সের কাপড় কাটা সাবান, আড়াইপো সাগোমণ্ডের দাল, বারোটা ঝাড়া আম, একটি তরফ, দুজোড়া রুপাণে-সাজী, ছোট্ট সেমিজ, একপাতা চুলের কাটা, এক শিশি সো ইত্যাদি ইত্যাদি। আর চরণদাস টিকি তাহাদের কেন্দ্রস্থলে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে কি করিয়া এই জবাবসত্তার তাহার খোলা ইলিকি টানের স্নাটেকসটির উপরস্থ করা যায়।

আমাদের দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, 'স্বদেশদ্বী' এর কি করে বাঁধি বলুন ত?

কোচাৰী অগাধ সমুদ্রে কূল কিনারা পাইতেছে না। ইন্দুরে ঝড়টিং করিয়া পরোপকার-রক্ত হাতেপিত দিয়াছিল।

উভয়ে নানাপ্রকার পরামর্শের পর এই আমার নিজস্ব বুদ্ধি একটু অবিক পরিমাণে খরচ করিয়া যে বস্তুটি অবশেষে রাজ্য করিলাম, সেটি মোটেই স্নাটেকস নয়, একটি কাপড়ে বাঁধা পুঁচুটি।

বলিলাম, কি কাজ এই বায়না নিয়ে গিয়ে, আবার ও হাতে করে বয়ে আনতে হবে। তার চেয়ে জিনিষ-জুলা বেড়ে ফেলে কাপড়খানা ভাঁজ করে বগলদাখা করে নিয়ে আসবে। চাইকি পেতেও বসতে পারে গাড়ীর বুকিতে—খা ছারপোকা!

—উঃ—দেখলেন, এ বুদ্ধিটা আর আমার জোগােলা না। বলিয়া একটি মধুর হাস্তে মহাতৃষ্ণির চিহ্ন আঁকিয়া চরণদাস বইতে নামিয়া গেল।

রাত্রি এগারোটার সময় আলোটি নিবাইয়া ও একটি কৌশল শীতল জল পান করিয়া শরনের ঘোণাড করিতেছি, সহসা চোখে পড়িল চরণের ঘরে তখনো খালো জ্বলিতেছে। কোত্থলে পা টিপিয়া উকি মারিয়া দেখি, সে আবার সেই গৃহ গমনের সরজামগুলি পুঁচুপুঁজ বহিরাগ্র প্রায়ে বহুবিধ কলংগ করিতেছে।

আশ্চর্যেরে শুধাইলাম, চরণ, ওটা আবার গুলেছিল কেন? মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চরণ বাহা বলিল তার ভাবার্থ এই যে, শব্দর, হরিচরণও বিধুবাবু এই তিনজনকে তিনবার পুঁচুচি বুলিয়া দেখাইতে হইয়াছে, পুঁচুচির আয়তন এত ক্ষীত হইয়াছে চরণের পঞ্জীগ্রন্থের কোন্ কোন্ উপাদান-রাশিতে।

বিধুবাবু আবগারি-বিভাগে কাজ করেন। তিনি আবার আরও একটা ফ্যানদা বানাইয়া বসিয়াছিলেন। চরণের পুঁচুলিতে যে গাজা বা আকিম জুকানো নাই, এ সভা আগেই উল্লগিত হইয়া যাওয়া ভালো। তাই তিনি সাবানের বাস্মা হইতে আলতার শিশি পর্যন্ত রীতিমতে সার্চ্চ (অনুসন্ধান) করিয়া একটি সার্টিফিকেট (হাউপজর) লিখিয়া দিয়াছেন—যাহাযায়া শ্রীচরণদাস সামন্ত সম্পূর্ণ নিরপদ্রবে গৃহ পর্যন্ত রেল ভ্রমণ করিতে পারিব,—আর কাছারা বাপের ক্ষমতা নাই তাহার পুঁচুলিতে হস্তক্ষেপ করবে।

ঐ শেখেরে নানাভঙ্গির পরে সকল দিক এখানে গুজাইয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। অথচ আবার খানাকে হাত লাগাইতে হইল। বলিলাম, চরণ এইবার তুমি পড়া, আবার সেই ভোরে উঠতে হবে বেধ হয়।

—স্বদেশদ্বী! এতটা যদি করলেন ত আর একটু উপকার করুন, নইলে বড় মুক্তি পড়বে।

—কী বল।

—আপনার এলাম্‌ খড়িটা আজকের মতো যদি আমার ঘরে রাখেন ত—

হাসিয়া বলিলাম—বেশ ত! নিয়ে যাও।

ওইবার সময় পরিষ্কার কাপে গেল, চরণ এলামের দম দিতেছে। ভাবিলাম, বোধ হয় ভোর ছটাতেই গাড়ী।

(২)

খটাম্ খটাম্ খট! খটাম্ খটাম্ খট! চরণের সুপরিচিত বড়মের আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুলিলাম, আর রাত্রি বেশি নাই। দক্ষিণের জানালা দিয়া ঝির ঝির করিয়া মিঠা হাওয়া আসিতেছে। নগরীর ধুমধাম আকাশে তখনো তারাগুলি স্তিমিত নেত্র চাহিয়া আছে।

মনে পড়িল চরণ গৃহে বাইবে। বিগত রজনীতে তাহার কিশোরী বধু হয়ত আদৌ ঘুমাইতে পারে নাই—আসন্ন স্বামী-সোহাগের অসীম লোলভায় কত শত ছোট খাটো পুণীর ধারকাগুলি মনের আকাশে জ্বলাইয়া রাখিয়া হয়ত সারারাত্রি জাগিয়াই কাটায়াছে। বন্ধ-পঞ্জীর প্রতীক্ষামান্য কোরাগিরি-বধুর এই সরল বিরহের ছবি আঁকিয়াছে কোন্ চিত্রকর?

হঠাৎ বিধুবাবুর গঞ্জীর কর্কশ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল,— এই উজ্জ্বল চরণ! এই রাত আড়াইটার সময় লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে, কি হচ্ছে কি? বাড়ী যাবি যদি ত কাল সকালে গিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে বলে থাকিসনি কেন? বড়মের শব্দ শ্রুতক হইয়া গেল। চরণের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তাহার ঘরে গিয়া উট জালিয়া দেখি, সভ্যই ছুটো বাজিয়া চলিণ মিনিট হইয়াছে। তরু ও তিনের মাংসখানে এলামের কাটা। চরণ নীচের গিয়াছে।

আরও দশ মিনিট চুপচাপ। তারপর জৌযফা হইতে জল জুলিয়া মুখ ধোয়া, গলা পরিষ্কার করার শব্দ



পাওয়া গেল। অতঃপর বুলিলাম, চরণ আপাতত খালি পায়েরে ওড়া নাবা করিতেছে। কি জানি যজ্ঞমের শব্দে বিধবাবু যম চটাইয়া রাখিলে কাল ঠেঁশন হইতেই পুণিষি চরণকে একেবারে থানায় চালান দিতে পারেন! তখন বাজী খাওয়া মাথায় উঠিলে।

সকাল সাড়ে ছটায় উঠিয়া দেখি চরণ তখনও যাত্রা করে নাই, দাড়ি কামাইতেছে। বিস্মিত হইয়া শুধাইলাম, ওহে তোমার গাড়ী ক'টার?

—আর দেখি সেই স্বদেশলা! দশটা সাত মিনিটে গাড়ী, কুলী এসে গেছে।

—তার মানে? তুমি খেপেছো নাকি? তুমি যাবে ত সেই সাত ন'টায়। ঠাকুরকে ব'লে রেখেছো ত, একটু সকাল সকাল তোমাকে রেঁধে দেবে।

চরণ নিশ্চেষ্টে ঘাড় নাড়িল। বুলিলাম সে না বাইয়াই যাইবে। দাড়ি কামানো শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিল, আর এই সঙ্গে কুলীকে উপরে ডাকিয়া আনিল।

চরণকে আমরা অনেক কাকুতি মিনতি করিলাম, ছুটি ভাত খাইয়া থাক সে। আজ রবিবার—গরীব কেহাণির স্বাদ-পরিবর্তনের ছোট অবকাশ। তাই ইলশে মাছ ভাজার মধুর পদ তখনো রান্নাঘরে হইতে বাহির হইয়া শয়ন ঘর পর্যন্ত ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এই সবে সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে, গাড়ী সেই দশটার পর। এখন হইতে হাওড়া ঠেঁশনে বসিয়া থাকিলে কোন্ পিতৃপুত্র উজাড়িত হইবেন? গায়ে পৌছিতে বাজিবে প্রায় বারোটা, কারণ কলিকাতা হইতে কিছু না হোক পঞ্চাশ মাইল দূর। একে গ্রীষ্মকাল, তার উপর কয়েক-দিন ব্যবৎ ঝটপাত নাই। গৃহে পৌছিয়া বানিকেশ্বর বিশ্রাম, তারপর হান, চাই কি জ্বর সঙ্গে আর ঘটাথানেক রসলাপ, তারপর ত আহার। হয়ত দুইটা বাজিয়া যাইবে। অত বেলায় গৃহীয়া পেট করিবে আই চাই, রায়ে ভালোটা মন্দটা আর খাওয়া চলিবে না। চরণের মা ক্ষুব্ধ হইবেন। ওদিকে দিনে বিশ্রামের অবকাশ না মিলিয়া রাত্রি-জাগরণের বিশেষ অসুবিধাও ঘটতে পারে।

—যেহা? স্বদেশ দা যেন কী! বলিতে বলিতে চরণের মুখে সলজ্জ হাসির একটি কণক আভা ফুটিয়া উঠিল। ধীরে কুলীর মাথায় পুঁটলীটা তুলিয়া দিল।

আমাদের এত তর্ক-বিতর্ক, এত সনির্বাক অহরোধ অবহেলা করিয়া চরণদাস ঠেঁশনাত্মিতে যাত্রা করিল পদরেজে।

শশধর বলিল,—ও চরণ, ভালো চাও ত একখানা রিম্মা করে। 'তারপর ইংরিজী করিয়া বলিল,—ও শালা কুলী কখন ষ্ট্রাওব্রোডের ভীড়ে পুঁটলি সমেত চম্পট দেবে, তখন 'হরের মা' 'হরের মা' ক'রে খুঁজে মরবে, বাজী খাওয়া চুলোয় যাবে—

বিধবাবু তামাক বাইতেছিলেন। হাঁকাটা নামাইয়া একবার মুছিয়া লইয়া বলিলেন,—তখন শ্রীমান গঙ্গাধার ক'রে আবার অম্ব-তারণ মেনে ফিরবেন আর কি!

কিন্তু চরণ চৌকাট ডিঙ্গাইয়া রাস্তায় নামিল। আমরা সকলে মিলিয়া বলিলাম,—হুর্গা, হুর্গা।

শশধরের পিছু ভাকা অভাস। বলিল,—ওহে ষ্ট্রাওব্রোডের কোকানে কিছু খেয়ে নিও যেন, নইলে পিচ্চি পড়বে।

—একবারে বাজী গিয়ে হয়ে যাবে। বিধবাবু মুখ বিকৃতি করিয়া বলিলেন।

চরণ চলিয়া গেল। তাহার চিত্তের দুর্বলতা লইয়া আমরা অনেক হাসিলাম, নানা প্রকার কৌতুক করিলাম। কলিকাতার মেসে চরণ না থাকিলে আসর জমে না, অতএব হইাকে তাহাড়া করা চলিলে না।

তারপর বেলা বাড়িল। ইলশে মাছের সোল খাইয়া মাতিয়া উঠি, তখনও সকলের খাওয়া শেষ হয় নাই। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা। পাশের বাড়ীর একটা কচি মেয়ে বেড়াল-ছানার সঙ্গে খেলা করিতেছে, আন্মনে তাহাই দেখিতেছি। নীচের গলিতে একলল বিদেশী ভিখারী ভাটিয়াল স্বরে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। তাহাদের পানে চোখ নামাইতেই দেখি চরণ ফিরিয়া আসিতেছে।

হ্যাঁ চরণই বটে। সেই পরিচিত পুঁটলি বহিয়া ঐ

একটা কুলি। তার পিছনে গাড়ী-টানা ক্লাস্ত মহিষের মতো ঘম্মাক্ত পরিশ্রান্ত চরণ—অতি সন্তর্পণে, পরম লজ্জায় মেসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

( ৩ )

চরণ গাড়ী ফেলু করিয়াছে। বেলা সাড়ে সাতটায় ঠেঁশনে পৌছিয়া দশটার গাড়ী ধরিতে পারে নাই, ইহাতে হাসির কি কাঁবির তাই শুধু ভাবিতেছি। তারপর মেসের জেগ।

শশধর বুলিল,—চরণ, তুমি যে বলছো ভীড়ের জেগে টিকিট কাটতে পারলে না, বলি টিকিটের ঘর খুঁজে পেয়েছিল ত?

—তা আর পাইনি। সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তা গাড়ীটা ছেড়ে দিলে।

—এতো লোক টিকিট কাটিলে আর তুমি পড়ে ইলে! বলি প্লাটফর্মে গুমিয়ে পড়ো নি ত? কাল রাত্তিরে ত গুমোও নি।

—মেসমাহেবের মুখ দেখে ভড়কে গেছিলে বুঝি। বিধবাবু হান করিতে করিতে বলিলেন।

চরণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাঙা ভাঙা যে কাহিনী বিবৃত করিল তাহা ওড়াইয়া লিখিলে এই দাঁড়ায়।

টিক কোন্‌স্থানটিতে সোমড়ার টিকেট পাওয়া যায় তাহাই আবিষ্কার করিতে চরণের আশ থকো কাটিয়া গেল। তারপর গিয়া দেখে ঘরের সামনে কাঠের বেড়ার বায়ে মস্ত জনতা।

চরণ নীরবে সেই জনারণ্যের পিছনে দণ্ডায়মান কিছ পিছনে যে কুলীটা তাহার পুঁটলী লইয়া নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে, তার প্রণাম কি? চরণ ঘাড়, ফিরাইয়া বার কয়েক দেখিয়া লইল। কুলী পলায় নাই ইহা মগ্ন নিশ্চিন্তের কথা। ততক্ষণ চরণকে অতিক্রম করিয়া আরও দশ বারোজন যাত্রী টিকিট কাটিবার সেই অতিক্রম বাতায়নের উদ্দেশ্যে ধাবমান হইয়াছে। সন্ধ্যা চরণের মনে পড়িয়া গেল, গাড়ীখানা প্লাটফর্মে টিক

ভালো জেলের মতো চূপ চাপ পাড়াইয়া আছে তা! তাহাকে কীকি দিয়া পা চাকা দেয় নাই!

অতএব চরণ বাহির হইল। কুলী বাবুর 'টিকিট হো গিরা' বিবেচনা করিয়া অহসরণ করিল। পাটটি পেতে অহস্রান্বিতের পর কাটোয়ার গাড়ীর প্রাইফর্ম দিলে। গাড়ী পাড়াইয়া আছে, কোন ভয় নাই। চরণ পুনরায় নিশ্চিন্ত হইয়া পূর্ণস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। বেশ মাথা খেলাইয়া কুলীকে বুকাইয়া দিল যে, যেম সাহেব তাহাকে ভুল টিকিট দিয়াছে, সেখানা অবশ্য বদলাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু পূর্ণস্থানে ভাঁড় আরও বাড়িয়া গেছে, চরণের প্রবেশের জন্ত কিছু মাত্র ফাঁক নাই।

চরণ দেখিল পাঁচ ছয় জন লোকের সামনে একজন বৃদ্ধ। সেই সর্দাপেক্ষা নিরীহ, সচ্চরিত্র ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নির্ভারণ করিয়া চরণ একটা টাকা আগাইয়া ধরিয়া বলিল,—

ওগো বাবা বুজী, আমার একটা সোমড়ার টিকিট কিনে দাও না—ঐত তোমারও কিন্তে—

—আ মলো—মিসের রকম দেখ না! আমি বুড়ো মানুষ, নিজের আলায় মরজি—একটা জোয়ার মর্দ বলে কি না আমি গর টিকিট কিনে দেবো—মব্ব মব্ব মব্ব—

গলায় দড়িও জোটে না তোর? ইত্যাদি সন্তান্য পূর্বক সেই বৃদ্ধ রাগে গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। সন্তান্য অপ্রতিভ চরণের তখন আবার খোয়াল হইল গাড়ীখানা আর একবার দেখিয়া আসিলে হয়।

গাড়ীর তদারক করিয়া পুনরায় যখন ফিরিল, তখন তাহার সামনে আর একটা নূতন জনতা স্থান অধিকার করিয়াছে।

এইভাবে দশবার প্লাটফর্মে গাড়ী দেখিবার জন্ত আসা যাওয়া, এবং ঘাড় ফিরাইয়া পঞ্চাশ বার কুলীর উপস্থিতি মগ্নে নিঃসন্দেহ হওয়া। গাড়ী অবশেষে সত্য সত্যই ছাড়িয়া দিল। নিরুপায় চরণ তুই 'সেলের' কুলীকে চার আনা পারিশ্রমিক দিয়া, একটা বাহিরের



ক'না-মুঠের মাথা-গ্রন্থ-পূরক যেসকলিগে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। সন্ধ্যায় আর একখানা গাড়ী ছিলো বটে কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঠেঁসে বসিয়া না থাকিয়া মেসে কিরিয়া ইলশে মাছের কোল সংযোগে অন্নাহার করাইই কি সুবিবেচনার কাজ হয় নাই ?

আমরা একমতে বলিলাম,—হী হইয়াছে। কিন্তু শব্দর বলিলাম,—সেখো চরণ,—তোমার অবস্থা সবই বুঝলাম। ফুলীটার দিকে নজর রাখতে হবে ঠিক,—গাড়ীটা যে তার নিশ্চিষ্ট সময়ের পূর্বে যাবে না একথা জব্বলেও একবার দেখা দরকার ঠিক,—টিকিট খরের সামনে জড়ি ছিল তাও ঠিক—কিন্তু তুমি একবার ইন্টার ক্লাশ টিকিট বেতে গেলে না কেন ? —না হয় ছ'আনা বেশি দিয়ে একখানা ইন্টারের টিকিটই কিনতে—এই ত ব্যাভায়াতে বারো আনা বেরিয়ে গেলে !

চরণদাস স্তম্ভিত হইয়া পাড়াইয়া রহিল। সেবিত্ত সে তাহার নিজের ছুই গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড় মরিয়া চাঁৎকার করিয়া উঠিল,—ওরে আমি কি বোকারে ! কেন একখানা ইন্টার ক্লাশের টিকিট কিনলাম না !

আরও হয়ত আত্মহত্যার কাছাকাছি একটা কিছু করিয়া বসিত, আমরা তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দিলাম। কোনমতে হাসি চাপিয়া বলিলাম,—ভাতে আর হয়েছে কি চরণ। সব কথা কি পকেলে সব সময় নেন পড়ে ! বা হবার তা হ'য়েছে,—ক'ল আমরা তোমার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবো।

—সত্যি ?  
—সত্যি।

চরণ আমার ছুই হাত জড়াইয়া করণ কর্তে কহিল অশ্রুশ্রদ্ধা, সত্যি বলছি কাল যদি আপনি যান ঠেঁসেন, তবেই আমার বাঙা হব।

বিধবাব বলিলেন,—ওকে আর গিয়ে কাজ নেই, শব্দরই যাক ওর হ'য়ে—

আমি চরণকে আশ্বস্ত করিলাম। কিন্তু শব্দর বাবসারার লোক। ঠিক করিয়া লইল, শব্দর ও আমি

চরণকে ঠেঁসে টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া গিয়া আসিব, এবং চরণ তার বিনিময়ে আমাদিগকে আট আনার রাবডি বাওয়াইবে।

ভাল কথা। এত সন্তায় কাজ ইলিল হইবে চরণ ভাবে নাই। রাবড়ির দাম আট আনা, রিজা ভাড়া চার আনা, কুপী ছই আনা ও তাহার টিকিটের মূল্য এক টাকা, এই সবকিছু একটাকা চৌদ্দ আনা। চরণ বন্ম করিয়া ছুইটি চৌদ্দো মুদ্রা শব্দরের সামনে ফেলিয়া দিল।

শব্দর গম্ভীর ভাবে বলিল,—তুমি এখন নাকে সর্ঘের তেল দিয়ে ঘুমুতে পারো !

( ৪ )

বেলা পাঁচটার সময় চরণের আর বিশ্বাসের সীমা রহিল না। আমি বলিলাম,—চরণ আজ সন্ধ্যাতেই তোমাকে বেতে হবে, কাল সোমবার আমাদের আপিস আছে যে।

র'য়া আজই ?  
—হী—নাও জামা প'রে বেরিয়ে পড়ো। শব্দর তোমার পুঁটলি নিয়ে আগেই চলে গেছে।

চরণ যেন শব্দের পরীয়াঙ্কো আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা দুইজনকে আসিয়া টানে উঠিলাম।

শব্দরের ইচ্ছা ছিল, রাবডিটা আজই আগে বাইরা লইলে ভাল হইত, কি জানি কাল যদি দরচন্দ্র বাঁকিয়া বসে। কিন্তু বেলা বারোটার সে যে পরিমাণে ভাত খাইয়াছিল, তাহাতে উদর প্রায় ভূষিয়ে পরিণত। তাই লজ্জন করিবার সাহস হয় নাই।

পথে চরণের সঙ্গে কত কথা হইল। সে সব কথা তার জীবনের বড় মধুর, বড় গোপনীয়, তাহাই আজ ধ্রুব স্মৃতিয়া সে আমার নিকট প্রকাশ করিল।

আঠারো বছরে তার বিবাহ হইয়াছিল। দুই বছর পরে সে-বউ মরিয়া যায়। আর একবছর পরে সে তাহারি ভগিনীকে বিবাহ করে। যেমতে বড় শাস্ত, বড় সন্তান। গমনা পরিতে ভাল বাসে না। নিজেই চিঠি লিখিতে পারে, চরণের কাছে ছ'একটা ইংরাজীতে টিকানা লিখিতেও শিখিয়াছে।

আরও কতো কথা চরণ বলিয়া গেল। আমি মনে মনে একটি অতি রমণীয় মিত্র ছবি আঁকিয়া লইলাম। ফোড়ী বড়ি আজ সারা সকালটি কত আশায় ছিল, তাহার প্রবাসী স্বামী ঘরে আসিবে প্রায় আট মাস পরে। কিন্তু কই আসিয়া ত পৌছায় নাই। কে জানে হয়ত অধ্ব করিয়াছে—হঠাৎ কোন ব্যারাম ! হয়ত কোন চুটনা !.....মুহুর্তে বুক দুক দুক করিয়া ওঠে, চোখের পাতা কাপিতে থাকে, দীর্ঘ রান নিঃশ্বাসবানি ত্রিপ্রহরের গুণ বাতাসে নীরবে মিশিয়া যায়।

চরণও গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হয়ত কোন উল্লস ঘুটি জাগিয়া উঠে। তাহাকে টেলা দিয়া সচেতন করিয়া বলিলাম,—নামো, ঠেঁসেন পৌছেছি।

শব্দর টিকিট কিনিয়া প্রস্তুত। চরণকে গাড়ীতে

তুলিয়া দিলাম। মন তাহার তখনো সম্পূর্ণ নির্ভরতায় প্রশান্ত হয় নাই। শব্দরকে সে সন্দেহ করে। বলিল,—এটা কাটোরা লাইনের গাড়ী বটে ত ? কি ক'র জানলেন ? কই কাউকে ত ভিজেন্স করলেন না ?

চরণ একা কখনো এর আগে বাড়ী ফিরে নাই। তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, যে প্রত্যেক গাড়ীর প্রাটফর্মের নম্বর দেওয়া থাকে, বিশেষ কারণ ছাড়া তাহা বদলায় না।

তাহার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। বোম্বই গৃহের স্বথচ্ছবির দৃষ্টিতে সে-মুখ ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইতেছিল, কিন্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না—গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

এক স্থাপত্য ইঞ্জিনের বোঁয়া আসিয়া আমাদের মুখে লাগিল।

## নৈদেশিক বাতী

প্রীতমোদ সেন

### প্রলয়ের ডমরু

কিছুদিন আগে সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ রাজনীতিক মিঃ টম্বী বঙ্ক ইনি বলেছিলেন, “আমার সময় সময় রানে হয় যে আমরা বাতুল্যশ্রমে আছি।” বাস্তবিক ইয়ুরোপের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয়, অত বড় পাশ্চাত্য সভ্যতা

আজ একান্তই দিনেহার। জাতি-বিবেকের হলাহল সমগ্র মহাদেশে জর্জরিত। শঠতা, কপটতা, আত্মঘুরিতা আজ জগৎবিখ্যাত রাজনীতিকগণের একমাত্র আশ্রয়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কাজেই প্রত্যেক জাতি অপর

জাতির ভয়ে সন্ত্রস্ত। এই অবিশ্বাস ও ভয় সকলকেই

আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত করছে, আর ফলে শত্রুর বহর বেড়েই চলেছে। ও দিকে দেশের জনসাধারণকে জাতীয়তার মদিরায় মত্ত ক'রে শিখান হচ্ছে অতাব ও ক্ষুধার তাড়না চুলুতে এবং দেশ রক্ষায় কোমর বাঁধতে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর বিবেকতারা মনে করেছিলেন যে, জাতিবৈদ্বেষ কাল ক'রে তারা জাতিসংঘর্ষের পথ বন্ধ ক'রে দিলেন। আর তারা ভেবেছিলেন যে বিশ্বরাষ্ট্র-সম্বন্ধ খাড়া করে চিরদিনের জেছে দলবদ্ধভাবে থাকতে পারবেন। শত্রুসৈন্যের মত আউড়ে গুঁরা ভেবেছিলেন যে যুদ্ধ-দানবকে দাবিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু শীঘ্রই তাদের ভুল ভাঙ্গল, কারণ আঁতের দলের মধ্যেই আত্ম-ঘাতী অবিশ্বাস দেখা দিল। অপর পক্ষে বিজিত জাতি-ওলোও সন্ধির নাগপাশের মধ্যে বিশেষভাবে মোড় দিতে আরম্ভ করল।



ইহিয়ার





সঙ্কীর্ণত সমূহের বহুসংখ্যক

তবুও পাণ্ডা শক্তিবর্ধের চৈতন্যবাহ হ'ল না। তাঁদের পক্ষে দুটো পথ খোলা ছিল। প্রথম তাঁরা বিজিত জাতি সমূহের সঙ্গে একান্ত মিত্রভাবে ব্যবহার করে সকলের মধ্যে সমতা আনতে পারতেন। দ্বিতীয় তাঁরা প্রতিশ্রুতি অমূল্যবান নিজেদের শত্রুর বহর কনিজে বিজিত জাতিদের দেখাতে পারতেন যে, তাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে শুধু শান্তি দেবার জন্তে নয়, পৃথিবীর সকল জাতির পিঠ থেকে শত্রুর বোকা নামাতে। তাঁরা যদি এই দুইটার মধ্যে যে কোন উপায় অবলম্বন করতেন, তা'হলে আজ হিটলার সদর্পে ভাসাই সন্ধি বুটো কাগজের স্ক্রুজিতে ফেলতে পারতেন না। হযত হিটলারের অভ্যুদয় হতই না।

ইয়ুরোপের বর্তমান অবস্থার জন্তে রুটেনের দায়িত্ব বড় কম নয়। ইয়ুরোপে রাজনীতিক ক্ষেত্রে গত দুই শত বছর ধরে রুটেনই মোড়লী করেছে। মহাযুদ্ধের পরেও রুটেনের প্রাধান্য অটুট ছিল। কিন্তু রুটেন কোন দিনই কুট মন্ত্রণাতির পথ ত্যাগ করেনি। যুদ্ধের পূর্বের পুরানো কামুকি এখন যেটে কোন লাভ নেই, কিন্তু

যুদ্ধের পরেও রুটেনের অদ্বুত আচরণ পরোক্ষভাবে ইয়ুরোপের সমস্ত অশান্তির কারণ হয়েছে।

যুদ্ধের পর পরাজিত নিরস্ত্র জাংশানীর সঙ্গে ক্রান্ত যখন একান্ত দুর্ব্যবহার করেছিল, তখন রুটেন টু শব্দটা করেনি। জাংশানীর রুত্ব প্রদর্শনে যখন ফরাসী সৈন্য আশ্রয়লীলা করেছিল তখন রুটেন একটুও প্রতিবাদ করেনি। জাংশানী যখন যুদ্ধের কতিপয়বছরের বোকা থেকে মুক্ত হবার জন্তে কেঁদে বেড়িয়েছিল তখন রুটেন পাকা সুসীদাভাবীর মতই ব্যবহার করেছিল। রুটেন ও ক্রান্ত জাংশানীর কোন স্নাত্য দাবীতেই পাণ্ডা দেখনি।

ফলে জাংশানীর বন বিষয়ে উঠে আজ হিটলারের চণ্ডীভিত্তি আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যচক্র যেই যুগেই অমনি রুটেনের নীতিও বদলেছে। আজ আর রুটেনের ক্রান্ত, ইটালি বা পূর্ণ-বন্ধদের জন্তে অক্লান্ত নেই। রুটেন আজ এমন ভাব দেখাচ্ছে সে কত নির্মম! গত শতাব্দীতে যখন তুর্কী আরমেনিয়ানদের উপর অত্যাচার করেছিল, তখন রুটেনের রুকে আশ্রয় জলেছিল। কিন্তু আজ হিটলার জাংশানীর ইচ্ছাদের একান্ত সর্গনাশ করলেও রুটেনের মুখে একটুও কথা নেই। তুর্কীকে এককালে রুটেন বর্ধর বলেছিল, কিন্তু জাংশানীকে তো আজ সে কথা সে বলছে না!

অবশ্য আমরা রুটেন বলতে বর্তমান রুটিন পল্যাংকট এবং বিশেষ করে তার মন্ত্রীমণ্ডলীকেই মনে করছি। কারণ রুটেনের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সংবাদ পত্র জাংশানীর তাওগের পরে একান্ত প্রতিবাদ করেছে। তবে এসকল ব্যাপারে রুটিন গবর্নমেন্ট সরকারী-ভাবে একটা কথা এ পর্যন্ত বলেনি। এমন কি বিলাতের "টাইমস" কাগজ জাংশানীর পুলিশ বহরার বাজেয়াপ্ত করলেও রুটিন গবর্নমেন্ট একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। বিলাতের শ্রমিকদলের বহু কাগজ তও জাংশানীতে প্রেরণ করবেই পারে না।

আরও আচরণের বিষয় "টাইমস" জাংশানীর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পেলেও, হিটলারের ভাসাই সন্ধি-

ভঙ্গ বোধায় হজম করে জাংশানীকে দলে ভিড়ানাই মুক্তি দিচ্ছে। যে জাংশানী গত দুই বৎসর যাবৎ সব বিষয়ে বেপরোয়া ভাবে চলেছে, তাকে দলে টেনে আনার জাজ "টাইমস" ব্যগ্র। "টাইমসের" আচরণ যদি অদ্বুত হয় ত রুটিন গবর্নমেন্টের আচরণ অত্যদ্বুত। যে রুটেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জাংশানী রণ-তরী-বহরকে উত্তর মাগরে ডুবিয়ে দিতে ঝিঝ করেনি, সেই রুটেন আজ জাংশানীর নৈনহর রুকির প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হওয়া দূরের কথা স্মিত-বদনে জাংশানী প্রতিনিধিগণকে আলাপ আলাচনা-কাজেই অভিনন্দিত করেছে।

কিন্তু রুটেন কি একা জাংশানীরই বন্ধ হ'ল? তা না। ফ্রান্স ও ইটালির সঙ্গেও রুটেনের আনাপোনা বন্ধ হ'ল। ঠেঁসা বৈতকে রুটেনের আচরণে মনে হয়েছে পূর্ণ বন্ধস্ত অঙ্গুর আছে। বিশ্ববাস্তব সমূহের মধ্য থেকে রুটেন ক্রান্ত ও ইটালির সঙ্গে পলা মিলিয়ে জাংশানীর ভাসাই সন্ধি ভঙ্গের প্রতিবাদ করেছে। জাংশানী সে প্রতিবাদকে তৃণ জ্ঞানও করেনি, তবুও রুটেন পূর্ণ-বন্ধদের বোকাচ্ছেন যে জাংশানীর সঙ্গে একটা রফা করার প্রয়োজন। জাংশানীর সঙ্গে রফার অর্থ? জাংশানী করণীয় যা করেছে; জাংশানী কি তার একটা সৈন্য কমাবে না একখানা এরোপ্লেন ভাঙবে? তবু রুটেনের আশা জাংশানীর সঙ্গে একটা air pact বা বিমান চুক্তি হ'বে।

Air pactএর নমুনা কি রকম? রুটেনের মতলব টিক যে, জাংশানী রাতারাতি বিমানপোতের বহর গড়ে রুটেনের সবকক্ষ হওয়ার ফলে, রুটেন ২১ দলের জায়গায় ৭৬ দল বিমান বাহিনী গঠন করবে আপানী দুই বছরের ভিতর। ও-দিকে বিলাতের জনসাধারণ-কেও আকাশের বোমা ও বিখাজ গ্যাস থেকে কি করে আঁড়াকা করা যায় তাও শেখান চলেছে। কাজেই Air pact হবে বোধ হয় এই রকম—৫৭৮৯ খানা।

রুটেন হিটলারের শান্তি বাগীতে বড়ই মুগ্ধ হয়েছেন; কিন্তু ক্রান্ত, ইটালী বা রুশিয়ার মুগ্ধ হওয়ার কোনই লক্ষণ

দেখা যায়নি। কাজেই এই রাজনীতিক চোখ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডি আরও কিছুকাল চলেবে এবং এর মধ্যে যুদ্ধকালী জাতিরা যুদ্ধের মাল মসলা ভাল ভাবেই গোছাবে। জাংশানী ও ইটালী তাই করছে। তাদের দেখাদেখি ছোট ছোট দেশগুলিও অসহায় জনসাধারণের উপর শত্রুর বোকা চাপাচ্ছে। এর ফলে হয় জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রুর বোকা ও সঙ্গে সঙ্গে গবর্নমেন্টের বোকা ফেলে দেবে, নয় শত্রু নিয়ে হানাহানি করবে। শোকেই ব্যাপারটারই সম্ভাবনা খুব বেশী।

### আমেরিকা অদ্বুত সাম্রাজ্য

ইয়ুরোপ উগ্র জাতীয়তার মদে মোত আছ, আর আমেরিকা আছে নিজের ধাক্কা। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের তিরোধানের পর আমেরিকা আর ইয়ুরোপের ব্যাপারে দখা ঠোঁটা দেখনি, এখনও দেবার কোন লক্ষণ



"মহাভাঙ্গা" নামকাল

নেই। পৃথিবীর প্রায় সব সোনা হজম করে আমেরিকা হয়েছে। টাকার কুমীর, কিন্তু তার নিজের দেশের দুখে দুর্দশার অস্ত নেই। ইয়ুরোপের সব প্যাদানাদার দিয়েছে স্বাকি, আর তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালানোর টাকা নেই। কাজেই আমেরিকার বহির্বিভাগ দিনের পুর দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে। চীনে ছিল আমেরিকার অনেক লম্বী



টাকা, কিন্তু জাপান সেখানে এমন ভাবে পাত বসাজে সেখানে থেকেও খুব সম্ভব আমেরিকার পাতভাতি সৌভাগ্যে হবে। সেটা আমেরিকা সহজে করবে কিনা সন্দেহ, কারণ জাপানের নৌবহর গুলির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা বিপুল ভাবে নৌবহর বৃদ্ধি করছে। জাপান ওয়াশিংটন চুক্তিতে সশস্ত্রে সে পথ স্থগিত করেছে। এখন যখন প্রশান্ত মহাসাগরে পশ্চিম কূলে আমেরিকা জাপানের সঙ্গে পায় দেবে কিনা। কখনও মনে হয় সেবে; কারণ গত যে মাসের প্রথমে আমেরিকার নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগরে যে কসরৎ দেখিয়েছে তাতে অনেককেই মনে করেছে এটা জাপানের মনে বিভীষিকা সৃষ্টির ভাজে করা হয়েছিল।

অপর পক্ষে, জাপানের নিকটবর্তী বাটী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে আমেরিকা বেশ বখতারের মধ্যে স্বাধীনতা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। অনেকে মনে করেন এটা হচ্ছে আমেরিকার কৃষ্ণ-নীতি, আমেরিকা বহুদলপত হোক নিজেদের জমশাই গুটিয়ে নিয়ে আসছে। কিছু কাল আমেরিকা শুধু দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে থাকবে, বাস্তবে সাম্রাজ্য বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করবে না। কিন্তু ফিলিপাইনের পূর্ণ স্বাধীনতার এখনও দশবৎসর বাকী, এবং এই দশ বৎসর আমেরিকার নৌবহর যথার্থীতি ফিলিপাইনে পাহারা দেবে।

অনেকে বলেন যে আমেরিকা স্বার্থের ভজ্জেই ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিচ্ছে। ফিলিপাইনের চিনি, পান, তামাক কিনা শুধু আমেরিকার বাজারে কাটতি হয় এবং ফলে আমেরিকার নিজের ঐ সকল পণ্যের বিশেষ অর্থব্রি হয়। ফিলিপাইন স্বাধীন হওয়ার পরে ঐ সব পণ্যের ওপর ক্রমাগত শুদ্ধ দসবে, এবং ফিলিপাইনের হবে সর্বনাশ।

সে যা হোক, অত টাকা-সবেরও সরেয়া ব্যাপারে আমেরিকা বড়ই অর্থব্রিধার পড়েছে। হু'বহর ধরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নানা রকম আইন কানুন করে নিম্ন রাশিয়ার উন্নতির চেষ্টা করছিলেন, এবং আরও

হু'বহর ঐ "নবনীতি" (New Deal) চালানার ক্ষমতা রুজভেল্টের থেকে পেয়েছিলেন। রুজভেল্টের প্রতিপক্ষি হু'বই বাড়ছিল, কিন্তু প্রতীম কোটি রুজভেল্টের ক্ষমতা বে-আইনী বলে সিদ্ধান্ত করায় সব ব্যাপারই



রুজভেল্টের "স্বাধীন অধ্যায়ন আইন" (N. R. A.) আরেয় বুনা। এই উল্লাসকে নিউট্রনকে সংবলনশর ও অজ্ঞাত মিছিল।

উঠে গেল। অর্থাৎ এতদিন গণর্যমণ্টের নিজেদের প্রতিযোগিতা হার করে এবং শ্রমিকদের অর্থব্রি দিয়ে শিল্পের যে মধ্য পতিতে উন্নতি ছাঙ্কিন তা বন্ধ হয়ে উপজন্ম হয়েছে। ফলে অধার কারখানাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে এবং মালিকরা পূর্ণের দহ শ্রমিকদের বৈশী খাটিয়ে কম মাইনে রেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমেরিকার শিল্পে যে উন্নতি হয়েছে তাতে শ্রমিকদের কাজের সরন কমিয়ে বিলে বেকার-সমতা ক্রমাগত বাড়বে। এখনই রুজভেল্টের "নবনীতি" সবেও বেকারের সমতা এক কোটির ওপর, এবং এদের কাজ জোপার কাজ রুজভেল্ট বিপুল ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আইনের কলকাতী ঠিক না হলে সে সব আর কিছু হবে না।

আধুনিক অর্থনীতি প্রতিযোগিতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ রাষ্ট্র এই নীতির প্রসার করে। কিন্তু আজকালকার দিনে ব্যাপক ভাবে দেশের শ্রমিক কর্তৃক হ'লে অবাধ প্রতিযোগিতার রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

করতেই হবে। রুজভেল্ট তাই করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমেরিকার গণতন্ত্র হ'লেও রাষ্ট্রের গঠন এমন জটিল যে রুজভেল্টের সাধু ইচ্ছা বাস্তব হ'য়েছে। কাজেই চিন্তিতে আমেরিকা কি করে জাতীয় সমতা সমাধান করে দেওয়ার বিষয়। ইতিমধ্যে বেকার সমতা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্যকে রুজভেল্ট বড়ই বিপদের মধ্যে পড়েছে। রুজভেল্টের মন্তলব ছিল তাদেরও রক্ষা করা। এমন কি হবে বোকা থাকে না।

### ষ্টালিনের নূতন কল্পনা

মত কথা বলতে গেলে সবারইকে স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবীর এই দশক অর্থ সমতার দিনে কনিয়ার অর্থব্রি সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির পতিতর বার্ষিক ৮, লর্ড পাস-মিড, ফরাসী রাজনীতিক রেভিউর অনেক দিন আগেই দিয়েছেন। বিখ্যাত পাঁচশালা বনোবস্তের ফলে ধর্মির অনেকটা উন্নতি হয়েছে, এবং রাষ্ট্রের পরিস্রাবনায রুজভেল্টের চালসে। আগে জোর করে সম্মিলিত করার চেষ্টায় রুজভেল্টের ওপর শীতল চলছিল, কিন্তু এখন তাহাই বৃহত্ত পড়েছে যে ছোট ছোট খামারের চেয়ে বড় বড় ক্ষেত্রে কলের মাছল চালিয়ে দেশেরও উন্নতি হয়, নিজস্বেরও সুবিধে হয়। তা ছাড়া, তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী গেছে একবারে বদলে। আগের চেয়ে তারা চের বৈশী আদান ও আদান পায় এবং শিকিতের সাধ্যাও ক্ষতভাবে বাড়ছে। তবে রুজভেল্টের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর লোভ আছে বলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের গণভব-কোটি তারও বা ব'খা করেছেন। কিন্তু একটা গণী টেনে দেও য়। হয়ে ছে খাঁতে লোভ হুঁধার না



ষ্টালিন

হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের ব্যাপারেও রুজভেল্টের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং স্বার্থের পতিতর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হচ্ছে। শ্রমিকরা খাণ্ডা সমতার খেতে খায়, ইত্যপুর্নই অনেক স্বর্থ সুবিধা পেয়েছে এবং আরও পায়। কিন্তু ষ্টালিন কোশলে নিম্নগতা অর্থব্রি বৈতনের তারতম্য করেছে। এ তারতম্য না থাকলে ব্যক্তিগত উজ্জম বাড় না। কিন্তু লক্ষ্য রাখা হয়েছে তারতম্য খাঁতে একান্ত বিঘ্ন না হয়। এখন ষ্টালিন বলছেন যে, কলকারখানা যথেষ্ট হয়েছে, এবার চাই উপজন্ম পরিস্রাবক। অর্থাৎ শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর দিক এবার থেকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হবে। এ সম্বন্ধে নেতাদের দায়িত্ব কি ষ্টালিন তা বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন ষ্টালিনের কথাগুলি মনে রাখবার মতঃ 'The old slogan "Technique decides everything", reflecting a period already passed when we experienced hunger in the field of technique, must now be substituted by a new slogan: "Cadres decide everything"—অর্থাৎ, শুরে শুরে কবী উভয়টি কর্তৃক হবে; যত যত্নে, যত চাই।

রাজনীতিক ব্যাপারে ষ্টালিন কখনো উপরতায় পরিত্যক্ত দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, মনে রাখতে হবে আমাদের দলের বাইরেও এমন লোক আছে খাণ্ডা কম সাম্যবাহী নয়। মনে হয় কিছুদিন পরে সাম্যবাহী দল (এরাই এখন রাষ্ট্র চালায়) সমগ্র জাতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হ'য়ে পড়বে। এতে বোকা থাকে, দলদলি ষ্টালিনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য জাতির মঙ্গল, সমগ্র দেশের সমৃদ্ধি।

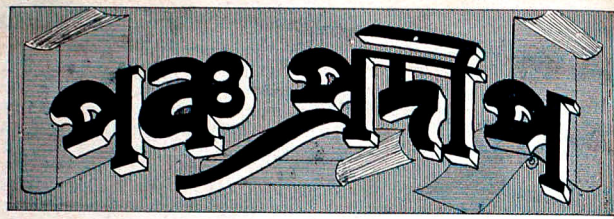
পররাষ্ট্র ব্যাপারে স্বধর্ম্যে সোভিয়েট-গণভব-কোটির দূরদর্শিতার পরিত্যক্ত জগৎ ক্রমাগতই পাচ্ছে। এখন বলা চলে এক জাণ্ডানী ছাড়া কনিয়ার কেউ শরু নেই। জাণ্ডারের সঙ্গে সাময়িক সন্ধি করায় হিটলার খুব চটেছেন, কিন্তু তাইতেই বোকা যায় কনিয়ার আত্মরক্ষার জজ্ঞ তা কর্তা দরকার। হিটলার তা কোনরিন গোপন করেনি যে, কনিয়াকে বাণে গেলেন তিনি ছাড়া মেনে না। কিন্তু অপর পক্ষে বিশ্বরাষ্ট্র সম্বন্ধে কম



দিইক্লিক

প্রতিনিধি লিটভিনকেও প্রতিপত্তিতে বোকা যায় আজ জগৎ কনিয়াকে কি জাণ্ডা দেবে। পাঁচ বছর আগেও প্রায় সকল দেশেই এই কনিয়াকে পৃথিবীর শরু বলে মনে করত।





## সাহিত্যে অসুন্দর

অলভাস হাঙ্গলি

আমার আলোচনার বিষয় সাহিত্যের অলীলতা নিয়ে নয়, পরন্তু অসুন্দরতা (vulgarity) নিয়ে। এই অসুন্দরতার অত্যাতিশয্য যেমন বিরল, শালীনতার অত্যাতিশয্যও তেমনি বিরল। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা



অলভাস হাঙ্গলি

প্রকৃতির অহস সৃষ্টি না করে সাফল্য পাই, তা দে র কে আ মা দে র আদর্শ সমাজের অশুভ আখ্যা দেওয়া চলে। ভাষাতত্ত্বের ঝাড়ু-দার বা মেথরের দৈববিড়ম্বনায় যেমন অশুভ, এরাও

কথা বোকে, এবং সেই মতো আচরণ করে। আমাদের আদর্শ সমাজের অশুভদেরও যদি প্রকৃতি দেবী এইরূপ শিক্ষা দিতেন! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা তেনেই। খাবার সময় হয় তো দেখলে, তোমার পাশে অসুন্দর রাজনৈতিক মতো বাসে থাকছেন; সাংবাদিক তো অসংখ্য, অসুন্দর সাংবাদিক তাঁর প্রিয় পানাগারে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে চলে। ভারতীয় অশুভরা যেমন জানে, এঁরা কিন্তু তেমন নিজেকে যোগ্য আচরণ সম্বন্ধে সচেতন নন। এঁরা নিজদের অবস্থা সম্বন্ধে এমনি অজ্ঞ যে, খাবার সময় তোমার পাশে বসে' ভাবেন তোমাকে সামান্যত করতেন, দুর্ভিক্ষের পানাগারে এক রাগ মদ খাইয়ে ভাবছেন তোমাকে তিনি দয়া করছেন। দশহাত বেড়িয়ে যাওয়ার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না; পঞ্চাত্তরে তাঁরা জোর করে' তোমার ঘাড়ে এসে পড়বেন।

আত্মপ্রমত্তের এই উচ্চ ঘোষণা, শূন্য আত্মজ্ঞানের এই নিম্নজ্ঞ প্রকাশই তো অসুন্দর। যে-নীচতা নিজেকে ঘোষণা করে, সে তো অলীলতারই নামান্তর; সভ্য কথা বলতে কি, আত্মঘোষণা মাজেই এক রকমের নীচতা। কারণ, বাড়াবাড়ি সব ক্ষেত্রেই খারাপ; প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি আমরা জোর জ্বরদপ্তি করিতে বাই, তা হ'লে আমাদের অসুন্দরশক্ততা দ্বা পড়ে, আর সেই সঙ্গে আমাদের চরিত্রের প্রকৃত নিষ্কৃতি এমনিভাবে নানগণোচর হয় যে, তাকে অসুন্দর ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

মাছঘ 'ফাশনের' দাপ। বেশী দিনের কথা নয়,

আখ্যা—১৩৪২]

অলভাস হাঙ্গলি

সাহিত্য

পায়ের ফ্যাকাসে রঙ, কুশা না-খা-কা, সামান্য আঘাতে মুখী যাওয়া ব্যপারগুলো ছিলো মেয়েদের আভিজাত্যের লক্ষণ। বজ্রাঘাত ও দুর্ভল পরিপাক যন্ত্রের কল্যাণে যে-কোনো মেয়ে মহিলা-পদে উন্নীত হতে পারতো। প্রয়োজনের পরিমাপ দিয়ে হত তাদের গুণব্যাখ্যা। ধনী মেয়েদের পরিশ্রম করতে নেই, স্বাস্থ্যময় জীবনযাত্রা তাদের আভিজাত্যের পরিপন্থী। নির্মূল মুক্তব্যুর গুণাবলী উৎখানো আবিস্তৃত হয়নি। এক কণ্ঠায় তখনকার রোমান্টিক সাহিত্যের হাওয়ার-খায়ে-মুখী-যাওয়া পাধু-বই মেয়ে বহু বৎসর যাবৎ অভিজাত নারীর আদর্শ ছিল।

সময়ে সময়ে সাহিত্যেও এমনি ঘটনা ঘটে। শক্তির প্রাবল্য, সাধারণ বস্ত্র ভালো লাগা ইত্যাদি ব্যাপারে সাহিত্যিক অসুন্দরতার চিহ্ন। কোনো কোনো শতাব্দীতে এই সাহিত্যিক ক্ষয়রোগের প্রাবল্য দেখা গিয়েছে,—তখন এইটাই ছিল গুণের আদর্শ, তাই লোকে এই ক্ষয়-রোগেরই উৎসর্গ সাধনের চেষ্টা করেছে।

উনিষশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখতে পাই, ফরাসী ট্যাকিক নাট্যমঞ্চে কম্বালের উল্লস একটা অশোভন ব্যাপার। এই সামাজিক রীতি অল্পসারে ট্যাজেভির নায়ক-নায়িকার নান্দিক ও গুণীক হীকৃৎদের থেকে সম্ভ্রান্ত রোমানদের প্রভেদ জানতেই ব্যবহার হবে, নাক-কাড়া ও-জগতের বহিষ্ঠূত ব্যাপার।.....এই রীতি প্রাচীন তত্ত্ব বিজ্ঞানের সভাবাদের পরিপোষক। জগতে মন ও বস্তু নামে দুটি জিনিষ আছে, মনোজগত আবার বস্তু জগতের বহু উচ্চে। এই মতবাদের কল্যাণে বহুধর্ম শরীরকে 'ক'রেছে অস্বীকার। সাহিত্যও বাদ যায় নি। বহু লেখক সাহিত্য থেকে শরীরকে বনবাসে পাঠিয়েছে, ব'লেছে 'সহীদ-বর্ণনা'—অসুন্দর, শরীরের উপর মনের অভিব্যক্তি-বর্ণনার চেষ্টা রুচি-বিপণিত ব্যাপার। এঁদের জগতের গোঁবো রক্ত মাংসের মাছঘ নয়, তারা ট্যাজেভির নায়ক-নায়িকা, তাদের নাক আছে কিন্তু তারা নাক ঝাড়ে না.....

মাছঘকে কেবলমাত্র মনোরাজ্যে সীমাবদ্ধ করে' ক্ষয়বদের স্থিতিধাই হয়েছে। তাই ফরাসী নাটকে

দেখতে পাই—কামের কোনো দৈহিক রূপ নেই, আর পাচটা নিরস্ত্রিয় নির্দশনের মতো থাকে নিয়ে অনায়াসে লালসা ও সংযমের অপূর্ণ বস্তুজাতা রেওয়ানো টলে। রাসিক লেখকরা তাই মাছঘকে বীতি বুদ্ধিসম্পন্ন করে' একেছেন, সে-নাচুঘের ইঙ্গিত্য নেই। তাতে মাছঘ বিশেষের কেঁঠায় না পড়ে' সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেহ বিশেষকে নির্দেশ করে, সে বলে—আমি সকলের মতো না, আমি একক; আর মন ঘটায় পরস্পরের সহিত সংযোগ। এমনিভাবে সীমারেখ টানার দ্বারা রাসিক লেখকেরা সার্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন; ধারা প্রকৃত দৈহিক জীবনের গুটিনাটি ও অসম্পূর্ণতা বর্ণনা করবার চেষ্টা ক'রেছেন, তাঁদের পক্ষে সার্বজনীন সাহিত্য-সৃষ্টি অসম্ভব। কিন্তু সার্বজনীনতার দিক দিয়ে তারা ভাষায় যথার্থ হয়েছেন, সহজীভব ও মাফাত সভ্যকেও তেমনি হারিয়েছেন। বিনা মূল্যে কিছুই লাভ করা যায় না।

রাসিক হবার উচ্ছাস আমার এতটুকু নেই। যা জীবন, যা জটিল এবং আটের ক্ষেত্রে যা অসম্পূর্ণ তাই আমার কামা, সার্বজনীনতা আমি চাই না। তা ছাড়া এই ধরণের সম্বন্ধ, এই দূরীকরণ, একীকরণ ও সুরলীকরণ পদ্ধতির জেদ বজায় রাখতে যথেষ্টক যে পরিমাণ আয়াস স্বীকার করতে হয়, তাহা অপেক্ষা অসীম জটিল এবং নিগূঢ় সভ্যকে সাহিত্যের ভাষায় যথার্থ বর্ণনা করার আয়াস বহু সহজগত বেশী। গভীর ভিতর শিশু যেমন নিরাপদ, সভ্যতার জগতের অসংখ্য অজ্ঞাত ঘটনার হাত এড়িয়ে মনোজগতের আশ্রয় তেমনি নিরাপদ ও আরাগপ্র। মন অপেক্ষা বস্তু যেমন জটিল তেমনি স্বক-চুটার তুলনা হয় না। আমাদের ইঙ্গিত্য, সংস্কার ও বোধের ভিতর দিয়ে বহু ঘটনা চেতনালোকে প্রত্যাক হয়, সেই প্রত্যাক চেতনা সম্বন্ধে আমরা পরে যে-সব ধারণা করি, সেই ধারণা অপেক্ষা চেতনালৌকিক প্রত্যাক ঘটনা বহু অংশে স্বক। তাই নন্দ-রাসিক লেখকদের স্বক— সাহিত্যের ভাষায় এই সাফল্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা, অনির্ভরতায়কে পরিগুণ করা। এই অসম্ভব জগতের



কাজাকাহি পৌছাতে পারাও ক্লাসিক সাহিত্যের চেয়ে কঠিন। কোনো ঘটনার জটিল বিশেষত্বগুলিকে বাদ দেওয়া (এখানে শারীরিক জটিলতাকে বাদ দেওয়া) মানেই আটের ক্ষেত্রে আশাসক এড়িয়ে চলা। এই এড়িয়ে চলা আমি পছন্দ করি না। তাই 'ক্লাসিসিজম'ের পক্ষপাতী আমি নই।

সাহিত্য দর্শনও বটে আবার বিজ্ঞানও বটে। হৃদয় ভাবায় সাহিত্য সত্যকে উন্মোচিত করে। ক্লাসিক লেখকের মতে সত্য শরীরকে একধরনের 'রাখা' তাই আমার মন-পুত নয়। বেহতরকে স্বীকার করা, এবং মন ও শরীরের যে সম্বন্ধ এখানে অস্পষ্ট, তার অঙ্গসন্ধান যে শুধু অঙ্গসন্ধান-সাপেক্ষ তা নয়, সত্যই তার প্রয়োজন আছে। এইসব অঙ্গসন্ধানের ইতিবৃত্ত যখন বিজ্ঞানসূত্রে পাঠ্য কৈতোরের পাতায় গোপন করা না হয়, তখন অনেকের মতে তা অস্বীকার্য। অনেক তাকে অতিশয় ক্ষতিকর মনে করে। বহু সমালোচক জন-সাধারণের কাছে, এবং বহু অসাহিত্যিক পাঠক ব্যক্তিগত চিত্রিতে আমাকে অশিষ্টতার অপরাধে অভিযুক্ত করেছে; কারণ কোনো কোনো বিষয়ে অঙ্গসন্ধানের ইতিবৃত্ত আমি বর্ণনা করেছি সরল ইংরেজীতে এবং উপন্যাসের পাতায়। লেখা পড়ে' মানুষ যখন আঘাতে মুগ্ধমান হয়, তখন লেখকের কর্তব্য হচ্ছে তাদের আঘাত করে দেওয়া। কারণ, যারা সত্য তখন আঘাত পায় তারা শুধু নিশ্বাসে নয়, তাদের নৈতিক অবনতিও ঘটেছে। যারা নিশ্বাসে তাদের শিক্ত কর, যারা পাণ্ডী তাদের শাস্তি দাঁও, তাদের নৈতিক সংস্কার কর। এসব এক ঐ আঘাতের দ্বারা ই সম্ভব। সত্যকে যারা দ্বাধা করে তাদের শাস্তি হচ্ছে তীর সত্যের আঘাতে তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়া; তাতে বাধ্য হই এই সত্যের আঘাতে তারা যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়ে উঠবে, এবং সত্যকে ঘৃণা করার অপরাধ থেকে সেই পাণ্ডীরা মুক্তি পাবে, শিক্ত হবেন, তারা সংশোধিত হইবে। কারণ সত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে সে সত্য আর আঘাত করে না। স্মৃতির সত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য, তাতে আনন্দও থাকিবে। কারণ বঙ্গদেশের বলাচেন,—কুকুটির মধ্যে এক

রকম মস্ততা আছে, অপরকে অসম্ভব করাতই অতিভাষা আনন্দ।

কুকুটি থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায়, অপরকে অসম্ভব করার আনন্দই যে তার একমাত্র আনন্দ, তা নয়। কেউ কেউ অশিষ্টতার জন্যই অশিষ্টতা পছন্দ করে। আটের ক্ষেত্রে সংযমকে অতিক্রম করা, প্রতিবাদের মজা উপভোগ করার জন্য অত্যধিক প্রতিবাদ করা—কুকুটির বিরুদ্ধে এই যে অপরাধ—এতে এত আনন্দ পাওয়া যায় যে, সময় সময় সে আনন্দ মস্ততা আনে। তার কারণ, এসব অপরকে অসম্ভব করে বলে নয় (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে আমোদই উপভোগ করে); তার কারণ, এসব সত্যই অশিষ্টতার পরিচায়ক। যে-কুকুটিক এরা অতিক্রম করে তা যতদূর সম্ভব সত্যাকার স্মৃতি।

জীবনের একস্থানে বর্ণনা করেছেন,—লেখকবীর সময় স্বীকে স্বীকে ভ্রমকালো কল্পনামুখি কাঁচের টাকে প্রবৃত্ত করতো, আর তিনি পাঠ্যগানের বোরালে সেই স্মৃতি মুখিগুলোকে উকুনের মতো গিয়ে মারতেন। তাঁর দৃশ্য সমস্ত ছিল যে, তাঁর রচনা কেবলমাত্র নিজের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে সন্মোহিত হয়ে, বাহ্য মনিমানিক্যের ছাড়া—তা যতই মনোহর হোক না—একবারেই থাকবে না। এই কঠোর তপস্বী সাহিত্যিক তাঁর নিজের পুরস্কার পেয়েছেন; তাঁর রচনায় অঙ্গসন্ধানের এতটুকু স্পর্শ লাগেনি। তাঁর ভক্ত লেখকরা যদি তাঁর অঙ্গসন্ধান করতে চান তো ভগবানের কাছে শক্তির জজ প্রার্থনা করুন। সে শক্তি কদাচিৎ কেহ পায়। যে প্রলোভন তিনি জয় করেছিলেন, সে প্রলোভন জয় করা যে কোনো তীক্ষ্ণবী সাহিত্যিকের পক্ষে দুঃস্বপ্ন। কল্পনায় ঢুটে ওঠে ইন্দ্রবজ্র বর্ষাছটা নিয়ে; রচনা প্রসঙ্গের পক্ষে তা যতই উজ্জ্বল হোকনা কেন, তাকে বন্ধী করে' শূলবিদ্ধ করতে হবে। একটি শূলসিঁটা শব্দ বিভ্রাস্ত, একটি ঘটনা চমকপ্রদ ভাবধারার হযতো আভাস দিচ্ছে, কিন্তু সেই ভাবধারা লেখকের স্তম্ভ জগতের বৃত্তকে স্পর্শকরে' তীক্ষ্ণ গতিতে ঢুটে চলে, স্ফট-আঙ্গদের সহিত কোনো সম্পর্কই হয়তো রাখে না; এখানে হৃদয় স্বপ্নের সঙ্গে গভীর একটি কথা বলবার কী ভীষণ প্রলোভন! সত্যি,

এই অলঙ্কার যেন গণ্ডের উপর একটি উজ্জ্বল লাল ব্রণের মতো শোভা পায়; আটের দিক দিয়ে এই তীক্ষ্ণ ভাবধারা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। যে বাক্যের প্রয়োগ অভিযাত্রায় স্তম্ভ, যার বর্ণ অতিরঞ্জিত সে বাক্যের প্রয়োগ স্বাভাবিক; যে ব্যঙ্গোক্তি অতি কঠোর, যে দৃশ্য অতি-শোচনীয়, যে নিন্দাবাদ অতি-নির্মম, যে বর্ণনা অতি-কবিরম—তা একবারেই নিষ্ফল। এইসব মনোহর প্রলোভনকে যদি আমরা বরণ করি, এই সব উজ্জ্বল কীট-গুলিকে প্রথম দর্শনেই গিয়ে না যেরে যদি আমরা সত্যের গ্রহণ করি, আমাদের রচনা তখন অচিরেই দক্ষিণ আমেরিকার পর-প্রান্ত অলঙ্কার-ভূষিত ছুইফোড় ব্যক্তির মতো চোখে দেখাবে, রচনা কৃটিবিশিষ্ট হয়ে উঠবে।

আঙ্গুসচেতন আটটি সঠিকরূপেই জানেন—প্রকাশের আশিষ্য এবং অতি-প্রতিবাদের দল কী—এই জানার মধ্যে অসামান্য আনন্দ আছে; কিন্তু (এই জানা সত্ত্বেও, বা এই জানা আছে বলেই) যে কুকুটির বিরুদ্ধে তাঁর বিবেক তাঁকে সাবধান করে' দেয়, এবং যে অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ গরিমহে তাঁকে অহুতাপ করতে হবে একথাও জানেন, সেই কৃতিহীনতার অপরাধ তিনি সম্মানে থেকেই আপন করার সমস্ত নৈপুণ্যের সাহায্যে করতে অগ্রসর হন; এই অপরাধের মধ্যেও অপর আনন্দ আছে। শোভনতার বিরুদ্ধে এই আঙ্গুসচেতন অপরাধকারী অপারের অসন্তোষ বিধান করে' যে অতিভাষা আনন্দ লাভ করেন, তার চেয়ে নিজেকে অসম্ভব করার অতিভাষা আনন্দ তের বেশী গরিমহেই পান।

যে জঘন্যবৎ স্বভাবতঃ তোমার নেই, অথচ তোমার মনে হচ্ছে বা তোমার থাকা উচিত, কারণ সকল ভাল লোকেরই তা থাকে—সেই জঘন্যবৎকে সাহিত্যে প্রকাশ করা কুকুটি ও অশোভনতার পরিচায়ক। কুকুটির আর একটা পরিচয় (এবং এইটাই সাধারণতঃ খঁচটে থাকে)—জঘন্যবৎ আছে, কিন্তু তার প্রকাশ-ভঙ্গী অত্যন্ত অপরূপ এবং তা বর্ণনা করা হচ্ছে এত বেশী অতিশয়োক্তির সঙ্গে, যাতে মনে হয় লেখকের এই অসম্ভূতি স্বাভাবিক নয়, মনে হবে লেখক এক রকম সাহিত্যিক জালিয়াতির দ্বারা কতকগুলি জঘন্যবৎ সৃষ্টি করছেন মাত্র। সাহিত্যে আন্তরিকতা প্রদানতঃ বীশক্তির উপর নির্ভর করে। Kents এর প্রথম-লিপি গুলির মধ্যে একটা সত্যের সুর আছে কারণ তাঁর ছিল অসাধারণ সাহিত্যিক শক্তি। অধিকাংশ মনোহর জঘন্যবৎ অহুতব করবার শক্তি আছে, কিন্তু নেই তা প্রকাশের শক্তি। ফলে তাদের প্রায়-লিপিগুলি (যে সব নমুনা মানবা, বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালত ইত্যাদিতে পাই) হয় একান্ত নীরস অথবা অতিশয়োক্তির দ্বারা কটকিত। উভয় ক্ষেত্রেই সে রচনা হয়ে পড়ায় আন্তরিকতামূলক বিশেষতঃ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে কুকুটির পরিচায়ক কারণ সেই সকল অতিশয়োক্তি একপ্রা অসংলগ্ন যে তাতে কেউ আত্ম স্থাপন করতে পারেন না। \*

\* Aldous Huxleys Vulgarities in Literature  
হইতে অনুদিত। অনুবাদক : - সন্ন্যাসী সাধুশ্রী





## ইন্ডাচে

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(২)

সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্নে প্রখ্যাত যেমন তাপাহতব হয়ইছিল প্রাচ্যে তেমনই একটু শৈতাহতব হইতছিল। মধ্য-ছুনির বায়ুবিস্তার তত্ত্ব হইয়া দিব্যবাসনে পরও বহুক্ষণ সজ্জিত তাপ বিকীরণ করে; তাহার পর শৈতাহতব হয়। বাহির হইয়া অকৃত দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। শত শত ইংরাজ সৈনিক বারাকে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে নিমিত্ত। খেজুরের শাখায় শলাকা প্রস্তত করিয়া তথ্যরা পাখীর খাচা যেমন ভাবে প্রস্তত করা হয় সেই ভাবে খাচ প্রস্তত করা হইয়াছে। তাহারই উপর একখানি কবল পাতিয়া ও একখানি গাভারণ করিয়া সৈনিকরা ঘুমাইতেছে। কাহারও কাহারও গাভারণ মরিয়া গিয়াছে। কাহারও পরিধানে পরিচ্ছন্ন নাই। ইংরাজ পুরুষরা পরস্পরের সম্মুখে বেশভ্যাগ বা পরিবর্তনে কোনরূপ লজ্জাহতব করে না—তাহাদিগের বেশ পরিবর্তন করিতে হইলে উল্লম্ব হওয়া বাস্তবিক উপায়ও নাই; যত সম্ভবচ লক্ষ্য কেবল নখিলায়া উপস্থিত থাকিলে।

যেণী ও আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া মানের কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না, সন্ধান করিতে চলিলাম। বড় বড় বাবদ্য ঘরে বাঁশের ঘুটির পর তক্তা দিয়া টেবল করা হইয়াছে—তাহার উপর সারি সারি জলের কল, প্রত্যেক কলের নিম্নে একখানি টিনের গামলা। সৈনিকরা আশিয়া এক একটি কল দখল করিয়া মুখে হাতে জল দিতেছে—দাড়ী কামাইতেছে, চলিয়া যাইতেছে; যাহানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পার্শ্বেই খাল। তাহাতে যান করা যায় কি না, জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, তাহা একবারেই নিষিদ্ধ। জলে যদি বিহচিকা-বীজাণু থাকে সেই ভয়ে কহাকেও খালের বা নদীর জলে যান করিতে দেওয়া হয় না—আর সেই জন্তই পানীয় জলে ক্লোরিন দেওয়া হয়—সে জল পান করা হুমাধ্য।



বাংলার ঘরে

সেখা গেল, প্রত্যেক কাছড়ার চারি কোণে চারটি সূর কং—বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে—বারে কন্সট নাই। যেণীকে বলিলাম, আমার নিকটে একখানা ঘু বড় তোয়ালে আছে—সেখানা পর্দা করিলে করা যায়। যদি তিনি বাহিরে সেখানা ধরিয়া থাকেন ও আমি ভিতরে যান মারিয়া লই এবং আমি পর্দা ধরিয়া ঝাঁড়াইলে ভিতরে তিনি যান সারেন, তবেই যান করা সম্ভব হয়। তিনি সোসায়ে আমায় প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পরদিন হইতে আমরা সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আমাদিগের ইংরাজ সঙ্গীরা ক্যাম্পিসের বাসভীতে জল আনিয়া তাগুর সম্মুখে বিবর হইয়া যান করিতেন! সদাশ্রম-নিষ্ঠার শ্যাওড়ককে এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্টকট বলায় তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "Does it wound the susceptibilities of the other members of the family?" আমি বলিয়াছিলাম, প্রতিদিন প্রাতে যে দৃশ্য দেখিতে হয়, তাহাতে তাহাদিগের ব্যবস্থায় আর বিষয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

প্রভাতে মানান্তে যেণী ও আমি সহরের মধ্য দিয়া আসার বাড়ির কূলে কিছুদূর পুরিরা আসিলাম। তখন

সহরের কাঁথীখানাগুলি কেবল বুলিতেছে। এ সব দেশে গুটিখানাগুলি বিশ্রামাগার, বৈঠকখানা, জন্ম বিজয়ের বাজার—ইত্যাদি। ছোট ছোট টেবল আর চেয়ার—আরও বসিয়া বসিয়া কুস্তি পাজে কন্সট পান করে, গল্প-কব্বা—আর সেই সাজেই শুদার ব্যবস্থা হয়। এইরূপে ঘটার পর খন্টা কাটে, দেখিলে—মনে হয়, লোকগুলির কোন কাথ নাই—আর ইহার অত্যন্ত অলস।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সকলে বাহির হইলাম। প্রথমেই যে বাহার গোছানোর সংবাদ তার করিয়া দিলাম; ওয়ার পর "ভিক্টোরিয়া" অখ্যান ভাড়া করিয়া সোরা দেিতে চলিলাম। পথে বোরকাচাকা স্ট্রোলক, ভারবাহী গর্ভক—কাঠ পাখির সবই বহন করিতেছে, আর বহুলাক। যান-চালক কেবলই বলিতে থাকে—"বালিক—রিজলিক" "গাংবান! পা সাংবান!"

বসোরা ফুলিমান সহ—জরাজীর্ণ। সহরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বাজারের বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট আকৃষ্ট করিল। ইংরাজ, ইরাণের, আরবের—বাজারগুলি দীর্ঘ খিলান করা—সারির পর সারি খিলান—মধ্যে মধ্যে, ছুই পার্শ্বে লোকান। বসারার বাজারে সস্তা মুসোপীয় পদ্যেরই বাহুয়া দেখিলাম।

বাজারে "শ্যালাড" বাস্তবিক আর কোনরূপ তরকারী নাই; বড় বড় চাপাটি বিক্রীত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ইংরাজ সৈনিকরা পাহারা দিতেছে। এই স্থানে ডাকঘর কয়জন বাঙ্গালী কর্মচারী কায করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন সন্ধ্যায় বারাক আমায় সহিত সাক্ষ্য করিতে আসিয়াছিলেন। বসোরা হইতে 'বাসরা টাইমস' নামক একখানি ক্ষুদ্র সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইংরাজ যে স্থানেই যায়—সংবাদপত্র ও খোড়দোড় নহিলে তিষ্ঠিতে পারে না। সিমস লরীমার নামক এক জন মহিলা এই পত্র সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহার কার্যালয়ে তাহার সহিত আমাদিগের পরিচয় হইল। ফিরিবার পথে দেখিলাম, মুড়ু যাহারা বন্ধী হইয়াছে, তাহাদিগকে দিয়া নদীকূলে পথ প্রস্তত করান হইতেছে। নদীকূল মাটিভরা গাটের বস্তা ফেলিয়া ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করা হইতেছে।

মধ্যাহ্নের পূর্বেই ফিরিয়া আসিতে হইল—কারণ প্রথম রথিতাপে বাহিরে থাকা যেমন বিপজ্জনক তেমনই নিষিদ্ধ। আসিবার পরই আমাদিগের উপর এক নূতন আদেশ প্রচার করা হয়—আমাদিগকে পাটের নিম্নে গ্রীবা হইতে মেরুদণ্ডের উপর একটি কাথার মত জিনিষ পরিতে হইবে—ইহাকে spine pad বলে এবং মধ্যাহ্নে ঘরের মধ্যেও টুপী মাথায় দিয়া থাকিতে হইবে। এই ব্যবস্থা সঙ্গিগণের অভিযোগে। আরবরা রৌদ্রের সময় তাহাদিগের মূল্যবান অশক্তিলিকে ঘরের মধ্যে রাখা না—কেবল তাহাদিগের পৃষ্ঠের উপর—মেরুদণ্ড—করিয়া একখানি কবল বিছাইয়া দেয়। আমরা spine pad অর্থাৎ মেরুদণ্ডাবরণ পরিধান করিওঁও শিরাবরণে অনভ্যস্ত বাঙ্গালী আমার পক্ষে শিরিবে হ্যাট মাথায় দিয়া বসিয়া থাকা কিরূপ কষ্টকর তাহা বাঙ্গালী মাঝেই সহজে অহমান করিতে পারিলাম।

অপরূহ রৌদ্রের তেজ কমিলে আমরা আসার বাড়ির মুখে বালান (ছোট বিলাসতরী) ভাড়া করিয়া বসোরা অভিযে যাত্রা করিলাম। জলপরে পশো কোন কোন রাজপথপার্শ্বে আক্ষলতার প্রাচুর্য লক্ষ্য করিলাম। সাহিত্যে বসোয়ার গোলাবের কথা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গোলাবের প্রাচুর্য বাগদাদ বাস্তবিক ইংরাজের আর কোথাও দেখি নাই। ওসিলাম, বসোয়ার যুবতীদিগের স্ফুরী ব্যাতি বাকায় করিয়া তাহাদিগকে গোলাব বলিতে।

প্রথমেই আমাদিগকে সেটুয়া কাগাগার দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় বন্ধীরা কাম করিতেছে। তখন কতকগুলি বন্ধী একপ্রকার তুল দিয়া বাহুর বুনিতছিল, আর কতকগুলি বন্ধী খাম প্রস্তত করিতেছিল। এক জন ঢুকী বন্ধী গালিচা বুনিতছিল। ঢুকীর গালিচা নিম্নবিখ্যাত। বন্ধীট একাকী যেভাবে বর্ষ বিভাজন করিয়া গালিচা বুনিতছিল, তাহাতে তাহার শিল্পমৌল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ওসিলাম, এই কাগাগারে ৫ লক্ষ খাম প্রস্তত করিবার আদেশ হইয়াছে। বন্ধীদিগের আহার চাপাটি, ভাত ও কুমড়ার



তরকারী। কারাগার হইতে বাহির হইয়া ব্যাক হোয়ারে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই স্থানে ইম্পিরিয়াল অটোম্যান ব্যাকের শাখা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন উচ্চ বন্ধ। ইহার নিকটে একটি উচ্চ গুহ। আমরা সোপানপথে তাহাতে আরোহণ করিলাম।

ইহার মধ্যেই বসোয়ার চলচ্চিত্রের চলন হইয়াছে। চলচ্চিত্র গৃহের অধিকারীরা আশিনিয়ান মহিলা! ইহাতে নাকি অর্থগণও অগ্র হয় না।



পেস্তুর বাগান

ব্যাক হোয়ারে ১৫টি কামান রক্ষিত—ইহার মধ্যে ৪টি বৃহদাকার। এগুলি বাগানের তুর্কিদিগের নিকট হইতে অধিকৃত।

নিকটে একটি বিরাট কাফীখানা; একটি রঙ্গালয়—ইহাও দিরাভাগে কাফীখানারূপে ব্যবহৃত হয়।

সমগ্র সহরে বাগানগারের বাহুল্য। গীতবাহুর ব্যবস্থাও আছে। দৈবিলে মনে হয় না, সহরটি গুটিশ সেনাবল কর্তৃক অধিকৃত।

আরও রমণীরা বোরকার আশ্রয় না হইয়া পথে

গতায়ত করে না। যাহারা লম্বল পাজে জল আনিতেছে, তাহারও ক্রমবর্ধ বোরকার আশ্রয়। আশ্মাণী ও ইহুদী রমণীরা শ্বেতবর্ণের দীর্ঘ অবগুণ্ঠন পরিধান করিয়াছে—এদেশে অনবগুণ্ঠিত অবস্থার গতায়ত রীতিবিকল্প। কেবল আশ্মাণী ও ইহুদী নারীদিগের বেশে বর্ণের বাহুল্য ও গুচ্ছনা। আর তাহার যে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে, তাহা এত ক্ষম বস্ত্রের যে, তাহারিগের পৃথ তাহার মধ্যে দিয়া দেখা যায়। তাহারিগের বর্ণ গোলাপী—চক্ষু স্বচ্ছের সজ্জিত। বালিকারা ১০ বৎসর বয়স হইতে বোরকা ব্যবহার আরম্ভ করে।

এই বসোয়ার মিটার ষ্টট নামক এক জন ইংরেজের সহিত আমাদিগের পরিচয় হইল। বলা বাহুল্য, ইনি সামরিক কায়ে বসোয়ারে অবস্থিত করিতেছেন। ইনি ভারতবাসীর সর্বপ্রথম রাজনীতিক উন্নতির বিরোধী এবং তন্মূলে উত্তেজনার বসিয়া ফেলিলেন, “আমি মতিবাল ঘোষের মুক্তা কামনা করি।” “অমৃতবাজার পত্রিকার” জাতীয়তাব প্রচারিত হয় বলিয়াই তাহার সম্পাদকের প্রতি তাহার এই অশিষ্ট ভাব।

সামরিক ব্যবস্থায়ও কালা। ধলয়া ব্যবহারবৈষম্যের অভাব নাই। তুর্ক বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা এমিয়াস্বিত তুর্কীর প্রেক তাহার্য অশ্রু হইলে যুরোপীয়দিগের হাসপাতালে স্থান পায় না—তাহাদিগকে ভারতবাসীদিগের হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়; কেবল যুরোপীয় তুর্কীর অধিবাসীরা যুরোপীয়দিগের হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়। গুচ্ছকারীর ব্যবস্থায়ও বিশেষ বৈষম্য বিজ্ঞান—ভারতীয় রোগীদিগের জন্ম সহরে ও জন ও যুরোপীয় রোগীদিগের জন্ম সহরে ৭০জন গুচ্ছকারী নিযুক্ত আছে।

১৯শে জৈজ (১লা এপ্রিল) আমাদিগকে হাসপাতাল প্রেরিত দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইল। অপরাহ্নে একখানি ছোট্ট স্টামারে ভাইসরয়েস পিয়ার হইতে যাত্রা করিয়া আমরা প্রথম হাসপাতালে উপনীত হইলাম।

নদীকে শত শত নৌকা—“মাহেলা” নামক নৌকার আকৃতি বাঙ্গালার নদীতে বড় বড় মাহাজনী নৌকার নত। তন্ময় “বাগলা”—অজ আকৃতির নৌকা। এই স্থানটিকে মাকিনা বলে। এই স্থানে অনেকগুলি জিপো বা তাণ্ডার রহিয়াছে।

এই দিন প্রাতে আমরা যেটির লরীতে সহরের বাহিরে বরকুমির পথে গিয়াছিলাম। গুনিয়া বিখিত হইলাম, বরকুমি প্রান্তি যাতায়াতের জন্ম যে পথ রচিত হইয়াছে, তাহাতে যেটি মাইলে ও লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শব্দের সব উপকরণ পরন্ত উপসাগর হইতে আনিতে হইয়াছে—ছোট্ট রেল বালু আনা হয় আর সিমেন্টও আছে। কোন কোন স্থানে বরকুমির উপর বাতুপূর্ণ পাটের বস্তা সাজাইয়া তাহার উপর সিমেন্ট জমাইয়া দেওয়া হয়। সামরিক প্রয়োজনে ব্যয়ের বিচার থাকে না। স্টামার হইতে যে ভক্ষ পাওয়া যায়, তাহাও রাজপথ নির্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে।



আরামিগের হুমার নির্মাণ

কিরবার সময় আমরা মাকিনায় সেনানির্বাসের ঘা দিয়া আসিলাম। এই স্থানে রেল স্টেশন আছে—একটি রেলপথ নাশিরিয়ার দিকে, আর একটি কারবার দিকে গিয়াছে। কারবা মাকিনা হইতে জলপথে ৪৬ মাইল—টাইবিস ও ইউফ্রেটিসের সম্মুখস্থানে অবস্থিত—বাইবেলে বর্ণিত নবনকানন এই স্থানে ছিল। মাকিনা হইতে প্রায় ১১ মাইল দূরে একটি বীধ নদীর বক্ষায় দেশের কতকটা রক্ষা করে।

মাকিনায় তিনটি ভারতীয় ও তিনটি ইংলিশ বেশ জিপো স্থাপিত হইয়াছে—ইংরাজ প্রায় সব জমী কিনিয়া লইয়াছেন; অদূরে মাগিলে জাহাজগুলি বাহাতে স্থলে ভিড়িতে পারে সেই জন্ম নদীর খাত গভীর করা ও তটে পোতাশ্রয় নির্মাণ করা চলিতেছে। যুদ্ধের পর মাগিল বড় বন্দর হইবার সম্ভাবনা—শম্ভু ও খব্বের ইহার প্রধান পথ হইবে এবং এখন সামরিক প্রয়োজনে যে সব ঘর নির্মিত হইয়াছে, সে সব গুদামরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এখন এই অঞ্চলে—কার্পাস বস্ত্র, চিনি, কাঠ, ছোলা, মসুর, চা প্রাকৃতি আমদানী এবং খব্বের, পশম, ফুলা উলগ্রাম প্রকৃতি রপ্তানী হয়। শুভ আদায়ের ব্যবস্থা তুর্ক সরকারেরও ছিল। তবে ব্যবস্থা কাগজে কলমে ভাল দেখাইলেও কায়ে ভাল চলে নাই। শাসনে শৃঙ্খলার অভাবই তাহার কারণ। সাধারণতঃ রপ্তানী বেজুরের উপর শতকরা ১ টাকা ও আমদানী মালের উপর শতকরা ১০ টাকা হইতে ১১ টাকা শুভ আদায়ের নিয়ম ছিল।

ক্রমিক পেশার শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ রাজকর ছিল। ভারতে চৌধুরময়ের মত ইরাকে মিঃ পশা রাজকর নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—চেষ্টা সফল হয় নাই। আবার জরিপ জমাবন্দী না হওয়ায় “টাপু” বা রেজেষ্টারী বিভাগের ভাগও নির্দেশ হইত না। বিচার বিধয়ে স্থানীয় বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে কনস্টান্টিনোপলে আপীল চলিত।

মাকিনায় সামরিক বন্দীদিগের এক বিরাট বন্ধাবারে বর্তমানে প্রায় ১২ শত বন্দীর স্থান হইয়াছে। ইহা-ইহাদের মধ্যে কয় জন করাসী প্রজাও আছে—তুর্কী ইহাদিগকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া কশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছিল।

আসারে, মাকিনায়, মাগিলে ও নদীর অপর পারে ভায়াময় বৃহৎ বন্ধাবার। ভায়াময় বাজিখালে কয় জন ইংরাজ সৈনিককে সন্দীহার্য অবস্থায় পাইয়া গ্রামসীরা আবদরা হত্যা করিয়াছিল এবং প্রতিহিংসায় ইংরাজরা



গ্রাম উজাড় করিয়া দিয়াছিল। এখন তাহাদের বিমানের আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে।



অধিবশিক জলপান করান

সব স্কাব্বারে আবজ্ঞনা দৃঢ় করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা আছে। এমন কি তাড়ারের যে সব জব্য অব্যাহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সে সবও তখ করিয়া ফেলা হয়।

এই সব স্থানের ডিপো হইতে অশ্ব, মোটরগাড়ী, উষ্ট্র প্রভৃতি প্রয়োজনানুসারে নানা স্থানে প্রেরণ করা হয়। ইহার মধ্যে ৭ শত মোটরবান বাগদাদে পাঠান হইয়াছে।

আসার হইতে নদীযুগে ঘাইতে নদীকূলে বেটনামায় সৈনিক কর্মচারীদের জন্ত হাসপাতাল করা হইয়াছে। নদীকূলে কমলাকুজ মাধো অবস্থিত এই গৃহটি এক জন ধনী আরব ব্যবসায়ীর ছিল—সম্মানিক টাকা ব্যয়ে ইহা নির্মিত হয়।

পরদিন আমরা স্থল প্রকৃতি দেখিয়া ইরাকের প্রধান কর্মচারীর গৃহে গমন করিলাম। তথায় রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী দিষ্টার গর্ডন ওয়াকার তুর্কীর রাজস্ব বিভাগের বৈশিষ্ট্য ও ক্রটি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, যে যে-স্থানে ইরাকের স্কাব্বার স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই চৌমাটো প্রকৃতি শাসকজীর চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই কর্মচারীর কার্যালয়ে কুমারী বেল নারী এক জন ইরাক-মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি ইরাকে

স্থপরিচিতা; ইরাক পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এই শীর্ষকায়ারী দীর্ঘাকৃতি, ক্রমদৃষ্টি মহিলার পরামর্শেই শায়ন বিভাগের প্রধান কর্মচারী সার পাশি কক্ষ পরিচালিত হইয়া থাকেন। সার পাশির সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে 'মারাজ মেল' পত্রের প্রতিনিধি দিষ্টার ওয়েলবী বলিলেন, ভারত-বাসীরাই যখন ইরাকের জন্ত ইরাক জয় করিয়াছে, তখন তাহাদিগকে ইরাকে উপনিবেশস্থাপনাদিকার প্রদান করা কষ্টব্য। শুনিয়াই মিস বেল বলিলেন, "না। এ দেশ আরবদিগের; তুর্কীর অধিকারমুক্ত করিয়া ইহা আরবদিগকে দেওয়াই সুস্থতা।" আলোচনাকালে তিনি দৃঢ়তা সহকারে তাহার এই মত সমর্থন করিতে লাগিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে দিষ্টার ওয়েলবী যেমত প্রকাশ করিলেন, তাহার ফল যে কিরূপ ভর হইতে পারে, তাহা আমরা কেহই তখন কল্পনা করিতে পারি নাই। পরে যখন আমাদের কাছে সেই ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল, তখন আমরা মিস বেলের ক্রমতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সম্রাট আরবরা বসবাসের কিরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা আমাদের জ্ঞান আমরা অগ্রহ প্রকাশ করায় সন্দের পুলী আসারের সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্মচারীর দ্বারা জোবেয়ারের শেখের সহিত ব্যবস্থা করিলেন—ইরাকের ব্যয়ে শেখ ২২শে চৈত্র (বৃহস্পতি) আমাদের ডোজ দিলেন।

২১শে তারিখে আমরা আবার মাকিনা, মাগিস দেবিয়া নদী পার হইয়া তালুমায় গুকাবার দেবিয়া আসিলাম।

২২শে চৈত্র নিরুদ্ধি সময়ের পূর্বেই প্রাতরাশ শেষ করিয়া আমরা একখানি মোটর বাসে জোবেয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মকতুমির বুকের উপর যে রাস্তা রচনা করা হইয়াছে সেই পথে যান ক্রম অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে পুরাতন বসোয়ার ভগ্নাবশেষ। আরও উপভ্রমের বসোয়ার আর চিন্তন্য নাই। ইহা জলরূপ হইতে এখন বহু দূরে, মরুমাধো অবস্থিত। ভগ্ন গৃহের

উপরবন লইয়া লোক নূতন স্থানে গৃহ নির্মাণ করিয়াছে—যে, বোধ হয়, ৬ বা ৭ শত বৎসর পূর্বের কথা। কেবল একটি বৃহৎ মসজিদ এখনও জীব অবস্থায় পাড়াইয়া আছে। জোবেয়ারের শেখরা প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্বে এই সহর প্রতিষ্ঠাবি ইহার অধিকারী। ইহার অধিবাসীদিগকে প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) বসোরা অঞ্চলে বাহাদিগের সম্পত্তি আছে, (২) বাহার কেইটে বসবাস করে, (৩) রুবক, (৪) শমিক। সহর প্রবেশের একটি দ্বার—তাহার উপর তোরাহ। সহরের উপকণ্ঠে উষ্ট্র চরিতেছে—নকতুমির বাবুদিত্তারে কি'আর্য্য পাইতেছে, বলিতে পারি না।

আমরা মরুমাধা দিয়া ঘাইবার সময় রৌদ্রের তেজ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় মোটর চালক দূরে একটি দৃষ্টের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। মনে হইতছিল, কিছু দূরে বৃহৎ সরাবর—তাহার জলে স্বেচ্ছ পাছের প্রতিবিম্ব। ইহা কিন্তু মৃগভ্রমিকা বা নীরীচী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শেখের বাড়ীটি, বোধ হয়, পরিবর্তনে, পরিবর্তনে ও পরিবর্তনে—একালের হইয়াছে। প্রাঙ্গণের পরই অগ্নিদ্বার পর প্রহর কক্ষ; মুরাপাশ প্রথায় সজ্জিত—স্বাভ হইতে কেঁচ ও চেয়ার সবই বিদেশী বা বিশেষ দরমের। শেখ বৃহৎ কক্ষের দ্বারে পাড়াইয়া ছিলেন। তাহার পরিধানে জাতীয় পরিক্রদ—চিলা কাব—কতকটা আলবোয়ার মত। মস্তকে রমালের উপর উল্লুলামের

রজ্জু জড়িত। তিনি আমাদের কাছে আগত সম্ভাষণ করিয়া বসিতে অস্বরোধ করিলেন। তাহার এক জন কর্মচারী ও আমাদের গের সঙ্গী একজন আদবীভাষক রাজনীতিক কর্মচারী বিভাধীর কাব করিতে লাগিলেন। শেখ একখানি পুরাতন তুর্ক তরবার দেখাইলেন। তাহার ফলা এখন যে, প্রায় মুড়িয়া ফেলা যায়। তাহা ভীমধার। সে কালে এই তুর্ক ফলার বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক অহমকানে জানা গিয়াছে, এই ফলক ভারতবর্ষে প্রবৃত্ত হইত। তুর্কীতে তাহাতে হাতল খোপ করা হইত।

শেখের পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভাল শিকারী—বিস্তারী বন্দুক চালনায় অশিক্ষিত।

বেলা প্রায় ১১টার সময় ভূত্যাণ আসিয়া সুবাদ দিল—আহার্য প্রবৃত্ত। শেখ অকারণ বিনয়ানিশ্রম্য প্রকাশ করিয়া আমাদের কাছে তাহার 'দীন আয়োজনের সম্ভাবহার' করিতে অস্বরোধ করিলেন।

এই অঞ্চলে সম্রাট ব্যক্তিরা যখন লোককে আহাার্য নিমন্ত্রণ করেন, তখন আয়োজন কিরূপ বিপুল হয়, তাহা এই সঙ্গে প্রবৃত্ত চিত্র হইতে বুঝা যাইবে। টেনেলসর উপর চীনাভাষার পায়ে নানা প্রকার গুজম্রা শুপারকে সজ্জিত—অধিকাংশই মাসে—রুখার ও উষ্ট্রের। বোধ হয় ৭০ প্রকার মাংসের ব্যঞ্জন—পলায় প্রকৃতির সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

ইরাজী ধরনের কাঁটা ছিল

না—একখানি করিয়া বহু চামচনাত্ত ভোজনপাত্রের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা প্রথমে কিছু কিছু ভোজ্য নিজ নিজ ভোজ্যপাত্রের ভূমিয়া লইলাম। কিন্তু তাহার পর আর কিছু লওয়া হইল না। কারণ, দেখিলাম, শেখ ও তাহার পুত্র প্রকৃতি যে চামচে আহাার্য ভূমিতেছেন তাহাই ভোজ্য পাত্রে অনিতে ব্যবহার করিতেছেন—স্বাভাচল চামচ-স্পষ্ট আহাার্য বাহাবারের স্তম্ভনায় 'অদা-



শেখের ভোজ

দিগের প্রায় সকলেরই প্রকৃতি বিদোহী। হইয়া



উঠিল। কেবল আমাদিগের সঙ্গী মৌলভী মানুষ আলম সানন্দে আহার করিতে লাগিলেন।

আহারের পর আমরা পুরোঁজ বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলে চা পরিবেশন করা হইল।

শেষকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা আসারে ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই দিনই তুনিলাম, এক দিন পরে আমাদিগকে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে।

পরদিন আমরা রিমাউক্ট ডিপো প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। আসার ভাগের কন্নায় সকলেই উৎফুল্ল হইলাম। কারণ, আমরা কেবল বসোরা দেখিবার ভক্ত সরকারের আশ্বাসে আসি নাই—ইরাক দেখিবার বলিয়া আসিয়াছি।

আর আসারে আমরা ইংরাজ সেনানায়কের প্রাপ্য ব্যবস্থা পাইলেও আমাদিগের অসুবিধার অভ্যুত নাই।

পশুর অত্যাচারের কথা পুরোঁজ বলিয়াছি। দারুণ তাপেরও উল্লেখ করিয়াছি।

আহারের অসুবিধা অনন্যাসধারণ। বুদ্ধক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় তবে রুটা ও বিস্কুট ৪৫ দিন রাখিয়া ধরচ হইবে বলিয়া প'টিকুটা ও বিস্কুট এত কড়া ভাজা যে কিছুক্ষণ স্থপে বা চা'য় না জুবাওয়া খাওয়া যায়

না। শাকশজী নাই, ফলেরও চিকু নাই—আছে কেবল খজুর। টাটকা ছুড় মিলে না তাই কেবল জমান ছুড়, মাংস বাহা বেওয়া হয়, তাহা “Bully Beef” নামে পরিচিত—তুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নানা প্রাণীর মাংস একত্র পিণ্ডাকারে কৌটায় বন্ধ করা—না আছে আশ্বাদ, না আছে কোমলত্ব। ইহা আহারের ফলে মাংস এমন অকচি জমিয়াছিল যে, দেশে ফিরিবার পর কয় মাস মাংস বাইতেই প্ররুজি হইত না।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া চালান শেষ করিয়া অব্যাদি গুছাইয়া লইলাম। বেলা সাড়ে ৭টা বাড়িযামাত্র কাফ জন ইংরাজ সৈনিক কয় জন ভারবাহীকে লইয়া আসিল এবং আমাদিগের অব্যাদি নদীকূলে লইয়া চলিল।

আবগা বাইয়া দেখিলাম, সব জিনিষ তাহাজে উঠিয়াছে। এই নদীপানী জাহাজ সমুদ্রপানী জাহাজের তুলনায় ছোট। বেলা সাড়ে ১০টায় জাহাজ ছাড়িল।

“ভাসল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা, মধুর বহিবে বায়ু তেমে যাব রসে।

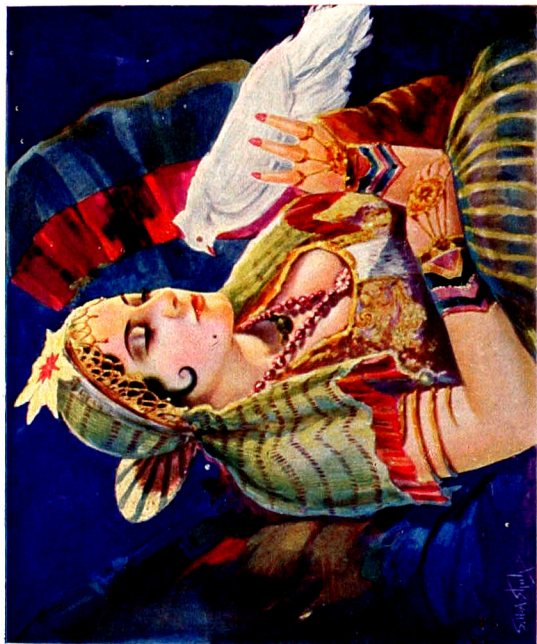
তখন সে জানিত—?

## সনেট

[শ্রীশ্রীশাংকুশেখর সেনগুপ্ত]

মনের নিবৃত্ত কুঁজে উড়ি' আসে স্বপ্ন-বিহীন,  
আমার সমগ্র সত্তা কল্লোলক গড়ে কন্নায়,  
অব্যক্ত বাসনা মোর কাঁদি মরে, বোঁবা বেদনায়,  
দৃষ্টি দিয়া ভোগ করি আলোকিত রূপ খনোবন।  
নিবিলের রূপ-লোকে ডাকে বন্যা হেরি অধুপম—  
সংখ্যাহীন গ্রহ তারা ভাসে মোর শুদ্ধ আঁখি ছায়,  
বিশ্বের সমস্ত প্রাণ কাঁপে যেন তারায় তারায়,  
সমগ্র অগতঃ হেরি অপকল্প জ্যোতিঃ নিরূপম।

পৃথিবী আকাশে আজ লাগিয়াছে রঙের উন্মত্ত,  
আমিও দিয়াছি যোগ, মিশায়েছি ছদি অহুরাগ,  
অবিলের রূপ স্পর্শি' মন মোর হ'য়েছে সজাগ,  
স্বপন সৃষ্টির লোকে হেরি শুধু নবীন গৌরব।  
আকাশে বাতাসে ওড়ে অস্তহীন আলোকের ফাগ,  
মুক আমি, ভাষা নাই—ছদি দিয়া করি অহুতব।



চিত্রালা

রাধা, বিহীন 'গোলাক' ওছরা'য় হিন্দী ছবিরা দেবী

দৃষ্টি—দেবী জৈন

শিষ্ট—বিঃ বা



## বীমা প্রসঙ্গ

### কীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

#### ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তরায়

এত সস্তা আজ খুব কম লোকই আছে যারা বিশ্বাস করে যে, জীবন-বীমা করলেই যমরাজের অফিস থেকে পরায়না নিয়ে দূত এসে হাজির হবে। দশ পনেরো বছর পূর্বে কিন্তু অনেকেই এই বিশ্বাস ছিল। ধারা ধারার উপকারিতা বুঝতেন, তাদেরও স্বদেশী কোম্পানীর ওপর আস্থা ছিল না এতটুকুও। শুধু এই-ই নয়, কেউ স্বদেশী কোম্পানীতে বীমা করলে বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্র-লোকদের কাছে উপহাসের পাত্র হ'ত। এই ছিল আমাদের দেশের আবহাওয়া। এই অবস্থাসের আবহাওয়ার মধ্যে স্বদেশী বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিদেশী কোম্পানী গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে, শুধু বেঁচে থাকারই নয়, ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দশটি প্রতিষ্ঠানেরই একটি। তুলনায় খুব কম সময়ের মধ্যে এতটা উন্নতি কল্যাণে দেশের বহুলোক এখনও স্বদেশী কোম্পানী-গুলিকে অবিশ্বাসের চোখেই দেখে।

দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে এইটি একটি মারাত্মক অন্তরায়। যে দেশে ওরিয়েন্টাল, ন্যাশনাল, এম্পায়ারের নত স্থপরিচালিত বীমা-কোম্পানী আছে, সে দেশে সাল্লাইফ বা প্রজেন্সিভালের মত বিদেশী কোম্পানীগুলি কিংবা ওঠে কি করে? যে দেশের লোকের মনোভিষ্টি এই, সে দেশে এতগুলি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান যে এত বড় হয়েছে, তাতে ব্যবসায় পরিচালনায় যে ভারতবাসীর যোগ্যতা অন্য যে কোন দেশবাসীর চেয়ে কমতো নাই, বরং ঢের বেশী এইটাই প্রমাণিত হয়েছে। নিজের দেশের প্রতি ধৃশা, দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাস অনাশ্র, বিদেশীর ওপর অত্যন্ত বৈরাগ্য আমাদের দেশছাড়া, আর কোনো দেশের নেই। একদিকে দেশবাসীর এই মনোভাব, অপর-দিকে বিদেশী কোম্পানীর একাধিক সুবিধা ও সুযোগ—

এর মাধ্যমে নিতান্ত অল্প মূলধন নিয়ে স্বদেশী কোম্পানী গুলিকে যে কী বেগ পেতে হয়েছে, তা ব'লে বোঝানো শক্ত।

এই কারণেই প্রচার কার্যের প্রয়োজনীয়তা যে সব-চেয়ে বেশী, তা পূর্বেই বলেছি। পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাদের মনে এমনি শিকড় চালিয়ে ব'সে গেছে যে, ভাল-মন্দ, হিতাহিত বিবেচনা আমাদের প্রায় নেই বললেও চলে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে স্বদেশী প্রচার করেছে যতটা সফলতা লাভ করা উচিত ছিল, তার সিকির সিকিও লাভ করতে পারেন নি। অর্দ্ধশতাব্দীর অবিরাম প্রচারণেও ভারতের বহুকেটি নর-নারী স্বদেশী বটে উজ্জ্বল হয়নি। বিদেশী ভব্যের আমদানী, এক কাপড় ছাড়া অন্য কিছুই বিশেষ হাস্য হয়নি। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, বীমা ব্যবসায় বিদেশী কোম্পানীর প্রতিপত্তি ভারতবর্ষে পূর্বের চেয়ে অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। প্রমাণ এই যে, ১৯৩৩ সালে ভারতে মোটামুটি ২৬ কোটি টাকার বীমা হয়েছিল, তার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানী ১৭ কোটি টাকার বীমা করেছিল।

এই প্রমাণের দ্বারা একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করা যায়না যে, বিদেশী কোম্পানীর প্রতিপত্তি ক্রমাগত কমে আসছে। প্রথম কারণ হ'ল এই যে, পূর্বে, যে কোন বছরে, বীমার পরিমাণ এর চেয়ে কম ছিল, কাজেই বীমা-কারীর সংখ্যাও নিশ্চয়ই ঢের কম ছিল। পূর্বে যে শ্রেণীর লোক বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করত, সেই শ্রেণীর লোক শতকরা কতজন স্বদেশী কোম্পানীতে আহ্বানন হয়েছিল? মোটামুটি ধরা যায় যে, মোট বীমার পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ বিদেশী কোম্পানী এবং দুই-তৃতীয়াংশ স্বদেশী কোম্পানী পেয়েছে। হিসাবে দেখা যায় বিদেশীর চেয়ে স্বদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ভবল'র বেশী। এ



অবস্থায় স্বীকার করতেনই হবে যে, স্বদেশী কোম্পানীর বীমার পরিমাণ বিদেশীর তুলনায় বেশী হয় নি, আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল।

যদি কেউ বলেন যে, স্বদেশীর চেয়ে বিদেশী কোম্পানীতে লাভ বেশী, অর্থাৎ বেশী বোনাস্ পাওয়া যায়; তা হ'লেও আমরা বলতে বাধ্য যে, তিনি ভুল বুঝেছেন। খুব নামজাদা বিদেশী কোম্পানীও কি একবার বোনাস্ দেওয়া একেবারেই সম্ভব করে নি? খুব বিখ্যাত কোন বিদেশী কোম্পানী যা বোনাস্ ঘোষণা করেছিল, দেবার সময় তার অর্ধেকেরও কম বিচ্ছে কিনা? বহু পুরাতন ও প্রসিদ্ধ কোম্পানীর পরিস্কারের জটিল জ্ঞান কান্ডার গভর্মেন্ট “অফিসিয়াল সনিটি” নিযুক্ত করেছিলেন কিনা? এত দোষ সবেও ভারতে এই সব কোম্পানীর ব্যবসায় বেশ ভালই চলছে।

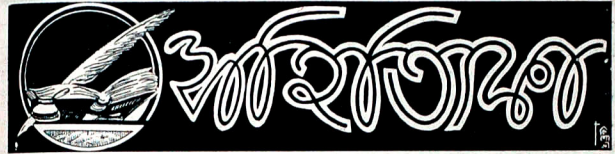
বিদেশী কোম্পানীর প্রতিপত্তি যদি কিছুমাত্র কমেও থাকে, তা হ'লেও লোপ পাবে বল মনে হয় না। যে দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জ্ঞান লোক যে কোন হীনকার্য্য করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনা, সে দেশে স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বড় হোক বা না হোক, বিদেশী প্রতিষ্ঠান বড় হবেই। এই স্বার্থসিদ্ধি কি, একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

বীমাকারী প্রথম বছরে কোম্পানীতে যা টাকা দেন, একটি প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় কোম্পানী তার শতকরা ২০ টাকা বা ২৫ টাকা বীমা কক্ষকে কমিশন দেন; আর একটি বিদেশী কোম্পানী কমিশন দেন শতকরা ৪০ থেকে ৫০ টাকা। একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কোম্পানীর জন্ম পেতে যদি একজন কক্ষী মাসে ২০০ টাকা আয় করতে পারেন, বিদেশী কোম্পানীর জন্ম সেই পরিমাণ বা তার চেয়ে ধানিকটক বেশী খেতে তিনি আয় করতে পারেন মাসে ২০০ টাকা। অনেকের এই প্রচলিত ভ্রম কথাকে পারেন না; সুতরাং তারা বাটে বাটে বাটে বিদেশী কোম্পানীর গৌরব তার-স্বরে ঘোষণা করে বেড়ান। বেশীর ভাগ লোক তাই ভ্রমে ভ্রমে বিশ্বাস করে এবং কেউ কেউ বীমা করে। ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে এটা কি সম্ভব বিপদ?

প্রথম শ্রেণীর স্বদেশী কোম্পানীর কর্মীদের অন্তরায় পড়ে পড়ে। আজ কাল এক নতুন অন্তরায় এর ওপর আবার বোঝা দিয়েছে। বিদেশী কোম্পানীর কর্মীরা নিজেদের কমিশন থেকে কিছু, ধরুন অর্ধেক টাকা, বীমাকারীকে দিয়ে দিলেন। বীমাকারী দেখলেন যে, বীমা করতে না করতেই পকেটে কিছু এলো। বেশ তো বাবু! অনেক সময়ের কর্মী বীমাকারীকে হঠাৎ এক কিস্তী চান্দা বীমা করার সময়ের পাট থেকে দিয়ে দিলেন। বীমাকারী দেখলেন যে, বীমাকর্মী পরোপকার প্রত্নতির এতই বশীভূত যে, নিজের গায়েই টাকা দিয়েও অপরের ভবিষ্যতের সংস্থান না করে দিয়ে পারেন না। বীমাকর্মী খুব উদারতা দেখালেন নাট, কিন্তু ভুল হয়ে হাত পড়ল না। ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে এটা কি কম বিপদ?

এ বছরই একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কোম্পানী ইটালী দেশে একটি শাখা খুলতে গিয়েছিলেন। ইটালীর গভর্মেন্টে তাকে বলেছেন—ইটালীর লোকদের কল্যাণ চিন্তা করবার জ্ঞান অনেক ইটালীয়ান কোম্পানী আছে; ইটালীর জ্ঞান আপনারদের মাথা ঘামাতে হবে না।

মাছের মত কথাইতো বটে। বিদেশী কোম্পানীকে আমরাও রকম কথা শোনাব, এ শক্তি আমাদের নেই। আমাদের দেশের বীমা-ব্যবসায়কে বড় করতে হ'লে, দেশময় স্বাভাব্য-বোধের উন্মেষ দরকার। এ ছাড়া এত অন্তরায়ের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত শক্ত।



( সমালোচনার জন্ম দুইখানি করিয়া পুস্তক প্রেরিতব্য )

দশের দানী

(নাটক) শ্রীশচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীশচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, চৌধুরী, রামেশ্বর এণ্ড কোং, চন্দ্রনগর দাম এক টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্বে ঠার রঙ্গমঞ্চে গিরিশ-স্মৃতি-সভায় বাঙ্গলার জনৈক নামকরা নাট্য-সমালোচক গিরিশচন্দ্র ও শ্রেণীগায়ের তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন গিরিশ-প্রতিভার নিকট শ্রেণীগায়ের-প্রতিভাও মান হইয়া যায়, যেহেতু শ্রেণীগায়ের “বিষমঙ্গল”-এর মত কোনো তর্জি-মূলক নাটক লিখিতে পারেন নাই। সেই সভায় বাঙ্গলার বহু গণ্যমান্ত সাহিত্যিকও ছিলেন, কিন্তু কেহই এই বাঙ্গলোচিত উক্তি প্রতীকার করেন নাই বরং যতদূর মনে পড়ে ঘন ঘন করতালির দ্বারা এই হাতকর বক্তব্যটি সার্থিত হইয়াছিল। ইহার পর কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও বাঙ্গলার নাট্য-সমালোচনার কোনো যায়ী ও নিরপেক্ষ আদর্শ স্থাপিত হয় নাই। কোনো একটি সমালোচনার সময় আমরা না মানি সংস্কৃতের প্রাচীন আদর্শ, না অনুরাগ করি পাশ্চাত্যরীতি। নিজের ভাবপ্রবণতা ও থিয়েটার রাজ্যে কোন্ নাটকের কিঞ্চিৎ প্রতিভা, সেই দিকে চাহিয়া আমরা নাটকের মূল্য যাচাই করি। তাই এ দেশে “বিসমঙ্গল”ও নাটক, “কর্ণাঙ্কন”ও নাটক, “আত্মদর্শন”ও নাটক।

নাটক দৃশ্য-কাব্য। না দেখিলে ইহার পূর্ণ উপলব্ধি হয়না সত্য কিন্তু তথাপি ইহার একটা কাব্যের বা সাহিত্যের দিকও আছে। নাটকের ঘটনা সংস্থান, চরিত্র

চিত্রণ ও ব্যক্তিবাদের মধ্য দিয়া যে নাট্যকার যথোচিত সাহিত্যরস পরিবেশন করিতে পারেন, তিনিই শক্তিশালী নাট্যকার। আলোচ্য পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সেই শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন। অধিনায় দর্শন না করিয়া কেবলমাত্র এই নাটকখানি পাঠ করিলেও অনেক আনন্দ পাওয়া যায়।

নাটকটি পাশ্চাত্য আদর্শে বাহ্যিক বলে—Problem play অর্থাৎ সমস্যা মূলক। কিন্তু সমস্যা কোথাও প্রাধান্য লাভ করিয়া চরিত্রকে ঝর্ষ করিয়া পাঠকের পক্ষে কণ্টকিত করে নাই। হরিজন-সমস্যা লইয়া নাটকটি রচিত। কিন্তু তাই বলিয়া হরিজন-সমস্যা শেষ হইলে এই নাটকের মূল্য কমিয়া যাইবে না। দেশকে না বুঝিয়া ও না চিনিয়া, ব্রত-হিসাবে না লইয়া, খোয়ালখুসীমত দেশকে সেবা করিতে গেলে যে ট্যাগেজির সৃষ্টি হয়—এই নাটকে তাহাই দেখানো হইয়াছে। সেইজন্য এই নাটকের মধ্যে একটি চিরন্তন সুর আছে যাহা একমাত্র বর্ধমানেরই লীলাবন্ধন।

পুর্কেই বলিয়াছি, নাটকটি সমস্যা মূলক অর্থাৎ Intellectual type-এর। সেইজন্য ইহার কথোপকথন-গুলি বুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল, বুদ্ধির শৃঙ্খলায় স্তম্ভ। বাঙ্গলায় এই ধরণের নাটক একান্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। একস্থানের উপাধর্য্য নিয়ে উজ্জ্বত হইল। সহরের শিক্ষিত মেয়েরা গ্রামে আসিতেছেন, হরিজন সেবার উদ্দেশ্যে। ঠাহাদের আগমন উপলক্ষ্য করিয়া



পূর্ণগামী কল্পনের মধ্যে নিম্নলিখিত রূপ আলাপ  
হইতেছে :—

নিশানাথ

“দ্যায় অমরেশ, প্রত্যেক নবনারীর মাঝেই  
একটা করে নর আর একটা করে নারী বাস করে। এখন,  
সমাজে যেমন, তেমনি মনোরাষ্ট্রও প্রতি পুরুষ তার  
ভিতরের এই নারী-সম্মুখকে সর্বদা শাসন করে, দাবিয়ে  
রাখে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে পুরুষের মনোরাষ্ট্রের  
এই অস্বীকারী আপন প্রভাবে পুরুষকে প্রভাবান্বিত করে  
ফেলে। আর তখনই পুরুষ হয় মেয়ে ভাবাপন্ন, তখনই  
কর গলায় ছলিয়ে বেবে মালা, কাকে নেবে বরণ করে,  
তারই সন্ধান বিকে বিকে সে চেয়ে দেখে; তখনই তার  
অন্তর থেকে এই আকৃতি বেরিয়ে আসে—“জীবনে মরণে  
জনমে জনমে প্রাণনাথ হওয়া ছুনি।”

অমরেশ

যদিও সে জানে, যাকে সে চায়, সে নাথ  
নয়—অনাথা!

নিশানাথ

টিক তাই। ওতে লজ্জাও নেই অমরেশ,  
কোডেরও কারণ নেই—কেমনা পুরুষের অন্তরের ওই  
জাগ্রত নারী-সম্মুখ আবার ফিরিয়ে পড়েন। তখন পুরুষ  
নিজের হাতে রচা মালা নিজেই ছিঁড়ে ফেলে, বরণভালা  
ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

অমরেশ

আজ্ঞা নিশানা, প্রতি নারীর মাঝে যে পুরুষ  
থাকে সে কি করে?

নিশানাথ

সে-ও একপ্রকার তার পৌরুষ, তার প্রভুত্ব  
প্রতিষ্ঠিত করে। তখনই নারী নর হতে চায়; তখনই  
সে বরণ করে, সিংগারেট টানে, পান্থার শেষে, হকি খেলে,  
আপিসে খোঁজে স্বাস্থ্য, সভ্যর পোঁজে শ্রোতা, আর হাঁড়ি-  
বেড়ি ফেলে রেখে দেশের ও দেশের সেবার আশ্রিত্য  
করে।”

অমরেশ

তাহলে ধারা আসছেন?

নিশানাথ

স্বীকার করতেই হবে, তারা তাদের ভিতরের  
পুরুষ-সম্মুখের প্রভাবে প্রভাবান্বিত!

অমরেশ

হায়! নিশানা এ আপন কী শোনালেন!  
(অমরেশ লাফাইয়া উঠিল। মধু ফুল লইয়া প্রবেশ করিল)  
কেলে দাও ওই ফুল, মধু। ছিঁড়ে ফেলুন ওই মালা  
নিশানা। সব নিরর্থক, সব মিথ্যা; মিথ্যা, মিথ্যা সব  
আয়োজন।”

এইরূপ উচ্ছল ও মূল্যবান বার্তালাপের ইচ্ছা  
পুস্তকের অধিকাংশ স্থানেই ছড়াইয়া আছে।

অনিমিত্ত ঘটনাসংস্থান, চরিত্রের গভীরতা ও বাহ্যিক  
বিশ্লেষণ, শানিত, বার্তালাপ—সকল দিক দিয়াই “দশের  
দাবী” বাঙ্গালার একটা প্রথম শ্রেণীর নাটক হইয়াছে।  
আধুনিক হইলেও নাটকটীতে স্থানকাল সম্বন্ধে  
রাসিকরীতি অঙ্কুরিত হইয়াছে, নাট্যকারের পক্ষে  
ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

শ্রীযুগোপায়

সেকু—(কবিতার বই) শ্রীমদগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত।  
বরেন্দ্র পাণ্ডিত্য, কালিঘাট। দাম আট আনা।

শ্রীমদগোপাল সেনগুপ্তের ‘সেকু’ নামক কবিতার  
বইখানি পড়লাম। অনেকগুলি কবিতাই আমার যু  
ভাল লেগেছে। কবিতাগুলির মধ্যে Romantic  
strangeness-এর অভাব নেই, অথচ কবিতাগুলির  
setting কৃত Realistic।

Romanticism জিনিষটি কি তাই বোঝাতে গির  
সাহিত্য-রাসিক বেরেন্দ্র সাহেব বলেছেন, সৌন্দর্যের সাহ  
যোগানে রহস্তময়তা যুক্ত হয় (where strangeness is  
added to beauty) সেই বানানই আমরা Romantic  
কিছুই সন্ধান পাই। Romantic কবিতা বলেন, সৌন্দর্যের  
মাঝেই একটি চিররহস্ত থেকে গেছে। স্বন্দরকে আবরা  
কোনদিন জানতে পারিনা, এবং যেদিন জানতে পারি

সেদিন আর তা আমাদের কাছে স্বন্দর থাকে না।  
সৌন্দর্যের মাঝেই একটি অপরিমাপ্যতার বেদনা থেকে  
যায়। অর্থাৎ এক কথায় এরা বলতে চান যে, যা  
আমাদের পরিচিত, স্বতরাং স্থল, তা কখনও স্বন্দর হতে  
পারেনা, এবং তা স্বন্দর নয় বলেই তার মধ্যে strange-  
nessও বুঁজে পাওয়া যায় না। এরা বলতে চান—সৌন্দর্য  
হচ্ছে সেই জিনিষ, যা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের  
স্থল প্রয়োজনের উচ্চে। অর্থাৎ মানব জীবনের স্থল হুং-  
দৈত, অভাব-অভিযোগ, ঘাত-প্রতিঘাত, আমাদের মনকে  
কর্কট করে তোলে, কঠোর করে তোলে, স্থল করে তোলে  
স্বতরাং তাদের স্থল হস্তাবলপে ঝটিয়ে চলবে। নইলে  
Romantic স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমাচ হয়ে যাবে। তাই  
Romantic কবিতার Nature-এর এত ছড়াছড়ি। তাই  
strangeness-এর আর একটি নাম wildness

পূর্ণের বলেছি এখনও বলি, নন্দগোপাল বাবুর  
কবিতাগুলির মধ্যে Romantic strangeness-এর অভাব  
নেই। কিন্তু কবি কোথাও মানবজীবনের বাইরে গিয়ে  
মসারের ঘাত প্রতিঘাত, অভাব অভিযোগ, হুং-দৈতকে  
স্বপ্ন দিয়ে আড়াল করে Romantic strangeness উপভোগ  
করতে চান নি। জীবনের অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাত ও স্থল  
প্রয়োজনও টিক কোন তরুণতা দিয়েই আমরা তাড়াতে

পারি না। এরা রয়েছে এবং চিরদিন থাকবে। এরা  
স্বন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়—এরা সত্য, এরা real.

এদের এড়িয়ে, এদের জোর করে ভুলে বা তরুণতার  
সাহায্যে অস্বীকার করে Romantic হওয়া যায়, কিন্তু  
এদের স্বীকার করে, এদের স্থলদের তার সহ্য করেও  
মাঝে মাঝে আমরা যে একটা Romantic strangeness-  
এর স্বপ্ন দেখি, তা শুধু স্বন্দর নয়—তা Real. তার মধ্যে  
সৌন্দর্যের পেলবতা নেই—বাস্তবতার দৃঢ়তাও আছে।  
অর্থাৎ এক কথায় নন্দগোপাল বাবু হচ্ছেন সেই শ্রেণীর  
কবি যাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর Romanticism ও  
বিংশ শতাব্দীর Realism একাকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ  
ইনি হচ্ছেন সেই শ্রেণীর Romantic কবি যাদের কবিতার  
strangeness সৌন্দর্যের স্বচ্ছতার সঙ্গে যুক্ত হয়নি—যুক্ত  
হয়েছে মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে। সেইজন্মে তাঁর  
কবিতার মধ্যে আপনা হতেই ধানিকটা  
intellectualism এসে পড়েছে।

আপনা হতে এসে পড়েছে বলেই এই  
intellectualism উপভোগ্য হয়ে উঠেছে,—  
পাণ্ডিত্য প্রকাশের ওজ্ঞাতে উগ্র হয়ে ওঠেনি।

শ্রীবিষ্ণুপতি চৌধুরী





# আলোচনা

বিরূপাক্ষ শর্মা

নবশক্তির আলোচনা, না গোরেচনা?

নবশক্তি অর্থে যুবশক্তি এবং যুবশক্তির অত্যন্ত লক্ষণ একটা বেগরোয়া ভাব—বাধা বিয় তুচ্ছ করিয়া সমুদ্রের পথে চলা। তাই “নবশক্তি”র পৃষ্ঠায় (২৭শ সংখ্যা) শ্রীকৃষ্ণ প্রমুদকুমার ভট্টাচার্য বি. এ., “অর্থমর্নধন” জ্ঞানিয়া “বাহুল্যার ধর্মী” শীর্ষক যে আলোচনা চালাইয়াছেন, তাহা বাধনহারা যুবশক্তিরই পরিচায়ক। একটা উদাহরণ—“বিজ্ঞানসের ভিটি ভাঙ্গিয়া, হাঁটবার সোজা সরল পথ রচনা করিয়া, জ্ঞানের কলিতা ফুটিবার আগেই ছিড়িয়া নিয়া, ছাত্রকে অনন্য-শ্রমের কাণ্ডারী করিয়া, যেখানে বাধ্যতাব্য সেখানে বিশ্রামাগার বাড়াইয়া, ধর্মীর অর্ধের সম্যক স্পর্শকিত হইতেছে বলিয়াই তে দৃষ্টদের বাপ বিগলিত স্তম্ভিত ক্ষমিতে আজ দিগন্ত ভরিয়া উঠিতেছে।”

একজন বি-এ যখন দিশশায়া হইয়া এইরূপ প্রলাপ-চীৎকার ছাড়িতেছেন, তখন একটা হৃৎস্পন্দকারী অঘটন কিছু নিশ্চই ঘটুয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?। সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে গিয়া যেমন একটা বড় টেউ সামলাইতে না সামলাইতে নার একটা বড় টেউ আসিয়া পড়ে, প্রমুদ বাবুর আলোচনা পড়িতে গিয়া যেমন অনর্থের দ্বারবান অধির। কারণ পূর্বেকি দাঙ্গা সামলাইবার পক্ষেই চোখে পড়িল।—“খোলাপনার ভিত্তি যতই অমূলক হোক, যতই সে বলুক যে আমার দাদার চাইতে আমার পক্ষে সেতে হ্যাঁটে দেখা বুদ্ধীর caseটা বেশী considerable, ততই এ

৭০

কথার যুক্তি আমাদের কাছে খোলাসা হইয়া যায়।”

প্রমুদবাবু গ্রন্থিহীন বাহুয়, তাঁহার কাছে ভালদরক ভিদ্দা-বন্দ্য সকল কিছুই খোলাসা হইয়া গিয়াছে—কিছু পাঠকগণ কিছু বুঝিলেন কি?

“নবশক্তি”র এক পৃষ্ঠার এই আলোচনায় অনেকগুলি ইংরাজীর বুদ্ধী আছে। এক স্থানে লেখিতেছি:—“তাঁহাদের এই মতের গোঁড়ামী (Principle) অল্প থাকিবে।”

পাঠকদের উপর লেখক মহোদয়ের কি অহেতুকী দয়া! পাছে “মতের গোঁড়ামী”—এই শব্দ কথারটির অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তাই তাহার সঠিক ও প্রাক্কল অর্থ Principle কথাটা বসাইয়া দিয়াছেন। হাজার হোক বি-এ হতে!

লিখতে হইবে কাব্য-গাথা!

উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীশশীধরকুমার পাত্র লিখিত “পথ চলার গান” শীর্ষক একটা কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে।

কবিতার আরম্ভ এইরূপ:—

আমাদের চলতে হ'বে অসুখ পানে,  
আমাদের দলতে হ'বে অসুখ বাধা,  
আমাদের টুটেছে হ'বে পিছন টানে  
আমাদের টুটেছে হ'বে মুহূ-সাধা।”

জটনৈক কবিতাক্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আমাদের ছুঁতে হ'বে মুহূ-সাধা”—এই পদটির অর্থ কি? রক্তধর তাহার উত্তরে আমাকে নিম্নলিখিত কবিতাটা শুনাইয়া দিলেন:—

আমাদের

আখ্যে-১০৪২]

শ্রীবিদ্যাপাণ্ড শর্মা

আলোচনা

“বলুতে হ'বে প্রাণের টানে

ভরতে হ'বে বাতাস পাখা,

হোক বা না হোক তাহার মানে

লিখতে হ'বে কাব্য-গাথা।”

সচিহ্ন সমুদয়-সামান

এই কটন জগতে সর্বাঙ্গপেক্ষা কটন কাজ বোর হয় ভারতের রক্ষা করিয়া চলা। ধর্ম ও কর্ম, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে জানিলে পেট ও ভর, জাতটাও কোন রকমে বাঁচিয়া যায়। এই কোশলের প্রকল্প উপাধরণ—“সচিহ্ন মাসিক বসুমতী”

মিস্ট্রী সীমা ও শ্রীশ্রীশশীধর—এই উভয়েক অবলম্বন করিয়া মাসের পর মাস তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল, পেটভরাইবার ও জাত বাঁচাইবার চেষ্টায় যে অপূর্ণ সম্বয় সাধন করিতেছেন, তাহা দেখিলে বিম্বিত হইতে হয়। তদপেক্ষা বিম্বিত হইতে হয় পাঠকদের দৈর্ঘ্য দেখিয়া। সেই একই চর্চা, একই কথা—মাত্র একটু রয় ও ভগ্নীর তফাৎ—তাঁহারা বিনা প্রতিবাদে এবং সম্বয়ঃক্ষুণ্ণ বিষয়ে মাসের পর মাস গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বীমেন্দ্রকুমার রায়ের স্বদেশী ও বিদেশী, সম্বয় ও অসম্বয় আলোচনা, মঙ্গল্য ও অপ্রাণের পাখা, ভাষিতে যাহেনা ক্রান্তে এন-এ শ্রীকৃষ্ণ বসুমতীর চটোপাধ্যায়। এই অপূর্ণ শিথিলিতে সম্বয় দিতে সাহিত্যের সৈরিন্দী হো আছেই! যতদিন বাঙ্গালার চাকরীর বাজারে কোথাও শিলাদহের বাজারে ইলিশ মাছ আছে, ততদিন “সচিহ্ন মাসিক বসুমতী” এই সমুদয়-সামান যথেষ্ট চলিবে। এই পত্রিকাখানির কথা ভাবিলে মনে

হয়—যেমন গজাঙ্কলে গজাপুঞ্জ তেমনই তাঁহাদের গজাঙ্কলেই ঐশ্বর্যগিক অভিনন্দন জানাই—“সাহিত্য জগতে যুগপ্রলাপ। বিক্রয় নয় বিতরণ—ওজনমাত্র যায়।”

“সীরাটি” মৌলিকতা

অপ্রতিহত লেখক শ্রীকৃষ্ণ অবনীনাথ রায় কৈশোরের “বিচিত্রায়” “বেলকুল”র বেসাদি করিয়াছেন। “কিছু

“বেলকুল” কি বলুন তো?। রক্ত নহে, বাহুয়—একটা আশু ছেলে—মাদ্রাজী পিতা ও বাঙ্গালী মাতার সন্তান। পিতা ছেলেকে ডাকেন—“বেলা” (এ একেবারে মীরাটী মৌলিকতা)। এই ‘রামগঞ্জ’র নামও ‘বেলকুল’। ‘রামগঞ্জ’ বলিতেছি এই জন্ম ঘে, মাড়ে চার পাতার এই স্বভাবতন গল্পের মধ্যে কোথাও ছোট গল্পের নিয়মকানুন অঙ্গসরগের বালাই নাই।

গল্পের চুম্বিকা, একটা মেডিক্যাল কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রীর সহিত উক্ত কলেজের একটা মাদ্রাজী ছাত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়া লেখক লিখিতেছেন:—

“ইহার কয়েক বৎসর পূর্বের কথা”—অতঃপর কয়েক লাইনের মধ্যে লেখক নায়ক-নারিকার বিবাহ, সহানুভাবপান ও নামকরণ (বেলকুল) সারিয়া লিখিতেছেন—“ইহার পর পাঠককে আমার সহিত পনেরো ঘোলা বছর প্রসার অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। কেন না, এই বস্তুকালের ইতিহাস গল্পের পক্ষে অপরিহার্য নয়।” কি অশু ও ক্ষুণ্ণ ও অসোহ আদেশ! পাঠক-পাঠিকা ছে দুবুর কথা, শ্রুতিজ্ঞ বসুমতী সম্প্রদায়েরও এই আদেশ লম্বন করিবার মত শক্তি ও সাহস হয় নাই। গল্পের উপসংহার বা অপসংহার করিবার পূর্বে লেখক আবার বলিতেছেন—“তাঁহার পনের ইতিহাস বিবৃত করাও যেমন দুঃসাধ্য, শোনাও তেমনি কঠিন। কিছু শব্দ শেষ করিবার জ্ঞ তাহা হইয়া প্রয়োজন।” আলবৎ! গল্প যখন আরম্ভ করিয়াছেন তখন যে কোন রকমে তাহাকে শেষ করিতেই হইবে। এই মাড়ে চার পাতা গল্পের জন্ম লেখক কি ভয়ঙ্কর দুঃসাধ্য সাধন করিয়া পাঠকদের কি কটন পরীক্ষার মধ্যেই না ফেলিয়াছেন। আমরা এজন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িরাছি। ভবিষ্যতে কথা সাহিত্য-সৃষ্টির দুঃসাধ্য প্রয়াসে লেখক মহাশয় নিজের এবং পূর্বের ত্রুটি এতটা নিরূপায়-ভাবে নির্মম না হইলেই আমরা বাঁচি।

দিন আগত এ

সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেস ছন্দকার ব্যবসায়ী বাবু

৭১



রমণীকান্ত মৌদীর একটা স্বপ্নস্বভাষা ও তৎপরবর্তী বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রমণীবাণী একদিন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন এবং তৎপরদিবস প্রাতে তাঁহার বাগানের চম্পকবৃক্ষের তলদেশে বসন করিয়া একটা প্রস্তর-বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। বিগ্রহটির বর্ণনা যথা—“উঁহা রেখিতে ঠিক জীবন্ত মাহুষের মত। উঁহার দুইটা ঝাঁক ৩০ নমনীয় (?) খাড়া রহিয়াছে। অধিকতর নিকটে অনিয়া দৃষ্টি করিলে দেখা গেল যে, উঁহার বং গাঢ় লালবর্ণ এবং উঁহা ক্রমশঃ নীলাভা পধিত হইয়া পুনরায় সাধারণ পরিবর্তিত হইয়া গেল।

“অতঃপর আমি স্থানীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদিগের পরামর্শ গ্রহণ করি। তাঁহারা বলিলেন যে, সত্যযুগের প্রভু নারায়ণের আবির্ভাব হইয়াছে।”

সত্যযুগে ধনদাত্তের প্রার্থ্যা ছিল—এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। অতএব আশা করা যায়, সত্যযুগের নারায়ণের এই অবিকারীয় গৃহ অচিরে ধন-দাত্তে পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কলির ভ্রংশগণ সত্যযুগের নারায়ণকে চিনিলেন কিরূপে? কৃত বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা অতীতের স্বপ্নে বিভোর, সেই সমস্ত স্বপ্ন-বিলাসী অতীত-মরণপ্রাপ্ত দেশে দুইটিবার ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজ্য! ইহারাই জাতির ক্ষেত্রবৃত্তকে দুর্বল করিয়া দিতেছে। সংবাদের কি আজকাল এতই দুর্বল হইয়াছে, না—‘এ-পির’ এই সংবাদদাতা বাগবাজার হইতে গিয়া দুমকায় বাস-করিয়াছেন?

### অ-শিবেশের বিষয়

পাক্ষিক সাহিত্যের ইশান কোণে মেঘ জমিয়াছে—এক এই চর্যাপদ ঘোষণা করিবার জন্ত সম্ভবতঃ জনকয়েক তরুণ “বিষাণ” বাজাইতে সুরু করিয়াছেন কিন্তু শিবের শক্তি না থাকাতো তাঁহাদের “বিষাণের কুংকরে” অবশেষ ধ্বনিত হইতেছে।

দ্বিতীয় সংখ্যা “বিষাণে” এক ব্যক্তিগত “চিঠি” বিবৃত্য বা ছড়ায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চিঠির গ্রাহক

বা লেখক—কাহারও নাম নাই, তবে চিঠিতে রীতিমত অভঙ্গ শাসনি আছে। কয়েক লাইনের মনুনা :—  
“নিম্নে চলে তোমার সাথে যেথায় মোদের প্রিয়ার ঘর, অঙ্কুর গকে যেথায় দখিন বাতাস স্নহস্থর।  
মেখেয় ঝাঁক আল্পনাগো পললেখা বুকের তল, কুস কেকার স্বরের সুলন, সেই দোলাতে দেয় সে দোল।  
বাংতায়নের স্তব্ধলি আছে আমার কণ্ঠস্থ অনিয়ে আমি প্রিয়ার প্রেসে করবো স্নহের উটহ।  
তোমার মত বুজ্জায়ার হাতে পড়ার চুখ ঝাঁর ঘুরিয়ে দেবো নিঃশেষেতে, ঠোল খাবে গাল পুনর্বার।”  
এই নামহীন সাম্যাবাদী বীরপুরুষটা কে? পত্রিকার মারফত এইরূপ কামরাশা সন্দেহ বিতরণ করাই সাম্যাবাদীদের আদর্শ নাকি?

### অমৃত না বিষ?

এই সংখ্যাত্তই “অপরানী” নামে একটা “ঘোড়া-মার্কী” গল্প আছে। ‘ঘোড়া মার্কী’ বলিতেছি কাব্য এই গল্পের কেন্দ্র স্থলে আছে ঘোড়ার চাবুক। গল্পের নায়িকা কিছুতেই স্বামী প্রেমের নিজের বেহমবকে তাড়াইয়া তুলিতে পারিতেছেন না।  
স্বামী প্রশান্ত—বিশাল ভাও হে, খেলার মাঠে তার হুমান আছে। স্ত্রী গীতা—বাগ মার আরদের আঠায়ো বজ্রের মেয়ে—গানবাজনা জানে; আবুনিলা, শিক্তি।  
লেখক একস্থানে লিখিতেছেন :—“গীতার জুং, শক্তি এত সুরিকটে থেকেও তার কামনা জেগে ওঠে না, ও নিজেকে সমর্থ করে স্ত্রীকে স্বামীর শয্যা রাতের পর রাত অনিচ্ছায়, অসহায় বোলে। প্রশান্ত বোকে না ওর কেন এত অনিচ্ছা—কেন এত লজ্জা—কেন এত নিচ্ছীভতা? প্রশান্ত আর বুঝতেও ঢেঁড়া করে না।”  
জন্মে স্বামী নিরুপায় হইয়া মদ খেয়ে, স্ত্রীকে করে অবাহেলা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বাড়িয়া চলে। অবশেষে গীতাকে মাহুষ করিয়াছে এমনি এক পুরাণো অভিজ্ঞ কির উপদেশকমে গীতা একদিন মাহুষ স্বামীকে ঘোড়ার চাবুক লইয়া বেধড়ক মার দেয়—

এই উদ্ভেজনায তার কামনা ওঠে জেগে। ইহার কিছুক্ষণ পরের অবস্থা :—  
“গীতার শয্যার পাশে নাক ডাকিয়ে নিস্তা ঘায় প্রশস্ত। ছুঁখা দিয়ে দিলে আছে গীতা প্রশান্তকে, ওর মাথার একরাশ চুল প্রশান্তের মুখ ঢেকে ফেললে। দুখ থেকে চুল সরিয়ে, অন্ধকারে গলা জড়িয়ে, ওর মুখে মুখ রেখে প্রশান্তকে ভরিয়ে দেয় সাহোদাগ।.....  
গীতা প্রশান্তকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে বলে—  
“অপরানী গুণ্ড তুমি নাক, আমিও।”  
স্ত্রীর প্রেমের কি আকুল উচ্ছ্বাস! দরদী অন্তরের কি অপরানীয় অধুতাপ! লেগেছে নাম—অমৃত দুখোপাধায়। অমৃতবাণী কি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা-মাগরণমিত বিষ ভক্ষণ করিয়া মীলকণ্ঠ হইয়া আমাদের এই কাহিনী তনাহিতছে? নিজের কণ্ঠের বিয়ে সাপ মরে না, কিন্তু অপরের পক্ষে যে তাহা মারাত্মক!

**বীণার বদলে একতার**  
দেবী সরস্বতী বীণাপাণি—কিন্তু স্ত্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সম্ভবতঃ বীণার কৌশল আরজ করিতে না পারিয়া বীণা বাতিল করিয়া একতারা ধরিয়াছেন। তাঁহার গর বা উপভাস—সকলধরই এক সুর। স্বামী হয় মাতাল চরিত্রহীন, না হয় অবাধ্য অকর্মণ্য কিংবা অসমর্থ হইলেও অসাময়িক অত্যাচার করিয়া স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়াছে কিংবা নিত্যন্ত পক্ষে দিয়া বাঁচিয়াছে এবং স্ত্রী নিজের শক্তিতে বড় হইয়া উঠিল। অর্থাৎ পুরুষ হইয়াছে কি প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর হাতে তোমার আর রক্ষা নাই—আর স্ত্রীলোক হইয়াছে কি তোমার জন্ত স্বর্গের সিঁড়ি রচিত হইয়াছে!

জ্যোতের ‘বদন্তী’ “অস্তঃপুর” শীর্ষক এক গল্পে তিনি এইরূপ রূপকণ্য আমাদের তনাহিয়াছেন। একটা অযোগ্য স্বামীর স্ত্রী কেমন করিয়া বড়লোক বিধবা সঙ্গীর সাহায্যে “নারী-কল্যাণ-কেন্দ্র” স্থাপন করিয়া নিজের

বড়লোক হইল এবং আরও পাঁচজনকে বড়লোক করিল, তাহার পারিপার্শ্বিকহীন বিচ্ছিন্ন ইতিহাস। এইরূপ গল্প বলিতেও ভাল, শুনিতেও ভাল কিন্তু তাহা “শিশুসাহিত্য” “মৌচাক” প্রভৃতি ছেলেদের পত্রিকায়। তিনি তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লইয়া যতই তারদরের ঘোষণা করুন যে, বীণা অপেক্ষা একতরাই শ্রেষ্ঠ—তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার এই মত শিল্পী-মহলে অচল!

**ভবিষ্যদ্বাণী**  
“সংস্কার” মূখ্যত্র সাপ্তাহিক “বিবর্দ্ধন” সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম “বিবর্দ্ধন না গোবর্দ্ধন”? এবং “বিবর্দ্ধনের রসধারা”র লেখক স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম—“হয়তো ইনি সম্ভাব্য দৈবদর্শী লোক—কিন্তু এর রসের কন্মতি নাই। আর রসধারার প্রবাহে পা ভাগাইয়াও তো সেই আনন্দচিহ্ন মস্তিষ্কে পাওয়া যাইতে পারে, কারণ ‘রসো বৈ সা’। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের (৩৬ সংখ্যা) “বিবর্দ্ধন” স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী পুনরায় যে “রস ধারার” প্রাবন আনিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই :—  
“চলার পথের চরমধাম—গিরিধারী লাল মেখানে বিরাজ করেন, সেই “গোবর্দ্ধনই” যেন তোমার লক্ষ্য হয়।  
“রসো বৈ সা”—সেই রসময় পুরুষের রসধারায় সঞ্জীবিত হয়ে, অরসিকগণকে তাঁর চরণতলে এনে, স্বরসিক করে তোলা।”  
আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী এত শীঘ্রই সফল হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত।  
এই রসিক স্বামীর রসজ্ঞানের পরিচায়ক আর একটা সরস উপদেশ উদ্ধৃত করিব :—  
“সব চোরের চেয়ে ছিটকে চোরায়ই বেশী dangerous। জরা ছিটকে চুরি করে, হকার পথ বন্ধ করে, ধূমপান ব্যাখাত খটায়।”  
ছিটকে চোরের বংশ নিকাশ হউক এই ধূম-



মাগী স্বামী চকার পথে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে পরমা-  
নন্দে চণ্ডিতে থাকুন—ইহাই কামনা করি।

অবশ্য 'সংস্পর্শে' যে অনাজ চকার চেয়ে রসচর্চাই  
হইবে তাহাতে বিবয়ের বিষয় কিছুই নাই, কারণ রস-  
ধারার আনন্দ-প্রবাহ সহস্র-তাপে তপ্ত নর ও নারীর

প্রাণ যেমন শীতল হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই নয়।  
সেই জন্যই বোধ হয় সংস্পর্শের প্রতিভা তা সধকে সংসর্গ-  
দের মূলমন্ত্র হইতেছে :—

"জগৎ-জীবের জুগে দেখিয়া পরম পুরুষ রাধাস্বামী  
'অমৃকলা' হ'য়ে জগতের প্রভু অসিলেন এই ধরায় নানি।"

## দ্বিতীয়

### শ্রীগুরুচরণ যুগোপাখ্যান

দেবতা তোমারি প্রেমে ও ক্রমেতে সিনান করিয়া আমি,  
জীবন আমার করিছ ধরু তুমি কী তা জানো স্বামী;  
তুমি মোরে বাসো ভালো—

ইহাই যে মোর জীবনের পথ করিয়া রেখেছে আলো।  
আমার আকাশ, আমার বাতাস, কানন-বীথিকা মম,  
পরশে তোমার উদ্ভিগাছে হাসি' প্রভাত-পথ সম;

হেলে উদ্ভিগাছে কানন আমার পাখী গাহিয়াছে গান,  
লীড়িয়া তোমারে জানো কী গো স্বামী, হয়েছি প্রাণের মান।

(এলো) তপন-কী কহু জানে—

কেমনে কমল হেরিয়া তাহারে, নিজেরে ধরু মানে ?

মোর অন্তরে, যে সুর জাগিছে, তুমি কী জানিবে তার ?  
তুমি কী জানিবে কি করি যেচালে আমার বাধার ভার ?  
জানো কী রাজ্যবিরাজ—

কেনম করিয়া জীর্ণ এ বীণে স্বরধর গুণে আজ !

চাহি না স্বর্ণ, এর চেয়ে আমি—শুধু এসো আরো কাছে,  
সকল লক্ষ্য ভেঙে ধাও আজ, তোমার বাধার মাঝে।

জানি আমি জানি ভালো,—

চিরতরে মোর নন্দন হইতে ঘুচে গেছে সব ভালো।

সকল জীবন, সকল মরণ, তুমি যদি থাক কাছে

নিখিল মুক্তি ধরা দিল তব বাহ-বন্দন-মাঝে।

## খেলনা-শ্রুতনা

### = ক্রীড়াপাঠ্য =

#### অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

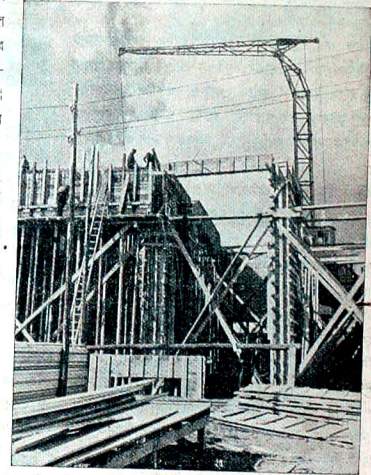
পরম্পর পরম্পরের মাঝে মিশবার সুযোগ পেলেই  
জাবের আদান গ্রহণ দ্বারা পরম্পর পরম্পরকে বুঝতে  
পারে। জাতীয় জীবনে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজ-  
নীতি-চর্চা যেকোন রাষ্ট্র সমূহকে পরম্পরকে জানবার  
যে পরিমাণ সুযোগ দেয়, বেলা-খুলাও সে সুবিধা  
তার চেয়ে কম দেয় না,—এ তথ্য আবিষ্কার হওয়ার  
পর থেকে রাষ্ট্র সমূহ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া  
যোগীভায় জন্মঃ যত নিচ্ছেন। তাই, যে  
অলিম্পিক প্রতিযোগিতা একদিন ছিল  
নিরাস্রবের, আজ তা হয়েছে সমগ্র বিশ্বের  
আন্তর্জাতিক খেলা-খুলার প্রতিযোগীতার কেন্দ্র-  
স্থল। এই প্রতিযোগীতায় প্রত্যেক রাষ্ট্রই চেষ্টা  
করে কী ক'রে সে বিশ্বের দরবারে নিজের  
মানব বজায় রাখবে।

আমুছে অলিম্পিক প্রতিযোগীতা  
যে বলিনে হবে, সে খবর আমরা পূর্বেই  
দিয়েছি। এবং এই প্রতিযোগীতা যাতে  
সরঞ্জামে সাদৃশ্যমণ্ডিত হয় তার জন্ত  
কর্তৃপক্ষ যে আশ্রয় চেষ্টা করছেন তারও  
কিছু কিছু আভাস আমরা দিয়েছি।  
সম্রতি কোন্ কোন্ রাষ্ট্র প্রতিযোগীতায়  
যোগদান করার জন্ত কী একার তোড়জোড়  
হক করেছে তাই আপনাদের জানান।

এই প্রতিযোগীতা সম্পর্কে সবচেয়ে  
তাৎ লাগিয়েছে জাপান। স্বদ্র প্রাচ্য  
দেশ—জাপান থেকেই ৩৪ জন প্রতি-  
যোগীকে অলিম্পিকে পাঠান হবে। স্বতরাং  
বুঝতে পারছেন ও দেশে অলিম্পিকের তোড়জোড়  
কী বহু সুর হয়েছে। প্রতিযোগীতা যাতে কৃতকার্য

হতে পারে সেক্ষেপে ভাবের ট্রেনিং তাদের সর্বদাই দেওয়া  
হচ্ছে।

তারপরই নাম করা যেতে পারে জুকোবো-  
ভেকিয়ান। ওখান থেকে ১০০ জন প্রতিযোগী  
অলিম্পিকে যাবে। বিলেতেও অলিম্পিকের জন্ত  
সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বুটেনের প্রতিযোগীগণ  
সাহারনতঃ হাই জাম্প, জেভেলিন ছোড়া ও জীকেট  
বল নিক্ষেপ করা ইত্যাদিতে (throwing events)।



অলিম্পিকের দিরাট ষ্টেডিয়াম  
নির্মাণ শুরু হয়েছে



বিশেষ সুবিধা কোন সময়েই কর্তে পারে না। তাই এবার ওরা টিক করেছে 'আসছে' অলিম্পিকে এ সকল বিষয়ে কতকালা হতেই হবে এবং নরওয়ের বিখ্যাত ট্রেনার মিঃ হফক ওয়া নিম্নলিখ ক'রে ইংলণ্ডে নিয়ে গেছে।

অষ্ট্রিয়াতে বিলাতের মিঃ আরলেন্টকে নেওয়া হয়েছে।। দাঁড় টানাতে মিঃ আরলেন্ট হচ্ছেন একজন বিখ্যাত ট্রেনার। অষ্ট্রিয়া টিক করেছে এবছর দাঁড় টানায় সে চ্যাম্পিয়ান হবেই।

ডেনমার্কও চুপ চাপ বসে নেই। দাঁটারে ওদেরশের মিঃ বোকবের খুব নাম আছে। মিঃ বোকব ডেনমার্কের প্রতিযোগীপক্ষকে স'তার শিখা দিচ্ছেন। আমেরিকাতও অলিম্পিকের জন্ত উল্লেখ্য আয়োজন চলছে।

ফ্রান্সের ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মসিয়ে রিনেট বলেছেন, ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স যোগদান করবে। রুটিন থেকেও একটি বেশ শক্তিশালী ফুটবল দল পাঠানো হবে। ইটালী, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক পুর্বেই জানিয়েছে, তারাও ফুটবল প্রতিযোগীতার যোগদান করবে। সব দেখে মনে হয় এবছর অলিম্পিকে ফুটবল প্রতিযোগীতা খুব ভালই হবে।

অষ্ট্রেলিয়া থেকে মিঃ ম্যাকমিন যোগা করেছেন, অলিম্পিক প্রতিযোগীতার জন্ত অষ্ট্রেলিয়া থেকে বেশ একটি শক্তিশালী টিম পাঠানো হবে। বিশেষ করে দাঁটার প্রতিযোগিতায় ওরা আশ্রয় চেষ্টা করবে চ্যাম্পিয়ান হবার জন্ত। এ বিষয়ে ওদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াবে আমেরিকা ও জাপান—কিন্তু দৃষ্টি থেকে নিম্নলিখ করে জিন টেরিস্ ও এমিল পোয়াডমেকে ইতিমধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ায় নেওয়া হয়েছে ওদের শক্ত পক্ষীর জন্ত। তার উপর এখনই অষ্ট্রেলিয়ায় মিঃ বরাউস বর্ষা নিক্ষেপ যে কৃত্রিম দেখাচ্ছেন তাতে মনে হয় অষ্ট্রেলিয়া অলিম্পিকে খুবই নাম কর্তে পুরবে। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেবার জন্ত 'অষ্ট্রেলিয়া' থেকে বহু দর্শককে যে বাগিনে হাজির করা হবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বেশ মনে হয়, আসছে অলিম্পিকে প্রতিযোগীতা সর্ব প্রকারেই সাফল্যমণ্ডিত হবে।

### ফুটবল

ফুটবল প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লীগ খেলা। এবছরকার লীগ খেলা প্রায় শেষ হয়ে



এম. দত্ত (মোহনবাগান)

ছিল কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হওয়ার সাথে যে তার 'লীড' বজায় রাখতে অসমর্থ হয়। গেল বায়ের লীগ বিজয়ী মহামাভান স্পোর্টিং, কালীঘাট ও এই বৈশ্বল এ কয়টি টিমের ভেতরই 'লীগ' বিজয়ের জন্ত চলবে দ্বন্দ্ব।

### ফুটবল ফেডারেশন

লীচের খবরগুলো শুনে প্রত্যেক ক্রীড়াবোদীই দুই হাতের নিশ্চয়। প্রথমতঃ আসছে ১৯২৬ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় একটি ভারতীয় ফুটবল টিমের যোগদানের খবরেই সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইটালী ও অষ্ট্রিকাত ভারত থেকে একটি ফুটবল টিম খুব সম্ভব যেতে পারে। তৃতীয়তঃ একটি চাইনিজ ক্লাব খেলবার জন্ত কোলকাতায় আসছে, এবং খুব সম্ভব ওরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও খেলবে। চতুর্থতঃ ব্রিটিশ মালয় ও ডাচ ইষ্ট-ইন্ডিয়া আসছে বছর একই ভারতীয় টিমকে ওদের জন্ত নিয়মণ করবে।

এসব কারণে স্থির হয়েছে একটি নিয়ম ভারত ফুটবল ফেডারেশন গঠিত করা হবে। ফেডারেশনের

হয়ে এল  
কিন্তু লীগ  
চ্যাম্পিয়ন  
কে হতে তা  
এখনও জোর  
করে বেলা  
শক্ত খেলার  
প্রথমার্ধে  
লীঘাট  
মহিও সর্ব-  
প্রথম হয়ে

কাউন্সিলে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হবে। এবং প্রতি ৫০টি অন্তর্ভুক্ত রাবার জন্ত প্রত্যেক প্রদেশের এক একট ভোট দেওয়ার পদ্ধতি থাকবে। ফেডারেশনের প্রস্তাব কার্যকরী হলে আমরা খুবই খুশী হব।

### ক্রীকেট

বেঙ্গল ও আসামের ক্রীকেট এসোসিয়েশন আসছে ক্রীকেট চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগীতায় যোগদান করবেন বলে স্থির করেছেন। বেঙ্গল ও আসামকে কলিকাতায় মধ্যপ্রদেশ ও বেহারের সঙ্গে খেলতে হবে। এ খেলার



রায় চৌধুরী (মোহনবাগান)

ক্রীকেট জগতে কয়েকটি আকর্ষণীয় বিষয় থাকবে।

প্রথমতঃ অষ্ট্রেলিয়ার দল এখানে আসবে।। চ্যাম্পিয়ন লীগ খেলা হবে। তৃতীয়তঃ—পাঞ্জাব ওয়াওরাস খেলতে যাবে। চতুর্থতঃ ইউনিভার্সিটি অফেনসালের সাথে সাইমন্স দলের খেলা হবে। তারপরই ঢাকা ও নয়মন্সিং থেকে একটি শক্তিশালী দল কলকাতায় খেলতে আসবে। এইচ, বোস; এন, বোস; এম, বোস; প্রব্রুতি গাছনামা খেলোয়াড়গণ ওগলে খেলবে।

### টেস্ট খেলা

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার ফল "ড্র" হয়েছে। খেলাতে দক্ষিণ আফ্রিকাই পরাজিত হত, কিন্তু খেলার তৃতীয় দিবসে বৃষ্টি হওয়ায় খেলা বন্ধ থাকে।

বরাদ্দ নির্দিষ্ট অধুয়ারী পর্যন্ত সমান সমান হয়।

টেসে জয়লাভ করে প্রথমে ইংলণ্ড ব্যাটিং করে এবং মোট ৩৬৪ রান করার পর ইনিংস শেষ হয় বলে যোগা করে; তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা সকলে ব্যাটিং করে মোট ২৪৪ রান

তো লে।

ফলে ইংলণ্ড

"ফলো অন"

যোগা করে।

কিন্তু বৃষ্টিতে

ফল হল

ড্রটে।

দ্বিতীয়

টেস্টে মিঃ

ওয়াট ক্যা-

প্টেন নির্ধা-

চিত হয়েছেন।



গেমসাল (কালীঘাট)

এই টেস্ট খেলার ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। এদের প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হয় ১৮৮৮ সাল থেকে। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর ইংলণ্ড টেস্ট খেলার জন্ত ১০বার দক্ষিণ



সিমান (কাঁমন)

২৮ বার ও দক্ষিণ আফ্রিকা ১১ বার টেস্ট খেলায় জয়ী হয়েছে এবং এই ১১বারই দক্ষিণ আফ্রিকাত ইংলণ্ড হেরেছে। তাই এবারের টেস্ট খেলার যদি দক্ষিণ আফ্রিকা



জয়লাভ করতে পারে তবে তাদের ক্রীকেট টেস্টে ম্যাচ ইতিহাসে মূহু হবে এক নতুন অধ্যায়।

### টেনিস

আমেরিকার খ্যাতিনামা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় মিসেস মৃত্তী উইথোল্ডন প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন

বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ সংবাদে টেনিসমহলে বেশ একটু চাকচাক্যের সৃষ্টি হয়েছে। শীঘ্রই তিনি বিলাত যাবেন ও উইথোল্ডন



মিসেস (উইথোল্ডন)

প্রতিযোগিতার পূর্বে ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

### ডেভিস কাপ

জেকোলাভাকিয়া ও জাপানের ভেতর ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় জাপান ৩-০ ম্যাচে হেরে গেছে। এখন স্প্রিং অস্ট্রিয়া ও পোল্যান্ডের খেলার বিজয়ী দলের সহিত জেকোলাভাকিয়াকে সেমি-ফাইনাল খেলতে হবে। অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্সকে পরাজিত করে তৃতীয় রাউন্ডে গিয়েছে।

### ভারতীয় হকি টিম

ভারতীয় হকি টিম এ পর্যন্ত তাদের পূর্ণ গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছে। গত ৬ই জুন ওয়েলিংটনে ওভার সাউথ ক্যান্টাবেরিয়ার সাথে খেলা হয়। খেলায় ২২ গোলে

ভারতীয় হকি টিম জয়লাভ করে। ক্যান্টাবেরিয়ার একটি গোলেও কণ্ঠে পারে নি।

অনেকেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে তাদের হাতের লেগার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করার ভারতীয় টিমের



হকি-খাচর বহানকার

সাধ্যা ভাণ্ডারে দেওয়া হবে,—কিন্তু তবুও ভিড লেগেই আছে। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যেখানেই যান্ধে সেখানেই বিপুলভাবে তাদের মঞ্চনা করা হচ্ছে। হকি খেলার খাচরদের দেখবার জন্য বহু দূর দেশ থেকে লোক এসে মাঠে জমায়েত হয়। সে এক অস্বপ্নপূর্ণ দৃশ্য, কিন্তু এ উৎসাহেও ওধানকার প্রচণ্ড শীতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আগ্রহ যথেষ্ট কমে। ওধানকার তুলনায় আমাদের দেশের শীত কিছুই নয়। খেলার পর পূর্ব একঘণ্টা কাল আঙনের চুল্লীর পাশে বসে থাকতে হয়। মাঠে অত বে চুটেছুটে, শরীর পরমের জন্যও কিছুই নয়।

এ পর্যন্ত যত খেলা হয়ে গেছে তাতে ধানটার একাই ৬০টি গোল করেছেন,—ভারপরই অধিক সংখ্যক গোল করেছেন রূপসিং—৪২টি।

খেলোয়াড়গণ হিরক রেডেন প্রত্যেক স্বাক্ষরের জন্য ছয় পেন্স করে দিতে হবে। এই অর্থ কোয়েটা জুটুক

# ক্রীড়া

### ক্রীমলিন মিড

এল্ ফে রাবে ভারী সেলিন ভিড। মাজানো উঠলো। মাটিতে লোটারানো গাউন পরা এক মহিলা টেম্বের ধারে ধারে কলো পোষাক-পরা অসংখ্য উঠে এলেন, চুলে তাঁর পাক ধরেছে। অবিশি, তখনও কায়লা ছুস্ত পুরু, আর তাদের আশে পাশে অগণিত আঙ্গুর আবেদনে পুরুদের মূহু করবার সখ তার পুরো

মেরে। তাদের গাউন, রূপ আর গহনা উচ্ছলতায় এ ওর সঙ্গে পান্না দিচ্ছে। নিউ ইয়র্কে নৈশ যে সমস্ত



মাজায়। নাম—টেক্সাস ওইমান। পরিচয়—সম্রাজ্ঞী, কোনো মহাদেশের নায়, নিউইয়র্কের নৈশ হোটেলে। আর এই এল্ ফে রাবেই আসল অধিকারিণী। তাঁর কপোলা মাখা অভিবাদনের ভাবে ধানিকটা নীচু হতেই অতো বড়ো হলুটা উজ্জ্বল করতালিতে ভারী উঠলো। বন্ধুতার ভঙ্গীতে তাঁর মা বললেন তার ভাবার্থ হচ্ছে এই—আজকে এখনি যে ছোটো মেয়েটি আপনাদের 'ট্যাপ ড্যান্সিং' দেখাতে যাচ্ছে—সে, অস্বস্ত: আমার কাছে, এক মস্ত বড়, নাচিয়ে। এই নাচেও অচিরেই অস্তিত্ব হবে সম্ভব নয়।

### মাগের পার

খিয়াত হোটেল এল্ ফে আবার তাদেরই মাথার দুকুট। একটু পর, হাল্-এর থালা ওলো ক্রমশঃ কীথ হয়ে' এলো, কিন্তু একেবারে নিভে গেলো না। মাগ-বানো গোলা একটা জায়গা, তারপরই ক্রমশঃ চোখ খাঁধানো বিজলীতে আয়নার মত উজ্জ্বল হয়ে

ওয়ার্ডার পারটার—মিলখা লয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছে "স্ট্রাইট লি কম্বিডেনশিয়াল"-এ।





পায়ের ভঙ্গী নাচের তালে টিক হজ্জের কিনা—আরনার  
দেখছেন মেট্রার নাচের পরিচালক

একাত্তানের যন্ত্রারের বড় উঠলো। হাসতে হাসতে ছুটে এলো  
অর্জনমিস্ত্রী এক মেয়ে। ভারী মনোহারী তার পায়ের গড়ন, কোঁকড়া  
বাদামী একরাশ চুল, প্রীকান্ত নীল আর বেগুণে তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা  
চোখ। বয়েস প্রায় পনেরো হবে।

টেক্সাস হাত দিয়ে মেয়েটির কাঁধ জড়িয়ে বললে—‘এর নাম  
কবি কিলার। চমৎকার নাচে। ভবিষ্যতে এর নাম খুবই হবে। কিন্তু,  
আমি চাই আপনারা এখনই এর নামের পথে সবাই সহায়  
হবেন।—এখন কবি, দেখাও এদের তোমার নাচ।’

মিটি হাসি হেসে তখনকার দিনে সববার অজানা কবি কিলার  
নাচ আরম্ভ করল।

টেক্সাস গুইনান-এর কথা আজ সত্যি হয়েছে। কবি কিলার—এই  
সমাজ ছাড়া শব্দ আজ চিত্রামোদীদের মুখে যাবে। কবি কিলার—বিখ্যাত

ঐ মেয়ের প্রথম পরিচয় এল ফে কাবে  
হয়েছিলো। ঐ ভাবে, ভাবতেও  
অবাক লাগে। টেক্সাসের ঐ  
পরিচয়ের পর; কবির নাম জড়িয়ে  
পড়লো আমেরিকার দেশে দেশে।  
কত ছেলে তার প্রেমে পড়লো, কত  
প্রলোভন দেখালো—কিন্তু, কবি  
একেবারে অচল। কারো প্রেমে  
সে পড়লো না। একটি অনিন্দ্য  
স্বন্দর দেখতে ছেলে সীতাই কবিকে  
খুব ভালোবেসেছিলো—পকেটে  
তার সর্গদা থাকতো পিস্তল। তার  
এক দল ছিলো—লুট করবার ও খুন  
করবার। তার আচ্ছাদনেও কবি  
কোনদিন সাড়া দেয় নি।

বহরের পর বছর কাটে।  
কিলার ছুটিতে একবার গেলো  
ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানেই  
প্রথম দেখা অল্জল্জসনের সঙ্গে।  
প্রথম দেখাতেই প্রেম। জল্জসনের  
তখন অনেক টাকা, অনেক নাম।  
মেয়েদের সে বিখ্যাস করতো না,  
তাই বিয়ে করতো না। কিন্তু,  
কবি তার প্রেমে পড়লো। কেন—  
কেউ বলতে পারে না। পল্লবের  
মত চেহারা তার ছিলো না, যত



পল্লব মূর্খির জনসিয়তা রূপস: পাড়ছে, ওয়াশিংটন  
‘ব্লাক্‌ টিউবি’ তার পরিচয়।



জেনেট গেনর

কায়রো কৈরে এ দেশের পছিন্দ কবির  
‘দি কায়মার টেক্সাস ওয়াশিংটন’ এ।





অ্যান্‌ ভোরশাক্

‘যার গতি’ ছায়াবি নেমেছে ‘খুঁট মিস্টিক’ এ।



জোন্‌ ব্লন্ডেল্

‘ট্রাফেলিং সেলফ লেডি’ এর আধুনিক ছবির নাম।





রুবি কিলার

স্বামী হালু জলুসন এর প্রথম ছবি  
‘কালিশিনো ডি পারা’

তার টাকা কিম্বা নামের ব্যক্তিরও  
বে। রুবির প্রেম নয়—এটাও  
স্বামী জানতো। যা হোক, অনেক  
ভাবনার পর, জলুসন দেখলে এক-  
মাত্র এ মেয়েটিকেই সে বিশ্বাস  
করতে পারে। অতএব, অচিরে  
তাদের বিয়ে হ'লো।

সেই ‘ভাকাত’ ডেলোটি চমৎকার  
এক উপহার পাঠিয়েছিলো। মনে  
হিসে তার হয় নি, কারণ—কিলারকে  
সে সত্যিই ভালোবেসেছিলো, সে  
য়েছিলো—রুবি স্বামী হোক।

তারপর মিঃ আর মিসেস জলুসন  
এলো হলিউডে—অলু ওখানে কাজ  
করতো। রুবিকে ক্যামেরার সামনে  
আনার জন্তে—কতো সাধনাসাধি,  
কতো আরাধনা। কিন্তু, মেয়েটির মত  
কিছুতেই হয় না। অনেক কথা  
বাটাকাটির পর সে নাবলে ‘কলুটি-  
সেকেন্ড স্ট্রিট’-এ। নাববার ঐ ফল  
আজ স্বামী জানে, ডাবি সাধারণকে



উনিভার্সাল-এর ‘সাইট লাইফ অফ গড’-এর প্রদর্শন একটি দৃশ্য।  
দেখবার আগেই রুবি একদিন দেখলে তার নামের পাশে একটা  
তারো!

কিছুদিন হ'লো মিঃ আর মিসেস একসাথে একখানা ছবিতে  
নোবেছে—তার নাম হচ্ছে ‘গো ইনটু ইয়র ডান্স’।

নে ওয়েই-এর নামে অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে। অবিশ্যি,  
জলুসন না সত্যি তা কেউ বলতে পারে না। ক্রাফ ওয়াশেল বলে  
এক ভক্তলোক: সেদিন হঠাৎ ব'লে বসেছে—সে নাকি তার স্ত্রী।  
তাদের বিয়ে হয়েছিলো ১৯১১ খৃঃ অব্দে। শুধু তাই নয়—মের  
একজোড়া জমজ ছেলেও নাকি আছে!



বিকট ককটিক গোটা পাল্পোর ছিলো  
পঙ্কায় প্রথম জেমিক।

পৃথিবী এতদিন মিস ওয়েষ্টকে জানতো অবিবাহিত। এখন  
তার বিয়ের খবর—এমন কি ছেলে হবার খবর পেয়ে ই-ফিউরে





আনা স্ট্রেন আর হারী ক্লার তার প্রথম প্রেম-দৃশ্যটি 'ওয়েড্ডিং নাইট'-এ।

ভীষণ পোলাল—সেটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। খবরটির সত্যাসত্যতার ওপর মৌরী ছুটে যেতো মেয়েকে আধুনিক সম্মান অনেকখানি নির্ভর করছে।

মৌরী 'গোইং টু টাউন' শেষ হইবে। এমন যে ছবিতে সে অভিনয় করবে—আপাততঃ তার নাম "মুন্সি লেডি।"

হলিউডে মা হবার মত অভিশাপ আর বৃষ্টি কিছু নাই!

"আজ তিন দিন হ'লো, আমার ঝোঁককে আমি কোণে থলুতে রাখিনি।"

এ কাতর উক্তি সেদিন মোটোর সেট-এ শোনা গিয়েছিলো তারুজিনীয়া ক্রমের মুখে। একটা নতুন ছবিতে দিনরাত তাকে বাটতে ছিটকোলে। একটু রাত হ'লে কাজের পর বাড়ী যখন সে ফিরতো, তার মেয়ে ফ্যান আনু তখন ঘুমিয়ে পড়তো। আবার পরদিন ভোরে সে ষ্টুডিয়ার জল রঙনামা হ'তো—সুদান তখন একবার ফিফি বোতলে দুধ খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়তো।

একটি সম্মানের মায়ের পক্ষে এর চেয়ে শাস্তি এর চেয়ে অভিশাপ পৃথিবীতে আর কী হ'তে পারে, তা একমাত্র সাধারণ সন্তানের মায়েরাই বুঝতে পারেন।

হলিউডের অভিনয়জীবনের জীবন মৃত্যু চক্কে আপনারা ভাবেন,

ততটা মোটেই নয়। চক-চক হ'তে পারে যদি তারা এই নিয়মটা মাসে—মে হলিউডে সম্মান, হাবী কিংবীর স্থান নয়।

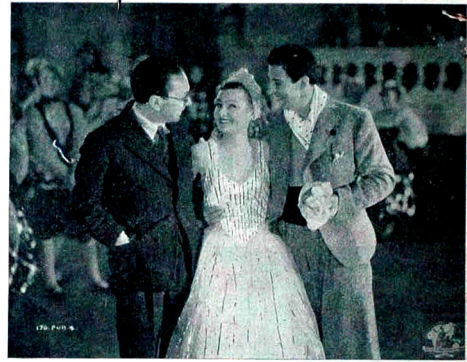
'কোয়েন্ট এন্ড্রি ওয়ান নোন্স'-এ হলেন হেজ এর অভিনয় যদি একটুও খারাপ হ'য়ে থাকে—সব জল্প দায়ী হলেন নিজে নয়, তার মেয়ে মেরি। নিউ ইয়র্কে মেরিকে সে রেখে এসেছিলো। তার জেজ ভাবনায় বিখ্যাত অভিনয়জীবীর দো-আর রাত আফ্রর হয়ে থাকতো। সন্ধ্যা হলেই সে



শ্রীমতি, যেন ফোটেট'-এ প্রকাশনে উল্লিখিত।  
নোমেরে কোন্সাল্ট-এর সঙ্গে।

ট্রেলিফোন ক'বুতে। ষ্টুডিয়ার হাজির বাধা বিপত্তি তাকে আটকে রাখতে পারতো না। মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বহুতে কোথের জেলে টেলিফোনটা রোজ স্থান ক'বুতো। সে রি কেক হলেন আর কাছ ছাড়া করে নি। এখন—সেখানে হলেন সেখানে মেরি।

মেন্ডা ফারেন্সের ছেলে টমির একবার এমন সময় অস্থ হ'লো—যখন মেন্ডা ছ'ছটো ছবিতে একসঙ্গে অভিনয়



'ইন্ডিউস্ট্রিয়াল টুপি ওয়াশিং' হচ্ছে বিলেতে গিলিয়ান হার্ডের প্রথম ছবি।

ক'বুতে। তার ছেলের অস্থের জন্ম ষ্টুডিয়ারে তো আর বসে থাকতে পারে না। আর কাজ ছাড়বারও উপায় নেই, তা হ'লে ও ষ্টুডিয়ার একবারেই ছাড়তে হবে। তার ফল হতো—প্রাপ্ত লিয়ে যেন অভিনয় করতে পারতো না। উৎসাহভাবে সে শুধু অপেক্ষা করতো যে সমারটুকুর জেজ যখন পামবিচে টমিকে সে দেখতে যেতে পারবে। ঝাঁক পেলেই সে ছুটে যেতো টমির কাছে। টমির যতদিন অস্থ ছিলো ততদিন হলিউডের অধিবাসীরা প্রায়ই দেখতো—সময় নেই! অসময় নেই, মেন্ডার পাড়িখানা মাঝে মাঝে পাগলের মত পামবিচের দিকে ছুটে চলেছে।

ত্রিক এনিম অবস্থাই—লুই ফ্যাক্সা, ফ্রান্সেস ডী, এ্যানু হার্ডিং, জোন বেনেট, আব্রলিন জাঙ্ক, কারেন মোরেল, স্কারা বো, আর মেরিয়া সোয়ানসনের। সম্মান যেখানে কারণ সেখানে তারা সব এক।

অবিশিষ্ট, কুমারীর রূপ আর মাহুদের রূপে তফাৎ অনেক। এলামেলা, উদ্ভাস্ত কেমন যেন কুমারী রূপ। মাহুদের পর্যায়ে যারা গিয়ে পড়েছে তাদের রূপ স্বন্দর নারীদের সোনালী ছায়া। এর উজ্জল চূড়ান্ত আপনারা জোন ব্রুন্ডেল, স্কারা বো, জালি ইলারিয়স, আব্রলিন জাঙ্ক, ফ্রান্সিস ডি আর ডিকসি লি কসবিত পামবিচ।



গায়ক, ভালো অভিনয়তা ও গায়ক গায়িকা—এ  
চিনেটিক পাণ্ডুরূপের বিশেষণ।





আমার বিয়ে করে—  
তোমার বিয়ে হবার  
পটার বাজাতে দেখাযাবে।  
আমার চেয়ে ভালো  
গিটার বাজাতে পারবে  
নিউজিল্যান্ডে এমন লোক  
নেই। আর, তার বদলে  
তুমি আমার একটু একটু  
অভিনয় করতে শিখিয়ে।



বেটি কারেন্স—এর সময় বাস্কেটবল। 'জি এন্ড'  
হচ্ছে জেন্সন ক্যাশমির হার্লিনকে জড়ি। আর, টুপি  
পরা স্ট্রোর স্ট্রোরের হচ্ছে ফ্রয়ের মেয়ে।

কতকম অল্পত চিঠিই না যে অভিনেত্রীদের কাছে  
যায় তার আর সংখ্যা নেই। সম্রাতি এই ভাবতবর্ষ  
থেকে এক মহারাজা জিনজার রোজাস এর প্যারি-প্রাণী  
করে' এক চিঠি লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—  
তার ঠাকুর সংখ্যা আমেরিকার কোনো কোটাপতির  
থেকে কোনো অংশে কম নয়। আর, যদিও তার  
জাতে বহু-বিবাহ প্রচলিত, তবুও জিনজার যদি তাকে  
বিয়ে করে—সেই হবে তার এক ও একমাত্র পাট-বাগী।

কিন্তু তিনি হ'লো জিন হারুলোও এরকম অল্পত  
একখানা চিঠি পেয়েছে। তবে সেটা কোনো মহারাজা  
পুত্রের চিঠি প্যারিয়েছে সাধারণ এক লোক অল্প  
নিউজিল্যান্ড থেকে। সে লিখেছে—জিন তুমি যদি

জিন লোভায় বিলেতের নানী এক অভিনেতা। এমন তার  
এক ভাগীর ভাগী 'জ্যাম' খাবার সম। একদিন, কাজ শেষে জন  
বাড়ী কিসে দেখে তার ভাগীর টোটার নীচে বানিকটা 'জ্যাম'এর  
দ্রাণ। একটু কড়া ভাবেই সে জিজ্ঞেস করল—'আবার তুমি 'জ্যাম'  
খেতে গিয়েছিলে, মাগি?'  
ছেঁচি মেয়েটি তাতে জবাব দিলে—'না, মামা। তবে বেরিয়ে  
খাবার আগে মামী বোধ হয় ওখানে আমার চুমো খেয়েছিলো!'

যদি মউরিশ ষ্টিলার একদিন ষ্টেকহলসের রয়াল ড্রামাটিক একা-  
ডেমিতে না যেতো, আজ প্রোটা পল্লোর নাম তা'হলে আর কাউকে  
জানতে হ'তো না।

এক কবি, যদি একদিন পথের ধারে একটি মেয়েকে অজান  
হয়ে পড়ে থাকতে দেখে দয়া করে' তাকে হাসপাতালে না নিয়ে  
হয়ে পড়ে থাকতে দেখে দয়া করে' তাকে হাসপাতালে না নিয়ে

ছেঁচি এক থিয়েটার কোম্পানীর টিক বননিকা  
ওঠবার আগে এক অভিনেতার হঠাৎ ঘনি  
না হ'তো তা হ'লে রার্কে পেরুল আজ থাকতো  
অজানা দেশের অন্তরালে।

সত্যি, ভাবতে ভাগী অবাং লাগে এই সব বিখ্যাত  
অভিনেতা অভিনেত্রীর বিখ্যাত হ'বার কারণ। কতো  
সামাজ আবার কতো সম্মানে!

প্রোটা গমটাকসন ছিলো একাডেমির অনেক  
ভাগীদের ভেতর একজন। দৈবাৎ একদিন যেতে যেতে  
মউরিশ ষ্টিলারের কী মনে হলো—সে চুকলো এ স্থলে।

এর চোকার সঙ্গে সঙ্গেই  
চোখে পড়লো প্রোটা।  
কল হ'লো সে তারই ছবি  
'গোষ্ঠী বালিও'এ নাবলো  
নারিকা হ'য়ে। মেটো  
একদিন এ ছবিখানা  
দেবুলে। তার পর?—  
ভাষণ, আর কী, এক  
বখার এক ইন্ডিয়াস।

নুসিলি লি সিউয়ার

ক'র মেয়েটির আঁচ বজর যখন বয়েস, সে একদিন এক জুজলের  
ধরে বাসি পায়ে খেলা করছিলেন। হঠাৎ, এক দোতল ভাঙ্গা কাচে  
মেয়ে তার পাটি এমন ভাবে জখম হয় যে, সে তখনই অজান হয়ে  
পড়ে। ভাগী কোপ চারিধারে, কোনো পথিকের তাকে খেতে  
গাঙ্গা সহজ কথা নয়। সেই সময়, মনে মনে কবিতা রচনা করতে  
করতে আসছিলেন ভাগী এক কবি। সেই লুসিলিকে প্রথম দেখতে  
লে। অবস্থা শোচনীয়—তাই সে একখানা গাড়ি ঢেকে মেয়েটিকে  
নিয়ে চলেলো হাসপাতালে। এই হচ্ছে জেন্সন ক্রাওফোর্ডের  
সত্যি থকালে না মনুষ্যের কাহিনী।

লার্কে পেরুল ছোট এক থিয়েটার কোম্পানীতে ছোট এক অংশে  
খলিয়ে করে' তারে' বিরক্ত হয়ে উঠছিলো। সে টিক করলো—  
সম্রাৎ খানেক পর দেখা ছেড়ে এই কোম্পানী। কিন্তু একদিন  
সেইদিন লার্কে'র কপাল খুললো। থিয়েটারের সব  
দিক; সেই সকলো লো, বননিকা উঠতে থালি বানী!  
এন সময় হঠাৎ অত্যন্ত অল্পত হয়ে পড়লো সেই  
নউরিশ প্রাণ অভিনেতা। অল্পতায় হ'য়ে মালিক  
লার্কে'র অংশটি অভিনয় করতে দিলে। রঙ্গমঞ্চে সে  
নাবলো—আশায় ও আশঙ্কায় বুক তার কাঁপছে। তার  
খলিয়ে দর্শকরা দিলে হাততালি। নাম ছড়িয়ে  
পড়লো।

মউরিশ ও' স্মলভানু'এর মতে—মাঝে মাঝে বাপ  
মাঝে কথা আলাপ করা ভালো। তার মায়ের আদেশ  
এবং যদি সে অমাজ না করতো—তা হ'লে মউরিশকে



কাজ ভালি গান গায় ভালো। কেউ খামিয়ান  
এসেছে তাল, বেকো। আর 'খান'ভোগ্যাক অভিন-  
নরও কঙ্গ, আবার মেটোর নাচেরও পরিচালনা।

আজ আর চালস্ ডিকেন্সের 'ডেভিল্ড কপারহিট'এ  
অভিনয় করতে হ'তো না। তার মা—মিসেস স্মলভানু  
ছিলেন একটু সেকেলে। তিনি পছন্দ করতেন না—  
তার মেয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে থাকে। স্বর্গান্তের  
মাঝে মাঝে মউরিশকে তাই ছুটিতে হ'য়ে বাড়ীর ভেতর  
প্রবেশ করতে হ'তো। একদিন, তার এক বন্ধু বিখ্যাত  
এক হোটেল তাকে নাচতে ও ডিনার খেতে নেমস্তম  
করুল। সে নেমস্তম অগ্রাহ্য করা মউরিশ এর পক্ষে  
সম্ভব হ'লো না। মায়ের হাজার অমত থাকা সত্ত্বেও  
সে পালিয়ে গেলো।

ডিনার চলছে। ওরিকে মুহু স্বরে বাজছে জিপসি



ব্যাও। হঠাৎ, 'ওয়েটার' এসে মউরিনকে একখানা কাড় দিলেন—পরিকার ছাপার তাতে লেখা রয়েছে—  
'হুগো বার্নেস'। ওজলোক একবার দেখে করুতে চান।

সেই দেবার ফলই হ'লো মউরিনের রূপ-ছায়ার রাজ্যে প্রথম প্রবেশ। জন ম্যাকরোম্যাক ছিলো তার প্রথম ছবিরা নায়ক।

বালিন্‌ও জর্জ ব্যাঙ্কফোর্ট ছিলো জোসেফ, তম্‌ ঠাণ্ডাবর্ণের বন্ধু। জর্জ একদিন থিয়েটারে যাবের টিকিট করুতে। টিকিট কিনে আনলো। কিন্তু সন্ধ্যা হলে অজান্তে তার শরীর হলো একটু ঘাৱাপ। টিকিট-খুলো মাঠে মারা যায় দেখে—সে ভুরু টেলিফোন করুতে। জনএরও কোনও কাজ ছিলো না।

জর্জ ব্যাঙ্কফোর্ট এর সেদিন যদি অস্থব ন করুতো তবে মালিনকে আজ প্যারামাউন্টের 'ডেভিল্‌ ইন্‌ এ ওয়ান্‌'এ অভিনয় করুতে দেখা যেতো কিনা সম্ভব।

মালিন ছিলো ঐ বালিন থিয়েটারেরই একজন অভিনেত্রী।

হোটেই একটি সিনেমা হাউসে ফিল্ম দেখানোর পর হোটেই একটি নাটিকা দেখানো হ'তো। তাতে জনসমাজ হ'তো বেকী। বাজীর পাশে ছিলো ঐই সিনেমা, অতএব স্বভাবতই প্রতি সপ্তাহে ওখানে বাওরা আমার একটা অভ্যাস ছিলো। থিয়েটারে থিয়েটারের ছিলো না মোটে, থওটা ছিলো ছাব্বালমী। এ লোকের অভাব নেই যারা এর সমর্থন কিছুতেই করুতো না। কিন্তু, আশ্চর্য্য, সিনেমা শেষ হবার পরও তাদের বেশ 'গ্যাট্‌' হ'য়ে বসে থাকতে দেখা যেত।

নাটকের অভিনয় এদের কাছে আকর্ষণ ছিলো না, দৃশ্যপটের প্রশংসাও তারা করুতে যেতো না। আকর্ষণ ছিলো—অল্প বয়সের এক অভিনেত্রী—ভারী মিষ্টি তার মুখ, আর ভারী মিষ্টি তার কথা ববুবাঁ কাধ। নাম মাজ ছিলো তার পারিশ্রমিক, লুয়েট্‌-পেয়াদা আর ডিসে বাজনা বাজিয়ে অতি সস্তা

স্বপ্নে পান তাকে গাইতে হ'তো। প্রতিভা প্রকাশের ক্ষমতা তখনও সে পায়নি। থিয়েটারের একটা স্ব-স্বপ্নে 'ফিয়ার্ট' করে' রোজ সে আসতো।

সেই মেয়েটিকেই সে দিন দেখলুম স্বয়ংক্রিয় একটা 'হিল্যান্ড'এ বসে—হৃদয় তার শাড়ি, হাওধ্যাণ আর হাই-হিল্‌ হু। একটা টুডিয়াম টুপে দারোয়ান তাকে সেলাম করুতে। বাংলা দেশের ফিল্ম রাজ্যে আজ একজনে তার নাম, সে এখন ভারত বিখ্যাত উমা।

নীতীন বোস ক্যামেরার হাতল কীরকম ঘুরায় আপনাদের জানা আছে। হাতে 'মেগামোন্‌' ধরেও ভজলোকের নাম কিছু কম নয়। তিনিই এখন বাংলায় তুলুছেন 'ভাগ্যচক্র', আর হিন্দীতে 'মুণ্ডাভাং'। নিউ থিয়েটার্স এর ও ছোট্ট ছবিতেই প্রধান নায়িকা উমা। সঙ্গে আছে পাহাড়ী সান্তাল, হুর্গাদাস, অন্যর মল্লিক, রুক্ষচন্দ্র—আরো অনেক।

ওদিকে হিন্দী 'দেববাসে' রাজত্ব করুছে—যমুনা। পরিচালক প্রমথেন বড়ুয়া তাঁর গাড়ির রঙ বদলেছেন। বাঙালী ও পশ্চিমবঙ্গের পছন্দে আকাশ পাতাল প্রবেশে। আনাদের 'মাদুয়া' ভাইদের নন্দলী কী করে' করা যায় সেই ভাবনাতেই পরিচালক বড়ুয়া এখন ব্যস্ত। বাংলায় চন্দ্রমুখীর অংশে অভিনয় করেছিলো—চন্দ্রাবতী। হিন্দীতে রাজকুমারী। নাকে একটা হীরে—স্বন্দরী রাজকুমারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো তার টিকিট কল্‌কাতায় আসবার আগেই। কোপায় এবং কেন—এক বলছি। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে 'বমেজি' হচ্ছে বিখ্যাত একটা রাজ্য। গুজব আছে—এর রাজা নাকি টাকার গরিতে ঘুমোয়। সেই রাজকুমারের সে দিন বিয়ে হ'লো। পুরীতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। সেখানে থেকে একরকম জোর করেই আমাদের বমেজির নিয়ে যাওয়া হ'লো—বিয়ের সভায় উপস্থিত থাকতে। রাজার বিয়ে, মুখদাম আর অকারণ টাকা রক্তার অভাব নেই। সভা আলো করুতে চারদিক থেকে এসেছিলো অনেক নায়ী ও দানী বাঁজী। আগাগোড়া

বোম্বাইতে ঢাকা, নাকে হীরে। সব চেয়ে সুন্দরী আর সব চেয়ে লাজুক যে মেয়েটি—মোটো কয়েকবার খুঁজা বেদিন ঘুরিয়েছিলো তারই নাম পরে জানুতে পারবুম—রাজকুমারী!

‘তোনার টোটার সিঁদুর’ অক্ষয় কোক—‘আপনাদের মনে আছে কার লেখা এ লাইন?—পরকারের। কোথায় আছে?—‘বুধবা’ গল্পে। সেই ‘বুধবা’ কালী ফিল্মস কমিকে তুলুনে। আর, ‘কতিসংসদ’-এ পরিচালনা করুবেন—তুলসী গাঙ্গুলী, ‘দুর্গাধামে’ অভিনয় করে’ বিখ্যাত যার নাম। জিন্নামার দ্বিতীয় পর্ব সবচেয়ে আগে ক্যামেরার সামনে ঐরা আসুবে বসে’ শুনতে পাছি।

নিকাক-মুগে ‘কাল-পরিণাম’ একবার চিত্রামৌলীদের কণ্ঠে শ্রবণ করিয়েছিলো। একে সবাক রূপ দেবার অভিজ্ঞা কালী ফিল্মস্‌ এর আছে।

হুমায়ূঁ পিণ্ডলের গুলি, পুলিশ আর ডিক্টেট্‌র এবার যুববে রাখা ফিল্মস্‌ এর পরবর্তী বাংলা চিত্রে। কাজ হলো এখনি আরম্ভ হ'তো, কিন্তু—পরিচালক জ্যোতিষ বানার্জীর হঠাৎ হলো কটন অস্থব। তাঁর শরীর সারুতে হ'লো দেবী, সম্পূর্ণ সারুতে যেতে হ'লো দাঙ্গিগি এ। অতএব, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত

রাখা ফিল্মস্‌ এর পরবর্তী বাংলা চিত্রের বিশদ বিবরণ আপনাদের আশি জানাতে পারছি নে।

তবে, এইসু জানুতে পেরেছি—শ্রীমতী কাননমল্লী হরতো এ চিত্রের নায়িকা। কী একটা কারণে, সাহেবের এক কোম্পানীর ক্যামেরার সামনে—এক প্রেমিকের সঙ্গে আধখানা প্রেম করে’ ইনি হঠাৎ ঢলে এসেছেন কল্‌কাতায়। পাহাড়ী আবহাওয়ায় এর, স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়েছে—আশা করি।

জ্যোতিষ পিণ্ডা বাংলা দেশের বায়োস্কোপের বাদশাদের কাছে জনপ্রিয়তা জমায় হারাচ্ছে। এ জন্ত দোষী জ্যোতিষ নিজে কিংবা তার অভিনয় নয়। দোষী তার বাবা—দাড়ি-ওলা, বুদ্ধ এক ভজলোক। সেট-এর ওপর এসে মাঝে মাঝে তিনি এমন নাকি বিরক্ত করেন—যার জন্তে কাজের অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সম্প্রতি ষ্টেই ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর ‘বিস্তোহী’র কথীরা এটা উপভোগ করছেন।

‘ডি জি’র পরিচালনার ‘বিস্তোহী’ রাজপুতানার এক গল্প, আগামী ৩রা আগস্টে ‘রূপকণীতে’ মুক্তিলাভ করুবে। সারা রাত ধরে জ্যোতিষ মুখাঙ্কির ‘পায়ের ধূলা’র গুটিং চমুড়ে এবং রাত জাগার পরিশ্রমে টুডিয়োতে সেদিন বিকেল বেলা একটা বোম্বের ওপর জ্যোতিষ রাবুক ঘুমোতে আমরা দেখে এসেছি।

## রায়ান নোভারো

(আত্মকথা)

ক্রীড়পেঙ্গ নাথ দত্ত

অভিনেতাদের জীবনকথা জানিতে স্বভাবতই একটা কৌতুক হয়। যাহারা ভালকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে, তাহারা নিজেরা কি ভাবেই লোক, সেই সব ভাবের সঙ্গে তাহাদের আন্তরিকতা বা কতদূর—এ প্রর মনে হওয়া বিচিত্র নয়। যোগ হয়, এই সব কারণেই অনেক অভিনেতাদের জীবনকথা জানিতে প্রয়াস পান। তবে প্রায়শ্চাত্তবে, যার কথা তার মুখে শুনিবার সুযোগ সুবিধা আরেই লাভ হয়। যে আত্মকথা এখানে প্রকাশিত

হইল, উহা সেইজন্য একটা আগ্রহেরই প্রত্যক্ষ ফল।  
মেরি বি মুলেট উচ্চশিক্ষিতা জনৈকা নারিন মহিলা। বিখ্যাত অভিনেতা রায়ান নোভারোর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার জীবনকথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নোভারো কোনরূপ বিধা না করিয়া তাহা যথাসম্ভব বর্ণনা করেন।

যে নামে এই স্বনামধন্য অভিনেতা জগদ্বিখ্যাত, সেই ‘রায়ান নোভারো’ নাম পারিবারিক নাম নয়। ‘সারি’



বারিক নাম—জামানিগো। নোভারো মেক্সিকোর অধিবাসী। মেক্সিকোর অধুনা সর্বত্র ভূরাস্ত্রো তাঁহার জন্মভূমি। পিতা ভূরাস্ত্রোতে দলিতকিসক ছিলেন। তাই-ভগিনীতে নোভারোরো চৌদ্দ জন। বর্তমানে এগারো জন জীবিত। নোভারো চতুর্থ সন্তান।

“১৮৯২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, আমার জন্ম হয়।”

সুতরাং নোভারোর বয়স এখন ৩৬ বৎসর। বয়স সম্বন্ধে অতিমহত্বপূর্ণ প্রায়ই একটা চাপচাপির ভাব দেখা যায়। নোভারো তৎসম্বন্ধে বলেন,—

“বয়স ভাঁড়ানো আমার মোটেই গুরুত্ব নয়। কি প্রয়োজন? বয়স মত বাড়, সৌন্দর্যও তত বাড়িতে থাকে—এমন কি, যুদ্ধ বয়স পর্যন্ত। আমি মতই বড় হইতে থাকি, আমার অভিজ্ঞতাও ততই বাড়িতে থাকিবে। আমি যখন নয় বৎসরের ছিলাম, তখনকার অপেক্ষা কি এখন আমার অভিজ্ঞতা বেশী নহে? আমার এখনকার অপেক্ষা কি ভবিষ্যতে আরো বেশী হইবে না?”

শিক্ষা-দীক্ষা কোথায়, কিরূপে,—এই প্রশ্নের উত্তরে নোভারো বলেন—

“পানরো বৎসর বয়স পর্যন্ত ভূরাস্ত্রোতেই লেখাপড়া শিখি। তারপর আমার মেক্সিকো সহরের উরিয়া আমি এক কলেজে ভর্তি হই। পিতা মেক্সিকোতে চিকিৎসা ব্যবসায় আশ্রয় করেন; কিন্তু যেমন সময় না হওয়ায়, আমার ভূরাস্ত্রোতে ফিরিয়া বাইতে মনস্থ করেন।—

একটু ঘামিয়া, হাসিয়া আমার বলিতে লাগিলেন, “ভূরাস্ত্রোতে ফিরিয়া বাইতে তখন আমার বখেট্টই উৎসাহ।” অপর নয়, ভূরাস্ত্রোতে একটি বালিকার সঙ্গে আমি প্রেমে পড়িয়াছিলাম। প্রথমে পিতামাতা আমাকে সঙ্গে লইয়া রওনা হইলেন। পৌছিয়া মাতা আমার মেক্সিকোতে ফিরিয়া আসিলেন আর সব ভাই-বোনদের লইয়া বাইলেন বলিয়া। ঠিক এই সময়ে মেক্সিকোতে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, মাতা আর বাইতে পুরিলেন না। আমারও আর মেক্সিকোতে ফিরিয়া আসিতে পারিলাম না। এক বৎসর কাল এইরূপে রায়ান ডাডাডা হইয়া রহিলাম।

“আমার বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। বয়সে বালক হইলেও, পড়াশুনা বখেট্টই করিয়াছিলাম; শুধু পড়াশুনা নয়, অনেক বিষয় চিত্তাও করিয়াছি। ভবিষ্যতে, কি করিব, কি হইব—একরূপ তখনই স্থির করিয়া সেিয়াছিলাম।—”

নোভারো আবার হাসিলেন। বলিলেন,

“স্থির করিয়াছিলাম—একজন মস্ত বড় সাধু হইব।

আমার অন্তরে এখন পতনই বলিতে হইবে। আমার বড় ছই ভগিনীও সমাসিনীদের মতে যোগদান করিবেন, একরূপ স্থির হইয়াছিল। আমিও সাধু-জীবনের জ্ঞান প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

“আমার এইরূপ মতিগতি হওয়ার কারণ, কতকটা তখনকার রাইক্সের। প্রত্যেক লেখিলাম, আমাদের অতি নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেহ রাতারাতি বড়মহা হইয়া উঠিলেন, আমার কেহ বা একেবারে পথের ভিড়ক হইয়া দাড়াইলেন। শুধু-কথের এতটা আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ যখন অর্থ—আর অর্থের যখন কোনই স্থিতি নাই, তখন এই অর্থের উপর নির্ভর করিয়া জীবনে স্থায়ী হইবার আশা করার মত মূর্খতা আর কি হইতে পারে? এইরূপ নানা তত্ত্ববিদ্যার আমার মন তখন ব্যাপ্ত। মহাকাব্যের কতদিনের? অনন্তকালের ভুলনার সে কতটুকু? আমার জীবনে নিন্দা বলিতে আমার একমাত্র আশ্রয়। অন্তরঙ্গ জীবনের যে আশে নিতান্ত এখন হইতে সেই জীবনই যাপন করি না কেন?”

একটু ঘামিয়া বলিলেন,

“আমি সাধু না হইয়া অভিনেতা, ছইয়া পড়িয়াছি। আমার গতির পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মস্তিষ্ক পরিবর্তন হইয়াছে—এরূপ মনে করিবেন না। আমার এলো রায়না—পাখির বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া উঠাতেই নিমজ্জিত থাকার মতো জীবনের এত বড় নিরর্থকতা আর কিছুই হইতে পারে না।

“আমার জীবনের গতি-পরিবর্তন খোয়াল বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। খোয়াল হইলেও, উঠা থোলা নয়। জন্মের আমার মনে এইরূপ একটা রায়না হইতে লাগিল।



এইবার নিয়ে তিনবার মাথলে এই গুণার্ণব পাগু টার আর লেনেট খেলার। “গুণান মের সীং” এই ছন্দই ছিলো অশান্তারী পথের পথিক। হঠাৎ কাজ পেয়ে একটি লক্ষ্যনা কিনেছে—গাছটার তাই বলছে খেলারকে।





1. 2010 年 1 月 1 日起，凡在《企业所得税法》施行前未按照企业所得税法规定进行税务处理的股权交易，如符合以下条件的，可追溯适用企业所得税法第二十条（一）项的规定，按原实际取得的成本进行计税。

[illegible]





মাউলি দিল কামর খান প্রিন্স জুজের দলের দল  
অভিনয় কল্যাণ-বিশিষ্ট প্রিন্স আফগানের খুদে  
ডিক্টেটর প্রিন্স জুজের প্রিন্স জুজের প্রিন্স

যে, অপরের জীবনের উপরও একটা  
প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি আমাতে  
বিজ্ঞমান। তজ্জন্ম সংঘারে থাকিয়া  
কিছু সাধনার প্রয়োজন।

“এই মনোভাব আমার যথোপযোজ্য  
নিকট প্রকাশ করিলাম এবং তখনই  
সম্যাস্ত্রত অবলম্বন না করিয়া সংসারের  
কিছু কিছু কল্প সংস্পাদন করিবার  
অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আমার  
মনোভাব ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়া-  
ছিলেন এবং হঠাৎ কিছু না করিয়া  
মহজ স্বাভাবিক ভাবে গাড়িয়া উঠাই  
বুদ্ধিভূত, উপদেশ দিলেন। আমার  
জীবন সেই উপদেশানুযায়ী নিয়মিত,—  
মহজ ও স্বাভাবিক ভাবে পরিণত হইয়া  
আসিততঃ, কোনরূপ হঠকারিতার  
ফল নয়।

“এই রাষ্ট্র-নিয়মে আমাদের পরিবারও  
বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়া। আমাদের  
আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া  
পড়িল। বৃহৎ পরিবার, পিতার ব্যবসায়  
একরূপ বন্ধ, আমার সাহায্য বিশেষ  
প্রয়োজন হইয়া পড়িল। পারিবারিক  
জীবনে এই কষ্টের অমোদ্য জীবনের  
গতি পরিবর্তনের একটা বিশেষ কারণ।  
প্রয়োজন কিংবা কষ্টবোর বাতির এখন  
যা করিতেছি, প্রয়োজন না থাকিলেও  
যে করিতাম না, তাহাও বলিতে পারি  
না।

“যেহাওয়াতে আর বিশেষ কি  
হইবে? উন্নতি করিতে হইলে দুল্ল-  
গাভাই উপযুক্ত স্থান। ১৯১৬ সালের  
নভেম্বর লন্স এঞ্জেলসে চলিয়া আসিলাম।





টিক মদন আছে, যেদিন পৌছলাম, সেদিন ছিল Thanksgiving Day. কিন্তু বলিতে কি, বহুদিনের মনকে এমন কিছু জুটিল না, যাহাতে সত্যই ধন্যবাদ দিতে পারি।

“গান বাজনা কিছু কিছু জানিতাম। গান ও পিয়ানো শিখাইয়া যৎসামান্য কিছু পাইতাম। অল্প মিষ্টা কোন কান্ডেই লাগিল না।

“গান বাজনা শেখানো কাজ অর্ধের জন্তই করিতাম; আমার মনোনিবেশ কাজ অভিনয় করা। এই অভিনয় কাজের আশায় কতদিন যে থিয়েটারে থিয়েটারে ধরনা দিয়াছি, ম্যানেজারদের দরজায় উন্মেরার হইয়া পাড়াইয়া রহিয়াছি, হিসার নিকাশ নাই। যেমন তেমন, যা তা, একটা কিছু পাইলেই হয়।

“শেষ অভিনয় নভঞ্জে আসিয়াছি, সন্তোষের মাঠ—পাঁচ মাসের মধ্যে বহু সাধাসাধনায়ও কিছু জুটিল না। পাঁচমাস পরে ভাগ্য একটু সুপ্রসন্ন হইল। একটা ব্যয়ত্বপে কোম্পানিতে টিকা কাজ জুটিল। মাসের মধ্যে মাত্র তিন চারদিন কাজ করিতে হইবে। মজুরি, ও ডলার হিসাব। তিন চার দিনের টিকা রোগজগারে কৈরীর লাঘব বিশেষ কিছুই হইল না। পিয়ানো ও গান শিখাইয়া বাহা পাইতাম, তাহাতেই কায়রোতে কোনমতে না চলার মতই একরূপ চলাইতে হইত।

“এই ভাবে এক বৎসরেরও বেশী কাটিল। পরিচিত এবং জানাশোনা সকলেই বলিতে লাগিল—‘রুখা চেষ্টা। এ আমেরিকা যন্ত্রণাকাজ—কটন ঠাঁই! বিদেশীর এখানে কোন আশা ভরসাই নাই। স্তবরা আমার আশাও নিতান্ত দুঃশাস। সকলেই নিরুৎসাহ করিতে লাগিল এবং দেশে গিয়া একটা কিছু করিয়া রাইতে উপদেশ দিতে লাগিল। নিরুৎসাহের আরও একটা কারণ, ইংরেজি ভাষায় আমার অসভিজ্ঞতা। সত্যই, প্রথম প্রথম আমি ইংরেজিতে ভাল করিয়া কথাবার্তাই বলিতে পারিতাম না। কোন রকমে কাজ চালাবার স্বত অল্পস্বত বলিতে পারিতাম। পিতা ইংরেজি বেশ ভালভাবে কথাবার্তাও বেশ বলিতে পারেন। কিন্তু বাড়ীতে

এ পাট ছিল না। বাড়ীতে আমার স্পেনের ভাষাই কথাবার্তা বলিতাম।”

কোনো নোভারোর ইংরেজি ভাষার জ্ঞান, ইংরেজীতে কথাবলখন-দক্ষতা একরূপ অসাধারণ। একটা বিদেশী ভাষাকে সব দিক দিয়া একরূপ আচ্ছন্ন করিতে অস্বীকৃত বোঝা যায়।

“তারপর মিস্ ম্যারিয়ান মরণান আমাকে মুক অভিনয়ের জন্য তাঁর দলে ডাকিলেন।” তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল। মিস্ ম্যারিয়ান দেখিলেন, কোন মার্কিন যুবককে এই কাজে নিযুক্ত করিলে, গোলমাল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কেননা, যে কোন যুদ্ধে যুদ্ধের জন্ত তাহার ডাক পড়িতে পারে। আমি বিদেশী, ভাষা-ভাষিকের সম্ভাবনা নাই, তাই আমাকে ডাকিলেন, স্তবরা আমার অযোগ্যতাই যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইল। মুক অভিনয়ে কথাবার্তারও প্রয়োজন নাই। অবশ্য, মিস্ ম্যারিয়ান যখন আমার নিযুক্ত করেন, তখন ইংরেজিতে কথাবার্তা বলিতে একরূপ ভালই শিখিয়াছিলাম। এই দল একস্থানে বসিয়া ছিল। এখানে সেখানে অভিনয় দেখাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। কয়েক বার ঘোরাঘুরির পর দল যখন লস্ এঞ্জেলসে আবার ফিরিয়া আসিল, স্থির করিলাম, আর ঠাঁইনাদা হইব না।

“ইহার কিছুদিন পরে আমেরিকিউ থিয়েটারে একটা কাজ জুটিল। বেতন সম্ভায়ে পাঁচ ডলার, অভিনয়ের কাজ না হইলেও, রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কীয় বলিয়াই উহা গ্রহণ করিলাম। কোনো, কোন নাট্যবিভাগে প্রবেশ করিয়া অভিনয় শিক্ষা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব, অথচ শিক্ষারও প্রয়োজন। কোথা থিয়েটারের সংগ্রহে থাকিলে ঐ শিক্ষা সহজেই হইতে পারিবে। এই থিয়েটারে একস্থান বই অনেক দিন অভিনীত হইত না, সম্ভায়ে সম্ভায়ে নূতন বই দেওয়া হইত। বেশী হইলে দুই সম্ভাহ। বই টিক করা এবং পাট বিক্রি করার তার ছিল মিস্ উইলকিন্সের উপর। শুক্রবার রাতে তিনি অভিনেতাদের পাট বিক্রি করিতেন। আমিও পিছনে গিয়া পাড়াইতাম, ছোট

রাটো যদি কিছু মেলে। বহু শুক্রবার বিফল হইল, কিছুই মিলিল না। অবশেষে নহাৎ নাহোজোয়া দেখিয়াই বোধ হয় মিস্ উইলকিন্সের দয়া হইল। আমাকে ডাকিয়া আমার শিক্ষা দীক্ষা, উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ আশা ভরসা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। আমার নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় তিনি বিমগ্ন করিলেন এবং একটি পাট দিলেন। একটি নয়, দুইটি; কিন্তু এত ছোট যে, নাম মাত্র—দুই চারিট কথাই বেশী নয়।

“ইহাই আমার প্রথম সুরাক অভিনয়। মহা ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেও বোধ হয়, আমি এতটা দূরী হইতাম না। আর্থিক লাভের কথা বলি। এক সম্ভায়ে জ্ঞান অভিনয়, প্রাশ্রিতিক নয় ডলার। একটি কুমিকায় সাক্ষাতভোজের পোষাক পরিতে হইবে, তদন্ত একজোড়া ভাল জুতা এবং একটা ভাল ব্যাকটের দরকার। অপর কুমিকায় খানসামার পোষাক। এই দুই প্রথ পোষাকই আমাকে যোগ্যত করিয়া লইতে হইবে, থিয়েটার কোম্পানী দিবে না। আমার নিজের কাপড় চোপড় এ কাজে চলিবার মতো একটি নাই। হয় তাড়া করিতে হইবে, নয় কিনিতে হইবে। জ্যাকেট ও অন্তর পোষাক তাড়া করিলাম, কিন্তু জুতাভোড়া কিনিতে হইল। ইচ্ছা হইত নয় আর নয় আঠারো ডলার নিজের পকেট হইতে বরাদ্দ করিলাম।

“ইহার কিছু আগে পিতামাতা ভাইভগিনী—লস্ এঞ্জেলসে আসিয়াছেন। পিতার দুঃশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। এমন অবস্থায় নূতন বাগায় পসার জমানো অসম্ভব। উপার্জন একরূপ নাই বলিলেই হয়। বিদেশে রুহৎ পরিবার, উপার্জন নাই, কি যে নৈরুদ্ভাশার আমাদের দিন সাক্ষ্যেছিল, কি আর বলিব! এই অবস্থায় যখন সকলে কুনিয়ল, আমি নয় ডলারের চাকরী করিতে গিয়া ১৮ ডলার পকেট হইতে বরাদ্দ করিব, তখন

তাঁহাদের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

“কি করিব! আমার গতান্তর ছিল না। আর ইহাও ঠিক, কোন কাজে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন, অনেক সময় অর্থব্যয়ও করিতে হয়।

“আর একটা ভূমিকা পাইব, মনে খুবই আশা ছিল। মিস্ উইলকিন্স আমার সে আশা পূর্ণ করিলেন। এ ভূমিকাও খুব ছোট, তবে দুই সম্ভায়ে জ্ঞান। আমার ব্যবহারে এবং কার্যকলাপে আমার উপর তাঁহার একটু আস্থা হইয়াছিল। আমাকে নানা উপায়ে সাহায্য করিতে তাঁহার একটু আগ্রহও দেখিলাম। মিস্ উইলকিন্সের নিকট যে আমি কত কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়।

“এইরূপে রঙ্গমঞ্চের কাজের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে অভিনয় কয়েক মাস ধরিয়া করিলাম। তারপর ষ্টেজ ম্যানেজারের কাজ মিলিল। আমার এই পদোন্নতি একরূপ মিস্ উইলকিন্সের জন্তই যে হইয়াছিল, বলাই বাহ্যিক। বেতন হইল সম্ভায়ে দশ ডলার। সঙ্গে অভিনয়ের কাজ থাকিলে উপরি আরও ৫ ডলার। অভিনয় শিক্ষা এবং রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অজ্ঞতা লাভের পক্ষে এ সুযোগ আমার আশীর্বাদ। যদি কোন সুযোগ না মিলিত, এমন কি এই জ্ঞান উপবাসও করিতে হইত, তাহাতেও আমি প্রস্তুত ছিলাম।

“রুহৎ পরিবারের পক্ষে এই আয় একপ্রকার উপবাসই বলিতে হইবে। উপবাসে আমার নিজের দুঃখ নাই, কিন্তু পিতামাতা ভাইভগিনীদের শুষ্ক মুখ দেখা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল।

“থিয়েটারে আমার সমগ্রস্থ বঁধুবার, সম্ভায়ে ৩৫ ডলারের কম কেহই পান না। আমার বেলায়ই কেবল ১০ ডলার। আট মাস এই ভাবে কটাবার পর, যখন রঙ্গমঞ্চের কাজ বেশ দক্ষতা লাভ হইল, এবং সকলেই তাহা স্বীকার করিতে লাগিল,



হইল, তখন বেতনবৃদ্ধির আবেদন করিলাম। উত্তরে বড়-ম্যানেজার সাহেব কেবল একটুখানি ব্যঙ্গ হাস্য করিলেন।

“স্বতরাং অল্প কাজ গুজিতে লাগিলাম। কালিকাগিয়া থিয়েটারে একটা জুটিয়া গেল, টিকা কাজ। কোরাসে পান গাছিতে হইবে। বেতন সপ্তাহে ৩৫ ডলার। এই ৩৫ ডলার এবং পিয়ানো শিখাইয়া বাহা পাইতাম, তাহাতে অনশন-ক্লেশ দূর হইল।

“নাট্যজগতে মিস্ মরগ্যানের তখন যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তিনি ছায়াগানের জন্ম এক নাচের রূপ গঠন করিতছিলেন। আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া পাঠাইলেন। নাচে আমার তেমন দক্ষতা ছিল না। একথা বলা সত্ত্বেও তিনি ছাড়িলেন না। আমাকে পরীক্ষার দিতে হইল। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইল না। অপর একজনের ভাল হওয়ায় মিস্ মরগ্যান তাহাকেই নিযুক্ত করিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি আমার তেলিকোন করিলেন—‘সে লোকের দ্বারা কাজ চালান একরূপ অসম্ভব। তোমাকে নিযুক্ত করিতে চাই।’

“নিযুক্ত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে এই অভিনয়ে মৃত্যুর সম্বন্ধ মধুর থাকায়, আমার অভিনয় বেশ প্রশংসাই লাভ করিল। একটু নামও হইল। তারপর হইতেই ছায়ানাট্যে এই পরণের অভিনয়ের জন্ম ডাক পড়িতে লাগিল।

“এতদিন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে সবাক অভিনয়ের দিকেই আমার ঝোক ছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে ক্রমশঃ নির্ভীক ছায়ানাট্যের অভিনয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইল। যখন বুঝিলাম, এইরকমই আমার গতি একরূপ নিশ্চিত হইয়াছে, তখন পূরাপূরি ছায়ানাট্যের অভিনয়ে হওয়াই স্থির করিলাম। ছায়ারাজ্যে আমিগোনা বন্ধ করিয়া বিলাম এবং রীতিমত ভূমিসারী করিতে লাগিলাম।

“১৯১৭ সালের মার্চ মাসে ছায়ানাট্যে অভিনয়ের

জন্ম আমার প্রথম ডাক পড়ে। প্রথমে উপরি ভাঙ-করা অভিনয়ে হিমায়ে। চারিবৎসর এই উপরি ভাঙিয়া উপর যোরা-কোরার পর বাস্ তালিকার নাম উঠে এবং ভূমিকা মিলে। প্রথম পাট বিলিল, “মিঃ বার্ণল অফ নিউ ইয়র্ক” ছবিতে, অতি ছোট পাট। এত ছোট যে, এক সপ্তাহের সম সময়ের মধ্যে, কাজ শেষ হইল। কিন্তু এই এক সপ্তাহের কাজেই আমার তথিবাৎ একরূপ নিযুক্তি হইল।

“এই এক সপ্তাহের কাজে ১০০ ডলার পারিশ্রমিক মিলিল। তার পর “স্ববাইয়া” ছবিতে অভিনয় করি। এই কাজে পাঁচ সপ্তাহ লাগে; পারিশ্রমিক প্রতি সপ্তাহে ৭৫ ডলার। তার পরের অভিনয়ে “প্রিন্সার অফ জেগু” ছবিতে। এই ছবির পরই কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হয়, সপ্তাহে আমি ১০০ ডলার করিয়া পাইব।

“সপ্তাহে একশত ডলার—আশাতীত উপার্জন। গ্রাসাচ্ছদনের অভাব আর রহিল না। দারিদ্র্য হৃদয়ের একরূপ অবসানই বলিতে হইবে।

“১৯২১ সালে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করি। তাহার পর হইতে অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করিতে হয়। প্রায় সবগুলিতেই প্রধান পাট।

“এই অভিনয়-মাফল্যে আমার প্রধান গর্বের বিষয় এই যে, আমি মার্কিন নই, আমি বিদেশী। বিদেশী বলিয়া এত দিনের নিক্সত্বে এবং নির্যাতন যে আমাকে একটুও দমাইতে পারে নাই, এই আশ্চর্য্যসাহই আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার।

“আমার সাক্ষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বেযোগ লাভ হয় “বেন্‌হুর” ছবিতে। “বেন্‌হুরের” প্রধান ভূমিকা অভিনয়ের জন্ম আমার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। বোর হয়, সেই জন্মই সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া থাকিল। ঠিক মনে আছে, সেদিন রবিবার রাত্রি, ভাইরেক্টর টেলিফোন করিলেন—তোমাকে জুঁ পাট দেওয়া হইবে।

“এই ছবির কাজে আমাদের বেড বৎসর থাকিবে হইয়াছে। এরিনা (arena) প্রস্তুত করিতে অনেকটা

সময় লাগে। ইতিমধ্যে আমরা “দি মিডগিগ্‌স্‌ ম্যান” ছবির কাজ শেষ করি। এরিনা প্রস্তুত হইলে Charlot maco মুক্ত তোলা হয়। এই রেস্‌ আমার জীবনের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

এই রেসে বিপদের আশঙ্কা ছিল কিনা, প্রশ্নের উত্তরে নোভারো বলেন,—

“হাঁ, বিপদের সম্ভাবনা খুবই ছিল।”

এই সব ব্যাপারের প্রায়ই বদলি লওয়া হইয়া থাকে। এই রেসে নোভারোর পরিবর্তে অজ কোন অভিজ্ঞ লোক তাঁহার স্থানে গৃহীত হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করার নোভারো বলেন,—

“না। এই রেসের পৌরব আমানই প্রাপ্য। বিপদের হুমকী হইয়া প্রতিমুহুর্তে আশা-আশঙ্কার হ্রস্পন্দন—এত বড় একটা অজিজ্ঞতা লাভের সুযোগ জীবনে অতি অধিক আসে। আমি সে সুযোগ হারাও নাই। আমার বলি গৃহীত হয় নাই।”

Charlot race শিখা সম্বন্ধে বলেন,—

“স্বভাব করমৎ করিতে হইয়াছে। শিক্ষার সময় একজন গুস্তাফ সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আল্লা যোড়ায় তিনি পাশে পাশে দৌড়াইতেন। দৌড়ের সময় যোড়া বেশ রাখা সব চেয়ে শক্ত কাজ। ছোট বেলা হইতে যোড়ায় চড়া আমার অভ্যাস থাকায়, আর পক্ষে তেমন শক্ত হয় নাই। সে অভ্যাস এখনো রাখিয়াছি। তা ছাড়া, সাঁতার কাটা, দৌড়ানো, টেনিস খেলা—এ সবকলও আমার বিশেষ ঝোক। লুৎজেলগাসে আমার বাড়ীতে আমার নিজের টেনিস কোর্ট আছে।”

ছায়া-রাজ্যের রাজাদের গৃহের কাছে অনেক রাজ-প্রাসাদও হার মানে, গৃহের কথায় নোভারোর গৃহ কিম্বদ—এই প্রশ্নের উত্তরে নোভারো বলেন,—

“একটা মামুলী পুরানো বাড়ী কিনিয়া কিছু কিছু বোতাম ও অঙ্গল বদল করিয়া লইয়াছি। যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, বেশ আরামে থাকা যায়। গাভা সৌষ্ঠব তেমন কিছুই নাই। গৃহে কিনা

গৃহস্থালীতে কোনরূপ জীকৃন্দক বা বড়মানুষী আমার পোতে নাই। আর সে দিকে আমার আগ্রহও নাই। গৃহের গুরুত্ব ও স্বথশান্তি ওসবে কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার সব চেয়ে সুখের কথা এই যে, পিতা মাতা ভাইভগিনীদের থাকিবার মতো একখানি বাসগৃহ করিয়া দিতে পারিয়াছি এবং তাহাদের জীবন যাত্রায় এবং উন্নতিতে সাহায্য করিতে পারিতেছি।

এই প্রসঙ্গে নোভারোর সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে অর্থাৎ বিবাহাদি করিবেন কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন,

“করিব না—এমন কোন পণ নাই, তার কারণ, হইয়া উঠে নাই। এতদিন আমি নিতান্তই দরিদ্র ছিলাম। দারিদ্র্য এখন নাই বটে, কিন্তু এত ব্যস্ত যে বিবাহ এখন সম্ভব নাই। আমার মনে হয়, বিবাহিত জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে পারিব বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহারই বিবাহ করা উচিত। তজ্জন্ম যথেষ্ট অবসর এবং সাধ্য সাধনার প্রয়োজন। সে সুবিধা যাহার নাই, তাহার পক্ষে বিবাহ অনেকটা বিড়ম্বনা।

“আমারও এই অবস্থা। অভিনয় ব্যাপারে আমি একরূপ হাত পা বাঁধা; আর উহাতে আমি এতটা ব্যাপৃত যে বিবাহিত জীবনের কর্তব্যগুলি ঠিক ঠিক পালন করা অসম্ভব। আমার প্রীত উপযুক্ত তত্ত্বাবধি যদি না করি তাহা হইলে নিতান্তই অবিচার করা হইবে। যদি কখনো অবস্থার পরিবর্তন হয়, সময় সুবিধা আসে, তখন—

সেরূপ কোন সম্ভাবনা ভবিষ্যতে হইবে কিনা—উত্তরে বলেন, “হাঁ, সে সম্ভাবনা আছে। অবশ্য, যদি আমার তথিবাৎ সম্বল কার্যে পরিণত হয়। বর্তমানে আমার কণ্ঠস্বরের উন্নতি এবং সঙ্গীতে আরও পারদর্শিতা লাভের জন্য বিখ্যাত গায়ক এবং সঙ্গীত শিক্ষক Louis Graveure-এর নিকট শিক্ষালাভ করিতেছি। সেটো পোজুইনের সঙ্গে যে চুক্তি, এই বৎসরেই উহা শেষ হইবে। তারপর মাত্র একটা ছবিতে অভিনয় করিব, বাহ্যতে অভিনয় প্রকৃত অভিনয় হয়। অবশিষ্ট সময় একাত্তানবানদ সম্বন্ধে নিয়োগ করিয়া—হাঁ,







পূর্বে তাহা জনসাধারণের সমক্ষে প্রচারিত ও বিশেষজ্ঞ-  
গণ কর্তৃক আলোচিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

**জানকীনাথ** বহুর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ও রাজবন্দী শ্রীযুক্ত  
শরৎচন্দ্র বহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অশোকনাথ বহু নিউনিক  
বিশ্ববিদ্যালয়ের “ডক্টর অফ ইঞ্জিনিয়ার” উপাধি লাভ  
করিয়াছেন। ১৯৩১সালে কলি-  
কাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-

এস. সি উপাধি গ্রহণ করিয়া অশোকনাথ ১৯৩২ সালের

অক্টোবর  
মাসে App-  
lied Che-  
mistry তে  
উচ্চতর  
শিক্ষালভের  
জন্য জার্মানি  
যান। অধ্যা-  
পক বুচার-  
রের অধীনে  
তিনি মিউনি-  
কের Technische Hochschuleতে অধ্যয়ন করিতে  
আরম্ভ করেন। তিনি বঙ্গশিল্পে রপ্তান প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ  
হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কলেজে অধ্যয়নের সঙ্গে  
সঙ্গেই তিনি জার্মানির প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান I. G. N.  
Farben Industriesতে Dyeing and Printing  
সম্বন্ধে হাতে কলমে কাজ শিখিয়াছেন। আগামী আগষ্ট



শ্রী অশোকনাথ বহু

মাসে coal-tar distillation সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন  
করিবার মানসে অশোকনাথ রটগার কোম্পানীর কারখানায়  
যোগদান করিবেন। তৎপরে তিনি I. G. N. Farben  
Industries কারখানায় শিক্ষা গ্রহণ করিবেন সম্বন্ধ  
করিয়াছেন—তদনুযায়ী তাহাকে আরও দুই বৎসর  
জার্মানিতে অবস্থান করিতে হইবে।

বাংলার বিখ্যাত বহু পরিবারের এই উদীয়মান  
যুবকের সাক্ষ্যে আমরা আশা আশঙ্কিত। অশোকনাথ  
বঙ্গশিল্প সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া  
পিতৃ-বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন ও বাংলার বঙ্গশিল্পের  
উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করুন ইহাই আমরা কামনা  
করি। প্রিয়তম পুত্রের এই সাক্ষ্যে রাজবন্দী পিতাকে  
যে উৎফুল্ল করিয়াছে তাহা সহজেই অহমেয়।

**শিবাজী ও মারাঠা** জাতি, বুদ্ধের জীবনী ও  
বাণী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও  
প্রধান শিক্ষক শরৎকুমার রায় সম্প্রতি পরলোক গমন  
করিয়াছেন। মৃত্যুকালে  
তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর  
হইয়াছিল।

তিনি একসময়ে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পূর্বে  
দ্বীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে প্রচলিত আশ্রমে বহুদিন  
ধরিয়া খ্যাতিসহিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।  
তিনি অমায়িক প্রকৃতির ও ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয়  
ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁহার প্রতিভা কম  
ছিল না। তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টার পুরস্কার হিসাবে  
স্বয়ং দ্বীন্দ্রনাথ তাঁহার শিবাজী ও মারাঠা জাতি  
পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

### চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদপটের উপরের ছবি—বারী দ্বীপের একটি গ্রামীন মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি।

“নিয়তি”—নিয়তি অর্থ কিছ তত্ত্ব সমূহের পথ করিয়া ভ্রমের হইবার অসুত কৌশল তাহার জ্ঞান আছে। চতুর্থদান মানুষ  
নিয়তির আবরণে মুক্ত হইয়া তাহাকে ধরিতে যায়—কিন্তু ব্যর্থকাম হয়।

পি. ১৮বি. হাজরা রোডের “বেঙ্গালী প্রেসে” শ্রীরামেশচন্দ্র দত্তের কর্তৃক মুদ্রিত ও

২ হারময় রোড হইতে প্রকাশিত।





কলিকাতা পিটেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৬/এম. ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩



পরিচালক—চ্যামনাল নিউজপেপার্স লিমিটেড

সম্পাদক—শ্রীপ্রবোধ দাস

প্রথম বর্ষ

আরম্ভ—১৩৪২

তৃতীয়া সংখ্যা

## আমাদের পাঠ্য

অধ্যাপক শিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম.এ.

আধুনিক যুগের চিন্তাধারা এত বিস্তৃত ও জটিল হয়ে উঠেছে যে এ সময়ে আমাদের প্রতিভা বিষয় নির্ধারণ করাই শক্ত। জগতের সর্বত্রই নবজীবনের স্পন্দনজনিত চাঞ্চল্য। কি দেশে কি বিদেশে সবখানেই আপন জাতীয় সমগ্র নিয়ে মাুষ্য বিরত হয়ে আছে। যে স্থলে জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সরল ও নির্দ্বন্দ্ব, সেখানে হয়ত শিল্পচর্চা অথবা বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের স্বপ্নে আছে। কিন্তু এমন দেশও আছে, যেখানে কোনও প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন করাটাই একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। সেখানে বই পড়ার স্থা অশরীরী ভাব-বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়; কারণ সেখানে পাঠ্যের চেয়ে কণ্ঠব্যবহার তাগিদ অনেক বেশী।

ধরা যাক আমাদের দেশের কথা। এখানে অন্ধকেরও উপর শিক্ষিত যুবকগণ উপার্জনের জন্ত লালসায়িত, অথচ অর্থের সন্ধান মিলেছে না। কোনও নেতা সন্তায় উপদেশ দিয়ে বলবেন, “যাও, ফিরি করে বেড়াও গে।” কেউ বা ধ্যানভূমিত নেত্রে বলবেন, “হায়! সেই আরণ্যক জীবন! আমাদের পুনরায় সেখানে ফিরে

যেতে হবে।” কিন্তু এত হুঁল উজ্জ্বলের কথা, বেরন এড়িয়ে যাবার একটি স্বকোশল। দৈহ-সংস্কারে ভাব-প্রবণতার চেয়ে গঠনমূলক রীতির অনেক বেশী প্রয়োজন। ধরতাই বুলি যতই মধুর ও আপাত-সত্য হোক না কেন, তার সাহায্যে আমরা উন্নত হতে পারি না। অবশ্য আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার মস্তুর সার্থকতা আছে; কিন্তু জাগতিক জীবের গতি কি সে? বলা বাহুল্য, যুবকগণ তাদের নিজের পস্থা নিজেই ভাল বেছে নিতে পারবেন। বই পড়ার সার্থকতা এইখানেই উপলব্ধি করা যায়। দেশ-বিদেশের মনীষীদের চিন্তা-ধারার সহিত পরিচয় এই কারণেই বাঞ্ছনীয়। জন-মন যদি কেবল মস্তুর দাসত্ব করে, তা হলে তার অবস্থা কিরূপ প্রাজ্ঞ, ইতিহাসের পাতায় তার প্রচুর সাক্ষ্য মিলবে।

দেশের অবস্থা যখন খুব মোচলীয় তখন লেখা-পড়ার চর্চা স্থগিত রাখাই ভাল, এ কথা ভাবা ভুল। যদি তা হ’ত, তা হ’লে ফরাসী ও জার্মান সাহিত্য কখনই গড়ে উঠতনা। রুমের সাম্রাজ্য ইতিহাসের



কথা অনেকই জানেন। এমন কি, গত শতাব্দীতে যখন সে দেশের সামাজিক অবস্থা খুব নিম্নস্তরে এসে পৌঁছেছিল, তার মনোজগতের খার খুব সঞ্জীৱ হয়ে এসেছিল, বিশেষে বাক্যবলী হিসাবে যখন সন্ধ্যার যুবকরা নাম কিনেছিল, সে সময়ে টুর্নামেন্ট, ডট্টো-ডট্টী প্রমুখ মনোবীরা কঠিন সমালোচকরূপে অবিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন এবং বোধকরি জাতীয় ইতিহাসের অনেকটা বোঝে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। স্মৃত্তরাং দেখা যায়, যে নানা বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও, জ্ঞানাদেশবাদের বিরাট ঈঙ্গিত হতে পারে না। বরং উল্টে দেখা গিয়েছে যে যখন জন-মন ক্ষুদ্র ও জীবন-সংগ্রামে ক্ষুদ্র, তখন সে খুঁজছে নতুন আলোক। নৈরাশ্রের ভিতর থেকেও মানুষ জ্ঞানচাক্ষুর কান্ধে হরনি; জীবন যজ্ঞের আহাতি সংগেই করেছে বরা পুঁথির পাতা থেকে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাস্য এই আমরা কি পড়ব? আমাদের পরমাধু অতি স্থগিরমিত, অথচ জ্ঞানরাশ্রের বিস্তার অনন্ত-প্রসারী। দিনের পর দিন হাজার হাজার নতুন বিবিত্ত ও প্রচারিত হচ্ছে; সর্বসাধারণের নত গজলিকা-প্রবাহে পড়ে যা প্রকাশিত হচ্ছে তাই গলাধঃকরণ স্বখনও বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে না। স্মৃত্তরাং, পুস্তক-নির্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে বিচারের বিপক্ষে অনেক বিপত্তি আছে। প্রথম বাধা, মাহুয়ের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও কুটি নামক একটি সামগ্ৰী আছে। দ্বিতীয় বাধা এবং সবচেয়ে বড় বাধা এই যে, জ্ঞানরাশ্রো মতদ্বৈতের অতাব ঘটে না। একজনকে মত অপরের গ্রাহ্য না হ'তে পারে এবং হওয়াও সমীচীন নয়।

তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে জগতের ও বিশেষ করে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে, তার সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ জীৱন্ত রাখতে হলে আমাদের সব রকম বই পড়া দরকার। আমাদের মন সচল। সেটি একটি জড় পরাধীন নয়; সেটি সঞ্জীৱক ও সক্রিয়। আমাদের সকলকে সম্পূর্ণ ও ব্যক্তিগতক সমগ্ররূপে বিকশিত করার প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বে একটি

বক্তৃতায় বর্তমান জগতের চিন্তাধারা-প্রদর্শে 'অধ্যাপক মুজ্জতিপ্রদাং এই সব কথাই বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বেশীরা ভাগ সময়েই আমরা কোন একটি বিষয় অধিকার করবার ইচ্ছায় বই পড়ে থাকি। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোকা যাবে, জ্ঞানের বিষয়গুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটির বাদ দিয়ে অপরটির সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ চর্চা একপ্রকার অসম্ভব। কিছুদিন পূর্বেও সাধারণ শিক্ষার specialisationের যুগ চলছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে মনীষীদের দেখা পড়ে এইটুকু অন্তত বোঝা গিয়েছে, যে জ্ঞানের ভাঙার compartmental system চল না। বাছাই ও ভাগ করে যদি একটি কক্ষের ভিতর আমরা বাস করি তা হ'লে আমাদের মন একশেষদর্শী অথবা সঙ্কীর্ণ হতে পারে। উর্দ্বারের তত্ত্ব-রচনের মতই আমাদের জ্ঞানচাক্ষুর নিরর্থক এমন কি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। জ্ঞানরাশ্রো নেতি-মূলক নির্বাচনে ট্যাংজেডি অনেক জীবনমই খটেছে। কহিতি এই, যে বিষয়গুলি আমরা আলোচনা বা চর্চায় বহিষ্কৃত করে দিয়েছিলাম, "সে শুলি সদর দরজা" না দিয়ে বিড়কী দরজা দিয়ে প্রবেশ লাভ করেছে। জ্ঞানগত বিষয়গুলি যখন সনাক্তরূপে বিচ্ছিন্ন করা যায় না তখন জ্ঞানচাক্ষুর আমাদের দৃষ্টান্তবীর পরিবর্তন একান্তজগৎ কাম্য।

আধুনিক জগতে যে বিষয়গুলি জনসাধারণের মধ্যে তাদের অপরিহার্য আবশ্যকতার জন্ম বহুল প্রসার লাভ করেছে, সেগুলি হ'ল অর্থ ও রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজ-নীতি ও বিজ্ঞান। আমরা যে যুগে বাস করি, সেটি হ'ল সর্বস্তো-ভাবে বৈজ্ঞানিক যুগ। স্মৃত্তরাং জ্ঞানের বিষয় বই হোক না কেন, বিজ্ঞান-চর্চাকে কোন মতেই নিরাস্ত্র করা যায় না। বিজ্ঞান কথাটির অর্থও একটি বিশিষ্ট ও শৌকিক ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু তার বাহ্যায় অর্থ হচ্ছে বিশেষ রূপে জ্ঞান। জ্ঞানের ঐশ্বর্য যেখানে অসীম, সেখানে যেখানে অসংখ্য, সেখানে আমাদের মনে প্রশ ও আত্মবিকি যে কেবল বই পড়েই কি আমরা সর্ব-বিষয়ে স্থপতিত হয়ে উঠব? এমন দুরাশা অবশ্য আমরা

পোষণ করি না। জ্ঞানের অর্থ পরিবর্তন-সাপেক্ষ। এক কালে জ্ঞান ছিল গভীরতা-জ্যোতক, এখন হয়েছে ব্যাপ্তি-বাহক। এইখানে H. G. Wellsের লাইন কয়েকটা গ্রহণীয়যোগে—“We range wider, last longer and escape more and more from intensity towards understanding.” স্মৃত্তরাং জ্ঞানের ব্যাপ্তিপন্থিত অর্থ বই হোক না কেন, জ্ঞানের মীমা ক্রমশঃই পরিবর্তনমান। যে কোনও শিক্ষণীয় বস্তুই হোক, আমাদের পিছনে অতীত-সিদ্ধিৎ পরিমানে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন। নতুবা বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমাদের হবে না। কি সমাজ-তত্ত্বে, কি অর্থনীতিতে, কি রাষ্ট্রজীবনে, সর্বত্রই অসংযত চিন্তার চিহ্ন আমাদের জীবনে স্থপষ্ট। আমরা মনে প্বেষমাণার থেকে কোনও আন্দোলনে যোগ দিতে, অথবা অবস্থার কলনরাশ্রো বিহার করিতে উঠব। অথচ মাহুয়কে উরত হ'তে হ'লে তাকে দূর করতে হবে অসংলগ্ন ও মূল্যহীন উচ্ছ্বাসের আবক্ষক। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অথবা পুস্তক-পাঠে আমাদের মন শুদ্ধ, নিসম্পূর্ণ ও জ্ঞানাহরণী হবে। সমাজনীতিই হোক, অথবা অর্থনীতিই হোক, মাহুয়ের অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ই বিজ্ঞানের উপর স্থপতিজিত। সমাজ-তত্ত্বেও কথা বলা বাক্য। এ বিষয়ে অহুশীলন করতে হলে আমাদের স্মৃত্তরাং চর্চায় প্রয়োজন; আবার স্মৃত্তরেও সহিত জীবনধের বহিষ্ট সম্পর্ক। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তাই; যখন এখানে সর্বপেক্ষা কাম্য মনোবৃত্তি। আর সেই মনোবৃত্তির সঙ্গে বিশুদ্ধ চিন্তা পদ্ধতি অতি নিকট রয়েছে। স্মৃত্তরাং যে বিষয়টি নিয়ে আমরা অগ্রসর হইনা কেন, বৈজ্ঞানিক চিন্তাবৃত্তির ছাপ সর্বত্রই বিরাজ করছে।

কিন্তু এখন একটি বিপদের সম্ভাবনা আছে; তার উন্নয়-প্রয়োজন। মন অতিরিক্তমাত্রায় নিসম্পূর্ণ হ'লে, যাহোক জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের জীবনের অথবা সমাজের যোগ্যত মনে যেতে বাধা। যেমন, আমরা শুধু পড়ার জগেই পড়ে থাকি। ছাত্রাবস্থা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়তে আমরা অনেক অধ্যাত, বিখ্যাত গ্রন্থকারের পুস্তক

মুখস্ত করে এসেছি। অনেক শিওরী শিওরী; কিন্তু কুলেছি প্রাকটিকসেই শিওরীর সার্থকতা। শিওরী শিবতে কাকুর মানা নেই; কিন্তু সেই শিওরীগুলি কি কেবল মৃত মত-বাহুরে পরিণত হয় না, যদি পড়বার সময় আমরা কোনও উদ্বেগ না নিয়ে বসি? আমরা টাইপিং, পড়ি, মার্শালের বই মূগধ করি, অজ্ঞাত নানাবিধ অর্থ নৈতিক বা ঐতিহাসিকের মত সময়ে শিখি; কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, বা ঐতিহাসিক ধারার সহিত এগুলির সম্পর্ক কি তা ভাববার অবসর পাই না। ভারতীয় সমাজ হ'ল পরিণাম-গত। যে চুটি ভিত্তির উপর আমাদের জীবন ধারা স্থপতিজিত হতে চলে হ'ল গোষ্ঠীগত জীবন। বই পড়বার সময় এই ঐক্য অথবা বিরোধের স্বতগুলি মনে রাখা উচিত। আমাদের দেশের উপাধান, নীতি ও নীতি, ও সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অজ দেশের থেকে কি বিদ্যাপে ভিন্ন, সে যথেক আমাদের জ্ঞান অতি স্বল্প। সেইজন্ম কেবলমাত্র নব-প্রকাশিত পুস্তক পাঠে আমাদের কোনও উপকার হবে না, যদি না আমাদের মন সজাগ থাকে। সর্বদা মনে রাখতে হবে—যে সব বিদেশীয় মনীষীদের চিন্তারামির সঙ্গে আমরা প্রতিক্রিয়ায় পরিচিতি হই, তাদের দান কতবানি, তার কতটুকু আমরা আশ্রয়্য করতে পারি, কতটা আমাদের আত্মোপলব্ধির সহায়ক, আর কতটাই বা আমাদের দেশের পক্ষে প্রযুক্ত ও উপকারী। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। দার্শনিক বিচারে হয়ত কোনও অর্থ-নৈতিক মত-বাদ নিম্নলিখ বা খাটী বাদ-প্রতিপন্ন হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের মত শিক্ষা ও নীতি সম্পন্ন দেশে তার স্থান ও অবসর আছে কিনা! অথচ কোনও মতবাদের গ্রহণের পূর্বে আমাদের অহুশীল-গুলি সন্ধান-সাপেক্ষ কিনা? ধনী-সম্প্রদায়ের উজ্জ্বেদ সন্ধানের পূর্বে ভেবে দেখা যেতে পারে, আমাদের দেশে প্রভুত অর্থ যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, তাদের অর্থ আমরা, অর্থাৎ বাঙালী, কোনও ব্যবসারে প্রয়োগ করে অনেকটা বেকার-সমস্তার সমাধান করাও পারি



কিনা? সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায় এই, বিদেশী মুখি থেকে উদ্ধৃত মত-বাদের কোনও সার্বকথাই থাকতে পারে না, যদি না তার সঙ্গে আমাদের আন্তরিক সংযোগ থাকে। টি-এস-এলিয়টের ঐতিহ্যবাদ তাঁর দেশবাসিগণের নিকটেই স্বপুষ্ট ও বোধগম্য। বেলক-চেল্লারটনের মধ্যযুগীয় ইটালোয় ব্যক্তিরাই কদর কামরেন; কারণ ইটালোয় বর্তমান নামক একটি যুগ আছে এবং সেই যুগে অনাথবান্ হস্তে চিত্রশিল্প ব্যক্তির পুরাতন যুগের আদর্শ অম্লসন্ধান করছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান কি এবং ভবিষ্যৎই বা কোথায়? অতীতের ভূত আমাদের স্বপ্নে চেপে আছে; আর সে অতীত ইজরায়েলের অতীত থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রজীবনেরও তাই। বিশেষে যে সব মতবাদের প্রচার আছে, আমাদের দেশের জীবনের সঙ্গে তাদের কতটুকু মিলে? মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা আধুনিক জীবন-সংক্রান্ত এমন বই পড়ব, যা আমাদের জ্ঞানানুরাগ বদ্ধিত করে এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করে, ও আমাদের আচার, ব্যবহার ও চিন্তাধারাকে উন্নত ও পরিমার্জিত করে দেয়।

যেখানে ভুলনা-মূলক বিচারের অবকাশ সেইখানেই সমালোচনার আবির্ভাব ও স্রোযোগ। এইস্থলে একটি কথা আমাদের মনে স্তম্ভই উদয় হয়। আমাদের দেশে সমালোচনা-সাহিত্য খুব কম লোকেই পড়ে। কারণ বোধ হয় আমাদের সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্র এখনও অসংকীর্ণ। কন্যারান্ লেখক আছেন নিশ্চই, কিন্তু সাহিত্যের এই বিভাগটিতে তাঁদের পূর্ব মনঃসংযোগ হয় নি। এক দাবীজ্ঞান ও বীরবল মধ্যে মধ্যে মিষ্ট ভাষায় আমাদের চোখা উদ্ভুদ্ধ করেছেন। এবং তার জন্ত তীব্র কষ্টটিও ভোগ করেছেন। কিন্তু Lupatun (Lapping) এর সময় এটা নয়। কঠোর ও কঠিন সমালোচকের প্রয়োজন আমাদের সবিশেষ। আশ্চর্যজনক জাতির আত্মবিশেষণ না হলে উপায় কী? এ ক্ষেত্রে বড় স্ক্রু বিদেশী সমালোচকের কথা মনে পড়ে।

লেখকটির অতীত আক্রমণ তাঁরা দেশবাসিগণের অম্লসন্ধান ও বিরোধ প্রবৃত্তি কত বেশী পরিমাণে বাড়িয়ে গেছেন!

বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, সব তত্ত্বের কথাই আমরা চিন্তা করে থাকি, কিন্তু দগ্ধত্ব যেন আমাদের জ্ঞানের বহিঃস্পর্শ দাড়িয়েছে। অথচ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই জানেন, এটা কত প্রয়োজনীয় বস্তু। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটা আপাত বিরোধ আছে; সেইজন্যই বোধ হয় আধুনিক যুগে চিন্তার কল্যাণেও হুঁসর মতো ভাবনাটা থাকছে না। কিন্তু বিদেশী চিন্তাধারার গতি কিভাবে? নাম-করা শুধু বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিরাও শেষ পর্যন্ত সমস্ত দিকে ঝুঁকছেন। সুতরাং আমাদের দেশে জীবনের সহিত ধর্মের সমন্বয় বাঞ্জীয়া। ধর্ম অর্থে আমরা কোন সর্বাঙ্গী নানোবৃত্তিকে ইঙ্গিত করিনি—একথা বলা উচিত। দ্বারা ধর্মে মানুষের চিন্তাকে কতখানি উদ্ভুদ্ধ করে, দাবীজ্ঞানসিদ্ধি তার শ্রেষ্ঠ নির্দেশ। এ দিকে আমাদের অবহিত হ'তে হবে; কারণ আমাদের দৃঢ় ধারণা যে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন ধর্মকে অপরিসীম অঙ্গ বলে মনে নেবে। রাষ্ট্রতত্ত্ব জীবন ধর্মের প্রকাশ কতখানি তা ইতিহাস পাঠ্য আমাদের বোধগম্য হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে ধর্মগত একা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইংরাজী ঐতিহাসিকের ভাষায় বলতে হলে—Religious unity leads to political synthesis.

প্রবন্ধের উপসংহারে একটি কথা বলে শেষ করি। আমরা পাঠ্য-নির্বাচনে বেশী ভাগ প্রয়োজনীয় জ্ঞানের উল্লেখ করেছি; কিন্তু একটি বাদ পড়ে গেছে সেটি হল সাহিত্য। জ্ঞানের ছুটি রূপ আছে—একটি হল গুণি বিবরণগত, অপকর্তি রসবস্ত সম্পর্কিত। এই শব্দতত্ত্বের সন্ধান, সাহিত্যে। সাহিত্য আমাদের জীবনকে স্বপ্নায় ক'রে এ কথা অবিসংবাদিত সত্য। সাহিত্য অর্থেই উপজ্ঞান নয়। উৎকৃষ্ট উপজ্ঞানে মানুষ অনেক চিন্তার খোরাক পেয়েছে। বলা বাহুল্য উপজ্ঞান ছ'প্রকারের—এক রকম কোনও উদ্ভুদ্ধ নিয়ে লেখা; আর এক রকম

তত্ত্ব রস হ'ল। উদ্ভুদ্ধ মূলক উপন্যাসের সার্বকথা কোথায় ও কিসে এ নিয়ে স্বদেশে, বিদেশে বহু বাদ-বিতর্ক হয়ে গেছে; কেবল এটুকু বললেই চলবে যে রসবস্তির উদ্ভুদ্ধ-কর্তৃক উপজ্ঞানের স্থান নিলে। কেবলমাত্র প্রকৃষ্ট উপন্যাসের প্রাণ হয়, তা হলে, সে প্রাণ "শেষ প্রাণ" হয়ে দাঁড়ায়। উপজ্ঞানিক ব্যঙ্গ করুন, পোঁচা দিন আপত্তি নেই, কিন্তু শুধু সমালোচকের পাদে পর্যাবসিত হ'লে রসগুণের হানি হয়। উদ্ভুদ্ধ-মূলক উপজ্ঞান আমরা নিশ্চয়ই পড়ব, সেই সঙ্গে কিন্তু আমাদের দেখতে হ'বে, যে প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগত মত ও তাঁর নৈর্ব্যক্তিক মত, এই দুটির স্বদেশে ফলে শোষণে পদার্থটি জড়ি হয়েছে কি না।

উপজ্ঞানের সংজ্ঞা আধুনিক যুগে অত্যন্ত ব্যাপক। বহিঃআমরা এ কথা মনে নিই যে আমাদের চিন্তাগতি সর্বাঙ্গী, তার সরল ও বিস্তৃত প্রকাশ আমাদের ব্যক্তিগত বিকাশের সহায়ক, তা হলে এ কথা স্বীকার করতে হবে, যে উপজ্ঞান পড়ার সার্বকথা আছে। উপজ্ঞানের স্বাধীনতা Wells-এর নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টিতে অতি সুন্দরভাবে সূচী উঠেছে—“We are going to write, subject only to our limitations about the whole of human life. We are going to deal with political questions and social questions. We cannot present people unless we have this free hand, this unrestricted field.” আধুনিক উপজ্ঞানের স্বাভাবিক সার্বকথা-সদৃশ; তার আলোচ্য বিষয়গুলি আমাদের জীবনকে সর্বাঙ্গীণ স্পর্শ করে আছে।

উপজ্ঞান যে আমাদের জীবনকে বৃদ্ধার ও উপজ্ঞানিক করবার সাহায্য করে, যে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর একটি চরিত্রকার উক্তি আছে—“Nothing is more fascinating than to be shown the truth which lies behind those immense facades of fiction—if life is indeed true, and if fiction is indeed fictitious.....Books are the flowers or fruit stuck here and there on a tree which has its roots deep down in the earth of our life...”

একটি কথা এখানে বলা উচিত। কাব্য বা উপজ্ঞান-পাঠের কথা উঠলেই আমরা ভয় পাই, বুদ্ধি বা ভাব-রাগে ও বুদ্ধি-রাগে বিরোধে সন্নিবিষ্ট হ'ল। ইমোশন জিনিট কি মনস্তাত্ত্বিকই বস্তুত পাদের; আমাদের ধারণা, বুদ্ধি-স্বারা উপভোগের সহিত আবেগের অহিন-কূল সম্পর্ক নেই। আবেগ ও উপভোগ কেবলমাত্র cerebral process নয়; ও মানুষের জীবনে বুদ্ধি-বিচারের প্রাধান্য থাকলেও সৌন্দর্য-উপভোগের বস্তুই অবসর আছে।

কিরিতি দীর্ঘ হয়ে গেছে। পরিশেষে বক্তব্য এই, আমাদের পাঠ্যগুলি হবে উদার নানোবৃত্তির পরিচায়ক। দেশ-কাল-পাত্র, অথবা কেবলমাত্র রুচি ও ইচ্ছার মধ্যে তা' অবস্থ থাকবে না। তবে যেহেতু সময় আর এবং জ্ঞান অনন্ত, আমাদের উচিত সব বিষয়েরই কিছু পরিমাণে অম্লসন্ধান। তারপরে আমাদের রুচি ও ইচ্ছার প্রাণ উঠতে পারে; পূর্বে নয়। জ্ঞানার্জনের অথবা পাঠ্যনির্বাচনের প্রথম স্তরটা হ'ল তত্ত্বগত অথবা রুচু সাধনের, পরবর্তী কাল হ'ল আমাদের স্ব-কল্পিত, ও স্বজ্ঞা-প্রণোদিত রুচি অম্লসন্ধানের।





## সহপাঠিনী

অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়

আজ স্বপ্নে দেখলাম ছুটি মেয়েকে

যারা এককালে ছিল সহপাঠিনী,

ও আমার জগতে যারা উল্লিখ হয়েছিল

একই বছরে।

সে বছরটি আমার আয়ুষ্কালের তুফানবিন্দু,

জীবন-খিলানের কেন্দ্রশিলা,

যার আশ্রয়ে ছুটি প্রবল—বিরোধী প্রাণশক্তি পেয়েছিল

সাময়িক স্থিতি।

ওদের একটি আমার ভালো বাসত, আমি বাসতুম

অজ্ঞাটিকে।

এ নিবিড় স্থিতি স্থায়ী হয় না,

পরিবর্তনের গতিবেগ আমাদের নিয়ে চললো গড়িয়ে।

প্রথমা কাছে এল, পেলে প্রত্যাখ্যান;

দ্বিতীয়ার কাছে গেলুম, বললে—টু লেট;

ফিরে আসতে হোল।

ত্রিবেণী বইল আমার তিনটি ধারায়;

আবার বেঙ্গার আশা রাখি না;

মুক্তবেণীর পর মুক্তবেণী কে করে দেখেছে।

বাস্তবে যা অখটন, তাই নিয়েই স্বপ্নের কারবার;

আজ ফের দিল দেখা সেই ছুজনে একই সঙ্গে,

বলে গেল পালা কোরে তাদের ইতিহাস

এমনভাবে যেন একের স্তম্ভিত অস্ত্রের অগোচর।

প্রথমা বলতে লাগলো—

তোমাকে জানাতে এলুম, আজ আমার বিয়ে।

তুমি যেদিন ফিরিয়ে দিলে তারপর একমুগু কেটে গেছে,

সুখ কালজগতে নয়; মনোজগতেও।

পুরুষজাতী কি, ইতিমধ্যে চিনে নিয়েছি।

একের পর এক, কখনও বা একই সঙ্গে অনেক,

যাদের খেলিয়ে বেড়িয়েছি তাদের সংখ্যা ত বড় কম নয়।

বেলাটাও কিছু ভাসা-ভাসা ছিল না।

ভাবতুম, তোমার প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিচ্ছি,

তবু তৃপ্তি পেতুম না।

যেন নির্জলা ত্রাণ্ডির আশ্বাস,

যত না সুখ আলা তার শতগুণ।

আজ আমি রাস্তা, নানা আকর্ষণের আবর্তনে;

তাই ত্রিক করেছি ধাঁধাবো ছোট একটি বাসা

এই নিরীহ ভ্রমলোকটিকে কেন্দ্র কোরে

যেখানে আর কারো জায়গা থাকবে না।

বৈদে থাকতে হোলো একটা অবলম্বন ত চাই;

যদিও এ বাচার মূল্য সেই—আমার মৃত্যু

যাকে তুমি জানতে।

এইবার দ্বিতীয়ার পালা।—

অনেক নিশ্চয় আজ আমি ছাড়া পেয়েছি,

ভিতোস' হয়ে গেল।

লোকনিন্দার পাণ্ডে যে-বান ডেকেছে তার চেউ কি

তোমার কাছে পৌছয় নি?

তবু শোন, তোমায় সত্যি কথাটা বলি।

আমি আজও সতী, বানো, কাগজ-কলামে সতী,

পতি ভিন্ন অপর কাউকে শরীর না দেওয়া যদি হয়

সত্যীত্বের চরম লক্ষণ।

বিয়ের পর দেখতে-না-দেখতে স্বামীটির মুখোশ ঘসে গেল,

স্বক হোল লড়াই প্ররক্তির সঙ্গে প্রতিজ্ঞার;

চিন্তা যাকে ঘৃণা করে বজায় রাখলুম তারই ঘর

বিবাহ-পথে স্বাক্ষরের খাতিরে।

সেহের কথা যে মোটা মন ছিল তার কাছে উপবাসী,

ইনের খোরাক যোগ্যত অস্ত্রের।

দরীশ-মানের এ-পাটিশন কি চলে?

যাও মনের ছোঁয়া পায় তারা তাতে তুষ্ট থাকে না কেন?

এ যেন দারুণ গ্রীষ্মে শীতল পানীয়

বটী তৃপ্তি দেয়, জাগায় তার চের বৈশী আকাজ্জা।

লাগলো সংঘাত স্বামীর স্বভাবের সঙ্গে অহরহের কামনার,

বান দড়িটাও ইলাষ্টিক নয়,

তাই আজ সেটা টুটুলো, প্রকাজ্জভাবে টুটুলো।

বা-পুণী করার পথ আজ থেকে থোলো;

আমি মৃত্ত,

যদিও এ মৃত্তির মূল্য সেই—আমার মৃত্যু

যাকে তুমি জানতে।

আমি তনে গেলাম তাদের ছুজনের কথা নিতান্ত

নিশিগ্ধভাবে,

বাইরে এপিডেমিক লেগেছে তনে কয়েকী যেমন ভাবে,

লাগলোই বা, তাতে তার কি!

ওদের সঙ্গে কোনোকালে যে আমার ঘনিষ্ঠযোগে ছিল

সে-বোধ তখন অত্যন্ত ক্ষীণ।

এমন সময় প্রথমা বললে দ্বিতীয়ারকে—

আমার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার জন্মে দারী তুই,

তোরা জন্মেই ওকে পেঙ্গুম না,

বইল আমার চরম অভিশাপ তোরা ওপর।

উত্তরে বললে দ্বিতীয়া—

অশিশাপটা ফেরত যাচ্ছে,

ব্যর্থতা কি আমারই কম?

কে তার কাণ্ড, জানিস?

তোরা মুখ চেয়েই ওকে নিতে পারিনি।

নাড়া পেয়ে জেগে শুনি গৃহিণী বললেন—

সত্যি বলছি, হিংসে হয় তোমার ঘুম দেখে

কী নিশিগ্ধ প্রাণ তোমার,

কথা কয়েছ তুই এই একটু আগেও।

ওকি, কৌপাচ্ছ কেন, স্বপ্ন দেখেছিলে?

পাশ ফিরে শুলুম,

সাইপ হোল না স্বপ্নরসজ্বাল শোনাতো,

পরে যা হয় কিছু বললেই চলবে;

অশান্তির চেয়ে মিথ্যা ভালো।

## অনুব্রাণ

## শ্রীহরীবোধ রায়

চঞ্চল অঞ্চল দোলে

দোলা লাগে বন্ধ-নিচোলে

মুগ্ধ ভ্রমরা পথ ভালো,

কমলিনী মধু-অম্বরগো

তোমার অধরে ঠাই মাগে।

যেন চঞ্চল দীপ-শিখা

নবধনে বিভ্রান্ত-লিখা

জীবনবনে বন-মল্লিকা

বরষার ছলসলী মলিকা

মলকিছে নয়নের আগে,

বিশ্বয়-উল্লাস জাগে।

ফুলের ডোরে বাধলে তোমার

আঁকুল এলা-চুল,

কানো তোমার চলিয়ে দিলে

স্বমুখে ফুলের ছল,

চলুত পথে পথিকজনের

পথ হ'ল যে ভুল।

তোমার মন্দির আঁখি-দৃষ্টি

করে প্রেম-স্বধা-রস-সুষ্টি

জীর্ণ এ জরাভূত সৃষ্টি

পুষ্পিত যৌবন রাগে,

অপরূপ স্বপ্নর লাগে।

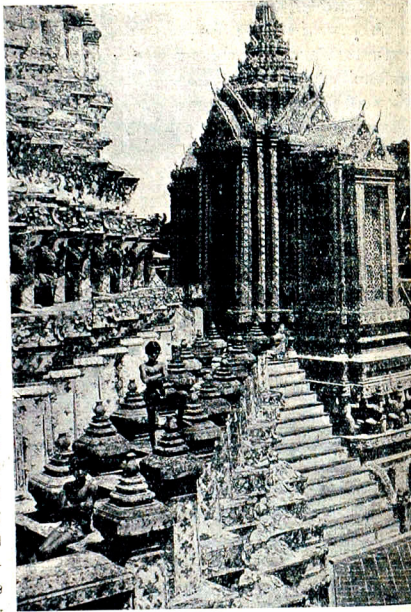




[ ৪ ]

শিল্প-কথা

গ্রামশিল্পের এবং গ্রাম প্রগতির অনেক কিছু তার রাজসিংহাসন ও রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে। রাজ-পুরীর মধ্যে যে মন্দির-গুলির অবস্থান তাদের গঠন-স্বয়ং ও রং বিজ্ঞাস চমৎকৃত করে। মন্দিরের গভন ও চূড়া যে কত রসম অথচ কত স্বন্দর হ'তে পারে, তা এখানে না এলে ধারণা হ'ত না। পথের মাঝে যে সেতু, শুধু লোক ও যানবাহন চলাচলের প্রয়োজন ও স্থবিধা সাধন করে দিয়েই, তার নিম্নেই হয় না। এখানে গ্রাম শিল্পীর একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য বুদ্ধি জাগরিত হয়ে আছে, এবং তার সাধনা রূপ পেয়েছে অতি মনোজ্ঞ ও বিচিত্রভাবে। প্রাচীর চীরে যেখানে একটা সামান্য প্রবেশ দ্বার তৈরী হ'ল, সে প্রবেশ তোরণ শুধুই লোক যাতায়াতের প্রয়োজন-টির মাঝেই নিঃশেষ হয়নি, সেখানেও মুক্তি পেয়েছে শিল্পীর কোন একটি বিশিষ্ট ধ্যান। গ্রাম শিল্পী এসব নিছক প্রয়োজন সাধনের বস্তুগুলো নিয়েই নিজস্ব সৌন্দর্য্য গেলায় রেলেতে ও অনবদ্য রূপ সৃষ্টি করেত ভালবাসে।



রাজপুরীর মন্দিরের একাংশ

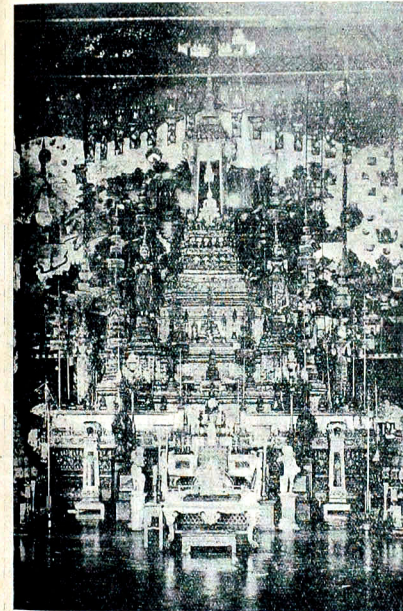
রাজপ্রাসাদের এক অংশ যে দেবায়তনগুলি তার মাঝে মরকত বুদ্ধের (Emerald Buddha) মন্দিরটি প্রধান। প্রশস্ত ও স্বরহস্ত মন্দিরের

প্রাথমিক—১০৪২]

শ্রীবসুভূতি রক্ষিত

মন্দির

ভিতরবিকে দেওয়ালে ও ছাদে মরকত বুদ্ধ জন্ম ও জীবন গাথা রচিত চিত্রে অঙ্কিত। পুরোভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে সজ্জিত ভ্রমকালো মন্দির, সর্বোপরি স্ববৈজ্ঞানিক মরকত বুদ্ধ স্থাপিত। মোকতে আপাগোড়া মন্দির বিধান,— পরিষ্কার।



মরকত বুদ্ধ

দেখলাম উপবিষ্ট গ্রাম নারানী, —ভিক্রম স্বর অঙ্গুরণ করে সমস্তর সন্নিধুর প্রাণনায় রত—সে স্বর ভারতের কতকালের পরিচিত। কোথা ও গোলাবাল কিছু নাই। এমন কি সামনে ধারা বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে

কারও উঠে যাওয়ার দরকার হ'লে, অতি সতর্কপন নিচু হয়ে বা হাঁটু পেড়ে এক পাশে চলে যান। মন্দিরের জন্ম দান পাতি একস্থানে রাখা আছে। এখানে দানের জন্ম কোথাও কাহারও দাবী বা কোন প্রশ্ন নাই; তবুও সে দানপত্র অপর্য্য থাকে না কখনও। ভারি স্বন্দর লাগে মন্দিরমায়ে এই শান্তির ব্যবস্থাগুলি। কিন্তু এই সঙ্গে আবার অল্প হু একটা জিনিস যেন কেমন লাগে। সৈয়ামবাসী বোধ করি অতিরিক্ত তাৎখল প্রিয়; এই উপাসনা গৃহের আসনগুলিতে নান্যস্থানে পিতৃদানি রাখা হয়, এবং মহিলারা বিশেষতঃ সেখানেই তার সম্বাহার করতে থাকেন। বোতলে ক'রে কেউ বা কোন রকম কিছু পানীয় নিয়ে এসেছেন এবং মাঝে মাঝে পেয়ালায় ঢেলে পান করছেন। উপাসনা গৃহের আব-হাওয়ায় মাঝে একগুলি কোন অসামঞ্জস্য এদের লাগে নি!

গ্রামের মন্দির রচনায় একালে চীন শিল্পের প্রভাব কম পড়ছে না। অনেক মন্দিরের ছাতের বক্রমা চীনা আকর্ষণ সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কেলেছে। স্বাররক্ষক প্রহরীর যে বিকট আকৃতি, তার অত্যাঙ্গ পারিপার্শ্বিক শিল্পস্বয়ং সঙ্গে কোথাও সামঞ্জস্য নেই; তবে চীনা কারিগর, শিল্পী বা ইক্সিমিয়ারের মন্দিরের পরিকল্পনা তা নিতান্তই



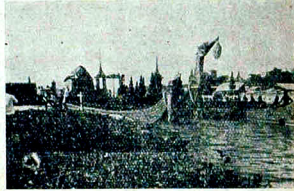
প্রোজাভন; অপদেবতাগুলোর মন্দির চোখে ব্যাহত করার ব্রহ্ম এদের কত না বিশিষ্ট সম্ভার!

এ দেবায়ত্তনগুলি পরিদর্শন করে যে প্রাচীর, তার ভিতর দিকে রামায়ণের সকল ঘটনা বহু ফ্রেস্কো চিত্রে শোভিত। লঙ্কাকাণ্ডে বিশেষ করে, বহু প্রকার মন্দির ও রথের যে উচ্ছল পরিকল্পনাগুলি আছে, তার নবম ও নানাহারিত্বের রূপবর্ণনের নিপুণতার পরিচয় রয়েছে। সৈন্যবাহিনী আজ যদিও বৌদ্ধ, তাদের বৌদ্ধ মন্দিরে—হিন্দুর রামায়ণ পাথার প্রাচীর-চিত্রগুলি এমন সমস্ত সন্নিবেশিত। ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ যে বিরোধ বহিঃ প্রবল হয়েছিল, এখানে তার আঁচ আসে নি?

‘এম্বারাল্ড বুদ্ধ’ মন্দির বাদেও ব্যাংককে অনেক বিশিষ্ট মন্দির আছে। চৌফাইয়া নদীতীরে সন্নিবেশিত বিপুল এক প্রাচীরের চতুর্দশীনা মধ্যেও অষ্ট গো শ্রাম মন্দির সমষ্টির আর একটি প্রধান ও চিত্তাকর্ষক কেন্দ্র। ওখট সেক্ট্রে সংখ্যক শিলাস্তূপ শিখর থেকে সহস্রের চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের সমগ্র দৃশ্য উপভোগ্য।

রাজপুরী ও সেনাবাসের প্রান্তবর্তী স্তূপসমূহ ময়মনের অপরদিকে ‘ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী’ এবং তার পাশে নিউজিয়াম। এই শাখতবনে শ্রাম সভ্যতার নানামুগের শিল্পসাহিত্যের বহুপ্রকার চিত্তাকর্ষক নির্দশন সংগৃহীত আছে। উত্তর গ্রামের স্থানিশাল সেতুঘরের ঘন জঙ্গল, এ রাজ্যের একটি সম্পদ। এই কাঠের কাজে শ্রাম-শিল্পীর দক্ষতা ও বেশিষ্টা আছে। কিন্তু শুধু কাঠ নয়, তার চাইতেও কঠিনতর বস্তু হতে ভাব ও রূপ স্থাপিত কত সুলভ নির্দশনই না এখানে রয়েছে। ধর্মহীন হস্তে ভারতের রামচন্দ্রের যে মুক্তি পুরোভাবে স্থাপিত রয়েছে, তার অসম্ভবতা ও মুখাবরণ দেখলে আনন্দ হয়। সুখোদয় যুগের প্রস্তম্ভগুলির ভাব ও স্ফুটিত চমৎকর্ত ও চকিত করে। ভারতের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ প্রস্তম্ভ-মুষ্টি শিল্পের সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য ও যোগ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সুখোদয় গ্রামের প্রথম স্বাধীন নৃপতি শ্রী ইন্দ্রজিত প্রথম রাজধানী করেছিলেন। ত্রয়োদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে। এর শতবর্ষ পরে আধুনিক (অথোডায়) প্রতিষ্ঠিত পরবর্তীকালের রাজধানী হতে যে সকল মুষ্টি শিল্পের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে, তা সুখোদয় যুগের চাইতে কতই না নিরুৎসাহ! কোন জাতিরই জীবনহুম দেখা নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভবদিকে নয়, ক্ষুণ্ণ ও নয়। পূর্ববর্তী কালের বিকাশ ও শ্রেষ্ঠতা পরবর্তীকালে কেমন করেই না হারিয়ে যায়! মেমোরার বৃক্কে প্রতি-বসন্ত যে স্মৃতি নৌ শোভাবাত্রা ও প্রসিদ্ধ উৎসব হয়,



নৌ শোভাবাত্রা ও উৎসব

রাজবাড়ীর সে মনোহার তরণীও এই শাখত ভবনের সন্নিকটে রাখা আছে।

[ ৫ ]

### জাতীয় জীবন

গ্রামে নারীর অবগুণ্ঠন নাই। এই প্রাচ্য ভূখণ্ডেও উত্তর ভারতে আচরিত নারীর অবরোধ প্রচার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না; এবং সে প্রচার পরিণতি অতিরিক্ত সঙ্কোচ এবং আংশিক অক্ষমতা, তাও এদের মাঝে দেখা যায় না। বাটে, বাজারে, মন্দিরে, বিপণিতে, আহার্য্য পরিবেশনে—সর্বত্র নারীজাতি অন্বেষিত হয়ে নেই। ভারতের মত নারী বিবজ্জিত জীবন ধারণা বহুবিশ ব্যবস্থা ও প্রয়োজন এদের মাঝে আসে নি।

গ্রামে নরনারীর আভ্যন্তর মাঝে চীন ও হাঙ্গের ছাঁদ যদিও আসছে, ভারতীয়ের বিশেষ করে বাঙ্গালীর সাদৃশ্য নিতান্ত কম নয়। কাপড় পরার ভঙ্গিটি বাঙ্গালীর

ধরণেরই; তবে লম্বান কোঁচার চলন নেই। বেশ অস্থায়ণ ভঙ্গ পরিবারে মালাকোঁচা দিয়ে কাপড় পরে, নতুন সাধারণভাবে ধৃতির দৈর্ঘ্য সজ্জা—কোঁচা নেই। বাহা অবশ্য মেয়ে পুরুষ উভয়েরই, জামাও অতি বাহাধিবে; আর গায়ের ওপর থাকে পুরুষ ও মেয়ে উভয়েরই একধার করে উত্তরীয়; মাথা খালি। এই হল জাভান্দীর জাতীয় পোষাক। অনেক মেয়েদের মাথার চুল, পুরুষদের মতই ছোট ছোট করে ঠাঁটা। পুরুষ ও মেয়েদের সময় সময় এত সাদৃশ্য দেখায় যে বোঝার সম্ভাব হয়।

আধুনিকতার হাওয়া পৃথিবীর কোন্ দেশে বয় না? গ্রামেও আধুনিক পরিচ্ছদ অবশ্য পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মেয়েদের বড়-ছোট, গুঁজ এবং কিনে কিনে রাউন্ডের নীচে আঙুর ওঠারের লেস যেন দেখা যাওয়া চাইই এবং আর একটু নীচে লুচি কিংবা ঝাঁট ঝাঁটা চক্চকে উজ্জ্বল হালু; নিশ্চিত একধার কটিবন্ধও। উত্তরীয় হীন, বীধ শাড়ী বজ্জিত, জুতোপরা আধুনিক এই দেশে এদের বেশ ‘সাঁট’ দেখায়, এবং তৎপরতা এনেছেও যথেষ্ট।

পূর্বকালের কথা কোন জানা নেই, বর্তমানকালের সোমাবাদী যেন বড় নিরীহ, শান্তি এবং সুবভোগ প্রিয়। আমাদের বাংলার সাধারণ মেয়েদের চাইতে, এদের সাধারণ মেয়েরা ভাল ভালসবে অনেক বেশী; এবং নারায়ণক মালা ও গুজ রচনায় নিপুণ। এদের বিবাহ প্রথা আমাদের দেশের বর্তমান প্রথার মত নয়। প্রাপ্ত বয়সের ছেলে মেয়েরা পরপরের প্রণয় আবহ হওয়ার সুযোগ পায় এবং তারা নিজেরা বিবাহ স্থির করেন, আপনাদান গৃহ হতে যেয়ে অল্প আত্মীয়ের একটি বাগীতে আশ্রয় গ্রহণ করে সাময়িকভাবে। তৎপরে বাপ না ও গুজকনোরা এই আনন্দ সংবাদ জানতে পারলেই, সাধারণতঃ দম্পতির বিবাহের ব্যবস্থা ও অস্থান করে দেন। যে ক্ষেত্রে শুভাকাঙ্ক্ষীরা সম্মত হ’তে পারেন না, সে ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই সে ব্যবস্থা করে। জীবনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী

মনোনিয়নের অধিকার এবং দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই উপর জুড়ত।

গ্রাম বেশ স্বাধীন সভ্য। ভূমণ্ডলের বত দেশে স্বাধীনতা আজ আছে, তার সকলগুলিই যথেষ্ট উন্নত বলে নয়। গ্রামের স্বাধীনতা যেন তার অবস্থানের উপরই নির্ভর করে আছে। একদিকের রুটিশ অপর-দিকে ফ্রেঞ্চ রাজশক্তির মাঝে (sandwiched), পূর দেওয়া স্কটির মত এই প্রাচ্যভূমির দেশটির স্বাধীনতা বজায় আছে, এটা আমাদের মত হতভাগ্য দেশের কাছে কম আনন্দের কথা নয়। এই ছুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের মাঝে এটি একটি buffer state এর মতই যেন। বাকি বাকি কাছাকাছি, বাকি এবং মালা—কারও সে সৌভাগ্য অবশিষ্ট নেই। এই ইয়েরোপীয় শক্তিবৃহদের (business interest) ব্যবসায় স্বার্থ বিশেষ ব্যাহত হয়ে নেই এই স্বাধীন রাজ্যে। নানা সাম্রাজ্যের লোভলুপ দৃষ্টির চক্রান্ত ভিতরে কম চলে না, সকলেই তার (sphere of influence) প্রতিপত্তির ক্ষেত্র বাড়ানতে যত্নশীল, বলা বাহুল্য।

রাজ্য প্রজাদীপক রাজ্যভিত্তিককালে যথেষ্ট সমারোহ ও বিপুল সৌকিক অর্থচরনের মাঝ দিয়ে যেয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। উনলাম এ পীঠ জাতির অধীশ্বরকে, শ্রেষ্ঠ আগন্তুকদের (প্রায় রাম গ্রাম যুগ প্রভৃতি) রাজদর্শন দান করতে এবং রাজ্যোচিত সম্মানে অধ্যায়িত করতে অস্বীকৃত হতে হ’ত। গ্রামেও রাজ্য দেবতাদ্বারা। কিছুকাল আগে রাজ্য মাঝে ব্যবস্থাপক সংসদ প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল। সম্ভ্রুতি এ রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হয়ে গেছে! সামান্য একটা (coup) আংশিক ‘আঘাত’,—বিনারক্কে এতটা পরিবর্তনের ব্যাপার, পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত নেই। ঠিকপতির যন্ত্রণ এবং পুনরায় পরিবর্তনও হয়ে গেছে। এই তৃতীয় অধ্যায়টি সম্ভ্রুতি হয়েছে অতি সামান্য রূপান্তরে। শোনা যায় প্রজাদীপক প্রজারাজকেই ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি রাজধানীতে ছিলেন না, এবং সেখান থেকেই



ইউরোপে চলে গেছেন। রাজতন্ত্র যাক্ কিছ কতক-গুলি অযোগ্য লোকের হাতে বর্তমান শাসন কার্যের অনেক বিভাগ ভ্রষ্ট হয়েছে, এই মজীবে নাকি পুনরায় আর একটা কোন রকম বিদ্রাব ও পরিবর্তনের গুণ্ডর শোনা যাচ্ছে। এতকালের একাধিপত্য রাজতন্ত্রের মাঝে যে অক্ষাৎ এই বিপুল রাষ্ট্র পরিবর্তন ঘটল গণতন্ত্রের জন্ম এ পক্ষপাত শ্রামের কটা প্রজার মাঝে জন্মেছিল এবং হয়েছে? এ যেন নিছক কতলাভের জন্ম রাজনৈতিক দলদলি, যুগ্ম প্রজাতন্ত্রের বুদ্ধি—ওষু সৈন্তশক্তি করায়ত্ত করে, গুরুত্বপূর্ণ খেলা। হয়ত যারা খেলেছে, তারাও সকলে জানে না, এ খেলার কোথায় পরিণতি। রাজ্যকে শক্তিশালী হতে না দেওয়ায় এবং বরখা বিভক্ত রাধায় কোন গোপন শক্তির হাত এবং চেষ্টা আছে কিনা, কে জানে?

কথা হচ্ছে যে পরিমাণ বুদ্ধি বৃত্তি রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও চুক্তনীতি প্রভৃতির জ্ঞান ও চর্চা একটি স্বাধীন জাতির মাঝে আধুনিককালে প্রয়োজন, এরাজে তা বিরল। এ দেশে শিক্ষিতের শতকরা সংখ্যা ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী। যাদের বিদ্যেবাণ্ড শ্রাম ভাষার ধবরের কাগজ পড়ে থাকে। কিন্তু যে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক বিকাশ ভারতের মাঝে তার সমকক্ষ কিছু নাই। এ দেশের লোকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নগ্নিত চালনা করবার, দর্শন প্রভৃতি জটিল বিষয় গুলি সম্যক আলোচনা করা এবং তা বোঝাবার ক্ষমতা আজও কান-শারও সুনাম, বরীন্দ্রাঙ্গ এখানে এসে যা বহুতর্য বলে-জিহ্বেন, এদের মাঝে তা জরাজনন করত পেলেছে এমন লোক বেশী নাই। শিলা ও সংস্কৃতি অধিক পরিমাণে রাজা ও রাজপরিবারের মাঝেই সংনিবদ্ধ।

এ স্বাধীন রাজ্য হতে বর্তমানে অনেক ছাত্রকে

বিদেশে নানা বিষয়ে জানাজানির জন্ম পাঠান হয়। কিন্তু যে কয় বৎসরের পাঠক্রম, তার প্রায় ষড়্ভঙ্গ সময়েও কৃতকার্য হয়ে অধিকাংশই ফিরতে পারেন না। সেখান থেকে অশ্বা সকলেই বদনুভূতা পারদর্শী হয়ে ফেরে। ব্যাংককে এ মুত্থের বহু সংখ্যক নৃত্যশালা আছে, সেখানে গৌমভাবে শ্রামের জাতীয় নৃত্যের কিছু কিছু নমুনা দেখা যায় বটে। কিন্তু বলনুভূতা এদেশে এসে এখন স্থিত আবহাওয়ার মাঝে সংসারিত হচ্ছে, যে জাতীয় বৌদন শক্তিকে কোন দিক দিয়েও চুটিয়ে তোলে না, শুধু কল্মিত করে চলেছে। এদিকে শ্রামের জাতীয় অভিন্ন ও প্রসিদ্ধ নৃত্যকলার জন্ম রাজধানী ব্যাংককেও কোন একটিও নিষ্কিষ্ট বদনুভূতা প্রতিষ্ঠা নেই। এ নগরীতে Air conditioned এবং অতি আধুনিক বাবস্থায় সিনেমাগৃহের জন্ম যে গৌরব ও আদর হয়েছে; এবং যে



শ্রাম নৃত্য

পরিমাণ সিনেমা ও নাচগৃহ, সে পরিমাণ স্থল কলেজের এবং উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সহরে ট্রাম আছে, ট্যাক্সি ভাড়াও সস্তা, কিন্তু নাগার দারে দারে মাছঘরে যে বাসগৃহগুলি তা দেখলে বর্ধয়ে। সহরে দবার উপপাত গুরই বেশী। পুরুষের চাইতে মেয়েরাই অনেক অধিক কর্মপটু। অনেক মৎসার তারাই চালায়, অনেক দোকানপাট, বিকিকিনি তারাই করে।

বাসা বলতে অধিকাংশ চীনাদের হাতে, শ্রামবাণী এদিক দিয়ে কোথাও নাই,—তারের প্রতিনিবদেই মত।

চীনার সঙ্গে এজাতির সংশ্লিষ্ট বহু পরিমাণে ঘটেছে এবং ঘটে লেগেছে। এইরূপ পরিবারে কিছু নায়ের তাইহা এসে এবং শ্রামের শিক্ষা সভ্যতারই অমূলীন হয়। বাপ চীন হলেও সন্তান সৃষ্টি বা সে পরিবারের মাঝে ভিন্ন জাতীয় আদর্শ বা আবহাওয়া নাই। এমন কি এরকম পরিবারেও কেহ (চীনা) দেয় তেমন শ্রদ্ধা বৃত্তিতে দেখে না শোনা যায়। শ্রাম সভ্যতা এই বংশধরদের নিজের বহু এমনভাব বিশিয়ে নিয়েছে। সাধারণ ভাবে কোনটি নিষিদ্ধ কোনটি বা খাটি অনিষিদ্ধ শ্রাম পরিবার সহজে বোকা চলে না।

ভারতবাণী এ সহরে হাজার পাঁচেক। অধিকাংশ হিন্দুবাণী—গোবরখুর জেলার অধিবাসী। এদের প্রধান বাহ এখানে পাহারাদারি ও দরোয়ানি। সিদ্ধাপুর, যক্ষ ও বংহাইয়ে শিবরা বহুকাল হইতে যে কাজটা নিজের জাতভাইদের মাঝে একচেটে করেছে, এই ব্যাংককেও সেটা কেমন করে অনেক কাল হতে হয়ে গেছে, এই হিন্দুবাণী ভাইবাদের হাতে। এখানকার বড় বড় অধিক, ব্যাঙ্ক ও গোদাম প্রভৃতিতে 'গুয়াচম্যানের' বাজী এদের যেন একচেটায় অধিকারে।

শিবও কিছু পরিমাণ এমহরে আছে। শিবদের এবং হিন্দুবাণীদের কাপড়ের ও সিংহের কিছু কাজ কারবার এখানে আছে। বলা বাহুল্য এ গিঘবস্ত অধিকাংশ গ্রামে প্রবৃত্ত এবং কিছু পরিমাণ চীনে। কয়েকটা পোগান এই সকল ভারতবাণীর আহার্য বস্ত্র সরবরাহের কাজ আছে। শ্রামের বাজারে শ্রামবাণীর জন্ম ভারতে প্রবৃত্ত বিশেষ কোন জবোর স্থান আজও হয়নি। শিবদের কল্কার এবং হিন্দুবাণীদের আর্থ সমাজ ও সমানান্তর উভয়েরই গৃহ এখানে আছে।

বাণালী আছে নে 'জুটি' আছে। এদের কারবার কারও নই। দুইজন এখানে বাজী করে ও বিবাহ করে দলদল করেন, বাকী অস্থায়ী সাধারণ চাকুরীয়া। এ ছাড়া বৈদ্য ভারত সামের স্বামী সভ্যতানন্দ আছে কয়েক

বৎসর। শ্রামভাষা ইনি ভাল রকম আয়ত্ত করছেন। এর সঙ্গে শ্রামের অনেক স্বধীজনের পরিচয় হয়েছে, এবং তাঁদের শ্রদ্ধাও ইনি অধিকার করেছেন। এই অনাড়ম্বর বাংলার সাধকটি ভারতের ঐতিহ্যের কথাগুলি পুস্তিকা ও বক্তৃতা দিয়ে শ্রামে প্রচার করছেন; এবং আশা করা যায় এই সঙ্গে শ্রাম সম্বন্ধে যে বিশদ জ্ঞান ও সম্যক তথ্য সংগ্রহ করবার সুযোগ পাবেন, তা দিয়ে শ্রামের সভ্যতা ও জীবন কথা এ দেশকে শোনাবেন। জাতিকে এমন করে দেখবার ও বোঝবার সুযোগ না করলে কোন জাতি সম্বন্ধে পরিচয় কত না অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তপূর্ণ হতে পারে।

শ্রামবাণীর সঙ্গে এখানকার প্রবাসী ভারতবাণীর বেশা বেশার জন্ম এবং সে সূত্রে তাদের স্থানান প্রবাসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মিলক্ষেত্রে আজও এখানে সৃষ্টি হয় নি। প্রচারের এই ছুটী জাতির পরস্পরের পুনঃ পরিচয় স্থাপন এবং তা সৌহার্দ্যে পরিণতির জন্ম মনোভাব এবং উপযুক্ত মণ্ডলী ক্রমে প্রয়োজন।

[ ৬ ]

শ্রামরাজ্যে প্রবেশ ও পরিভ্রমণের সময় তার ইমিগ্রেশন বিভাগের ব্যবহাওগলার কথা বিশেষভাবে মনে না এসে পারে না। প্রত্যেক দেশেই দেশান্তর গমনাগমনের জন্ম আইন হয়েছে, কিন্তু এখানে বিশেষী ইয়োরাপীয়ের তুলনায় ভারতীয় অগম্যকর জন্ম ব্যবহাওগলার অধিকতর পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছে। আগে এখানে ছিল না। পাগপোটি এবং শ্রাম কামালের ভিষা যথার্থীতি লগ্না সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রবেশ প্রার্থীর জমা দেওয়া চাই ১০০ টিকস (১ টিকস = ১৫/০)। এই মূল্যবান মুদ্রাগুলি রাজকোষের অধিকারে 'চিরতরে' না দিয়ে গ্রামে থাকতে পারা যায় যদিও মোট ছয় মাস পর্যন্ত, শ্রামে শ্রামের সীমানার মাঝে অবস্থানের 'মোদা' একমাগে একমাসের অধিক নয়। জাননি কেউ ছিল এ টাকটা' জমা দিতে হয় না বটে, কিন্তু যে সকল লোক ভারতীয়ের জন্ম ইমিগ্রেশন অফিসে জামিনের জন্ম নিষ্কৃত, তাদের অবশ্য দক্ষিণা দিতে হয়, এবং



তাদের হাতেই পাসপোর্টখানি দাখিল রাখতে হয়। ইমিগ্রেশন বিভাগের অফিসারদের হাতে, পথে রেল-গাড়ীতে ছুবার, ব্যাঙ্ক ঠেগনে একবার, এবং হেড-অফিসে একবার, পরে ব্যাঙ্ক পরিচাপণ করবার পূর্বদিন আর একবার, এবং সেজন্ত গাড়ীতে উঠে আরও একবার যাওয়া চাইই। যারা এই পেশাদার জামিনদারের সঙ্গ না নিয়ে, সোজা জমার মুদ্রাগুলি দিয়ে দেবে, তারও নাকি ফেরৎ হবে গ্রাম পরিচাপণ করলেও একমাসের মধ্যে নয়। অসমর্থকারীদের পক্ষে এটা কৃত অসুবিধাজনক।

কোন দেশে শিল্পকার্য নির্দশন দেখা যে পরিমাণ সহজসাধ্য, তার জাতীয় জীবন ধারাটি দেখা ও বোকা তেমনটি নয়। সকল দেশেই জাতীয় জীবনের মাসে উচ্চ এবং নিম্নতর বলে বসে বসে কঠোর আছে, এবং তাদের মধ্যে নানাবিধের মিল যেমন আছে, দুইটি স্তরে পার্থক্যও প্রচুর। বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও জাতির একটি ছাঁদ আছে, তার বাস্তব ও সত্যরূপটি ধরা দিতে পারে, অতি পক্ষপাতশূন্য মন, জাগ্রত চেতনা ও নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে যদি দেখবার প্রচুর সুযোগ ও সময় থাকে। গ্রাম সভ্যতার হরি-মন্দির দর্শন করে, একটি তীর্থ যাত্রীর নন্দ্যার জামিয়ে যেতে এসেছিলাম; কিন্তু দেহলাল অতি সামান্য। সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে এ মন্দিরের রহস্যের কোথাও উদ্ভূত হয় না,—যেখানে উল্লসিত থাকে সকল বস্তুর সত্য ও সমগ্ররূপ। সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে, সংক্ষিপ্ত অবদর নিয়ে মানুষ যা কিছু দেখে তা অসম্পূর্ণ এবং স্বেচ্ছা সত্য অবস্থা হ'তে বিমূর্ত এবং তার বর্ণনায় অবতার হতে বাধ্য। তবুও মাধ্যমকে নিজ সীমার মধ্য দিয়ে দেখে চলা ছাড়া উপায় নেই।

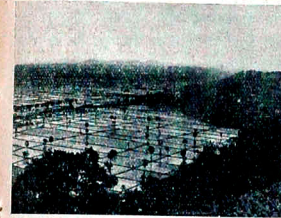
ভাষার দুর্লভ্য প্রাচীরে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদান প্রদানের পুণ্য অবদার করে আছে। পথে গথব্য হাঙ্গনে দিক নির্দেশ জন্ত প্রঙ্গ, টাম, বাস, ট্যান্ডি পৃথিবী রিকশত বাতায়ত, ভোজনালয়ে যেখানে প্রয়োজনীয় আহার সাগ্রহ, ব্যাককে দিয়ে যেমন জিনিষ গর লওয়াই, কোন জিনিষ কেনা, জীবনযাত্রার সামান্য গুটি-

নাটি অথচ প্রয়োজনীয় কাজ যেটান, প্রায় কোন রকম ভাবের আদান প্রদান যেখানে অসম্ভব,—সেখানে, যৌরবার, দেখবার, মোলামেশের, প্রশ্ন করবার এবং তখন বোঝবার গীমা কি নিদারুণভাবে সঙ্গীর্ণ হয়ে আছে। কত ইচ্ছা করে, নানা মানব শিশুর সঙ্গে দেখবার, নানা প্রশ্ন করবার ও শোনার কিন্তু বার্তায় মন জ্বল আকোশে কৈদে ওঠে,—কেন, কেন আমাদের এই ব্যবস্থা ও ব্যবধান। সত্য জগত, সত্য মানুষ আর কতদিন এই অসহ যন্ত্রণাময় ব্যবস্থা ও ভাষার ব্যবহান মেনে নিয়ে চলবে—সভ্যতার এই পরিপন্থী ও বৈপরীত্যক ?

ব্যাংক থেকে অতি প্রাতে গাড়ী ছাড়ল, এ রেলপথ শ্রামবাজারে পূর্ব-সীমান্ত 'অরণ্য প্রদেশ' ঠেগন পর্যন্ত। সেখান থেকে এককর হয়ে, কাঞ্চাল অতিক্রম করে স্থল পথেই সাইগন যাওয়ার উদ্দেশ্য।

গাড়ী ছাড়ার অল্পক্ষণ পরেই, আবার গ্রামের সেই রিক্ততা ও সৌন্দর্যের মাসে পড়লাম। স্রহ ও গ্রাম কোথাও এক নয় সত্য। শুধু স্রহ দেখলে, স্রহের হোটেল জীবন, নাচঘর, সিনেমা, দোকানপাট পরিপাটি পোশাক পরিধি নরনারী দেখলে, অফিস, মিউজিয়াম, জাকাল মন্দির ও পথের ঐক্যই দেখলে সবচেয়ে বেশে জান হয়না সত্য কিন্তু শুধু গ্রাম দেখলেও তা হবে না কোথাও। ভাল এবং মন্দ মিশিয়ে স্রহগুলি গরী অঙ্গ হতেই তাদের এক একটি নিজস্ব প্রয়োজন নিয়ে চুটে আছে, একে অপরী করা যেমন চলে না, একে ঠা করাও চলেনা—এ অমিবার্ধ্য। প্রতিদেশে বড় স্রহের আধুনিক শিক্ত নরনারী, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, হু আসবাব—তাদের জীবন ধারা দূর পর্বা অঙ্গ হতে গির ভে, কিন্তু তাই বলে এদের সকলকে বাদ দিয়ে সে দেশের গ্রামা নরনারী এবং তার সকল কিছুকে বড় করে ধরলেও বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হবে। স্রহের শিক্ত পরিবর্তনশীল এবং আধুনিকরীতি সম্পন্ন লোকসংখ্যা অঙ্গ হলেও, জাতির জীবনে তাদের একটি প্রধান স্থান আছে। গ্রামের লোকও এই পরিবর্তিত রূপের দিকে আকর্ষ করে সাধামত সকল দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। শিক্ত

এই অর্থশীল লোকদের বাদ দিয়ে শুধু ভিন্ন দিকটা দেখলেও অনেক দেখা বাকী থাকতে বাধ্য।



গ্রামের ধান ক্ষেত

## বীমা প্রসঙ্গ

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

### কোম্পানী-বাছাই

গীরা জীবনবীমা করেন তাঁদেরও শতকরা অল্পতঃ ২০ জন বীমা সফল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আর এ কথা স্রহেও বিশেষ ভুল হবে না যে, বীমা কর্মীদের মধ্যেও ধুব বেশীরা ভাগই অভিজ্ঞ নয়। এর ফলে জন-সাধারণ বীমার প্রয়োজনীয়তা কিছু কিছু বুঝতে পারলেও কোম্পানী সফল, অর্থাৎ কোম্পানী ভাল আর কোন কোম্পানী ভাল নয়, এ সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যায়।

যে দেশের পন্যেরো আনা লোক দিন আনে দিন যায়, সেই দেশে 'গীরা অতি কষ্টে বীমার চাঁদা দেন, গীরে সেই চাঁদা কোম্পানী কি ভাবে লম্বী করেন ও বড় করেন, কোম কোম্পানী সত্যিই তাঁদের স্বার্থ রক্ষা যতান, এইটি ভাল করে তাঁদের জানা দরকার। কি করে কোম্পানী-বাছাই করতে হয়, তা-ই এখানে বোঝাই সমলভাবে আলোচনা করা যাক। এ খরচ আসে কোথা

মনোময় গ্রামা আবহাওয়ার মানসি দিয়ে গাড়ী চলে—যে আবহাওয়া স্রহের ভুলনায় কত বিস্তৃত। হুবারে ধান ক্ষেত। এক একটি বৃহৎ চক্রাকার ফ্রেমে কতকগুলি শুষ্ক ছোট ছোট পাল লাগান। বাতাস ভরে ঢাকা ঘোরে এবং সংলগ্ন যন্ত্র সাহায্যে ক্ষেতে জল যায়, বিনা আয়াসে ও ব্যয়ে।

প্রাচীন নগর ছাড়িয়ে ক্রমে অরণ্য প্রদেশের মানসি দিয়ে গাড়ী চলতে থাকে। 'অরণ্য-প্রদেশ' ত অরণ্য প্রদেশই। লোকলায় নাই, বসতি বিরল। হুবারে যতদূর দেখা যায় কেবল গাছ আর গাছ,—তারও ওদিকে সীমান্তে পাছাড়ের সারি।

থেকে ? গীরা বীমা করেন, তাঁদের চাঁদা থেকেই যে এই খরচ হয়, তা বলাই বাহুল্য। স্রহেরা যে কোম্পানী পরের টাকা যত কম খরচ করেন সে কোম্পানী তত ভাল। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। মনে করুন আপনি একটা কোম্পানীতে বসে ১০০ টাকা চাঁদা দেন। সেই কোম্পানী আপনার চাঁদা থেকে ৭০ টাকা খরচ করেন। এই খরচের দ্বারা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ নিজের স্বার্থ পূর্য্যামাত্রায়ই রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু আপনার স্বার্থ রক্ষা করা হ'ল কোথায় ? আপনার টাকারভে মাত্র ৩০ টাকা রয়েল। যদি বলা যায় যে, লম্বী থেকে কোম্পানীর যে খরচ হয়, তা-ই দিয়ে খরচ আবার পূরণও হয়, তা হ'লেও একথা স্বীকার করা কঠিন যে, ৩০ টাকার স্রহের খরচ থেকে বাকী ৭০ টাকার খাটুটি পূরণ হবে। স্রহের খরচ ছাড়াও কোম্পানীর অঙ্গ রকমে খরচ হ'তে পারে, এবং সেই খরচ থেকেও খাটুটি পূরণ



সম্ভব। যদি সম্ভব হয়ও, তা হ'লে একথাও নিশ্চয়ই ঠিক যে, বরচের পরিমাণ শতকরা ৭০ টাকার বড় কম হবে, আয়ের পরিমাণও সেই অল্পপাত্র বেড়ে যাবে। সুতরাং যে কোম্পানী শতকরা ২০, ২৫ বা বড় জোর ৩০ টাকা মাত্র বরচ করেন, সেই কোম্পানীর আয়ও বেশী। ১০০ টাকার যেখানে অন্ততঃ ৭০ টাকা অবধি বাঁচানো হয়, সেখানে যে বীমা কারীর বার্ষিক পুঁজি বেশী ব্যয় থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই সেবা বাছকে যে, কোম্পানী-বাছাই কর্তৃক হলেই সব তারতম্য কোম্পানীর বরচের হার পুঁজি কম, সেই ভুলিকেই বেছে নিতে হয়।

বরচের হার কোম্পানীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষের শ্রেষ্ঠ নির্দর্শক। শরীর সুস্থ কি অস্থির, সবল কি দুর্বল যেমন তাকী দেখে চিকিৎসক কাজ স্থির করতে পারেন, তেমনি জনসাধারণও বরচের হার দেখেও কোন কোম্পানী ভাল আর কোনটুকি ভাল নয়, মোটামুটি স্থির করতে পারেন। অবশ্য আরও একটি বিষয়ের দ্বারাও বীমা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি অবনতি বুঝতে পারা যায়। এইটাই হচ্ছে লম্বী করার প্রণালী। এই সম্বন্ধেই এখন কিছু বলছি। আশা করি এই সরল ও সহজ আলোচনা সকল পাঠক-পাঠিকাই বুঝতে পারবেন।

কোম্পানীর ভবিষ্যৎ স্বাধীন ও উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে টাকা লম্বীর ওপরে। লম্বী মত নিরাপদ হবে ততই মঙ্গল। লম্বীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত হ'তে না পাবুল কোম্পানীর ভবিষ্যৎ এবং অংশীদার ও বীমা-কারীর বার্ষিক সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় কি করে? যে সব কোম্পানীর বরচের হার পুঁজি বেশী, তাদের লম্বীও প্রায়ই নিরাপদ নয়। লম্বী নিরাপদ না হ'লেই কোম্পানীর কতি অনিবার্য এবং কোম্পানীর কতি হ'লেই বীমাকারীরও কতি অব্যবহিত।

বীমা করার সময় এইটুকি মনে রাখা চাই যে, বোনাস্ বা বীমার প্রস্তাবের সংখ্যাদিকাই কোন কোম্পানীর উত্তির মাপকাঠি নয়। এই প্রবল প্রতিযোগিতার যুগে বীমা-

কম্পানীকে অস্বাভাবিক রকমে বেশী পারিশ্রমিক দিয়ে অনেক কোম্পানী পুঁজি বেশী বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ করেন। বেশী পারিশ্রমিকের লোভে বীমাকম্পানী অনেক ক্ষেত্রেই প্রস্তাবের সোনার হাত পা দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের কিয়দংশ দিয়েও প্রস্তাব সংগ্রহ করে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করে এবং মোট পারিশ্রমিকের ওপরেও বন্দীশ লাভ করে। কাজেই প্রস্তাব বা পলিসির বহর দেখেই কোম্পানীকে পুঁজি ভান মনে কবুলে সুবিধেমনার পরিচয় দেয়া হয়নি।

কাজন বীমাকম্পানী একথা ব'লে থাকেন যে, বোনাস্ সম্বন্ধে কোন কোম্পানী প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। প্রতি পাঁচ বছর বা তিন বছর পর বোনাস্ ব্যাংকার নিশ্চয়তা কিছুমাত্র নেই। লম্বী টাকার স্বরের হার কম হলে বোনাসের হার বাড়ানো দুইয়ের কথা। যে হার আছে তাই রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। তা ছাড়া যে কোম্পানী বোনাস্ দিয়ে অথচ বার বরচের হারও বেশী, সেই কোম্পানীতে শুধু বোনাসের আশায় বীমার প্রস্তাব বরচ পুঁজি সাহসের পরিচয় দেয়া হয় বটে।

অন্যকেই হয়তো বলবেন যে, কোম্পানী-বাছাই কর্তৃক গিয়ে বাংলায় বাইরে বাই কি করে? মনে হয়, যে বাংলা দেশে বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর বহু লক্ষ টাকার বীমার প্রস্তাব পাচ্ছে, যে বাংলা দেশের মফঃস্বলের সহস্রও বিদেশী প্রতিষ্ঠানে শাখা কার্যালয় স্থাপিত এবং বাঙালীর সহায়তার সাধনাব্যয় পরিত্যাগ, সেই বাংলাদেশ বীমা-ব্যবসায়ে প্রাদেশিকতার নীতি প্রয়োগ করার দর এতদূরও আসে নি। যখন সময় আসবে, তখন বাঙালীকে আর 'অবাঙালী প্রতিষ্ঠান' খুঁজতে হবে না। বীমা ব্যবসায়ের মতাই প্রাদেশিকতা থাকতে পারে কি না, কিংবা থাকা উচিত কি না, তাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তাই, "বীমা ব্যবসায় প্রাদেশিকতা" সত্ত্বে অগামী সংখ্যায় কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

হে হারকানাথ! কমল চরণে ভব করি প্রণিপাত।  
নাহি সাধকের ভক্তি গোপিকার আহরজি,  
বিধাসে সংশয়ে চিন্তে মাত-প্রতিমাত।  
বার্ষহীন সম্য—যাহে রাখাল তোমারে চাহে,  
সে সম্য দুই ভি—কোথা পাব, ভগবান?   
বোহ-কুখ্যাটিকা টুটি' হুদে নাহি রহে টুটি—  
তোমার স্বরূপ—নাহি হয় প্রতিভাত।  
তবু মন্ত হুরাশায় হৃদয় তোমারে চায়—  
তোমার রূপায় যি যুগে গতযাত।  
অভাজনে কর স্তুতি, হে হারকানাথ!

ব্রজের রাখাল! বিখ-বদ্যাবনে তুমি পালিছ গোপাল।  
ছাদিনী-যমুনাকূলে পরাভক্তি নীপমূলে  
তোমার বাঁশরীরে টুটে মোহজাল;  
হৃদয়ী প্রীতি রাধা তোমার প্রণয়ে বাধা;  
নন্দপুরে তুমি যশোদা-দুলাল।  
গোপীপ্রেম-পথবনে বিহর আনন্দবনে  
শোভি' মুক্তি-শতদলে ভক্তির মণ্ডল;  
পীতবাস অঙ্গোভা ত্রিভঙ্গ আলোচনোভা,  
সর্বজি, কুসুমোচ্ছল গলে বনমাল।  
মাধুর্যমণ্ডিত ব্রজ ব্রজের রাখাল।

বিপদ-বারণ! অনাচার কংস ধ্বংস কল্যাণ-কারণ।  
মাধুর্যের লীলাশেখরে রাজরাজেশ্বরের বেশে  
মণ্ডিতপ্রণতিপূর্ণ লহ সিংহাসন;  
ব্রজস্থ যমকর মথুরার দিবাকর—  
ছুটের দলন আর শিঠের পালন।  
বিভূজ মুরলীধর গীতুসিদ্ধকর—  
অভ্যুত্থিত অধর্মের বিনাশ-কারণ।  
হৃদয়কু হৃদয়ান্তি, অশান্তি ঘটায় শান্তি  
—অজ্ঞাত শক্তিতে নিজ কর সংস্থাপন।  
ধর্মের আশ্রয় তুমি, বিপদ-বারণ।

চক্রী—চক্রধর! অর্জুনের জয়-রথে যাত্রাভ্যন্তর—  
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে হের অঙ্গল নজ্রে  
মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা—বিম্বহিতকর।  
পাকজন্ত শমন্যদেব দূর করে অবসাদ,  
রুধিরের রক্তভা ধরে ধরার অশ্রু;

আশ্রয়-কলসেহর ফলে পবিত্র ভারতভূমি—ধর্মের আকর;  
বড় ভারতের স্থলে প্রতিষ্ঠিলে নিজ বলে—  
কি মহাভারত! কীষ্টি অজর—অমর।  
প্রথম চরণে তব, চক্রী—চক্রধর।

ওহে লীলাময়! অধর্ম করিল ক্ষয়—ধর্ম দিলে জয়।  
যে কার্য সাধন তব অবতীর্ণ নরবরে,  
সে কার্য সাধিত হ'ল—অচ্যুত—অব্যয়;  
তা'র পরে সিংহাসনে, ধৌত তা'র নীল নীরে,  
লীলা শেষ করিবারে লইলে আশ্রয়।  
দেহিলেই কোন দিন নহে জরামৃত্যুহীন,  
সুংসারের প্রলীপ প্রায় যত্নবশ লয়;  
তোমারি বিধান বলে মৃত্যু-বাধ পদতলে  
বিদ্ধ করে শর তা'র ওহে মৃত্যুজয়।  
তুমি অদ্বিত্যহীন—ওহে লীলাময়।

আজি হারকায়—দূর তীর্থধারী দেয় অর্থ তব পায়।  
তুমি শম্ভুচক্রধর, গদাধারী, পদ্মকর—  
কংসবংশ ধ্বংস তুমি কর মথুরায়;  
একচ্ছত্র রাজ্য করি' যুদ্ধিলে তাহে বরি'  
নিজে তুমি ছত্রধর পাণ্ডব-শতায়।  
আদি অন্ত নাহি তব লীলারূপ নব নব—  
তব ব্রহ্মেশ্বররূপে ছুটি দেবো চায়—  
অতৃপ্ত প্রেমনের কৃপা তোমারে দেখিতে আশা  
বিভূজ মুরলীধর—শ্রীনাথ-সহায়।  
সেই রূপে দিও দেখা বাহুর শযায়।

হে রাধা-জীবন! যুচিবে কি গভায়াত; পাব কি দর্শন?  
মল্লকুলে বারি সম এ ধর্ম জীবনে মম  
যবে সিদ্ধ শাস্তিরূপে নামিবে নর-  
অর্দ্ধ অঙ্গ পল্লীরে অর্দ্ধ তা'র পূণ্য ভীরে,  
শেষ বার নাম তব শুনিবে শ্রবণ,  
আঁখি হ'বে দীপ্তিহারা, স্থির হ'বে আঁখিতারা,  
প্রাণবায়ু দেহভাঙ্গা করিবে যখন—  
তবে নীলপদ্মগায়ার সোনার কমল হাদে—  
রাধানাথরূপে, নাথ, পিতৃ দরশন—  
তখন সার্বক হ'বে এ বার্ষ জীবন।



## নব-জন্ম

## শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রাতের অন্ধকার-জটরে মাঠকোঠার ঘরে একটি নবজাত শিশুর অতর্কিত আবির্ভাব। তখন ধনীদেবের গৃহে গৃহে আনন্দের দেয়ালী-উৎসব চলিয়াছে।

যে-শিশুটি আজ জন্মাইবার সাধে সাধে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে দারিদ্র্য আর উৎকর্ষ। তাহার, কথা শ্রবণ করিয়া নীলাধর ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শিশুটির আবির্ভাবে কাহারও মনে মহাশূন্যের আনন্দ, আশার ক্ষীণ আলোক কিংবা হৃদয়ের নিষ্ঠুর কল্পন ছাড়া কশিকের জঙ্ঘা একটুও রেখাপাত করিলনা।

নীলাধর দুঃখ-হরণ প্রসিদ্ধ গুয়ার্কসে কম্পোজিটারি করে। সমস্ত মাস ধরিয়া মুখের রক্তে তুলিয়া যে অসামান্যিক পরিশ্রম সে করে তাহার পারিতোষিক মাত্র বায়ো টাকা। কোন কোন মাসে উপরি থাকায় সে আরো দুই চারি টাকার মুখ দেখিতে পায়। এই বৎসামাত্র আয়ে সে কোন রকমে কায়ক্লেশে সংসারের সকল অভাব-অভিযোগের আংশিক পূরণ করিতে পারে না, আর আজ কিনা সে পুত্রের পিতা হইয়া বসিল!

নৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রার কথা শ্রবণ করিয়া সে উল্লেষিত হইয়া উঠিল। দেহের প্রতিটি নিরাম বিভ্রাহের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। বাহ্যিক নিজেদের স্বার্থের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া টাকার অল্পপাত বাড়াইয়া চলে তাহাদের এই পেক্ষাকৃত উদাসীনতাকে সে কখনই উপেক্ষা করিবেনা।

নৈনন্দিন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে তাহার মন অবসন্ন হইয়া আসে। প্রতিদিনের অসংখ্য অভাব দেহের সামর্থ্যহীনেও কাড়িয়া লইয়াছে। কাজ করিবার

একপ্রান্ত স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। প্রতি দিবসের অভ্যাসের ফলে সে যন্ত্রচালিতের ন্যায় কাজ করিয়া চলে মাত্র।

প্রত্যাহ বেলা নয়টার সময় কোন রকমে নাকেমুখে হুমতো অন্ন শুদ্ধিয়া একটি শতছিন্ন ছাতা বগলে করিয়া নীলাধর প্রেসে ছাড়িয়া দেয়। এ্যাটেনডেন্স রেকর্ডিংয়ে সই করিয়া আপনার সিটের অনতিদূরে দেয়াল-পেরেকে জামাট গুলিয়া রাখিয়া কাজ করিবার জঙ্ঘা সাজ সরঞ্জাম ত্রিক করিয়া লয়। এক মিনিট দেবী হইবার কোন উপায় নাই। এসব গুটিনাটি ব্যাপারে-প্রেসের মালিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একদিন মিনিট পাঁচেক দেবী হওয়ার তাহাকে যে বাক্যবাণ হজম করিতে হইয়াছিল তাহা সে শত চেষ্টা করিয়া আজও ভুলিতে পারে নাই।

কটা বাজে বসন্তো, নীলাধর বাবু? সই করিতে করিতে ঘড়ির দিকে মহাশূন্যের জঙ্ঘা কাঁদাইয়া নীলাধর অপরাধীর জায় বসিল: মিনিট পাঁচেক দেবী হয়ে গেছে, বাবু।

এরকম দেবী কেন হয়? এটা অফিস তা জানেন, নীলাধরবাবু?

আজ্ঞে ইয়া। সংসারের নানা যন্ত্রাট এক আধনি একটু আধটু দেবী হয়ে যায় বাবু।

কর্মচারী মনিবের মুখের উপর কণার জ্বাব দিতেছে: দেবিয়া প্রেসের মালিক রাখিয়া উঠিয়া বসিলেন: দেবী করে আসবেন তারপর তর্ক করতে আপনার লজ্জা হয় না।

সে কি বাবু? আপনার সঙ্গে আবার কখন তর্ক করলাম।

তর্ক করচেন, আবার না বলচেন। যান যান, কাজে যান।

নীলাধর আর কোন কথা না বলিয়া নিজেব সিটের কাছে দেয়াল-পেরেককে জামাট ছাড়িয়া রাখিল। পরে নিজের সিটে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

নীলাধর এইবার একটি বিড়ি ধরাইল।  
হেঁজু কম্পোজিটারি গণেশ নীলাধরকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেবিয়া কাছে আসিয়া বলিল: ব্যাপার কী-হে, নিলু? হাত জড়িয়ে বসে যে-? কাজ কর্ম বৃষ্টি আজ করবে না? বাড়িতে বৃষ্টি কগড়া খাটি কিছু করে এসেচো?

তোমার যেমন কথাব ছিরি গণেশদা। কগড়া-কাটির বয়েস অনেকদিন কেটে গেছে।

চুপ করে বসে থেকোন, কাজে লেগে যাও। জানতো মনিবের মেজাজ। একুণি হয়তো ছু' কথা বলে যাব।

অর্ধঘণ্টা বিড়িটেতে পুনরায় অসিমযোগ করিয়া নীলাধর টিক লইয়া কাজ আরম্ভ করিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলাধর কেস হইতে মীসার টাইপ তুলিয়া টিকের উপর সাজাইয়া চলিয়াছে। টিক ভর্তি হইয়া গেলে গেলিতে ম্যাটার নামাইয়া রাখিয়া পুনরায় টিক লাইন গাথিতে বসে।

পাঁচ বৎসর আগে সেই যে কাশীদাসী নববধূবেশে নীলাধরের ঘর করিতে আসিয়াছে একদিনের জঙ্ঘা সে বাড়ীর বাহির হয় নাই। নীলাধর তাহার কোন সাহ-অস্বাদ পূরণ করে নাই। মনের কোণে হয়তো এতদই ইচ্ছা জাগিয়া ওঠে, অর্থের অভাবে কিন্তু তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। তাই কাশীদাসীর হাতে দুই-গাছি কাচের বেলায়ারি চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। স্বামী অস্বস্থার কথা সে ভালো করিয়াই জানে। কাজেই কোন আশার জানাইতে লজ্জায় তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া আসে।

স্বামী গরীব বলিয়া কোনদিন সে এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। খুব ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া বতঙ্গ পর্যন্ত না তাহার চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে

সংসারের বাবতীয় কর্ম সে সহ্যেই করে। নীলাধর মাঝে মাঝে একটি টিকা কি রাখিবার কথা উত্থাপন করিলে কাশীদাসী তাহাতে কর্ণপাত করেন। স্বামী তাত থাইতে বসিলে শিয়রে পাড়াইয়া সে পাখার বাতাস করে। নীলাধর যে-দিন ভাল করিয়া থাইতে পারে না কাশীদাসীর মন অজানা আশঙ্কায় কেমন যেনে হইয়া যায়।

নীলাধর অফিসে চলিয়া গেলে দুপুর বেলা কাশীদাসীর আর কিছুতেই কাটিতে চায় না। শোয়া বসি করিয়া কোন রকমে তিনটা বাজিয়া যায়। কলে জল আসিলেই সে এঁটো বাসনগুলি মাজিতে বসে।

কোন কোন দিন বিকালবেলায় কাপড়-চোপড় কাটা হইয়া গেলে সামনের বাড়ীর নবপরিণীতা ছোট বোয়ের সহিত দুই একটি কথা বলে।

বধুটি শুধায়: এ বেলায় আশ্রম দাওনি, কাশীদাসী? কাশীদাসী বলে: রান্নার পাট এ-বেলায় নেই।

এ-বেলায় তা হলে কী যাও?

রুটি। ওর আসতে রাত হয় বলে সকালের টেইসেলেই রুটি করে রেখে দেই।

অত রাত পর্যন্ত রোজ অফিস থাকতে হয়?

না, ছুটির পর উনি অল্প কোথায় কাজ করেন।

তোমার স্বামী তোমায় কি কি গহনা দিয়েছে, কাশীদাসী?

গহনার কথা শুনিয়া কাশীদাসী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। বলে: গহনা দেবার মত পয়সা ওনার নেই।

এইবার বধুটি নিমস্কোচে নিজেদের অর্থোৎসাহ কথা বলিয়া চলে। কাশীদাসীর এসব শুনিতে মোটেই ভাল লাগে না। কাজের একটা অধিষ্ঠা দেখাইয়া সেখান হইতে সে চলিয়া যায়।

কিছুদিন হইতে চলিল কাশীদাসীর যেন কী হইয়াছে। থাইতে বসিয়া আহারে রুচি থাকে না। থাকিয়া থাকিয়া গা-যেন পাক দিয়া ওঠে। সর্ব শরীরে কেমন যেন একটা আলস্য। একদিন নীলাধরকে ভাত খিঁতে



যাইয়া সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে কোন রকমে টাল সামলাইয়া লইল।

কালীদাসীর এই পরিবর্তন নীলাধরের চক্ষুকে কাঁচি দিতে পারিল না।

নীলাধর বলে : খেটে খেটে তোমার চেহারা ভারী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্বাস না হয় একবার আয়নায় তোমার মুখটা দেখে এসো। এত কষ্টে তোমার হইতে না। দিন কতকের জেজ্ঞ একটা কি রেখে দেই, কেননা ? তা না হলে কত করে অস্বস্তি পড়ে যাবে।

কালীদাসী হাসিয়া বলে : ও কিছু নয়। যে টাকা ব্যয় করে কি রাখতে চাইতে, তাই দিয়ে বরং তোমার অকিসের জামা কাপড় কিনে নিয়ে এসো। এরপর লোকসমাজে তোমার বেরুনা দুকর হয়ে উঠবে।

সন্তান-সন্তানবান কালীদাসীর সারা বেলায় ও মনে যে আনন্দ-কলরোলের উচ্চা উজ্জ্বল হইয়া যায় তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। একটি অজুতপূর্ব্ব অমৃত্যু তাহাকে উন্মাদা করিয়া তোলে। পরমুহুর্ত্তে কি ভাবিয়া সে কেননা যেন বিম্ব হইয়া যায়। নিষ্কিয়ে প্রসব করিতে না পারিলে নীলাধরকে কিরূপ আতঙ্কের পড়িতে হইবে সেই চিন্তায় সে পাপাল হইয়া ওঠে। মরি বাঁচি করিয়া না হয় নীলাধর পরয়া জোপাড় করিল। ইহার পর সন্তান ভূমিষ্ট হইয়া যদি না বাঁচে !

একদিন রাতে স্বামীর কাছে শুইয়া একথা সেকথা পর কালীদাসী শুভ সংবাদটি আর গোপন করিতে পারিল না। নীলাধর চুপ করিয়া শুনি, কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিল না। সন্তান আসিতেছে নবীন অতিথিবশে, ইহার চাহিতে আনন্দ আর কী হইতে পারে। নীলাধর কিন্তু ওম হইয়া দহিল। সে তাহার উপার্জনের অল্পপাত ভাল করিয়া জানে। এই শয়ন আয়ে তাহারই কোন রকমে মঙ্গলান হইয়া। ইহার উপ তাহাদের সংসারে যে শিশুটি না-বলিয়া-কহিয়া আকর্ষক দেখা দিলে, তাহাকে নাহয় করিয়া ভুলিবার মত স্বচ্ছল পদা তাহার নাই। নীলাধর চিন্তা করে : কালীদাসীর গর্ভের ওই ভ্রূপটি কোনরূপে নষ্ট হইয়া যায়না ? অনেকের তো এইগণ হয়

শুনিয়াছি। গরীবের সংসারে সন্তানের শুভাগমন হইবার আগে তাহার উজ্জ্বল সাধনই বোধহয় বাঞ্ছনীয়। নীলাধর একটু ইতস্তত করিয়া কালীদাসীর কাশের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যে কয়টি কথা উচ্চারণ করিল তাহাতে কালীদাসী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পরে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল : ভূমি মাঝে মত..... তাহার পর কি একটা কড়া কথা যেন উচ্চারণ করিতে গিয়া নিজেকে সতর্ক করিল। কিছুক্ষণ পরে নীলাধরের মনে হইল কালীদাসী যেন কান দিতেছে। একবার মনে হইল তাহারে মিল্কথায় সাধনা দেওয়া দরকার। কিন্তু কি-ইবা বলিবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিছুদিন পরের কথা। অনিশ্চিত সন্তানবা অতঃ সুনশিত সন্তানবাত্য পরিণত হইয়াছে।

তবুও নীলাধর ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভাবে : পুত্র যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে বাঁচিয়া থাকুক। যত-বাঁচা ভগবানের হাত।

ইহারই কৈকে একটি অতি প্রয়োজনীয় চিন্তা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীলাধরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল : এখন হইতে তাহার ঘরেরে মরত্মন শুরু হইবে।

নীলাধর এইবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। একটি আমকাঠের তক্তাপোষের উপর সযোজ্য শিশুটির পাশে শুইয়া আছে নীলাধরের কন্যাসার স্ত্রী কালীদাসী, অসহায় শিশুর জননী। শরীরে এর কোঁটা রক্ত না থাকায় সারা দেহটি মাকের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। নিম্নেবের মধ্যে সমস্ত রক্ত-কণ্ট ভুলিয়া গিয়া কালীদাসী মবজাত শিশুটির দিকে দ্বিহুদেই রক্ত আনন্দে চাহিয়া বসিল। সে যে সন্তানের জননী! এ আনন্দ সে কোথায় গোপন করিয়া রাখিবে ? আর নীলাধর কালীদাসীর মাথার কারে একটি টুলের উপর অপরাধীর ছায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

বিছানার উপর স্কুক্রিয়া পড়িয়া শিশুটির ঘেটি

ছোট হাত-পাগুলি রক্ত আবরণে অনেকক্ষণ ধরিয়া লম্বা করিয়া একটি কথা কিছুতেই নীলাধর না বলিয়া থাকিতে পারিল না। দেখ, এখন থেকে খাবারের খুব বিবেচনা ক'রে চলতে হ'বে—কথা কটি বলিয়াই দারিদ্র্যনিপেষিত নীলাধর মুখের কঠিন কোণগুলি সরস করিয়া আনিয়া আশানাআপনি হারিয়া উঠিল।

নীলাধর ভাল করিয়াই জানে কালীদাসীকে সমস্ত খানদ হইতে বঞ্চিত করিয়া যে নির্মম কথা শুনাইবে তাহার মাতৃ-হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিবারই কথা। সে আঘাত কণিকের, সময়ে আপনিই সে ক্ষত শুইয়া যাইবে। তবুও নীলাধর তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইবে, অন্ততঃ বুঝিবার জন্ত অস্ত্রোপেথ করিয়া।

স্বামীর হিংস্র-মুষ্টির উপর চোখ পড়িতেই কালীদাসী অর শিহরিয়া উঠিল। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ছেলেকে রক্ত করিবার আশায় নিজের শীর্ণরমান মধ্যমে অসাড় হাতটি প্রসারিত করিয়া ধরিল। নিম্নে, অন্ধকার স্বামীর পাশে শুইয়া কালীদাসী যে-সমস্ত কথা নীলাধরের মুখ হইতে স্বকর্বে শুনিয়াছে তাহা সে আজো ভুলিতে পারে নাই। বলা যায়না স্বামীর যন্ত্রণা মতিগতি.....

কালীদাসীর সম্বন্ধে—শুধু তাহার সম্বন্ধেই বা কেন, নবজাত শিশুটির কথা চিন্তা করিয়া নীলাধরের মস্তিষ্ক-উদ্বেগের অস্ত নাই। অভিশপ্ত জীবনের অসহ জন্মহারের কথা সে আর চিন্তা করিবে না। মহা-বালের নির্মম অউহাঙ্গ না হয় সে কোন রকমে সহ করিবে। কিন্তু সংসারের এই ভিনটি প্রাণীর এতাদৃশ অনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে একবারেই অসম্ভব। কারণ সেইতো বাজীর উপায়ক্ষম বাক্তি। ছেলেকির মঙ্গলকামনায় কালীদাসী টাকা চাহিতে এতটুকুও ঝিঝাবোধ করিবে না। ইহা নীলাধরের কাছে কেননা যেন বিসদৃশ ঠেকে।

ইহার আগে ধরতার টাকা দিবার সময় প্রতিকটি

পরয়া নীলাধর শ্রেনবৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লইয়া বলিত : দেখো, একটু বিবেচনা ক'রে চাশো, একটু সময়ে চলতে শিখো, লজ্জাটি।

কালীদাসী এখনও পর্য্যন্ত একটি কথাও বলে নাই। নীলাধর আর একবার ছেলেকির দিকে নির্মম দৃষ্টি হানিল, তাহাও কণিকের জন্ত। এই দ্বন্দ্বোদ্য নিম্নজতা তাহাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

নীলাধরের চোখের সামনে পরিষ্কার করিয়া ভাগিয়া উঠে ছেলেকির ভবিষ্যৎ জীবনবাজার স্পষ্ট হইল। তাহারই তো সন্তান, বড় হইয়া তাহারই মত অর মাহিয়ানায় কর্তব্য জীবন যাপন করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি !

না, না, বড় হইলে ছেলেকিকে নীলাধর লোপাড়া শিখাইবে। লোপাড়া না শেখায় তাহার যে কী কষ্ট সে তো সত্যকৈই তাহা দেখিতেছে। কিন্তু ছেলেকে মাঝে করিবার মত সংস্থান তাহার কোথায় ? অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার মত কোন লোক তো তাহার জানা নাই। তাহার ছেলেকেবলকার জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে : অর্থের অভাবেই তাহাকে বাহো বঙ্গের বয়সে অমিচ্ছাসহে লোপাড়া ছাড়িতে হয়। তারপর একদিন তাহার পিতা ছাপাখানার এক ম্যানেজারের কাছে লইয়া কাজ শিখিবার জন্ত অনেক করিয়া তাহাকে বিনা বেতনে ভর্তি করিয়া দিল। কী অমানুষিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহাকে কাজ শিখিতে হইয়াছে। নিজের সন্তানকে যদি কোনরকমে ঈশ্বরের রূপায় ক্ষুধার লোপাড়া শেষ করাইতে পারে, সে ছেলেকির শুভ বরাত বলিতে হইবে। তারপর আগে লোপাড়া শিখিলে সে নিজের পথ নিজেই বাছিয়া লইতে পারিবে। ইহার পর নিশ্চয় সে বড় রকমের একটা চাকরি জোপাড় করিয়া তাহার সংসারের ডানহাত হইয়া উঠিবে ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কিন্তু তাহার দ্রুতিত জীবনবাজার কথা স্বর্গের হওয়ার নীলাধরের কল্পনার জাল টুটিয়া পেল। এ



রকম লাক্ষিত অবহেলিত জীবন অতিবাহিত করার বিশেষ কোন মানে হয় না।

তাই নীলাধর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কালাদাসীকে ভবিষ্যতের দুঃখচিন্তায় দুর্দশার কথা শ্রবণ করাইয়া দিতেছে। কালাদাসী সব বুঝিতে পারে, কিন্তু সে যে সম্বাদনে জননী, কেমন করিয়া সে নিরীহাবদে স্বীকার করিয়া লইবে।

নীলাধর যে কিছু কিছু বুঝিতে পারেনা, এমন নয়। তাহার অবচেতন মনে চুঞ্চর শক্তির যে প্রলয় নাচন চলিয়া বায় তাহা বুঝিবার সামর্থ্য তাহার একটুও নাই।

নিজেকে দেখী সাব্যস্ত করিয়া নীলাধর একটাবার মাত্র কালাদাসীর মুখের পানে চাহিল, এবং নিম্নেই এই রহস্তময়ী নারীর কাছে তাহার অন্তরের কল্যাণ ওৎফুরার বিকৃত বীজন্ততা প্রকট হইয়া উঠিল।

প্রতিবাদ করিবার মত সাহস নীলাধরের নাই।

তবুও সে নিজেকে উৎসাহিত করিয়া সাহসে ভর দিয়া বলিল; কিছু মনে করো না, লক্ষী। কেউতো আর ভগবান নয়। বড় হয়ে এই যোকাই আমাদের মস্ত শত্রু হইবে উঠবে।

কিছু তবুও কালাদাসী কোন কথা কহিল না।

আর একবার নীলাধর কালাদাসীর পরিচিত মুখের এবং চোখের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল হঠাৎ সে কালাদাসীকে কথাগুলি বলিয়া পুনরায় আঘাত করিয়াছে। যে-সংস্কার লইয়া কালাদাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহার আশ্রয় ব্যর্থতার ক্ষমতা তাহার নাই। দারিদ্র্যের কথা শ্রবণ করাইয়া দিয়া কালাদাসীকে অথবা অপমান করা, ইহা তাহার ভাল কাজ হয় নাই।

কালাদাসীও অন্তরের অব্যক্ত অহুত্ব প্রকাশ করিবার সহজ পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাহার দুঃখশক্তির আয়তন সীমার, কথাবার্তা শুভাইয়া বলিবার দক্ষতা তাহার নাই। ইহার উপর মনকে সে একাগ্রতার নাগপার্শ্ব বন্ধন করিতে পারে নাই। তবুও সে কি

মনে করিয়া অন্তরের কথাগুলি বিচিত্র উপায়ে প্রকাশ করিল; তুমি কিছু মনে করোনা, বার বছর বয়সে আমার থোকাকে কিছুতেই তোমার কাজ শিখতে দেবোনা।

কালাদাসী নবজাত শিশুর দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া থোকার ভবিষ্যত জীবনের সুখকলয়ার অজ্ঞাতসাহেই স্বপ্নের বিচিত্র কেমারী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। স্বামীর মত কিছুতেই সে থোকাকে বড় হইলে তাহার কাজ শিখিতে দেবে না। আগে থোকা ফুলের পড়াই শেষ করুক, তাহার পর বহাতে বাছাই থাকুক না কেন তাহাকে সে আগে দেখা-পড়া শিখাইবে। ভিক্ষা করিতে হয় তাও স্বীকার। লেখাপড়া শেষ করিলে থোকার একটি বড় রকমের চাকরী জুটিয়া যাইবে।

বড় চাকুরী কাহাকে বলে ইহার স্পষ্ট ধারণা কালাদাসীর নাই। এই সব চিন্তা করিয়া এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সে পরম তৃপ্তি অহুত্ব করিতে থাকিল।

কল্লয়ার কালাদাসী ইহার চাইতে বেশী কিছু আশা করিতে সাহস পায় না। সে এইটুকু বুঝিয়াছে যে আবহাওয়া এবং আবহৌলীর মধ্যে তাহার জীবনের ভাঙ্গাচোরা জীব নৌকাকে চালিত করিয়াছে তাহার পরিধি অল্প নয়। খুঁজিয়া দেখিলে ভাল এবং বদল অবস্থার লোক অনেক মিলিতে পারে। সকলেরই অথবা যে তাহাদের মত এক-কথা জোর করিয়া কে বলিবে? তাহাদের সমাজে বাহ্যতে পুজির স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ইহার বেশী সে আশা করে না।

নীলাধরের সহিত তর্ক করিতে কালাদাসীর ইচ্ছা করে না। সে তাহাকে ভালো করিয়াই চেনে। তবুও সে একটা কথা স্বামীকে বলিবে; ছেলের কথা তবে কোন লাভ নাই। ভগবানের দয়ায় আমরা তাকে মাফ করতে পারবো।

কালাদাসীর অন্তরের সমস্ত কোমলরুজিগিল স্পষ্ট হইয়া জুটিয়া উঠিল। স্বামীর উপর তাহার পূর্ণগাধী আছে এই চিন্তা করিয়া সে নীলাধরের খসখস হাততালি

একপ্রকার জোর করিয়া শিশুর মাথার কাছে ডানিয়া আনি।

কালাদাসী আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠে : দেখ, দেখ চেয়ে দেখ, থোকা আমার কী সুন্দরই না হয়েছে, বলিয়া সে যুগ্মস্ত শিশুর দিকে নামানাজ চাহিয়াই স্বামীর দিকে চক্ষু ফিরাইল।

নীলাধর, কালাদাসীর অকপট সরলতার কথা চিন্তা করিয়া এসময়ে তাহার কথাই কোন প্রতিবাদ করিল না। তাহার মুখচোখ আনন্দে চক চক করিয়া উঠিল।

কিন্তু সে কণিকের। পরমুহুর্তে নীলাধর বিরক্ত হইয়া চিন্তা করে : এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সে একটি সম্বাদনে জনক হইয়াছে। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত গর্ভ

হইতে আর কতগুলি শিশুর জন্মগমন হইবে তাহা কে বলিতে পারে? তাহাদের বড় না হওয়া পর্যন্ত ইহা-বিপাকে সে কী করিয়া মাফ করিবে?

মুহুর্তে কি যেন ঘটিয়া গেল। নীলাধর নবজাত শিশুটিকে স্তন্যকী পড়িয়া সময়েই চুষন করিয়াই সরিয়া দাড়াইল। বিশ্বের অপার রহস্ত তাহার চোখ-মুখে স্ফুটাই উঠিয়াছে। এ কিসের বিশ্ব, কিসের রহস্ত? যে জৈবিক নিয়মসমূহের জগতে জীবন-যাত্রা অশ্রু-রাশিবার জন্ত পশুপক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্যন্ত প্রকৃতির হাতের ক্রীড়া-পুত্তলি মাত্র, এই রহস্ত লীলা তাহার, না মানুষ্যের মধ্যে জৈবদর্শ্যবিরক্ত যে স্বপ্নার বলিয়া বর্ণিত পিতৃহৃদে আছে, তাহার?

—:—

## পুত্রাতনের পুনরাগমন

(উপন্যাস)

শ্রীহরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মুকলী মহাশয়।

এখনাথের মাতা পুত্রী বাইবার অঙ্গনি পরেই এর নিবীজনাথের পুত্র গৃহে আসিয়া লজ্জাবতীকে বলিল “লিজী, কাল দিটার চৌধুরী আসবেন।”

লিজীর মুখে ও চোখে আনন্দ যেন স্ফুটাই উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “হঠাৎ আগছেন যে?”

“বাঙ্গালার গভর্ণরের সঙ্গে কি কাণ্ড আছে। এ বার মেলাবার জিদে আমাদের বাড়ীতেই থাকতে রাজি হয়েছেন।”

লজ্জাবতী মাগ্ধে বলিল, “বেশ হয়েছে।” “মেজদা বললেন, তা’ নইলে তাঁর কষ্ট হবে; জানিয়ে ত ওঁর ভাইয়ের বাড়ীতে ইলেকট্রিক ফ্যান নাই—আর ধর সেখানে থাকা পোষায় না।” “তাঁত বাটেই।”

“তুই কাল বা’বি ত’? তোরা ছ’ জনেই বাস—

রাখিরে খাবি—না বলে দিয়েছেন।”

“তাই হবে।”

“তবে আমি চরাম—অনেক জিনিষ কিনতে হ’বে।”—বলিয়া সে উঠিল।

দিটার চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মুকলী। তাহারই অল্পগ্রহে রবীন্দ্রনাথের ও তাহার কন্যাতার বড় চাকরী হইয়াছে। তিনি নিজে একটি রহস্ত। তাহার আবি বাস উত্তর বঙ্গের কোন স্থানে; সে সংবাদ এখন আর কেহ রাখে না। তিনি সামান্য চাকরী হইতে কোন গুণে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগে খুব বড় চাকরী করেন। সে বিভাগের যে সব চাকরীর স্বরূপ বাহিরের লোক জানে না—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও খবর দেওয়া এই সব কাণ্ডের জন্ত যে সব চাকরী, তিনি সেই সকলের একটিতে বহাল আছেন। স্ত্রাষ্ট্র সচিবের কেন, বড়দারের কাছেও যে তাহার গতি,



তাঁহা সন্দেশই জানে। তাঁহাতেই লোকের কাছে তাঁহার প্রভাব; আবার সেই প্রভাব ভাড়াইয়া তিনি সরকারের কাছে নিজ প্রভাব বাড়াইয়া লইতে জ্ঞানেন। তিনি অকুতহার—কি বিপতীক—কি পতীত্যাগী সে রহস্তও কেহ ভেদ করে নাই; সে সম্বন্ধ নানা জন নানী কথা বলে—তবে সে সবই অসম্ভব; তাঁহার লইয়া সাহসারকে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেও তাঁহারিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখেন না। কেবল কলিকাতায় তাঁহার যে মাকুলপুত্র হাইকোর্টের উকীল, তাঁহার সহিত তিনি সম্বন্ধ বীকার করেন। বিলাতে না-বাইয়াও এবং তাঁহার মত বর্ধে যে তেমন “সাহেব” হওয়া যায়, তাহা তাঁহারকা না দেখিলে কেহ করনা করিতেও পারে না।

তিনি কলিকাতায় আসিয়া রবীন্দ্রনাথদিগের গৃহে উদ্ভব; এ সম্বাদ সিল্লা হইতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা পূর্ণাঙ্কেই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—যেন সামসজ্ঞা সব টিক থাকে। এই মধ্যম ভ্রাতার সহিত মিষ্টার চৌধুরীর বন্ধন পরিচয় হয়, তখন তিনি ভাগ্যবদেবী, সামান্য চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছেন।

এই মুকুন্দী মহাশয়ের আগমনে রবীন্দ্রনাথদিগের গৃহে যে ভাব দেখা গেল, তাহার স্বরূপ বিজ্ঞপ্তি বুঝাইয়া বাখিয়া পাঠাইতে না। সেকালে বক্তৃত্তে জ্ঞানদেবের শুভানুগমন হইলে যেমন একটা প্রকার ও শব্দার ভাব—ভক্তির আবহাওয়া দেখা যাইত; আর একালে নূতন ও ধনী জামাতা গ্রন্থম স্বত্বরবাজী আসিলে যেমন একটা বস্ত্রের জ্ঞান একান্তিক ভাব—আনন্দের হিরায়ে দেখা যায়—এ যেন তত্ত্বত্বের সম্মিশ্রিত। বাজীর নৈতিকানাটিকে সম্পূর্ণরূপে উন্নয়ন রূপে পরিণত করিয়া কেদারা কৌতের ঢাকাগুলা কাচাইয়া ইষ্টী করিয়া পরান হইয়াছিল; একটা ছোট বর হইতে হেলেনের পড়িবার থেলো রাইটিং খুঁটল ও কাঠের আনন্দগুরু চোয়ার স্ত্রয়ধান। সরাইয়া গুড়া করা কার্পেট, রিভলভর চোয়ার, ফোকেটরিয়াটে টেবল, কর্ণার পিস প্রভৃতি দিয়া সেটিকে বসিলার ঘরে পরিণত করা হইয়াছিল। বাজীর সর্দারীকৃষ্ট শয়ন কক্ষটিতে এক ভ্রাতার বিবাহে “বর-

সজ্জার” প্রাপ্ত ভাল খাট আনিয়া সেটি মিষ্টার চৌধুরীর জন্ম নিষ্ঠিত করা হইয়াছিল এবং ছুটিয়া পানক-তলা বালিশও আনা হইয়াছিল। আহারের ব্যবস্থা খালায় হইলেও টেবলের উপর—টেবল ক্লথ বিছাইয়া বাজীর হেলেনের জন্ম পূজার পোষাক এবং পুষ্করী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং “বয়” নামে অভিজিত অফিসার চাপরানীদিগের প্রত্যেককে চাপকান ও পাগড়ী সাক্ষ্য করিয়া লাইবার জন্ম অম্বা উল্লাসতা সহকারে সাবানের দাম চারি পরয়া করিয়া নগর দেওয়া হইয়াছিল।

মিষ্টার চৌধুরী তাঁহার বাড়ীতে উদ্ভবন না বলিয়া তাঁহার কলিকাতায় ছোট চাকরীয়া ভ্রাতা আর ঠিকনে যায়েন নাই—রবীন্দ্রনাথের এক ভ্রাতা ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধনা ও অভ্যর্থনার জন্ম গিয়াছিল। ইহার বাইবে বুঝিয়াই ভ্রাতা বাইবার কথা বন হইতে বৃক করিয়া দিয়াছিলেন; কারণ, এই পরিবারের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। ইহারো যে তাঁহার ভ্রাতাকে একবারে “পাইয়া বসিয়াছিল” আর ইহারো যে তাঁহার প্রোদালভের জন্ম তাঁহার পদসেবাও করিতে পারে—তাহা জানিয়াই যে ইহাখিগণের প্রতি তাঁহার ভিত্তি অত্যন্ত বিমুখ হইয়াছিল, কেবল তাহাই নহে—সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থহানির বেদনাও যে ছিল না এমন নহে; কারণ তাঁহার মনে হইত, দাবার বেহ ও অর্থ ভ্রাতাখিগণের প্রোপা, ইহারো তাঁহাখিগণের প্রোপা; বন্ধিত করিতেছে—“যা”র দন তা’র দন নহ, নেপোয় মারি হইবে।

মিষ্টার চৌধুরী পৌছিতেই বাড়ীতে গৃহিণী, বধূ ও কস্তার আসিয়া তাঁহার ব্যস্ত নথকে প্রের ও তাঁহার বিশ্রামের জন্ম উৎকর্ষা প্রকাশ করিয়া যাইলেন। রবীন্দ্রনাথ সে দিন অফিসে ছুটি লইয়াছিল—মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে থাকিতে হইবে—তিনি যে স্থানে যাইবেন, তাঁহার লইয়া যাইতে হইবে।

সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া মিষ্টার চৌধুরী বেশপরিবর্তন করিলেন। আহারের স্বস্তা সম্বন্ধে না পুনঃ পুনঃ কথা পাড়িলে রবীন্দ্রনাথ বলিল, “আমি ও

বহেজিলান, ভাল তরকারী উনি খেতে পারিবেন না।”

মিষ্টার চৌধুরী বলিলেন, “আমি কিন্তু বলে বিরজিলান, আমি দেশী খাবারই খাব—আমি ওই খেতে চাই।”

বাহিরে বাইবার পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, “এবার দেখছি, মেলাটা বেশ বড় হয়েছে।”

কথাটীক বুঝিতে না পারিলেও রবীন্দ্রনাথ হাসিল; কারণ, মিষ্টার চৌধুরীর সব কথাতেই সায় দেওয়া সে কর্তব্য মনে করিত।

এই সময় মালতী তথায় আসিয়া—মিষ্টার চৌধুরীকে ফিরিবেন—জিজ্ঞাসা করিল। মিষ্টার চৌধুরী তাঁহার হাত-বাগটার মধ্যে সন্ধান করিয়া একটা স্মৃদ্ধ ভ্রবোর শিশি বাহির করিয়া মালতীকে দিয়া বলিলেন, “এই দেখ, তোমার নামে এক নাম রেখেছে।” শিশির আবরণ-কাগজে “মালতীর” বিলাতী বিস্তৃতি লিখিত ছিল—“মেলাটা।” তিনি রবীন্দ্রনাথের দিকে ফিরাই বলিলেন, “এখন থেকে নামটা বলে দিয়ে রাখ—মেলাটা।”

গভরনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কদমী স্থানে বাইয়া তিনি যে অপরাহ্নে চাঁপ সময় আসিবেন এবং রাজিতে কোন ইংরাজের গৃহে তাঁহার আহারের নিমন্ত্রণ আছে, তাহা জানাইয়া মিষ্টার চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

মিষ্টার চৌধুরী সরকারী দপ্তরে যে কামের জন্ম আসিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সরকারের স্ববুদ্ধিহেতু তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মিটিয়া গিয়াছিল; কাহেই পরদিন ইহার অবসর। তাহা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের সেজ ভাই প্রস্তাব করিলেন, পরদিন তাঁহার আফিসের ইয়ানকে সকলে বেড়াইয়া আসিবেন। লজ্জাবতীর ও প্রথমনাথের নিমন্ত্রণ হইল।

লিঞ্জীর জন্ম মিষ্টার চৌধুরী তাহার বিবাহের উপহার আনিয়াছিলেন—শীতপ্রধান বেশে মহিলায়া খাড়ের উপর যে বেকশিয়ালের চামড়া ফেলিয়া রাখেন,

তাহাই। লিঞ্জী তাহা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেও—সে তাহা লইয়া কি করিবে প্রমথনাথ তাহা ভাবিয়া পাঠল না।

পরদিনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে প্রমথনাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মাদুরী তাহার কাছে ছিল—আজ সে তাহাকে মাদুরীর গৃহে তাহার কাছে রাখিয়া আসিয়া-ছিল, কিন্তু পরদিন কি হইবে? মালতী যখন তাহাকেও লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিল এবং রবীন্দ্রনাথ বলিল, “সে ত নিশ্চয়”—তখন প্রমথনাথ তাহাতে সম্মত হইতে পারিল না; কারণ, মাদুরীর খবরবাড়ীর চালচলন বেক্রপ তাহাতে তাঁহার। তাহার পরগৃহে এক্ষণ নিমন্ত্রণ গ্রহণে প্রীত হইবেন কি না, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাহা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিল, “সেই জুই ত বলেছিল, এ বার ও পাড়ার বাওয়া বড় হ’ল। আপনি একবারে সেকলে চালের বড়মায়েদের ঘরে ভগিনীটিকে দিয়েছেন। অবশ্য আপনার ভগিনী—নিজামকে লিলেও হয়ত মানাত, আমারে ঘরেই অপূরণে পড়া—কিন্তু এতে ভগিনীটী স্বরী হবে ত?”

শুনিয়া প্রমথনাথ যেন “কিন্তু” হইয়া গেল; বলিল—

“জানাই ত, মার বড় জিহ ছিল।

এই সময় বুদ্ধিমতী লিঞ্জী সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান করিয়া ফেলিল। সে বলিল, “সে টিক হ’বে—আমরা আশ্রয় সন্ধান করে ফিরে গিয়ে দিমিশমিকে বর দেব। তিনি কাল এসে থাকবেন।”

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, “ছোট বোনটির হেগাভাজি করতে প?”

“হাঁ।

“বেশ হ’বে।”

তাহাই হইল—বাড়ী ফিরবার পথে প্রমথনাথ ও লজ্জাবতী মাদুরীর বাড়ী বাইয়া তাহাকে পরদিন মাইবার কথা বলিয়া আসিল। বলা বাচস্পী—মাদুরীর শাওড়ী বলিলেন—“তা বেশ—মৌমা-কাচা যাবে।”

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর মিষ্টার চৌধুরীকে লইয়া রবীন্দ্রনাথদিগের গৃহের প্রায় সন্দেশই চাঁদপাল



ঘাটে বাইরা জীম লক্ষ উল্লসিত—লক্ষ বারাকপুরের দিকে চলিল। ভেকের উপর চেয়ারে বসিয়া সকলে গল্প করিতে লাগিলেন এবং নদীর দুই কুলের বৃক্ষ বেধিতে লাগিলেন। গঙ্গার উভয় পাশে মধ্যে মধ্যে ঘাট ও শিবমন্দির—আর বড় বড় কল। দেখিয়া মিষ্টার চৌধুরী বলিলেন, “হুঁটা ভাতের প্রকৃতির পরিচয় পাওনা যাচ্ছে। আমরা—টাকা হ’লে—ঘাট বাধিয়ে আর মন্দির করে’ একবারে শস্যের স্বর্ণে যা’বার ব্যবস্থা করি; আর এরা কল কারখানা করে’—এই পৃথিবীতেই টাকা আর প্রভুত্ব সত্ত্বাপ করবার ব্যবস্থা করে।”

রবীন্দ্রের বড় ভাই বলিলেন, “ফল ও হাতে হাতে ফলেছে—ওরা ধনী, আমরা স্কীল।”

“তা’র উপর কারার আজলাল কথা উঠেছে, ওদের সঙ্গে অসহযোগ করা হ’বে।”

ইংরাজের চাকুরীয়া পরিবারের সকলেই হাসিয়া উঠিলেন—“ওদের সঙ্গে অসহযোগ।”

মিষ্টার চৌধুরী বলিলেন, “এ সব সেই কাঁচকলা—আর আলা চাল খাওয়া মুক্তি—সংসারে কিছুই দরকার নাই, ইচ্ছাকৃতক অর্থাৎ যা’ নিশ্চিত থাকে অসহযোগ করে’ পরকালের অর্থাৎ যা’ একেবারেই অনিশ্চিত তা’র জ্ঞান প্রাপ্যতা কর। কেবল কর ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ।”

এইরূপ আলোচনার মধ্যে বেলা ঠাণ্ডা বাজিল; তখন “বহরী” স্ট্রীট হরাইয়া চা প্রস্তুত করিল এবং পেলেটের দোকানের কেক ও বাজীতে প্রস্তুত লুটী পটলভাজা সনাতন সন্দেশের সহিত শোভা পাইয়া দেশী বিলাতীরা অসুপ্ত স্থানিলে পড়িত প্রদান করিল। মিষ্টার চৌধুরী কিছু সন্দেশের প্রতিই অধিক অমরাগ দেখাইলেন।

বড় যা’র সঙ্গে মালতী ও চা ও খাবার পরিবেশন করিতেছিল। মিষ্টার চৌধুরী বলিলেন, “রবিন, এ বার পুজার ছুটিতে সিমলায় যাস—মেলাটিকে নিয়ে যাস।”

রবীন্দ্রনাথ বলিল, “রেলের পাশ কেবন ত হ’বে?”  
“তুই এখন চাকরী করছিস, আর আমি পাশ দেব হ’বে?”  
“তোর চাকরী করে’ দিলেন কই হ’বে?”

“বটে! তোর যা’ বিভ্রান্তি তা’র তুলনায় চাকরীটা বৃষ্টি ফেলনা হ’বে”—তিনি মালতীর হাতখানা ধরিয়া বলিলেন, “তুমি জিদ করো—যা’বে। দেখব, ও কেমন না নিয়ে গিয়ে পাবে।” তাহার পর তিনি বলিলেন, “রবিন, তোর জ্ঞান পাশ দেব না বটে, কিন্তু মেলাটীর জ্ঞান পারিয়ে দেব।”

লিঙ্গী বলিল, “আমিও যা’ব।”  
প্রথমদণ্ডের দিকে ফিরিয়া মিষ্টার চৌধুরী বলিলেন, “সিমলায় গেছো হ’বে।”  
প্রথমদণ্ড বলিল, “না।”

“তবে চমুকই না! আপনি যদি যা’ন তবে আর মেলাটিকে নিয়ে যা’বার জ্ঞান রবিনকে তোমারো করতে হয় না। কি ববিস, রবিন হ’বে।”

রবীন্দ্রনাথ বলিল, “আপনি আজকাল ভারি রূপ হাফেন। সে বার দেখে এসেছিলাম, মেজ বৌদি আপনার সঙ্গে মাল্যে গিয়ে দোকানে যে শালপা না পছন্দ হ’ল নিয়ে এলেন—দোকানদার আপনার হিসাবে খরচ লিখলেন; আর এ বার আপনি আমাকে পাশ দিতে বেগের মত দর করছেন!”

কথাটা রবীন্দ্রনাথ খুবই সরলভাবে বলিল বটে, কিন্তু প্রথমদণ্ড তাহাতে ভাবিতে লাগিল—কতটা দমিতা থাকিলে, তবে এমনি ব্যবহার করা সম্ভব হয়? আর বণিতে কি—এই পরিবারের মহিলাদিগের সহিত মিষ্টার চৌধুরীর ঘনিষ্ঠতা তাহাকে বিমিত করিতেছিল। কিন্তু সেই বিষয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণের ভাব ছিল; কারণ, আজমা সংঘবের ও শুচিতার শিক্ষার দ্বিতীয় তাহার কাছে যে বিলাশিয়ার আশংকা কেবল বিদেশী উপজাতির উপকরণ ছিল—আজ যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিল এবং আশংকিতবিশেষ তাহাই ভাল বলিয়া বিবেচনা করিল।

সন্ধ্যা হয়-হয় সময়ে ঈশ্বরাল বারাকপুরে পৌছিল। তখন জোয়ার আসিতেছে—ফিরিতে রাজি হইবে। মিষ্টার চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন, “মিষ্টার মালতীরা ট্রেনে ফিরিবেন। ঘাটের কাছেই ছুইখনি মোটরকার ছিল।

সকলে নামিবার আয়োজন করিলে মিষ্টার চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন, “আমরা বাইবেন, কিন্তু প্রথমদণ্ড ও লিঙ্গী থাকিবে—তাহারা ঈমারের রাজিযাপন করিয়া সকালে কলিকাতার ঘাটে নামিবে।” শুনিয়া সকলেই যে ভাবে হাসিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রথমদণ্ড বৃষ্টি, এ যত্নবশ পূর্বেই ছুইয়াছিল—বোধ হয় লিঙ্গীও ইহা জানিত।

তাহার একবার মনে হইলে, সে বলে তাহাকে বাইতেই হইবে; কারণ, সে মালতীকে বলিয়া আসিয়াছে, সে সন্ধ্যার পরেই ফিরিবে। কিন্তু এই যত্নবশ লিঙ্গীরও সম্মতি ছিল মনে করিয়া—সে আর সে কথা বলিল না—মালতী ত সে দিন থাকিবেই। তবুও তাহার মতো কেমন যেন একটু ভাবাক্রান্ত হইল—রোজোজ্ঞান আশংকা লগু যেন আসিলে যেমন ঘোলাটে ঘোলাটে বোধ হয়, তেমনি বোধ হইতে লাগিল। শেষে তাহার মনে লিঙ্গীকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনাই জয়লাভ করিল।

রবীন্দ্রনাথ বলিল, “এটা ‘হনিমুন’ বটে, কিন্তু কিছু বিলম্ব হয়ে গেল।”

মিষ্টার চৌধুরী হাসিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, “কিন্তু জট সন্দেশন করার সময় কখন অতিক্রান্ত হয় না।”  
শুনিয়া সকলেই হাসিলেন—কতকটা রসিকতাতার জ্ঞানও, আর কতকটা মিষ্টার চৌধুরী রসিকতা করিয়া—জেন বলিয়া তাহার প্রশংসা জানাইতে; কেন না, তিনি যে পরিবারের মুখুরী মহাশয়।

নামিবার সময় মিষ্টার চৌধুরী গঙ্গাজলের পবিত্রতার কথা তুলিয়া যে রসিকতাতা করিয়া যেনেমন তাহা কিন্তু প্রথমদণ্ড মোটেই উপভোগ করিতে পারিল না—তাহা শুনিয়া লজ্জার তাহার মুখ রক্তভা ধারণ করিল।

সকলে চলিয়া বাটলে প্রথমদণ্ড লজ্জাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ যত্নবশটা কা’র মাথায় এসেছিল?”  
লজ্জাবতী বলিল, “মিষ্টার চৌধুরী আর মেলাটার।”

“মালতীর এ নামটাই কি তোমরা বলহ করে নিলে হ’বে?”  
“বেশ নামট ত। মিষ্টার চৌধুরীর খুব বৌদিকতা আছে।”

যত্নবশ যখন পূর্বেই হইয়াছিল, তখন সব বন্দোবস্ত

ঈমারের ভিল—ক্যাবিনে শয্যা, রাজির আহার কিছুই অভাব ছিল না।

প্রথমদণ্ড ও লজ্জাবতী বহুদণ্ড ডেকেই পাশাপাশি বসিয়া রহিল। কেহই অধিক কথা বলিল না; কিন্তু উভয়ে উভয়ের সান্নিধ্যে যে শিথ অমুকূতি লাভ করিল, তাহার ভাষা নাই।

প্রভাতে উভয়ে যখন কলিকাতার ঘাটে ঈমারের হইতে নামিতেছিল, তখন প্রথমদণ্ড বলিল, “কিলা আমি যখন মিষ্টার চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তিনি আজই ফিরে যাবেন কি না, তখন রবীন্দ্র বলেছিল—কেন আমি, কি তাকে পাটি দেব? তিনি কি আজই যা’বেন?”

লজ্জাবতী বলিল, “ত’ ত আমি জানি না। যে কাবের মাফ, উনি কি আর থাকতে পারবেন? তুমি কি মনে করছ, পাটি দিবে? দিলে কিন্তু বেশ হয়।”

প্রথমদণ্ড বলিল, “আমি বহরার বাড়ী যাচ্ছি। তুমি আর একখানা টাঙ্গি নিয়েও বাড়ী ঘুরে চল—যদি উনি সম্মত হন, তবে না হয়—একটু ছোট ঘাট আয়োজন করা যা’বে।”

লজ্জাবতীকে একখানা টাঙ্গিতে তুলিয়া দিয়া প্রথমদণ্ড আর একখানায় বাজী চলিয়া গেল।

প্রথমদণ্ড বাজীতে পৌঁছিলে মালতী বলিল, “কেন, দাদা, আমি বলিনি—ফিরতে রাত হ’বে, তখন আর আসতে কেমন না? ভাগিল আমি বলে আসিনি কালই ফিরব। বৌদি এলেন না?”

“আসতে আর বড় দেরী হ’বে না।”

তাহার অন্তরন পরেই লজ্জাবতী আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—কেবল তাহার বিশেষ জিদে মিষ্টার চৌধুরী পাট্টেতে সম্মত হয়েছেন। তবে তিনিই সন্ধ্যার পরই রক্তনা হইবেন।

আয়োজন আর বিলম্ব করা চলেনা।

## পঞ্চম পত্রিচ্ছেদ ১

নূতন হাওয়া।  
প্রথমদণ্ড যখন পাটি দিবার কথা লজ্জাবতীকে বলিয়াছিল, তখন সে যেনে করিয়াছিল, উটনার ঘাটের



হোটেলে দেখিয়াই পাটি হইতে পারিলে। ইমলক হইতে সেই হোটেলে দেখিয়াই কথাটা তাহার মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পর সে খতই বিবেচনা করিতে লাগিল, ততই উপলব্ধি করিতে লাগিল—তাহা হয় না; কেন না—মাধুরীকে তথায় লইয়া বাওয়া সম্ভব হইবে না; স্বেচ্ছা স্থানে বাওয়া তাহার স্বত্ত্ববাবাধীর লোক ভাল-বাসিনেব না। মাধবী ও জানিয়া গিয়াছে, সে বন্ধ-বান্ধবদিগের জ্ঞাত স্থানিলে আয়োজন করিতেছে; মাধবী ও উটরাম ঘাটে পাটিতে বাইবে না। এই অস্থানে তাহার এই দুই ভগিনীকে বাব দিতে তাহার মন স্থির নাই। কামেই সে স্থির করিল, বাজীতেই মঙ্গলদলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানাজকে ও দেবদত্তকে ও নিমন্ত্রণ করা হইল।

আহাওয়ার ব্যবস্থা হাল ফ্যানসনে—ইন্দ্র-বঙ্গ রকমের করা হইল, অর্থাৎ এক দিকে ভালসু ও সিঁদাড়া, আর এক দিকে ভাঙউইচ ও কেক চার'র সঙ্গে শোভা পাইল; আর সঙ্গে কুড়ী বরফও রহিল।

বাছিরের লোক আর কাহারও নিমন্ত্রণ হইল না—তবে রবীন্দ্রনাথের পরিবার একাই “এক শ”। মালতী পাটির জ্ঞাত সকলেই আসিল এবং বাহাতে আয়োজন কোনরূপ ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে দাবাকে আবশ্যক উপদেশ দিল। রবীন্দ্রনাথও ব্যবস্থার প্রথমদণ্ডকে সাহায্য করিল।

বেলা প্রায় ষটার সময় অতিথিরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথের নৌদিগরা ইতঃপূর্বে ঘর বার সে গৃহে আসিয়াছেন। কিন্তু তখন না ছিলেন, কামেই জুতা পরা দিয়া ও মাথার উপর হইতে কাপড় ফেলিয়া আশা সম্ভব হয় নাই। এ বার তাঁহার চান্দরী জুতা পায় দিয়া—সম্ভা গরদের শাড়ী “ব্রাজিক ফ্যানসনে” বুরাইয়া পরিয়া বৈশাখের আসিলেন, তাহাতে লোকের পক্ষে মনেকরা অসম্ভব ছিল না যে, ক্যাপ্টেনল স্কুলের “পলীকোইগী বাজী” বিভাগ প্রথমদণ্ডের গৃহে বসানগরিত হইয়াছে।

‘কেবল দুই কারণে তাঁহাদিগকে স্বাধীন ব্যবহার

একটু সম্মত করিতে হইল।—প্রথম, মাধবী কিছুতেই তাঁহাদিগের সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরে ও তাহার সম্মুখস্থিত সজ্জিত বারান্দায় আসিল না—মাধুরীকে লইয়া অস্থায়ী মার'ঘরে রহিল; দ্বিতীয়—মনোজ ও দেবদত্ত তাঁহাদিগের অপরিচিত এবং উদ্ভেদে একরূপ সন্মিলনে অন্যতর বলিয়া যেন কেমন “আড়ঠ—আড়ঠ” ভাবে এক পাশে বসিয়া রহিল—যে কিছু কথা পরস্পরের সঙ্গে বলা-বলি করিতে লাগিল—লজ্জিত ভাবে দেখাইতে লাগিল।

বাস্তবিক মনোজ বা দেবদত্ত কেহই ইহার পূর্বে ইন্দ্র-বঙ্গ দলের এইরূপ সন্মিলনে যোগ দেয় নাই—মহিলাদিগের সহিত পুরুষদিগের একরূপ মিলামিশি দেবে নাই। মনোজ শুনিয়াছিল বলে, রবীন্দ্রনাথের গৃহে খুব নকল “সাহেবীমানা” ছিল, কিন্তু সেই নকল—ষ্ট্রী “সাহেবীমানার” স্বরূপ সে পূর্বে কখন প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায় নাই। সে সুযোগ পাইয়া আজ তাহার মন কেবল বিরজিতেই ভরিয়া উঠিল। কুঠার উপর তাহার দৃশ্য ছিল; বিশেষ আজকাল—এই দেশোৎসবের যুগে যে শিক্তি বাঙ্গালী পরিবার এমনভাবে অহরুণশীল হইতে লক্ষ্যহত্ব করে না, তাহা দেখিয়া তাহার মনে দিগন্ত ও লক্ষ্যই কেবল মাত্রা দিতে লাগিল। মনোজের পিতা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আমোলনের সময় স্বদেশীয় বৈদ্যিক হইয়াছিলেন এবং পুত্রদিগকে যেরূপ যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাকে তাহাদিগের ধরবে জাতীয়তার ভাবই “দুর্ভ” হইয়াছিল। আমাদিগের মনোজের সব সম্ভার কুম্ভধার মাজে—এ কুম্ভধার তাহাদিগের মনে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। তাই আজিকার এই দৃশ্য মনোজের কাছে লক্ষ্যজনক বলিয়া মনে হইতেছিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন মনোজের সহিত মিষ্টার চৌধুরী পরিচয় করাইয়া দিল, তখন মনোজ এই মুকলী মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধিবিষয়কতার পরিমাণ করিবার জন্যই রাজনীতি ও সামাজিকতার নানা কথা আলাদাভাবে প্রবৃত্ত হইল। রবীন্দ্রনাথের কাছে সে শুনিয়াছিল—শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব মিষ্টার চৌধুরী নবদর্শনে দেখিয়া গানেন।

খতি থায়া আলাপের পরই সে সুবিধে পারিল, তিনি জিজ্ঞাস্য শাসন-পদ্ধতির ও রাজনীতিক ইতিহাসের কিছু জানেন না—ভারতের শাসন-পদ্ধতি তিনি যে পূর্বে দেখেন তাহার পদ্ধতের অধ্যয়নের পারদর্শন নাই বলিতে হয়, কামেই সে মুকুরের তাহা লক্ষিত হয়, হায়া অসম্পূর্ণ ও, অনেক স্থলে, বিকৃত। সামাজনীতি বিষয়ে তিনি একেবারেই অজ্ঞ—আমাদিগের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিয়া তিনি যে সব দৃষ্টি দিলেন, মনোজ সহজেই সে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। মিষ্টার চৌধুরী সুবিধে পারিলেন, তিনি বাহার সহিত খালাচানার প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মানসিক শক্তিতে তিনি প্রায় বরিকটক হইতে পারেন না। তিনি চতুর—যে সব আলোচনা তাগা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বিভ্রান্ত হইয়া পাইলে তাহাকে আশ্বত করিবার পূর্বেই তাহাকে লইয়া খেলা করে, মনোজ সেই ভাবে তাহাকে লইয়া তর্কের খেলা করিতে লাগিল—তিনি পলাইবার পথ পাইলেন না এবং পরে পরে প্রবৃত্ত অতিক্রম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার এই থধা লগ্ন্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই তাঁহার উদ্ধার মান করিলেন; বলিলেন, “চলুন, বারান্দায় বসুন—যে বড় ধরন”। মিষ্টার চৌধুরীও ঘড়ী দেখিলেন—আজকে ষেই ঘরিতে হইবে।

বারান্দায় আসিয়া মিষ্টার চৌধুরী মেলাটাকে গান গাহিতে বলিলেন। কিন্তু মালতী সম্মত হইল না—তাহার কোনোদিকে লক্ষ্যবস্তীও গান গাহিতে অস্বীকৃত হইল। শেষে রবীন্দ্রনাথের এক নৌদিক একটা গান বলিলেন। কিন্তু গান বা আদ্যের কিছুই আশাহরণ “হলি” না। মনোজ যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, তাহাই সে সব “জমিবার” পক্ষে অস্তরায় হইয়া রহিল।

এদিকে মাধবী ও মাধুরী বাজীর ভিতরে বসিয়া প্রথমদণ্ড এক গ্রেট কুড়ী বরফ ও কডকডলা কেক “এহি” লইয়া তাহাদিগের কাছে গেল; বলিল “মাধুরী কুই থা”।

মাধবী বলিল, “ওগুলো না হয় না-ই খেলে।” প্রথমদণ্ড কবিল, “ওত থায়। কুই নিজেও খাবি নে, আর আর কবিলকও খেতে দিবি নে।” মাধবী হাসিয়া বলিল, “অর্থাৎ আমি ‘কথামালা’র সেই মুকুরের মত। কিন্তু, দাদা, এতদিন খেলেও এখন যে খাওয়া চলবে, তা'ও নয়। ওর স্বত্ত্ববাবাধীতে—বাজীতে সকলেও সব পছন্দ করিলেন কি না সন্দেহ।”

“সে পরে দেখা যাবে।” “আচ্ছা, তবে থা, মাধুরী। কিন্তু লজ্জা দিচ্ছি আবার, এ ঘরে খেয়ে কায নাই।”

প্রথমদণ্ড জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?” মাধবী বলিল, “এটা মার'ঘর। মা আর কিরবেন না বলেই পেছনে বটে, কিন্তু যদি তিনি কখন আবার পায়ের ধূলা দেন, তাই ঘরটা তার উপস্থল্য করেই রাখ। বাজীতে ত ঘরের অভাব নাই, দাদা।”

প্রথমদণ্ড অহত্ব করিল, মাধবীর স্বরে আত্মতা ও কথা আবারে আত্মতা। এই সময় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাহাকে ডাকিল, “বেশ লোক! মিষ্টার চৌধুরী যে খা'বার জড় বড় হয়েছেন!”

“এখনই?”

“ওর কথা কেন বলেন! চেষ্টানে খা'বার পথে বেঙ্গল ক্লাবে এক ‘বড় সাহেবের’ সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে। ঠেকে নিয়ে সবাই যেন টানাটানি করে—আজ চার'র নৈমন্তর্য করেছিল, কিন্তু—তা' ত আর যেতে পারলেন না—লিজির জিদে এখানে আশ্বত হ'ল।”

বলিতে বলিতে লক্ষ্যবস্তী আসিয়া আবার তাগিদ দিল—মিষ্টার চৌধুরী আসিয়া আবার তাগিদ লক্ষ্যবস্তীর হাতে থাবারের পাত্র দিয়া প্রথমদণ্ড চলিয়া গেল।

মিষ্টার চৌধুরী যে সত্য সত্যই “কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিনেন বলিয়া নিদ্রাক্রান্ত সময়ের পূর্বেই চাঙ্গা-যাইতেছিলেন, তাহা নহে—মনোজের কাছে জগদীশ্বর-পর তাঁহার বৈদ্য “শয্যা-কটকটক” ভাব হইতেছিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনোজ ও তাহা অহমান করিয়াছিল।



তাই মিষ্টার চৌধুরী যখন বিদায় লইতে তাহার কাছে আসিলেন, তখন সে বলিল, “তাই ত আপনি এত শীঘ্র চল্লেন; আমি কেবলিছুম, অনেক কথার আলোচনা করে’ অনেক জিনিষ শিখে নিতে পারব; তা’ হ’ল না। এ যেন অসময়ে ‘বুজুচুপ’ হ’ল।”

মিষ্টার চৌধুরী চলিয়া বাইসে দেবদত্ত মনোজকে বলিল, “ভগ্না—বাইসেন না?”

মনোজ হাসিয়া বলিল, “বা’ব ত বটেই—শব্দ। কি আর আমাদের খেতে দেবে? আমরা ওর স্বস্তরবাড়ীর লোকও নই—তাঁদের মুক্কীও নই। কিন্তু অত ব্যস্ত হ’লে চলবে কেন? আমাদের ‘লাগেজ’ নিয়ে যেতে হ’বে; তোমাকেও ত একবার ‘লাগেজ’ দেখে যেতে হ’বে।”

দেবদত্ত হাসিয়া বলিল, “লাগেজ ত ‘কেয়ার অব গার্ড’ আছে; ভয়টা কিসের?”

“ভয় নই? আজকাল যে চলন্ত রেলের চুতী হয়! বিশেষ—এই যা’রা গেল, তা’রা ত রেলের কলিশন ঘটতে পারেন।”

“আপনার কি বড় ভয় ছিল?”

“তাই ত বসে বসে দুর্গামান জগ্ন করছিলাম।”

“কিন্তু আপনি ত মিষ্টার চৌধুরীকে খুব পেড়ে কলেশ ছিলেন।”

“দেখুন, লোকটা অন্তঃসারজ্ঞ; কেবল ওর হাতে ক্ষমতা আছে বলে’ লোক ওর তোষামোদ করে। চল, এখন ‘লাগেজের’ সন্ধানে যাই। ‘মেম সাহেবরা’ বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিলেন—বোধ হয়, একপক্ষের বেরিয়েছেন।”

“‘মেম সাহেবদের’ অত ভয় কেন? এতক্ষণ ত বাঁরা কাছেই ছিলেন।”

“এক বার বিশপে পেড়ে গেছি বলে’ কি বার বার ইচ্ছা করে’ বিপদের মুখে যা’ব?”

বলিতে বলিতে উভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ততক্ষণে মালতীর বা’ প্রাকৃতিক বিদায় লইয়া সিঁড়িতে নামিয়াছেন; মালতী দিগির সঙ্গে বগড়া করিতেছে—

“দিকি ভাই, তুমি যেন দিন দিন একেবারে সেকেলে হয়ে যাচ্ছে—যেন কত কালের বুড়ী।”

মাদবী বলিল, “সত্য, মালতী, আমি মা’র কাছে, আর তা’র পর শাওড়ীর কাছে থেকে সে কালটাই ভাল-বাসতে শিখেছি; সেই আমার খুব ভাল সাপে।”

“কিন্তু একাল ত সেকাল নয়, দিদি! যে নতুন হাওয়া বইছে, তা’কে তুমি ঘরে চুষতে দেবেন না, এমন কি হ’তে পারে?”

“তা’ হ’তে পারে না; কিন্তু সে যদি ঝড় হয়ে আসে, তবে তা’র গতিরোধ করবার চেষ্টা করতই হ’বে; আর কিছুই জ্ঞান না হ’লেও আত্মরক্ষার জন্ত! আর নতুন হাওয়া কি সকলের সম্ব হয়? শীতের হাওয়ায় পাছের পাতা মরে’ পড়ে, পরমের হাওয়ায় কত স্ব-ভাবের হয়। আমাদের মা’রও ত নতুন হাওয়ায় ভাঙিল। তিনি তাই ত—”

সমুদ্রে মনোজ ও দেবদত্তকে দেখিয়া মাদবী মাথার উপর কাপড় ছাড়িয়া টানিয়া দিল—মাদুরী ঘোমটা দিল।

দেখিয়া মনোজ হাসিয়া বলিল, “ও সব ঢাল আর চলবে না। দেখলে ত আজ ‘মেম সাহেবদের’ ঢাল?”

বলিয়া সে মালতীকে দেখাইয়া দিল।

মাদবী সে কথায় কিছু না বলিয়া প্রণত দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করিল, “কিছু খেয়েছ? না খেয়ে থাক ত বল; ঘরে মিটি যা’ আছে; বেশ।”

দেবদত্ত উত্তর দিবার পূর্বেই মনোজ বলিল, “এখন ত আর মা’র রাজত্ব নয় যে, প্রতিনিধি হয়ে তোমরা অতিথিকে অভ্যর্থনা করবে। এখন যিনি বাড়ীর কর্তা তিনি না বললে আমাদের অপমান করা হ’বে।”

“তোমাকে কে খেতে বলছে?”

“তিনিই হয়ত বলবেন; কাব, খাবার বয়সটা দেখাচ্ছেন। বলি, তিনি লুকালেন কোথায়?”

“তোমার ভয়ে?”

“কি জানি।”

“মালতীর শাওড়ীর কাল রান্তির থেকে তেড়ে অর এসেছে—বোধ হয়, ইনস্পেক্টর—তাই ও গেল, দেখে আসবে।”

“তা’র এত জ্বর, কিন্তু বাড়ীর সকলেই ত এসেছিলেন।”

চোপ চিপিয়া চুপ করিবার জন্ত অমরোদ জনাইয়া বসী বলিল, “এই ত একটুখানির জন্ত এসেছিলেন।”

মাদুরীকে পার্শ্বের ঘরে দিয়া আসিয়া মাদবী দেবদত্তকে বলিল, “যাও, একবার মাদুরীর সঙ্গে দেখা করে’ এস।”

দেবদত্ত বাইলে মাদবী স্বামীকে বলিল, “পাড়ী যাচ্ছে ত?”

মালতী বলিল, “অত তাড়াতাড়ি কেন, দিদি? হু’ হু’ কথাও কইবে না?”

“আজ আর হ’বে না, ভাই। বেলাবেলি গিয়ে জ্বর কাপড় ছাড়িয়ে ওর মুখহাতপা ধুইয়ে দেব—একটু দ্বিধা মত হয়তো—”

“তবুও মুখহাতপা ধোয়াচ্ছেই হ’বে?”

“তা’ হ’বে। ওর ঠাকমা’র কোলটি না পেলে ওরও হয় না—ও কাছে না থাকলে ঔরও ভাল লাগে না। তাই মা পুরীতে গিয়ে অস্ত্রবিদ্যার পড়েছিলেন; এসে ল্যান্সন, ‘সেখানে গিয়ে আমি ঐ পুঁই-মাচা বেঁধছি। আজ সব ছেঁঁয়া হয়েছে—মুখ হাতপা না ধোয়াল হ’বে না।”

মনোজ মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আজ জ্ঞান থাকবে?”

মালতী বলিল, “হাঁ। দিদি থাকতে বলছেন।”

মনোজ এখন মাদবীকে বলিল, “যদি যেতে চাও ত চল। আমি আবার একবার দিদির বাড়ী যা’ব—তোমাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে চলে যা’ব।”

“দেবদত্ত আসুক; যদি আজ থাকে—বলে যাই।”

“তোমার কথায় থাকবে কেন?”

পদ্ম হইতে প্রমথনাথ বলিল, “কি বলছ?”

সে কক্ষকে পাড়ীতে ছুটিয়া দিয়া বাহিরের ঘরে মাইয়া বসে—

মনোজ ও দেবদত্তকে না পাইয়া তাহাদিগের সন্ধানে গিয়াছিল।

মনোজ কিরিয়া বলিল, “পরমারাধ্য তোমার এই—

বড় ভগিনীটি বসুধেন, দেবকে আজ থাকতে বলবেন; তাই আমি বলছি, বাড়ীর যিনি গৃহিণী তিনি না বললে ওর কথায় সে থাকবে কেন?”

মাদবী বলিল, “কি বগড়াটে লোক! বগড়া না করে’ থাকতে পারেন না!” স্বামীর এই বগড়া তাহার কত ভাল লাগে তাহা এই কপটকপ-প্রকাশকালে তাহার মুখের আনন্দ-শীতলিতেই বুঝা গেল।

মনোজ বলিল, “সত্য কথা বললেই বগড়া করা হয়; তাই ত কথায় বলে—‘উচিং কহিতে মৃদু বিগড়ে।’ বা’ক—এখন যা’বে, ত চল। বাড়ীর কর্তা ত হাজির আছেন, উনিই দেবকে বলবেন। মালতীও আছে।”

প্রমথনাথ বলিল, “অত তাড়া কেন?”

“তাড়া আমার নয়—বা’র তাড়া খাওয়াটা আমার পেশা হয়ে গিয়েছে তা’রই।”

মাদবী মোরেক ও ছেলেকে ডাকিল এক চাকরকে তাহাদিগের কাপড় জমা জুতা দেখিয়া গুছাইয়া লইতে বলিল। মনোজ বলিল, “ভাই—বোকে কি বিশ্বাস! যদি ছেলের এক পাটি জুতা পড়ে থাকে, তা’ও কি আর পাওয়া যাবে না?”

মাদবী বলিল, “রুম মনিষ্টি বটে—সব কথারই কদর না করে’ হুড়াহুড়ি নাই?”

পাড়ীতে বসিয়া মাদবী মনোজকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি রকম দেখলে?”

মনোজ বলিল, “দেখলাম, নানা রকম; সেই—

‘হরি যে দেখলাম তোমার চিড়িয়াখানার বাছড়ে বাহার দিনে দিনে।’

—নন্দর এক—মিষ্টার চৌধুরী লোকটিকে আমার মোটেই ভাল লাগেন না; লোকটা যোল আনাই মন্দী।

নন্দর ছই—মালতীরের লোক চিৎরিয়াছে খেগো। সাহেব’ বলে, চাক্ষুষ প্রত্যয়ে বুঝা গেল—একবারে ‘হুসো-চিংড়ি খেগো সাহেব।’ মিষ্টার চৌধুরী যেন দেবতা ওঁরা তাঁ’র তেমনই বাহন। মালতী ত বেশ কাঁকর কৈ কাঁকে শিশে গেছে।”



“আর তিন নম্বর?”

“তিন নম্বর—আমার একটা ভুল ভেঙ্গে গেল। না’কে  
খা’ দেখেছি, তা’তে মনে হ’ত, কা’রও সঙ্গে তাঁর  
অবনিবনাও হ’তে পারে না। তাই ভাবতুম, তিনি ছেলের  
বিয়ে দিয়েই পালালেন কেন—হু’রিন বৌকে সংসারের  
কাষ শিথিয়ে খা’বার বিলম্বও সইল না? আজ তা’র

কারণ বুঝলুম—তিনি খুবই বুদ্ধির কাম করেছেন।”

মাধবী হাসিয়া বলিল, “কেন?”

“তোমার ভাজটি যে—”

“যে কি?”

“বলতে যাচ্ছিলাম—জাঠা। তা’ আর বলব না।”

মাধবী হাসিল—“বলতে খুবই বাকি রাখলে বটে!”

( জমশ )

## বাদল এলো

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

বাদল এলো, বাদল এলো, আজ শাঁওনে নদীর তটে,  
বাদল এলো পল্লী-মেয়ের চিকণ-কাঁধের শূন্যঘটে।  
ঐ দেখা যায় সাড়ীর আঁচল—রূপের আভাষ ঘাটের কোণে,—  
কাঁকন বাজে, কণ্ঠবাজে, ছন্দ বাজে পখিক-মনে।  
পায়ের দাগে জল জমেছে পিছল পথের বক জুড়ে,  
ঐ জলে কাঁর মন ভেসেছে কোথায় হ’তে কোন যুদ্রে!  
বন-কেতকীর গন্ধ লুটায়, পাগল হ’লো ঝড়ের হাওয়া,—  
কাঁর পরাণে তুফান ছোটে লাশ-জনমের বাদল পাওয়া।  
কদম-কেশর করলো উত্তল চপল জলের বুক ছাপায়ে,—  
কাঁর মরমে সরম লাগে, পুলক জাগে আঁচল গায়ে!  
দূর কাননে কাঁপন ওঠে, স্বপন পাটে মেয়ের চোখে,  
নাথার গোঁপা যায় এলায়ে মেঘ-চাওয়া কোন নেশার-কোকে!  
উদাসী-বন চমকে ওঠে হঠাৎ আবার আবুল খায়ার,  
ক্ষীণ তত্ত্বতে ঝাপটা লাগে, জলের তলায় কলসী হারায়।  
পল্লী-মেয়ের রোষ চাপে ঐ চপল আঁচল বকে নেবার—  
বাদল এলো, বাদল এলো, শূন্য কলস ভরতে এবার।

# দুঃখের বরষায়

উপন্যাস

শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

( পূর্ণ প্রকাশিতের পর )

৬

নিজকে সধরণ করিলেও, মন যে কথায় পরিপূর্ণ  
হইয়া থাকে, তাহা কোথা দিয়া, কেমন করিয়া, কোন্  
ধাঁকে বাহির হইয়া পড়ে, নির্বাক করা শক্ত!

রাজাবাবুর আহার প্রায় শেষ হইয়াছিল, রাগিমা  
দিকটে বসিয়া দেখা-ভনা করিতেছিলেন, হঠাৎ অতর্কিতে  
ঐহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, হরিলাগী  
মোটেই নিয়ে এসেছিল আজ।

বটে! কেমন দেখেছে?

ঐ প্রসঙ্গ উপাখান করিতে সেদিন রাগি চাইতে-  
ছিলেন না; কথাটা কেমন মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া-  
ছিল মাত্র; তাই, উদ্ভ্রত না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন।  
কিন্তু উদ্ভ্রত দিলেই বোধ হয় ভাল হইত। রাজাবাবুর  
ঐধাঁকে ধরিয়া ফেসিতে দেবী হইল না। মৌনীই  
স্বস্তির লক্ষণ, অতএব মেয়েটিকে পছন্দ হইয়াছে,  
তাহার প্রতি রাগির মন ধাবিত হইয়াছে, এমন কথা  
ধরিয়া লওয়া বিচিত্র নয়।

রাজাবাবু বলিলেন, ছেলে হওয়ার বয়স হো আর  
সোবার কেটে যায় নি?

ঐ কথায় ঐহার মনের অসম্প্রতি পরিপূর্ণ হইল।  
রাগি বলিলেন, রাজাবাবু ঐহার প্রতি অবিচার করিতে-  
নাই। তিনি কোন কথা বলেন নাই; তবুও এ  
আপত্তি কেন? আপত্তির সমুদ্র সোষ, নিমেষে মাছের  
মনকে বজ্র করিয়া বিরোধী করে; বিরোধী করিয়া  
যেলে।

মন স্বাধীনভাবে সর্বদাই বিচরণ করিতে চাহে;  
বাধা দেখিলে, অতিক্রম করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। যে  
বাধা দেয় সে একথা সাময়িকভাবে বোধ হয়  
বিস্মৃত হয়।

রাগির কোন উদ্ভ্রত না পাওয়াতে, রাজাবাবু বুঝিয়া  
বসিলেন, রাগির সংকল্প দৃঢ়; অতএব তিনিও কঠিন  
হইলেন। বিরোধ এমনি করিয়া অতর্কিতে অবাস্তবের  
ভূমিতে জন্মলাভ করিয়া অবশেষে অগাছার মত অনিত  
তেজে বাড়িয়া উঠে।

রাজাবাবু ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞতির প্রতি  
অঘাত করিয়া কথা কহিলেন: একটা-কিছু গেলে হয়,  
অমনি উঠবে নেচে ঐ মেয়ে মানুষের জাতটা!  
কোন কথা না কহিয়া রাগি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।  
রাজাবাবু বুঝিলেন: ইহা নিশ্চয়ে বড় ঘোষণা!

সেতার বাড়িতে বাড়িতে থাক। রাইয়া সমস্ত তার  
যেন বেশভূষা নামিয়া গেল।

অন্ত্যচাচারী যুদ্ধ ত সর্বদাই চলে; তাহার নুতন  
করিয়া ঘোষণা দিতে হয় না; অস্ববিধায় পড়িলে সঙ্গির  
প্রস্তাবও আসে, তাহারই কাছ হইতে। কিন্তু সে  
প্রস্তাবে উপনীত হইবার পূর্বে আস বহু চিন্তা, পাছে  
দুর্দলতা প্রকাশ হইয়া ভবিষ্যতে গোল হয়।

অনন্ত সে রাজের জ্ঞা হরেন্দ্রনারায়ণ শ্রামাস্ত্রিনীর  
সহিত বিরোধ করিতে চাহেন নাই; সেদিনের ঘটনা-  
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐহার মনে কতকটা রস-মাধুর্যের  
উজ্জ্বল স্মৃতি হইতেছিল; হয়ত কবি হইলে, ঋগুজ  
লইয়া বসিয়া থাকতেন; কিন্তু সকলের সে সৌভাগ্য হয়



না; তাই তাহার গলে, গানে সুস্থিত মতিতে চায়।  
তাহার সুবিধাও বাহার নাই, সে স্বীয় সহিত বিশস্ত  
আলোকে কতকটা সময় অতিবাহিত করিতে চাহে।

এই বস-ভঙ্গ রাজ্যবাসু স্বয়ী হইলেন না; কিন্তু  
কঠিন বাক্য হানার জন্ত অশ্রুশোচনাও তাহার জাগিল  
না; তাহার কারণও ছিল, একে পুরুষ; তায় জনিদার;  
অতএব কাঠিঙ্গের দ্বারা সমস্ত করা তাহার তো সহজ  
অধিকার। সেই সহজ অধিকারের মধ্যে অপর সাধারণ  
অসিতে পারে; কিন্তু স্বীয় প্রতি বিশেষ আচরণ  
প্রয়োজন; বিশেষ করিয়া শ্রামাস্থিনীর মত নারীর প্রতি।  
শ্রামাস্থিনীর যে বুদ্ধির দিকটা অপর ছিল তাহা বলা  
অনাশঙ্ক; সমস্ত দিন লেখাপড়া করিয়া তাহার অমূল্য  
দিকটা যেন একটু অসহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু  
তিনি কলহ করিতেন না। কলহ না করিয়া শুদ্ধতার  
দ্বারা প্রতিপক্ষকে হারয়ান করিতে জানিতেন।

হরেন্দ্র নারায়ণ তামাক খাইয়াও যখন নিশা-বোধ  
করিলেন না, তখন তাহার মন শ্রামাস্থিনীর জন্ত ধাবিত  
হইল। দেখিলেন, রাণী শুদ্ধ-ভাবে উইয়া আসেন;  
নিমিত্ত কিনা বোকা যায় না। দুই স্বীকার না করিলেও  
মনে মনে রাজা জানিতেন যে, কোথা দিয়া একটা  
অপরাধ হইয়া গেছে; সে স্বপ্নমাত্র তিনি প্রশ্নে  
করিতেন না। যেন সে মাথা-ব্যথাও তাহার ছিল না।

বীরে বীরে রাজা তাহার পিঠে হাত দিলেন; রাণী  
তাছাতে কিছুটা নড়িলেন না; রাজা কপাল কাছে মুখ  
লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, দোষ হয়েছে, ক্ষমা কর।  
ছি, ও কথা বলতে নেই—বলিয়া, রাণী পাশ ফিরিয়া  
ওইলেন।

রাজা পিঠের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।  
আর চুপ করিয়া থাকিতে পারা যায় না! শ্রামাস্থিনীর  
মধ্যে যে মনোমগ্ন ভরতাবোধ ছিল, তাছাতে তিনি চুপ  
করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পাশ ফিরিয়া পিঠের  
উপর নিজের কোমল হাততালি বুলাইতে বুলাইতে  
বলিলেন, ঘুম পাচ্ছে না বুঝি? একটু বিশ্রি নেবো?  
দুইহাতে সময় না কাটিলে ভাস খেলিতেন।

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না, কিছু ভাল  
লাগচে না!

শ্রামাস্থিনী উঠিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া  
বলিলেন, আমাকেও না?  
তবে তোমাকে জোর করে তুলুন কেন?  
রাজার, পুরুষের মজ্জি!

একগুণে হরেন্দ্র আশপ্ত হইলেন। কলহ করিতে  
হইলে মানুষকে এক ভূমির উপর ঠাড়াইতে হয়।  
নক্ষত্রের সহিত কলহ করা চলে না। হরেন্দ্রনারায়ণ  
বলিলেন, শ্রামাস্থিনী তাহার নাগালের মধ্যে আবার  
ফিরিয়া আসিয়াছেন। এইবার ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণীকে  
এক কথায় থুথী করিতে চাহিলেন; বলিলেন, ভাল  
প্রস্তাবিতক পাঠিয়ে হরিদাসীকে ডাকিয়ে আনাব;  
তোমার যদি ইচ্ছা হয় থাকে তো আমি কি বাধা  
দিতে পারি? কোন দিন, কোন কায়ে কে তোমার  
বিকল্পে গিয়েছে শ্রামা?

না বাণিনি, তা আমি জানি; সেই আমার জীবনের  
সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য, এই গৌরবেই আমি গর্ভ করি;  
কিন্তু হরিদাসীকে কাল ডাকতে পারবে না।

কেন, কুণি? সংঘব?  
না, বলিয়া রাণী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন; এই  
কথাটাই আজ আমি তোমাকে বলবো না মনে  
করেছিলাম; কিন্তু বলতে হবে দেখছি, নৈলে, আমার  
অপরাধ হবে। যে কোন কারণেই হোক তোমাকে  
আমি অতিক্রম করতে পারিনে।

হরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, সত্যি শ্রামা, তোমার হেঁয়ালি  
আমি কিছু বুঝতে পারিনে!

পার, একশো বার পার; কিন্তু ঐ ছোট্ট জিনি  
নিজে মাথা-বকাবার তোমার খেঁড়া নেই; তোমার না,  
বোধহয় সমস্ত পৃথিবীর পুরুষেরই এই দশা—

এইবার হরেন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন  
দেখছি তোমার পাণ্ডিত্য পৃথিবীর পুরুষদের দ্বারা  
মার্জনা করে চলে না; তোমার ঐ বইগুলো পড়ার  
ক'রে দিতে হবে, রাণী!

তা হলে বাস্তব চাকর ছাড়িয়ে দিও; নৈলে বাচব  
কি করে? একটা কাজ চাই তো!

হরেন্দ্রনারায়ণ মনে মনে হাসিলেন। রাণীর হাত  
চুইয়া লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিলেন, তা'হলে  
মনাকেও সঙ্গে ডেকে নিও। কাজের চেয়ে অ-কাজ  
করতে বেশী পারি আমি; তাই, আমি সঙ্গে থাকলে  
তোমার কাজের কমতি হবে না, শ্রামা।

শ্রামাস্থিনী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, তা হলেই হয়েছে  
যাকি! একেই শোকে বলে তোমাকে আমি বাছ  
বয়েছি, তখন বলবে ভেড়া করেছি! তোমার কাণের  
ধবনি কি? জমিদারী তো আর ভেঙ্গে যাবে না?  
তোমাদের মুরহৎ কোথায়? বুঝতে, যদি ঘরের মধ্যে  
আমাদের মত বাধা থাকতে হ'তো!

নিমজ্জতার মধ্যে হরেন্দ্রনারায়ণ নারী দলদের শূভতা,  
নিমেষের জন্ত দ্বন্দ্বাঙ্গম করিলেন। নিমস্জ্ঞানের  
আলোকা সংসারের কোন ঐশ্বর্য দিয়া পূরণ করিবার  
নহে। নিজের দুঃখ ভুলিবার জন্ত মাতাল যেমন মগ্ধমান  
বসে, তেমনি করিয়াই নাটক-নজলের মধ্যে শ্রামাস্থিনী  
নিজকে ভুলিয়া রাখিতে চাহে; সেইখানে আঘাত  
বিল, আঘাত যে মর্মে গিয়া পৌছায়!

হরেন্দ্রনারায়ণ অন্তরে বাধা বোধ করিলেন; একটা  
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, বিছানার উপর নিম্গম হইয়া বসিয়া  
রহিলেন। নারীর ইহাও ভাল লাগে না। নিজের  
নিম্গম বেনার একতিল অংশ অজ্ঞকে বলে চারিদিকের  
অবাব যেন চকুওঁড় হইয়া উঠে! এই দুঃখ বহন করি-  
বার পোষক প্রার্থ্য নিম্গম; এই কারণের ভাগে চলে না;  
এই দৈবের মধ্যে অশ্রীদার জুটানও একটা অসহ  
লিপিকা!

ঘরের নিমজ্জতা যেন গীড়ারায়ক হইয়া উঠিল!  
ইচ্ছা থাকিলেও আশ্রয়-প্রকাশের ভয়ে, রাণী কথা  
বলিলেন না।

হরেন্দ্র আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে  
ওঠা পড়িলেন। মনের মধ্যে যে চিন্তার দ্বারা প্রবাহিত  
হইয়াছিল তাহা হইতে একটি অর্ধ-পূর্ণ কথা সবগে  
উজ্জ্বল হইল।

বাস্তবিক!

জন্মের মনেই তরঙ্গ খেলিয়া গেল, কি বাস্তবিক?

কিসের বাস্তবিক?  
রাণী স্বামীর পা-উইখানি কোলের উপর টানিয়া লইয়া  
বীরে বীরে টিপিয়া দিতে লাগিলেন। এ সেবার প্রয়ো-  
জন ছিল না; শুধু ভালবাসা, নিবেদন; তাই হরেন্দ্র-  
নারায়ণের মনের অবসাদ ভেদ করিয়া, যেমন অন্ধকার  
সমুদ্রের কালো জলের উপর আলোর ছাতি চমকিয়া যায়,  
তেমনি করিয়া স্বস্তি হিল্লোলিত হইতে লাগিল। আবার  
একটা দীর্ঘ-শ্বাস!

শ্রামাস্থিনী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না,  
বলিলেন, একটা কি সব ভাব্বে?

তোমার কথাই!.....

মনে পড়ে, যে দিন তোমাকে প্রথম দেখি? কতবার  
বলেছি সে কথা, কিন্তু ভাত ভিতরের একটা কথা কখনো  
বলিনি তোমাকে শ্রামা; বলতে সাহস হয় না। বুকের  
মধ্যে কেঁপে-কেঁপে উঠে!

তা হলে বল দরকারও নেই। আমার শুনেই ভয়  
করছে।

নিমজ্জ অন্ধকারে, রাজার মুখ হাসির অস্পষ্ট শব্দ  
রাণীর কানে গেল। তিনি কথা কহিলেন—

কিন্তু, শ্রামা, এই সংসারে সত্যকে এড়িয়ে যাবার  
কোন উপায় নেই দেখছি। একদিন বয়সের দৃষ্টতার  
যাকে ভিসিয়ে যাব মনে করেছিলাম, আজ দেখছি,  
তা ডিঙ্গানো যায় না। এই সংসার, মানুষের একলার  
নয়। এর পিছনে বিবাতার অগ্নী শক্তি মানুষকে নিতাই  
বিভগ্নিত করছে!

হরেন্দ্রনারায়ণের এই অস্বাভাবিক ভাবাজ্ঞাসে  
শ্রামাস্থিনী ভয় পাইলেন। বলিলেন—তোমার মাথা  
গরম হয়েছে চোখে-মুখে একটু জল-হাত-বুলিয়ে হাওয়া  
করি, ঘুমিয়ে পড়।

না, আজ আমি তোমাকে আমার এতদিনের মনের  
জুকানো সেই কথাটা বলব। আর চেপে রাখতে  
পারি নে।



গ্রামাঙ্গিনী ব্যাপণ নাই বিমিত হইলেন, ভয়ে সমস্ত দেহ ঠাঁহার কটকিত হইয়া উঠিল। দাতকের উদ্ভট অসির দীর্ঘ প্রতীক্ষা যেনম অসহ—মানে হয়, যাহা অবশ্যস্তাণী তাহা ঘটিয়া যাক—তেননি মনকে পাবর করিয়া বলিলেন—

মুখি বলা দরকার হয়ে থাকে, তবে বল—

হরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, দরকার? ঠিক করে ভেবে দেখলে সেদিন কুবোবারও দরকার ছিল না, আর আজ কুবোবারও দরকার নেই। যাকে দরকার বলে মনে হয় সেটা, একটা সাময়িক জিনিষ, অত্যাশ্চর্য ছোট, অত্যাশ্চর্য সঙ্গীত, শ্রাম! আমরা বড় স্বার্থপর; তাই, স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত জিনিসকেই বড় করে দেখি, না কি?

মাছের জীবনের তর-মটিত কথা বুঝিবার অত্যাশ্রামাঙ্গিনীর ছিল; বিশেষ করিয়া নটক-নভেলের কল্যাণে। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, তা আমরাই কি এমন বড়? এ পৃথিবীরও শেষ নেই সময়েরও শেষ নেই; মাত্র দু-চার দিনের জন্তে মর কমা করতে এসেছি এখানে। মুষ্টিল, সব সময় আমাদের যে এই কথা গুলো মনে থাকে না। তাই বোধহয় ভগবান্ মাছকে ধুপ দেন; সব সময়ে মনে করিয়ে দিতে থাকেন; বলেন, তুই এই, তুই এই; তুলিগনি বেনে!

জ্ঞার কথা শুনিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ তাড়াহুড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, গ্রামাঙ্গিনী, সত্যি ববুজি, এতদিন আমি তোমাকে চিনতে পারি নি; আজ বুঝলাম যে, যে কথা তোমাকে গোপন করেছি, তা' করার একটুও দরকার ছিল না।.....বলি শোন তবে।

হরেন্দ্রনারায়ণ বলিতে লাগিলেন, তোমাকে তো বলেছি শ্রামা, যে, তোমাকে বিয়ে করার জন্তে আমার যার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। আজও সে কথাটা এটে নি। 'মাসে মাসে তাকে মাসহারা পাঠাই কাশীতে। এইটুকু সন্তু' অছা। তিনি কোনদিন একখানা চিঠি দিতে ত জানুতেচান না যে, আমি কেনম আছি।.....

গ্রামা বাধা দিয়া বলিলেন; কিন্তু এ কথা তুমি আমাকে বলনি! লোকের মুখে ধুংস করতে শুনি বটে মা-জেলের কথাটা নিয়ে; কিন্তু এ কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে কোনদিন সাহসে কুলোয় নি!

ভালই করেছ; জিজ্ঞাসা করলে তার ফল অশ্রিত বিঘ্ন হ'তো! সে যে কি হ'তো তা তুমি কল্পনা করতে পার না। আর সে কথা জানার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হ'লে অবশই জানতে পারবে। কিন্তু সময়ের আগে জানলে, কি জানার চেষ্টা করলে, ফল কিছুতেই ভাল হবে না।

গ্রামাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার মধ্যে প্রায় সকল কথাই গ্রামাঙ্গিনীর জান ছিল; কিন্তু সেই জানার মধ্যে পূর্ণাঙ্গের সম্ভবিতা মার জানা ছিল না; তাই তাহার অর্থও ছিল অস্পষ্ট। সহর অবস্থায় মাহুয় কোতুলহী দিয়া সম্ভবিতা বাহির করিয়া ফেলে; কিন্তু গ্রামাঙ্গিনী তাহা করিতে পারেন নাই। কোতুলহীর স্বাধীন ব্যবহারে হয়ত' মাহুয়ক বাধা ছিল। নাকি, বিবাহের পূর্বে সেই প্রতিশ্রুতি লিখিয়া দিয়া তরে ঠাহাকে হরেন্দ্রনারায়ণের ঘরে আনিবার পর উদ্ধৃত করিতে হইয়াছিল।

এমন ব্যাপার সমসার সচরাচর ঘটে না; কিন্তু এই বিচিত্র জগতে কোন বৈচিত্র্যই অসম্ভব নহে, অসম্ভব নহে। সেটি যে কি তাহা বলিতেছি।

হরেন্দ্রনারায়ণ অশ্রিত স্বাধীন দরিত্রের ঘরে বহু গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাত ভাই, পাঁচ বোনা। পিয়া বাতে পশু, উপার্জন করিতে পারিতেন না। মাহার বহু পরিশ্রম, বহু পরিশ্রম্য অচল সমসার যে কি করিয়া চলি তাহার নাগাল সাধারণ লোক কল্পনাও করিতে পারেন না।

পাঁচ বৎসর বয়সে কোন ধনী বাড়ীতে ভ্রাম্ব সাজিবার জন্ত বালক চাকর নিযুক্ত হয়। বালকের বৃত্তির অশুর্ষ পচিয়ে সেখানে এক সাধু বিদ্বৎ হন। সাধু ভ্রাহাকে সঙ্গে করিয়া কাশী লইয়া যান। তাহার পর, এই ভ্রাগোর উদয় হইল। সেখানে এ জনিবারের ঘরে আশ্রয় জুটিল।

অপরূক বৃদ্ধ জনিবারের মৃত্যুর পর দেখা গেল, উইলে তিনি হরেন্দ্রনারায়ণকেই উত্তরাধিকারী করিয়া বিখয়ের দরুণকী করিয়া গেছেন। বিধবা রাণী অত্যন্ত কুঠার সহিত স্বামীর শেষ ইচ্ছাটা গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু কোথায় যেন একটা বিরোধের সৃষ্টি হইল। সেই বিরোধ পরিপূর্ণ হইল বিবাহের ব্যাপারে। হরেন্দ্রনারায়ণ গ্রামাঙ্গিনীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিয়াছিলেন কিন্তু বিধবা রাণী এই কথাকে গৃহে আনিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। অপর দিকে হরেন্দ্রনারায়ণ অল্প দিনে কত্থাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। বয়সে, যিঘটি হরেন্দ্রনারায়ণের হাতে আসিল। হরেন্দ্রনারায়ণ গ্রামাঙ্গিনীকে ঘরে আনিবেন এবং সেইদিন হইতে মাতার সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটবে।

গ্রামাঙ্গিনীকে পছন্দ না করিবার যে কথাটী স্মরণ বিধবা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি ছিল কত্থার অসামান্য রূপ এবং অপরটা, কোটিতে লেখা ছিল বহু সূত-বহা হইবে।

শিক্ত বৃদ্ধকে কোঠা মানিতে চাহিলেন না এবং কোথায় থাকে স্বীর রূপ পরিভাষা? তাই, কত্থা না করিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ স্বযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং এ বিবাহের পূর্বে যাকে লিখিয়া দিলেন যে গ্রামাঙ্গিনী নিঃসন্তান হইলে কোনদিন তাহার পিতৃবংশের কাহাকেও দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই লেখাপড়ার না জানিয়া, গ্রামাঙ্গিনীকে স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল। এত ব্যবস্থার পরও যখন বিধবা আবার বিবাহের দিন দিন পূর্বে থাকিয়া বসিলেন, তখন হরেন্দ্রনারায়ণ আর কোন কথা শুনিলেন না। বিধবা রাণি গ্রামাঙ্গিনীকে চলিয়া গেলেন।

গ্রামাঙ্গিনী এনি করিয়া হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। বিবাহের ব্যাপারে খেলোখেণ বহুদিন হইতেই চলিয়াছিল, অবশেষে একটা কথাকে কত্থাকে সহি করিয়া দিতে হইল। কিসে যে সহি করিল কত্থা নিজে তাহা জানি না; শুধু লোকে বলিল, রাজপরিবারে

এনি প্রথা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। গ্রামাঙ্গিনী হরেন্দ্রনারায়ণকে ভাল বাসিয়াছিলেন, তাই ছুই চকু মুদ্রিত করিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিতে কোন দিক দিয়াই বাবিল না। শুধু মনে মনে জানিলেন, বহু নিয়ম বহু প্রথাতে অসম্মতাবে মানিয়া লইয়া ঠাঁহার জীবন আরম্ভ করিতে হইবে; এবং সে কোনো নারীর জীবনেই বা না হয়?

বাহিরের লোক যখন জানিল যে নূতন রাণী সর্গ-বিষয়ে স্বাধীন, তখন অতুরে পরম পরাধীনতা লইয়া, ষিধা এবং বাবার মধ্যে গ্রামাঙ্গিনীর জীবন আরম্ভ হইল। অপনার অধিকারে সব দিক দিয়া নন্দিত হইলে মনে অপরিশ্রম বৈরাগ্য আসিয়া বাসা বাঁধে। তখনই চতুর্দিকের পঙ্খী অতিক্রম করিয়া সেই নন বাস্তব হইতে অবাস্তবের রাজ্যে বাইতে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁধে। নিজেই ঘর-কন্ডায় হাত দিতে গ্রামাঙ্গিনীর যখন সাহসে কুলাইল না, তখন তিনি পূর্ণাঙ্গ-কাহিনী নটক-নভেলের ধারস্থ হইয়া কাঙ্গাঙ্গিনীর মত পথে পথে গুপ্ত-ভিঙ্গার উপর নির্ভর করিয়া যমের তীরে তীরে বিচরণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাণীর জীবনের এই অদ্ভুত পরিভ্রমের কথা অপর কেহই জানিল না; হরেন্দ্রনারায়ণ বুঝিয়াও শুকিলেন না। ফলে তিনি দ্বৈতজ্ঞ অভিমানের কবচে নিজেই চাকিয়া জীবন-সঙ্গিনীর কাছে থাকিয়াও ঘুরে রহিয়া গেলেন।

স্ট্রী-পুরুষের এই অসমতাকে পূরণ করে সন্তানরা আসিয়া; কিন্তু ভাগ্যবশে সে সূতরাও আসিয়া আসিয়া যেন রথ ভগ্ন দিয়া বিহিয়া বাইতে লাগিল। হরেন্দ্রনারায়ণ নিরাশ হন নাই। কিন্তু পরম বৈরাগ্যের মধ্যে মাহুয় জুড়িতে জুড়িতে যখন কষ্ট বরিয়া বাঁচিতে চায়; তেমনি করিয়া হরিপদসীর জাগরণরীকে পরিয়া গ্রামাঙ্গিনীর ভাসিয়া থাকিবার ইচ্ছা অন্তরে প্রবল হইল, কিন্তু হাত বাড়াইয়া নিজে তাহাকে অবলম্বন করিতে সাহসে কুলায় না; তাই সেখানেও তিনি দৈবের অহুগ্রহ এবং স্বাধীন অসম্মতের জন্ত-নিজেকে



সংঘত করিয়া প্রতীহত প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলেন।

তাই, শ্রামাস্ত্রিনীর মনে এই কথাই আজ প্রবল হইল যে, স্ব-চেষ্টায় ভাগ্যধরীকে ঘরে আনিবেন না; হরিদাসী বহি অক্ষম হইয়া তাহার শরণ লয় তাহা হইলে তিনি মনে ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহার আগে স্বামীর মন জানা চাই; যদি সেখানে তিলমাত্র অপজ্ঞিও থাকে তাহা হইলে এই বৈরাগিনী, দেবতার কোণা এই পরম সম্পদটিকে তাগ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।

স্বামীকে হইয়া এই মুষ্টি দখলি যে, তিনি নিজের দিকের নিম্নোক্তোক্ত এতাদ্য করিয়া স্ত্রীর জ্ঞ ভাগ্য-ধরীকে লুটিয়া আনিতে একবারে প্রস্তুত!

এমনি করিয়াও দান গ্রহণ করিতে শ্রামাস্ত্রিনীর মন চাহিল না; তাই তিনি সহসা নিলায়ের দিব্য-বিপ্রহের নিশীথিনীর মত নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন! অল্পে সেখানে সোহাগে করিয়া দাবী করিয়া বসে, সেখানে পর্ত্তের মত দূত-গাথীর দ্বারা স্বামীর মণ্ডি ব্যথিত করিয়া তুলিলেন।

হরেন্দ্রনারায়ণ সেদিন স্ত্রীর কাছে মন খুলিতে চাহিয়াছিলেন; শ্রামাস্ত্রিনীও আকর্ষণ হইয়া তুলিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু মনের চাণিত্যে অনভ্যাসের অব্যবহারে যে মরিচা ধরিয়াছিল তাহাতে বোলার কাজ কিছুতেই সহজ হইল না। যে কথাটি এতদিন তিনি গোপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই কথা আজ এমন করিয়া মাথা তুলিতে চাহে, বাহ্যকে হরেন্দ্রনারায়ণ নিজের মনেই বুঝিলেন যে, নিষ্ঠুর কঠোরতা ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

শ্রামাস্ত্রিনীও তাহা বুঝিলেন এবং স্বামীর প্রতি অস্বকণ্যায় তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিল:—তিনি হরেন্দ্রনারায়ণের হস্তাধিনি ধরিয়া বসিলেন, তুমি যে-কল্পা আজ বদতে গিয়ে ব'লতে পারবোনা, তা আমি জানি; কিন্তু ভয় কি? ও কথা আমি কোমদিন বিশ্বাস করিনি, আজও করিনে।

হরেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; হয়ত একটু স্বস্তিও বোধ করিলেন; আবার সেই স্বস্তির মধ্যেও সন্দেহের খোঁচাও আছে! তাই পাকে-প্রকারে জানিয়া লইতে চাহেন যে, শ্রামাস্ত্রিনী সত্য করিয়াই সেই কথাটি জানে কিনা!

প্রশ্ন করিলেন, কেন বিশ্বাস কর না? তুমি যে কর না।

হরেন্দ্রনারায়ণ আবার প্রশ্ন করিলেন, তাই বা তুমি কি ক'রে জানলে?

এইবার শ্রামাস্ত্রিনী মুহূর্ত্ত হস্ত করিলেন, বলিলেন, বিশ্বাস করাটা সহজদ্বিধীর কর্তব্য; কিন্তু সে আপত্ৰাণও নেই আমার। আমি বুঝি দিয়ে ভেঙেছি। আমি জানি যে, এ কথা বিশ্বাস ক'রে কোন পুঙ্খ কোন মেরোমহুগকে পড়জগে গ্রহণ করিতে পার না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া ঘরের মধ্যে একটু এদিক ওদিক করিয়া, আলোড়িত করে আঁচা বাড়াইয়া দিয়া অত্যন্ত গদ-গদ কর্তে হরেন্দ্র বলিলেন, শ্রামা ঐ বুঝি জিনিষকে বড় বেশী প্রত্যয় করা চলে না; তুমি আশা সেদিন মনে পড়ুক মনকে চিন্তা। সত্যি, পতির অস্বপ্ন কর, স্ত্রী মনের স্বপ্ন হ'তে পারে; কিন্তু ও ধাতুতে পুরুষের মন ঠেঙা নয়। অবিচার ক'রে অপারোচন করে না। আমার মনে হয় আমি তোমার রূপে দৃঢ় হয়ে তোমাকে বিয়ে করছি।

শ্রামাস্ত্রিনী বলিলেন, আমি তাও জানি; আর সেইখান দিয়ে আমার ইচ্ছা-জয়ের পূর্ণ সার্বভৌম পেয়েছি যে।

হরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, হ'তে পারে তোমার মনের ওটা একটা সাময়িক সমাধান; কিন্তু সনাতন নয়—

শ্রামাস্ত্রিনী উঠিয়া গিয়া হরেন্দ্রনারায়ণের হাত ধরিয়া বলিলেন, তা হলে আমাদের আর কোন মাথা খাওয়ার দরকার নেই—সে সনাতন তা'হলে স্নাজও জ্বালায় নি!

হরেন্দ্রনারায়ণ শ্রামাস্ত্রিনীকে নিবিড় ভাবে দেখে

করিয়া বলিলেন, বোধহয় শ্রামা, এই কথাই সব চেয়ে বড় গতি—এই বিশ্ব প্রজ্ঞাও!

ছুটি অশান্ত দ্বন্দ্ব নিমিষে পরম শান্তি লাভ করিল।

হরিদাসী আর আসিল না।

শ্রামাস্ত্রিনী কিন্তু আশা পরিত্যাগ করিলেন না। মনকে বুঝাইলেন, আশিবার সময় হয় নাই। মনকে বুঝাইতেও প্রাশংগতিক তাহা নিত্য-দিন প্রবাহমান, কিন্তু তবুও তাহা ব্যথিত। সকাল আছে, বিকাল আছে; দিন আছে, রাত্রি আছে; মাস আছে, বৎসর আছে; যুগ আছে, আয়ু আছে। জগদীশ অনন্ত, মুক্তি-প্রদ করিয়া শান্ত হইবে। মানুষের কাছে ধরা দিতে হইলে অনন্তকে শান্ত হইতে হয়।

এমনি করিয়াই মানুষের মনে সাহস আসিতে থাকে। বীজ অস্থির হইতে কতদিন লাগে, তাহার পর পরিণত হইতে কত সময়! তাহার পর আসে প্রীতির পালা, তাহারপর মগধেরবে সকল ব্যাধার ঘটান হইয়া আসে ফল। জানালার উপর বসিয়া ধরিয়া সেদিন শ্রামাস্ত্রিনী এইরূপ করিয়া চিন্তা করিতে-ছিলেন। সেদিন মন বড় উদ্ভাস্ত ছিল।

বিকাক্যে পূর্ণ কানী হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে রাণীমার শরীর ভাল নহে। হঠাৎ তার আসিয়াছে, বসে ভাল নহে, আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন।

হরেন্দ্রনারায়ণ আর বিলম্ব করেন নাই। শ্রামাস্ত্রিনীও

সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণ কিছুতেই রাণী হইলেন না; বলিলেন, তোমাকে দেখে বা কিছুতেই থুগী হবেন না। কিন্তু শ্রামাস্ত্রিনীর মুক্তি ছিল, অঙ্গপথের; তিনি বলিতেছিলেন, শেষের সময় মনকে সকলকেই মাছানা করে যায়; আমি তাঁর হাত-পায়ে ধরে এতদিনের রাগ নিমিষে জল ক'রে দেব। হৃদি সেগো.....

হরেন্দ্রনারায়ণ হাসিলেন, বলিলেন, যদি স্ত্রীবা বুঝি তোমাকে ভেঁকে দেবে; তাহলে খবর পেলে, নায়েব মশাই-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

শ্রামাস্ত্রিনী চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে কোন তর্ক কোনদিনই করেন নাই।

যে জানালার উপর শ্রামাস্ত্রিনী বসিয়াছিলেন তাহার নিচে বড় বড় ঝুঁই-এর কাণ্ডা। মালী তাহা ছাটিয়া দিয়া গোড়া খুঁড়িয়া জল দ্বারা ব্যবস্থা করিয়াছে। ফল ফুটতে এখনও কতদিন বাকি; কিন্তু সে কথা মনে করিয়া মালী একদিনের জজ নিরস্ত নহে। একজোড়া টুটুনি উড়িয়া আসিয়া পাছের উপর বাসিল; তাহার বাসার জজ গড়-কুটা সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেছে। মালী পাখীটা ছোট দিয়া শুকনো ডাল টানিয়া বাহির করিতেছে, তাহার সঙ্গিনী সেটি লইয়া উড়িয়া অঙ্গুরের নেরু পাছে গিয়া বসিল; সেইখানেই ঘন-পল্লবের অন্তরালে পাখীদের বাসা-বাঁধা শুরু হইয়াছে!

শ্রামাস্ত্রিনী জানিতেন, যে বাসা কোথায়, কত নিষ্ঠুর। ভিন্ন পাখীদের তখনও কত শেরি; কিন্তু সঙ্গিনী-পাখীর কি অধীরতা! ছুই চোখ বন্ধ করিয়া নিজের বুকের মধ্যে সেই অধীরতার আনন্দ-চাকলা বেন একটু একটু অস্থির করিতে পারেন, তিনি! আর বসে গেল না; উঠিয়া দাঁড়াইতে বুকের ভিতর হইতে থানিকটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল! সেই সঙ্গে হরিদাসীর পালিতা কস্তার কথা মনে আসিল; তাইতো হরিদাসী তাহার পর আর আসিলই না? হয়ত আসিবার সময় হয় নাই, হয়ত মেরোটারই অস্থির! শ্রামাস্ত্রিনীর বুকের মধ্যে বেন আনন্দ চাকলা উঠিল।

ঝুঁই পাছে জল ঢালার শব্দ হইল। পিছন ফিরিয়া শ্রামাস্ত্রিনী দেখিলেন, পাখী ছুটি উড়িয়া গেছে, একটা কাক আসিয়া জলের ধারে বসিয়াছে—কিন্তু কি পোকের লোভে। পাঠে জল ঢুকিলে তাহাদের বাহিরে আসিতে হইবে।

শ্রামাস্ত্রিনী মালীকে বলিলেন, লেনু পাছের তলার ভাল ক'রে জল দিয়ে বাও, মালী!

মালী হাসিল, বলিল, তাহলে এ বছরে আর ফল হবে না, কেবল-পাতাই জোর ক'রে গড়িয়ে যাবে. যে, যা!



গ্রামাঙ্গিনী বলিলেন, ফুলে কাজ নেই মালী, ওর পাতাতেই আমার কাজ।

মালী ভাবিল, এই বড় লোকের মজ্জা! তারপর রাজার কাছে কৈরিন্দ্র দিতে দিতে জান্ন হায়রাণ হবে আর কি?

মালী জানে না, সে কোন্ কাম্বালিনীর নিবিড় ব্যাধা, এই রাজ-রাণীর অন্তরের মধ্যে। পাখীর বাহার মধ্যে স্বভিতে ভিন্ন মুটিলে, রাণীর বুকের মধ্যে কাছারা যেন ডানা বাড়িয়া নাচিয়া মেঘের। পল্লবের ঘন অন্তরাল নহিলে পাখী যদি উড়িয়া যায়। কি হইবে নেবুর ফুল ফলে? পাখী ছুটাইর নীচে যে পাতার আড়াল চাই ই চাই!

টেবিলের উপর হইতে আসমানী রংএর উলে বেণা অসমাপ্ত ছোট জামাতা তুলিয়া লইয়া বুনিতে বুনিতে উঠার মনে হইল, সেতাকে হরিদাসীরা মেঘের জুখ পাঠাইয়া দেবেন; আর দেরি কি? ঘণ্টা ছুই বসিলেই তো শেষ হয়!

মনে হইল, আচ্ছা, হরিদাসীর বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিলে বোঝ কি হয়; উনি? না; রাগ করবেন না, হয়ত, মনে মনে খুশী হইবেন।

দাসী ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর ডাক রাখিতে রাখিতে বলিল, যা, এই চিঠি পঙ্কর হইলো গো.....

দেখি, এদিকে নিয়ে আর; ও বাবুর টেবিলে রাখিস্ কেন? তিনি নেই এখানে—তাও মনে তোর থাকে না?

ভুলে গেছহু.....বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

দৈনিক কাগজ, মাসিকপত্র, জমিদারী শেরেশ্বর চিঠি-পত্র নাড়িয়া বাড়িয়া গ্রামাঙ্গিনী হরেন্দ্রনারায়ণের চিঠি পাইলেন না। মনে মনে বলিলেন, কাজের ভিত্তি চিঠি দিতে ভুলে গেছেন; তারপর রাত নটার সময় জ্বরির ব্যাঘ আসবে। ওঠের উপর একটু হাসি চমকাইয়া গেল, মনে মনে বলিলেন, মাঘ্য বদলায় না! যেমন ছিলেন ঠিক তেমনটিই আসেন আচ্ছা!

তারের প্রতীকায় গ্রামাঙ্গিনী অনেক রাত্র পর্যন্ত

জাগিয়া বই পড়িয়া কাটাইলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম আসিল না।

বিজ্ঞানের গিয়া শুইলেন, মন পরিকার জাগিয়া আছে; কিন্তু শরীর যেন ঘুমাইতে চায়। পা ছুখার উপর শীতের কুসারার মত তন্দ্রার আচ্ছন্নতা ঘেরিয়া আসিতেছে; কিন্তু মন যেন কিছুতাই ঘুমাইবে না, আজ তাহা নিজের ইচ্ছায় অনল বকিবে, ভাবিবে, যেন তাহাকে ভাবনার জ্বত পাইয়াছে।

ছুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গ্রামাঙ্গিনী দেখিলেন, হরেন্দ্রনারায়ণ কাশীর দশাশমেঘবাটে পাড়াইয়া আসেন, একদিন যেমন করিয়া পাড়াইয়া তিনি গ্রামাঙ্গিনীর গ্রাম-শ্রীতে কান্ধনের আভা দেখিয়া মোহিত হইয়া ছিলেন। রূপ হয়াত তাঁহার ছিল, কিন্তু সে জগের কবি ছিল না। গ্রামাঙ্গিনীর নিজেকে নীর মত বিস্তৃত নিরন্তর করিয়া দিবার সাধ ছিল, যেমন করিয়া মোহিত দেখিয়া ফুল নিজেকে গ্রহ করিয়া এলাইয়া দিতে চাহে। স্বভেতে আরামে মন যেন আরো বড় শিকার বুজিতে অভলে ভুব মারিল।

সহসা কানে যেন কিসের ময় আসিল, চোখ দুইজুতে বোঁয়া আসিয়া লাগে। হঠাৎ তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, এ যে মণিকণিকা!

এমনি করিয়া কাশীর ঘাটে ঘাটে মন ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল তারা গ্রামাঙ্গিনী বুজিতে পারিলেন না।

সকালে উঠিয়া তাঁহার প্রথম কথা মনে হইল যে আর দেবী না করিয়া কাশী যাত্রা করিতে হইবে। কেন? তাহা তো জানা নাই; কিন্তু বাইতে হইবেই।

নায়েব মশাই আসিয়া পাড়াইলেন; বলিলেন আরো একদিন অপেক্ষা করুন; নিশ্চয় ভাল বর আসবে। গ্রামাঙ্গিনী নিজেই কথা কহিয়া বলিলেন, তা হোক, আপনি বাবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে থাকুন; আজ যদি চিঠি না আসে তো আমি সন্ধ্যায় পর রওনা হয়ে সকালের গাড়ি ধরতে চাই।

গৌড়িতে বড় অসময় হবে। বলিতে বলিতে নয়ে

চলিয়া গেলেন। চিঠি আসা-না-আসার কথা আর হইল না। গ্রামাঙ্গিনীর মন বাইবার জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠিল। কেবল একটা কাজ বাকি; সেইটাই বা হার বাকি থাকে কেন? জামাতা শেষ হইয়া গিয়াছিল, গটাইয়া দিলেই হয়; কিন্তু মন চাহে নিজে গিয়া দিয়া আসিতে। বিচার করিয়া দেখিলে নিজে বাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না; কিন্তু মন প্রয়োজনের কোনওরূপে মুখ্য থাকিতে চাহে না; মন বলিল, উল্লের হারাই বা কি প্রয়োজন ছিল? হরিদাসী তো তাহা চাহে নাই!

দাসীকে ডাকিয়া গ্রামাঙ্গিনী বলিলেন, দিয়ে আস্ মত পারব? সে হাসিল, পারবে না কেন? কি এত বড় ভার যাহ?

গ্রামাঙ্গিনী একটু লজ্জিত হইলেন, বলিলেন, বাওয়া মজ় নত' ক'টি গুণ্ডিও জানে; যদি গলাটা ছোট হয়, বাগা না ঢোকে, তুই তো কিরিয়ে এনে খালস্; কিন্তু ঠিক কতটুকু বড় ক'রে দিতে হবে তা তুই কি জানিস্?

দাসী রাগ করিল, ছোট হয়' আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবো তোকে। তুমি কেন যাবে না, ছোট লোকদের বাজিতে? আর লোকেই বা কি বলবে? রাজাবাবুই কি মনে ক'রবেন?

গ্রামাঙ্গিনী বুকের মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন, সে কথা সত্যি দেখিছ। তবে সে, তুই দেরি করিস নে আর! ও বেলা তোর সময় হবে না, বরি.....

দাসী কাশী বাওয়ার কথা জানিত, তাই সেই কাগজে মোড়া জামাতা লইয়া মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

গ্রামাঙ্গিনী বিমনা হইয়া ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, যানটা সারিয়া লুণে; কিন্তু মন চাহিল না। বানিকটা বসিলেন, তাহারপর এদিক-ওদিক করিয়া আলমারি হইতে চন্দন-বাঠের মাগাটা বাহির করিয়া নিজে নিজে বসিলেন,

এটা নাকে দিলে তিনি নিশ্চয় খুশী হবেন। কিন্তু দেখতে একটু পুরোনো হয়েছে। এটাকে পরম জ্বলে বুতে হবে; হুতাটা ময়লা দেখাচ্ছে, বসলে দি না? না আগেই বুতে হবে।

পরম জল আসিল। রেশমের হুতা বাহির করিলেন। বড় হুতে, হুতা পরাইয়া মাগাটি আবার পাখিয়া তুলিলেন।

কিন্তু কৈ কি যে ফেরে না? এই তো মজাব ওর; গর পেলে মেতে যায়, তখন আর বিক-বিকি জ্ঞান থাকে না; বেলা পুইয়ে তবে আসবে!

নায়েব মশাই আসিয়া পাড়াইলেন, একটা কি জ্বরির তার ক'রে দেব, না?

তা' দিন্ না। জ্বাব আনার জন্তে লোকটা যেন অপেক্ষা ক'রে আসে।

নায়েব চলিয়া বাইতেছিলেন, রাণী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, দেখুন, আপনি তৈরী হয়ে থাকুন; আমি আজকে যেতেই চাই। দো'মনায় কেবল দেহি হয়, ওতে লাভ নেই। আমি মনে করি, বাওয়া আনার দরকার।

বুদ্ধ ছিয়া পাড়াইয়া বলিল, আমি প্রস্তুত আছি; আমার জন্তে এক ভিল দেরি আশনার হবে না।

গ্রামাঙ্গিনী দেখিলেন বুকে দাসী ফিরিতেছে। হাতে তাহার কাগজের মোড়ক। সঙ্গে আর কেহ নাই! যেন সে-দুখ উঠার সাহ হইল না, তাই জ্রুতপদে ঘরে ফিরিলেন।

এই অনিশ্চয়ের জগতে, মনে মনে কিছু টিক একটা করিলে যেন বিধাতা-পুরুষের সহিত তর্কনি মাঘ্যের কলহ বাড়িয়া যায়। কিসে সেই টিকটাকে বেঠিক করিবেন, সেই চিন্তায় যেন মহাপুরুষটি অধীর হইয়া উঠেন। তাঁহার বোধ হয়, মনে হয় মাঘ্য চিরদিনই তাঁহার খোবার পুতুলটি; তাহার আবার স্বাধীনতা কি; আত্ম-কর্তৃত্বই বা কি?

দাসী আসিয়া যে সংবাদ দিল তাহাতে গ্রামাঙ্গিনী হরিদাসীর বাড়ি না বাইয়া থাকিতে পারিলেন না।



সে হরিদাসীর দেখা পায় নাই, হরি ভক্তারের সন্ধানে গেছে; মেয়েটার অবস্থা, এখন-তখন।

রাগে তাহার ঘেন সর্ব-শরীর জ্বালা করিতে লাগিল তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ক'নি অস্থব হ'য়েছে বলয়ে ?

দাসী ঘুন ঘুন করিয়া বলিল, অত কথা জিজ্ঞেস করিনি, না; আর, কথার জবাবই বা কে দেয় ? বুজী তো ডাইনি-মাণী। বহুন, জামাটা রাখ, তাতেই কি কিছুতে রাজি হ'লো?.....

তবে তোর এত দেরি হ'লো কেন ? গিয়েছিল কি আজ ?

দাসী উত্তর না দিয়া সরিয়া গেল।

হরিদাসীর বাড়ী হইতে ফিরিতে তাহার বেলা গেল। ভক্তার সে আনিতে পারে নাই। সঙ্গে আসিল হরিদাসী ও তাহার পালিত কল। বাড়ীতে পা দিয়াই সেই পালকিতা ভক্তার আনিতে পাঠাইয়া দিয়া, হরিদাসীর থাকিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

আর অল্প উপায় ছিল না বলিয়া হরিদাসী রাজি হইয়াছিল। ভক্তারকে নিম্নমিত কি দিবার তাহার সাধা কোথায় ? কোন রকমে একদিনের টাকা সংগ্রহ করিতেই তাহার জিত বাহির হইয়া গিয়াছিল। তবুও ভক্তার আসিল না; কেন, সে তাহা জানে না।

হরিদাসী বৃথিল, হিয়ার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারিত না। সে ভাগ্যদরীকে সাধা ধন্থপে বিজ্ঞানার উপর শোয়াইয়া দিতেই, শিশু এদিক-ওদিক করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তেমন আরাম বোধহয় সে জীবনে কখনও পায় নাই। তেমন ঘুম সে আটদিনের মধ্যে একদিনও ঘুমায়ে নাই। পাশে পাড়াইয়া হরিদাসীর দুইচক্ষু জ্বল ভগ্না গেল। সে দেখিতে পায় নাই, অথন গ্রামাস্ত্রিনী নিশাঙ্গে আসিয়া তাহার পাশে পাড়াইয়া আছে। হাতে সেই আম্রদানী উল্লের জামাটি।

বিজ্ঞানার একপাশে জামাটি রাখিয়া দিয়া গ্রামাস্ত্রিনী

বলিলেন, গায়ের উপর ঐ পরম কাপড়টা ধীরে ধীরে দিয়ে দে; আমি জামাটা খুলে দি।

জামা খুলিয়া বলিলেন, রাতে আর এটা বন্ধ করিস্নে; ওর খোলা বাতাস সবচেয়ে বেশী দরকার হয়েছে; বলিয়া জামাটার পড়তি টানিয়া দিলেন।

হরিদাসী বলিল, ঠাণ্ডা লাগবে না ?

দূর হইতেই হিয়ারা করিয়া বলিলেন, 'টেচিয়ে কথা কইতে হয় না রুগণীর ঘরে। উঠলে, জামাটা পরিয়ে দিবি।

হরিদাসী আগ্রহ ভরে জামাটা লইয়া বলিল, এগুনি পরিয়ে দিই না মা ?

না, ওকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ওষুধ পান্যত বাওয়াবিনে, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়।

হরিদাসী দুই চোখ তুলিয়া গ্রামাস্ত্রিনীর মুখের পানে চাহিল, তাহাতে রুহুতায় সজল-সিদ্ধ আলো বন্দব করিতেছে। গ্রামাস্ত্রিনী মুহু হাসিয়া বলিলেন, ভা নেই, তোর মেয়ে ভাল হয়ে যাবে।

হরিদাসী তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া মাটিতে মাথা রাখিয়া বলিল, আমার দোষ হয়েছে না, আমি বাসুন হয়ে চাদে হাত দিয়েছিলুম, ও আমার নয়, তোমার !

আত্মসম্বরণ করিতে করিতে গ্রামাস্ত্রিনী ঘর হইতে বাহিরে হইয়া গেলেন। বাহিরে নায়েবমশাই টেলিগ্রাম হাতে পাড়াইয়া আছে। খবর অতিশয় সাংখ্যিক; রাজাবাবুর সকাল হইতে কলেরা হইয়াছে !

গ্রামাস্ত্রিনীর চতুর্দিকের পৃথিবী নিমেষে ঘুরিয়া গেল।

এ কি ! বিনা মেঘে বজ্রপাত !

একভিল বিলম্ব করিবার আর সময় নাই !

প্রভুসিং বারোটা কাহার ভাকিয়া আসিল; আর একখানা পাঙ্কী বাহিরে হইল। জিন্ম-পেড়ে নারের মশাইএর জুজ প্রস্তুত যোড়া দৃশ্য-হেজ অষ্টে মাটিতে পা ঘষিয়া হেথারদে ঘেন দগিতে চায়, দেবি কিসের, দেবি কিসের ?

গ্রামাস্ত্রিনী একখানা সাধা চাদর জড়াইয়া হরিদাসীর দাঁড়াইলেন। মন্দিরের স্তিমিত আলোকে দেখিলেন, তেরে সামনে দাঁড়াইলেন, সে বাহিরে হইয়া আসিয়া বসিয়া পড়িল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া গ্রামাস্ত্রিনী বহিলেন, এই চিত্রখানা রাখ, ভক্তারবাবুকে দিবি। চিনি রোজ এসে দেখে যাবেন। তাত্তাত্তি করিয়া দাসী সন্ধ্যা-প্রাণী আসিয়া দি। চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে।

দাঁড়াইলেন। মন্দিরের স্তিমিত আলোকে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখে চিরদিনের সেই চট্টল হাসি, কোনদিন তাহা মলিন হয় না ! কিন্তু রাধিকার মুখে বিশ্বাসের ছায়া ! পাঙ্কীর মধ্যে উদ্ভিতা বসিতেই কাহারো তাহা সশব্দে কাণে তুলিয়া অন্ধকার পথে ভীরের মত ছুটিল। পিছনে যোড়ার পায়ের শব্দ ! সহসা, রাণীর দুইচক্ষে, বর্ষার প্রাণন দেখা দিল। (ক্রমশঃ)

## শ্রাবণে

### শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

ঘন-ঘোর মেঘে আকাশ ঢেকেছে

আঁধার হয়েছে ধরণী,

উতলা শ্রাবণ-রজনী !

বিজলী চমকি উঠে বার বার,

হৃদয়ের তারে তুলে ঝঙ্কার,

ভয়ে ভরশায় ছুটিছে দেহুল

শুষ্ক জীবন-তরণী !

উতলা শ্রাবণ-রজনী !

অধর পথে মেঘ-বালা আজ

গর্জন করি তুলিছে,

স্বষ্টির বুকে বৃষ্টি দারায়

মুক্তার হার ছুটিছে !

আজি নব-ঘন মেঘ-শ্রাবণে,

কী-বাধা গুমরে পরাণে পোপনে,

বোঝাব তোমারে—কী-ক'রে—কেমনে—

আজি যে কেন মন তুলিছে,

এ-ঘোর শ্রাবণে পরাণ আমার

কী-জপনি কেন আ-কুলিছে !

(আজি) কপিত কার সন্ধ্যা ভরে

এনেচি তোমার উপহার,

সমারোহ কিছু নাহি তাঁর !

পোঁতেচি যখন বন-ফুল মালা,

এনেচি বহিয়া ঘৃণী-ভরা ডালা,

আজি সমাধারে দিহু তব করে—

আমার প্রীতির উপহার ;

সমারোহ কিছু নাহি তাঁর !

বাতাসি আকুলি বিকুলি—

ছুটিছে বকে আজি বসুধার,

কদম-কুজে তুলে হাচাকা,

কেতকী কাননে উঠিছে গুমরি,

ভেঙে সে আগল শিকলি ;

ছুটিছে আকুলি বিকুলি !



# ইরাকে

(অনন্য কাহিনী)

স্বীহেমেন্দ্র প্রসাদ দোষ

(৩)

প্রাতে সাড়ে ষটার সময় গোরাবারাক ত্যাগ করিয়া আসিয়া জাহাজে উঠিলাম বটে, কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে সাড়ে ১০টা বাজিল। এ জাহাজ সমুদ্রগামী নাহ— নদীপথযাত্রী; স্তরং ইহার আরম্ভ নহে। বাঙ্গালার নদীপথে সাধারণতঃ মেরুণ জাহাজ গভীরতর করে এ জাহাজ সেইরূপ। এই সব নদীজলগামী জাহাজের অনেকগুলি ভারতবর্ষ হইতেই আনীত— বাঙ্গলা হইতেও কয়খানি আনা হইয়াছে। এই জাহাজে শয়নের সুব্যবস্থা নাই—অস্থানেরও সেই অবস্থা। আমরা ডেকের উপর থাকিতো স্থান বেশ ও চেয়ার দিয়া বিক্রিয়া লইলাম। সেই সব বেঙ্কের উপরই শয়ন করিতে হইবে—অথবা ডেকের উপর শয্যা বিছাইয়া। কটী, বিস্কুট, চা—আর টিনে ভরা ফল, এই আহারেরই সমস্ত থাকিতে হইবে। কিং এ সব অসুবিধা আমরা অসুবিধা বলিয়াই বিবেচনা করিলাম না; কারণ, আমরা বাগদাদে যাইব। যে আমরা উপভাস উপভাসের মনিসমুখা—সেই আরব উপভাসের বাগদাদ দর্শনের আশায় আমরা উৎকুল! বাসবিহারী স্বীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলাঙ্করে সন্ধ্যার কথ। বৈষ্ণব সাহিত্যে পাঠ করিয়া কবি কামিনী রায় “মমুন কল্পনার” মননার কথা লিখিয়াছিলেন :—

“তার কুলে কুলে বুঝি বকুল তমাল  
করে কুল ছায়া পান।

তুর জলে জলে ছুটে প্রেমের স্বরিত  
কল্পনে বিরহ-গান।

সেখা সমীর-হিম্মনে বলে বা বাধারী  
পরান উদাসী করা।  
সেখা দিবসের আলো গোখলি কোমল,  
আধার কোমলীভরা।”

তেনমই বাগদাদের কথা উপজ্ঞাসে ও ইচ্ছাসে পাঠ করিয়া আমরা তাহার সম্বন্ধে কত কল্পনাই করিতে-  
ছিলাম।

বসোরা হইতে ষত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, নদী উত্তরকূলে ততই গ্রাম শোভা লক্ষিত হইতে লাগিল। কারণে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নিশিয়াছে। এই স্থানে ইউফ্রেটিস নদীর বিস্তার অধিক নহে। নদীর উপর নৌকায় রচিত সেতু—নৌকা সরাইলে তবে জাহাজ গভীরতর করিতে পারে।

আমরা টাইগ্রিসে প্রবেশ করিলাম। নদী কূলে মেঘ, মহিষ ও অশ্ব চরিতেছে দেখা গেল। এই সব স্থানে কেবল আরবেরই বাস নহে; কুর্দরাও কোন কোন স্থানে গ্রামে বাস করে। কুর্দরা—বিশেষ কুর্দ-



দুর্দ গৃহ

প্রায়—১৩৪২]

স্বীহেমেন্দ্র প্রসাদ দোষ

দুর্দার আরবদিগের তুলনায় সুশ্রী। তাহাদিগের গৃহও অবিকারিত স্থলে আরবদিগের গৃহের মত কুটার মাত্র নহে।

কিছু দূর অগ্রসর হইলে নদীতে প্রহরী “গান বোটে” খোঁ গেল। নদীর বাঁক অত্যন্ত অধিক—বাঁকের কাছে আলোকের ব্যবস্থা আছে। কূলে মধ্যে মধ্যে দুর্গের বত গৃহ—প্রাচীরের উপর প্রহরী বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে। জলে “গান বোট”। পাছে শত্রুরা নদীতে জাহাজ আক্রমণ করে, তাই এই সতর্কতা।



নদীতে গান বোট

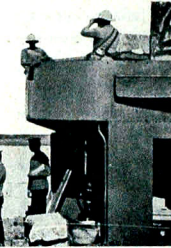
আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এজরার কবর ডাড়াইলাম।

এরা ইহুদীদিগের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পুরোহিত ছিলেন। ইহার মৃত্যু ও মৃত্যুস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু এই মৃত্যু সম্মানবিশিষ্ট এজরার সমাধি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এই স্থানে আমরা প্রথম স্ত্রীলোকদিগকে ফল প্রস্তুতি বিক্রয় করিতে দেখিলাম।

রাতি প্রায় সাড়ে ৯টায় জাহাজ আমাদের পৌছিল এবং তথায় নোঙ্গর করিল। জাহাজ হইতে আমরা আমাদের সাহাবের গৃহে আলোক দেখিতে পাইলাম। শয়নের স্থানের অসুবিধাহেতু স্ত্রীমুদ্রা স্তব্ধ হইল না; প্রায় জাগিয়াই রাতি কাটাইতে হইল।

পরদিন (৮ই এপ্রিল—২৬শে চৈত্র) সকাল প্রায় ষটার সময় জাহাজ ছাড়িল। সমুদ্রে নৌকায় রক্ষিত সেতু—জাহাজ তাহার নিকটে পৌছিলে নৌকা সরাইয়া জাহাজ যাইবার ব্যবস্থা করা হইতে লাগিল। এই সব জাহাজের কর্মচারীদিগের মধ্যে ঢাঙ্কলা লক্ষিত হইল—বেতনের সংবাদ আসিয়াছে, জাহাজ ধামাইতে হইবে।

জাহাজ থাকিলে আমরা হইতে কয়জন সামরিক কর্মচারী বোটে জাহাজে আসিলেন। তাহাদিগের হস্তে কাগজপত্র। তাহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভারতবর্ষ হইতে যে সাংবাদিকরা আসিয়াছেন, তাহারা



আমরা জানি না—জানিলেও বলিতে পারিতাম না। ইহাই আদেশ।”

তাই ত! এ যে সব সামরিক ব্যবস্থা। সামরিক কর্মচারীরা বলিলেন, আমাদের ব্যবহার-জ্ঞান ১১নং টাইগ্রিস ক্রফ্ট বাড়ী নির্দিষ্ট হইয়াছে; আমাদের গৃহে তথায় যাইতে হইবে। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের সহিত যাইতে পারি।

তাঁহাই স্থির হইল। আমরা তাহাদিগের বোটে উঠিলাম, জিনিষগুলি সামরিক কর্মচারীরা আমাদের জন্ত নির্দিষ্ট গৃহে পৌছাইয়া দিলেন।



কুর্দল



আমাদিগকে নদীকূলে নামাইয়া দিয়া কন্ঠচাটীয়া চলিয়া যাইলেন। আমরা ১১নং টাইগ্রিস ক্রান্তি গৃহে বাইয়া দেখিলাম—নদীকূলে রাস্তার উপর বৃহৎ গৃহ; আসবাব আছে, কিন্তু কোন লোক নাই। নৌকার নির্দিষ্ট সৈক, জাহাজ বাইবার জন্ত বুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—স্বতরাং আমাদিগের জিনিষ আসিতে অনেক বিলম্ব অনিবার্য। এ অবস্থার কি করা যায়? আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম। বসোরা মসজুদেতে অবস্থিত; নতুন সহর আমারায় গ্রাম শোভা। আমরা যে অঞ্চলে অবস্থিত, সে অঞ্চলে ধানের চাষও হয়। নদীর কূল গোষ্ঠে বাধান। বাজারটি বৃহৎ ও সুন্দর। উচ্চ ও দীর্ঘ বিলান করা বাজার—সারি সারি দোকান ঘর—নানা জন্তো পূর্ণ। দোকানদার প্রায় সবই ইহুদী। এই স্থানে ইংরেজের ৫টি হাসপাতাল ও ১টি আশ্রয় পথ-ক্রান্তিগণের চিকিৎসাগার বা “কনভ্যালেসেন্ট হোম।” বসোরার ইংরাজ সেনাদলের শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫ হাজার; হাসপাতালে ২০ হাজার রোগী রাখিবার স্থান। আমারায় হাসপাতালে ৭ হাজার রোগীর স্থান।



কৃষিগণের গ্রাম

ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও তৃষ্ণানুভব হইতে লাগিল। দোকানে সোডা, লিমনেড প্রভৃতির বোতল দেখিয়া কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় জামা পেল, সামরিক ব্যবস্থায় আমাদিগের নিকট তাঁহা বিক্রয় নিষিদ্ধ। এদেশের লোককে ইংরেজের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করা হয়; পাছে তাহারা ইংরাজ

পক্ষীয়দিগকে আহাৰ্য্য বা পানীয়ের সহিত বিশ্ব প্রদান করে—এই ভয়ে এই সামরিক সতর্কতা। কোন লোক ইংরাজ পক্ষীয়দিগের নিকট আহাৰ্য্য বা পানীয় বিক্রয় করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

এক দিকে এই অবস্থা—আর এক দিকে দেখিতে পাইলাম, সেতু তখনও সংযুক্ত হয় নাই; কাহেই আমাদিগের জ্বায়া আসিতে বিলম্ব আছে। বেলাও প্রায় ১২টা। এক ইহুদী যুবক আমাদিগকে বলিল, ইংরেজ ক্রান্তিগণ এসোসিয়েশন সৈনিকদিগের জন্ত ঘানে ঘানে আড্ডা স্থাপন করিয়াছে—তাহাতে আমরা পানীয় পাইতে পারিব। ইহুদীরা চতুর—তাহারা যে দিকে জল পড়ে সেই দিকে ছাতা ধরিয়া মাথা রক্ষা করিবার কৌশল পুরুষাচর্য্যে অশ্রুশীলন করিয়া কোনরূপে আশ্রয় করিয়া আসিয়াছে। ইংরাজ পক্ষে তাহাদিগের মহাহুত্বের স্মৃতি কারণও যে নাই, এমন নহে। এই মুসলমান শাসিত দেশে মুসলমানরা তাহাদিগের প্রতি যে ব্যবহার করে, তাহা আশ্চর্য্যজনকানন্দময় জাতিগণকে কষ্টকর। একদিন আমরা বাজারে কোন বৃদ্ধ ইহুদী দোকানদারের নিকট জিনিষ কিনিলে আর কুলীবালাক অনারামে বলিয়াছিল, “ইহুদীর কথায় বিশ্বাস করিয়া দাম দিলে ঠিকিবেন।” আমাদিগের সহিত আলোচনাকালে ইহুদীরা ইংরাজের জরকারমণি করিত। কিন্তু প্রকাশে তাহা করিতে সাহস পাইত না।

আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে ইহুদী যুবকের উল্লিখিত একটি আড্ডার সন্ধান পাইলাম। ইংরাজ সন্তীরা প্রস্তাব করিলেন, আজ যখন ভাগ্যে রেকফোর্ট ও লাগ নাই—ভিয়ারও আছে কি না সন্দেহ, তখন এই স্থানেই উদরপূতি করা সুবুদ্ধির কার্য। এই উক্তি যে হুজু-দুল তাহা সকলেই বুঝিলাম। তখন বিস্কুট, গা, টিনেভরা ফল ইত্যাদিতে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া আমরা আমাদিগের জন্ত নির্দিষ্ট গৃহে কিরলাম। এতক্ষণে আমাদিগের জিনিষগুলি আসিতেছে। জিনিষগুলি বুঝিয়া লইয়া আমরা শয্যা বিছাইয়া কিছুক্ষণের জন্ত বিশ্রামভোগ করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্বে আমরা স্থানীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ—“কম্যান্ডার” কার্ভায়ে গমন করিলাম। তিনি মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহারে আমাদিগকে ভুল্ল করিলেন বটে, কিন্তু কি জন্ত আমাদিগকে আমারায় নামান হইয়াছে—গৃহে বা আমরা বাইতে পারিব, সে সব কথাই কোন দৃষ্টান্ত দিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, তিনি রেকফোর্টের পাইয়াছেন, সেইরূপ কার্ভ করিয়াছেন। যার পর তিনি আমাদিগের অস্ত্রবিধার বিষয় অবগত হইয়া দৃঢ় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সব অস্ত্রবিধার প্রকার করা হইবে এবং আমাদিগের আমারাবাস গৃহেতে কষ্টকর না হয়, সে বিষয়ে তাহার চেষ্টার জটী হইবে না।

আমরা কম্যান্ডারের কথার বিষয় সাচনা বা আশা পাইলাম না।

আমাদের রাজি কাটিল।

বাজার সমুদ্রে নদী—অথচ রান করিতে পাই না! এনে—

“পানীয়ে মীন পিয়ায়ী!”  
পূর্বাধিন প্রত্যাবর্তনকালে আমি অহুসন্ধান করিয়া গিয়াছিলাম, ইংরাজ পক্ষীয় কোন লোক যদি নদীতে যান বা নদীর জল পান করে, তবে তাহাকে গুলী ধরিয়া মারিবার আদেশ আছে। কিন্তু এই গরম দেশে যখন লোভ সঞ্চর করা যায় না। তাই শেষে ঘুরিতে যখন দেখিলাম, এক জন ইংরাজ সৈনিক আমাদিগের বাসার সমুদ্রে পাহারা দিতেছে, তখন যাই। তাহার সহিত আলোচনা করিয়া বস্তুকি করিলাম, নদীতে একটা ডুব দিয়া আসিব—সে তাহা দেখিয়াও দেখিবে না। সংবাদ পাইয়া মিটার বোশী ও “গাইওমিয়ারের” প্রতিনিধি মিটার বোশী আমার সহকারী হইলেন—মিটার বোশীর সহচর শ্রীমান ইক্সলা বার্লিকও চলিলেন। আমরা কয়েক প্রস্তাবের উপর যান করিয়া আসিলাম। টাইগ্রিসকে এ দেশে “দালাল” বলে—ইহার অর্থ—তীর। যেতের বেগ প্রবল বলিয়া, বোধ হয়, এই নামকরণ হইয়াছে।

প্রাতে কম্যান্ডার—স্থানীয় রাজনীতিক কন্ঠচাটী মিটার দিলবীকে সঙ্গে লইয়া আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। সঙ্গে অস্ত্রাঙ্গ লোক। মিটার দিলবী খুব “গল্পে” লোক। তিনি সন্তীক আমারায়



নদীপথে

আছেন। যুদ্ধের সময় এ দেশে ইংরাজ মহিলার অবস্থিতি নিষিদ্ধ বলিয়াই তাহাকে আনিতে বিশেষ অহমতি লইতে হইয়াছে। আমারায় তিনিই একা ইংরাজ মহিলা।

কম্যান্ডার তাহার অধীনস্থ কন্ঠচাটীদিগকে আবশ্যক উপদেশ দিয়া বাইবার পর আর আহাৰ্য্য, পানীয় ও তৃষ্ণার অভাব রহিল না। এমন কি ইংরাজদিগের জন্ত এক বাজা জাপানী বিয়ার মজুদ আসিল।

মৌলবী সাহেব প্রস্তাব করিলেন, আমরা যদি ভারতীয় সেনাদিগের বাজ ব্যবহার করি, তবে সুবিধা যাই। কিন্তু আমি ইহাতে আপত্তি করিলাম। কারণ, একবার যদি আমরা ব্যবহার-দৈর্ঘ্যমো প্রীকৃত হই—ইচ্ছা করিয়া ব্যবহার-দৈর্ঘ্যমো ব্যবস্থা করি, তবে ভবিষ্যতে আমাদিগকে সেই বৈধম্যই ভোগ করিতে হইবে। শেষে আমার মতই গ্রহীত হইল।

অপরূপে আমরা নদীর কূলে ও সহরে বেড়াইরা আসিলাম। মিটার দিলবীর নিকট হইতে পত্র আসিল—রাজিতে তাহার গৃহে আমাদিগের আহারের নিয়ন্ত্রণ এবং আহারের পর তিনি আমাদিগকে স্থানীয় রক্ষাবলে



লইয়া যাইবেন। পক্ষেই লিখিত ছিল—ঐহার লোক যথাকালে রাজিতে পথে বাহির হইবার ছাড় লইয়া আমাদিগকে লইতে আসিবে।

রাজিত মিষ্টার ফিলবার গৃহে তাহার পত্নীর সহিত পরিচয় হইল। তিনি স্থানীয় ইয়ামেনপা ক্রিস্চান এঙ্গেলিসিয়ানের কামে বিশেষ অবস্থিত। বসোয়ায় জাহাজ হইতে অন্তর্যাবধি সামরিক ব্যবস্থায় রক্ষা-বানের আহার্য্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ আহার্য্য জুটে নাই—তাই আমাদের মিষ্টার ফিলবার গৃহে আহার্য্যে রসনায় রস সঞ্চার হইল। আহােরের পর মিষ্টার ফিলবারী আমাদিগকে স্থানীয় একটি রঙ্গালয়ে লইয়া যাইলেন। সিন্ধীয় নর্ত্তকী আমিনা আমাদের নৃত্যকৌশলের জ্ঞাত প্রসিদ্ধ। সে ও এক ইচ্ছলী দুবতী বেহালা, বাজো ও তাম্বুরীদের “সঙ্গত” নানারূপ নৃত্য দেখাইল। সে সকলের মধ্যে পিতৃনাত একটি—গাজে পিতৃর দংশনে বিব্রত ভাব দৃষ্টাইয়া এই নৃত্য। নৃত্যের পর একটি রঙ্গভিত্তি হইল।

রঙ্গালয় হইতে মিষ্টার ফিলবারী আমাদিগের বাসায় আসিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্ময়াজি, আমাদিগের বাসায় মজ ও আমদানী হইয়াছিল। আমরা ভারতীয় ও জন বিদায় লইয়া শয়ন করিতে গমন করিলাম; মিষ্টার স্বর্ণিলী ও মজগান করিতে না—তিনিও বিদায় লইলেন। মিষ্টার ফিলবারী, মেজর পুলী, মিষ্টার জাওরুক, মিষ্টার ওয়েলবী ও মিষ্টার ডিগবী মদের বোতল লইয়া গর আরম্ভ করিলেন। রাজি তাঁর সময় তাহারদিগের জলসা শেষ হইল। তখন মিষ্টার ফিলবারী বিদায় লইয়া যাইবার পর মিষ্টার জাওরুক আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে জাগাইলেন। মিষ্টার ফিলবারী আমাদিগকে আমাদের নামাইবার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। মিষ্টার ওয়েলবী যে কুমারী বেলের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ইরাকে ভারতবাসীদিগকে উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেওয়া সম্ভব—সে কথা তিনি এক প্রবন্ধে লিখিয়া তাহা “মাসিক মেলের” জ্ঞাত ভাকো স্থিতিছিলেন। ভাকবের সব পর গুলিয়া—পড়িয়া তবে পাঠান বা নষ্ট করা হয়।

মিষ্টার ওয়েলবীর প্রবন্ধ নষ্ট করা হইয়াছে এবং কুমারী বেল বলিয়াছেন, এইরূপ সব উক্তিহে আরবরা উত্তেজিত হইতে পারে—সুতরাং আমাদিগকে আর এ দেশে রাখা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তাহাই যির হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—“উৎসাহে বলিল রোগী শয্যার উপরে।” এ ক্ষেত্রে উৎসাহে নহে, উত্তেজনার আমি উত্তিয়া বলিলাম। তখনই পরামর্শ পরিষদ বসিল। কেবল সভারেট দেবধর ব্যতীত আর সকলেই এই ব্যবস্থার বিরক্তি প্রকাশ করিলাম—ইহাতে আমাদিগকে অপমানিত করা হইয়াছে। শেষে মেজর পুলী বলিলেন, মিষ্টার ফিলবারী প্রবন্ধের সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না; তিনি ব্যাপারটি কি জানিবার জর পরদিন সামরিক বিভাগে টেলিগ্রাফ করিবেন।

পরদিন তিনি টেলিগ্রাফ করিলে উত্তর আসিল—এ বিষয়ে ভারত-সচিবের উপদেশ প্রার্থনা করিয়া ঐহার নিকট তার করা হইল।

আমাদের সারিয়ানরা রোপের মধ্যে এতদিন প্রয়োগ করিয়া চিত্র ও অঙ্গর অঙ্কিত করে—বরষ রজতের উপর রক্ষণার্থ এতদিন চিত্রাঙ্গ যুল্লর খোয়া



খোয়াখাট

—ইহা স্থায়ী ও হয়। মিষ্টার ফিলবারী আমাদিগকে অহরোধে কয় জন সারিয়ান শিল্পীকে ডাকাইয়া দিলেন। আমরা কিছু কিছু জিনিষের ফরমাইস দিলাম। জরি সীমনকালে ব্যবহৃত “থিম্বল” ও কমটি অঙ্গুরী প্রায় করিতে দিলাম—কোনটিতে এজরার সমাধি দে





কোনটিতে দেখে গাড়, কোনটিতে নাম অঙ্কিত  
হইবে। এইগুলি সাধারণ মাপের হইবে, বলিয়া  
দিয়াছিলাম। সে বেশের "সাধারণ" যে আমাদের  
বাস্তবায় একবারে "অসাধারণ" সে কথা মনেও করি  
নাই বলিয়া অতিবৃহৎ অসুখীগুলি যখন বাড়ীতে  
আনিয়াছিলাম তখন আমার "জ্ঞান" আমার স্ত্রী হইতে  
কম্বার পর্যায়ে যে হাসি হাসিয়াছিলেন, তাহা উপভোগ্য—  
তবে তাহা আমাকে লজ্জা করিয়া।

আমার দাড়িখক্কড় বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সময়  
দাড়িখ গাড়গুলি মূলে ভরিয়া যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয়  
না। নদীর পরপারেই অধিক দাড়িখ বাগান, এ সময়  
বাগানগুলির শোভা মন মুগ্ধ করে। আমার কয়বার সেই  
সব বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম।

পরপারে বিরাট হাসপাতাল—সে হাসপাতালের  
ভার ডাক্তার কর্ণেল ভোলানাথের উপর। ইনি পাঞ্জাবী।  
ইনি একদিন আসিয়া আমাদের সহিত পরিচয় স্থাপন  
করিয়া যাইলেন ও ২৯শে চৈত্র ভারতীয় কয় জনকে  
তাঁহার তথ্যে আহ্বারের জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন।  
তিনি পাঞ্জাবী ধরণে প্রস্তুত আহ্বায়ে আমাদেরকে  
পরিতুষ্ট করাইয়া হাসপাতালের গাড়ীতে আমাদেরকে  
হাতিতে বাসায় পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। সামরিক  
পদব্যাধার কর্ণেল ভোলানাথ মেজর পুলীর উপরে  
সেই জন্ত মেজর পুলী আমাদের সঙ্গে লইয়া তাঁহার  
তথ্যে পৌছাইয়া দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন—শেষে  
কর্ণেলের আদেশে তাঁহাকে সে কাম করিতে হইয়াছিল।

আমাদের মধ্যে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা লইয়া  
তার চলিতে লাগিল; আর আমরা আমাদের উত্তর্য সব  
স্থান, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দেখিয়া সময় কাটাইতে  
লাগিলাম। এই সময় একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ  
হইল। তিনি সামরিক বিভাগে চাকরী করেন এবং  
আমাদের জন্ত নির্দিষ্ট বাসার নিকটেই বাস করেন।  
একদিন তাঁহার বাসায় যাইলে তিনি "বসন্তমতী" দেখাইয়া  
বিলেন, "আমি এই পত্রই পড়ি; কিন্তু সব সম্বন্ধে  
ইহা পাই না—সামরিক পরীক্ষায় হয় ত সে সব সম্বন্ধে

কাগজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। যে সম্বন্ধে কাগজ না  
পাই, সে সম্বন্ধেই বেন সজনকে পাইলাম না—মনে হয়।"

এই বাঙ্গালী ভক্তলোকটি একটি গৃহ দেখাইয়া  
বিলেন, বাঙ্গালী এথলেস কোরের লোকরা সেই গৃহে  
ছিলেন। এই যুদ্ধের সময়ও ভারত সরকার বাঙ্গালী-  
দিগের স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব  
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং সে বিষয়ে বাঙ্গালার  
পতর্ন লর্ড কার্ণারীকেলের অস্বরোধও রক্ষিত হয় নাই।  
শেষে বাঙ্গালী হইতে স্বেচ্ছাসৈনিক "এথলেস কোর"  
গঠিত হয়। এ সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভারতীয়  
ব্যবস্থাপক সভায় বলেন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪) :—

"In Bengal thousands of young men and  
those who had ceased to be young came forward  
offering to be enrolled for military service;  
after some hope had been held out great  
enthusiasm naturally evoked, came the orders  
of a Government.....to stop the movement.  
But the youth of Bengal persevered and they  
went out to Mesopotamia in the early days  
of difficulty and unpreparedness as an ambu-  
lance corps, in which capacity they have  
rendered good and meritorious service, winning  
the appreciation of their officers".

কিন্তু এই সেবাত্রত যুবকদিগের কার্যের গুরুত্ব  
তাহাদিগের দেশেও সম্যকরূপে উপলব্ধ হয় নাই। তাই  
আমায় অল্পসন্ধানফলে ইংরাজ, ইহুদী ও আরবদিগের  
নিকট তাহা অবগত হইয়া সেই ব্রহ্মদেশে আনন্দ উৎসব  
হইয়াছিল, আজ তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই  
যুবকরাই আমাদের অধিবাসীদিগের সহিত বিজ্ঞতা  
ইংরাজদিগের যোগস্থাপন করিয়াছিল—সন্দেহের স্থানে  
বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী সেবাত্রত যুবকরা  
যখন আমাদের উপনীত হয়, তখন আরবরা ইংরাজ-  
দিগকে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু ইহাদিগের ব্যবহার-  
ওণে আরবরা ক্রমে ইহাদিগের নিকট আসিতে, এমন-  
কি চিকিৎসার্থ রোগী আনিতে আরম্ভ করে। শেষে এই  
অবরোধ প্রথার ও বোরখার দেশেও দুঃখেরা স্ত্রীলোক-



বিগকে বাঙ্গালী “কোরের” চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার্থ আনিতে বিধাত্ত্বত করিলেন। ফলে দুই দশক শতাব্দীর ভাব দূর হয়। ইহা যে সেই বিদেশে বাঙ্গালী মূবকদিগের বিশেষ কৃত্তিকপরিচায়ক, তাহা বলা বাহুল্য। ইহার জন্ম ইরাক তাহাদিগের নিকট ঋতুতাত্ত্বিক স্বীকার করুন আর না-ই করুন বাঙ্গালীর প্রশংসা তাহাদিগের অবশ্যত।

এই সময়ের মধ্যে আমরা এক দিন মোটর বোটে বাইরা হাসপাতালগুলি দেখিয়া আসিলাম; আর এক দিন সিভিল ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল, এবং স্থানীয় বিদ্যালয়-গুলি দেখিলাম। এক দিন আমাদিগকে সহরের বাহিরে—মরুভূমির মধ্য দিয়া পুরাতন রথক্ষেত্রে পরিভ্রম লইয়া যাওয়া হইল। তথায় “স্ট্রোকস ব্যাটারী”—কামানের ব্যবহার দেখান হইল। আমাদিগকে পরিচা মধ্যে বসিতে বলিয়া উপরে জমীতে কামান ব্যবহার করা হইতে লাগিল। এই কলের কামান হইতে প্রতি মিনিটে ৩০ বার গুলী বাহির হয় এবং গুলী প্রায় ৪ শত গজ দূরে ও লক্ষ্যে আঘাত করিতে পারে। আমরা দেখিলাম, ৪ শত ২০ গজ দূরে একটি লক্ষ্য আহত হইল। কথা ছিল, কামান ব্যবহার শেষ করিয়া সিভিল গুল্মি পরিভ্রম পূর্ব পর্যন্ত আমরা কেহ পরিচা মধ্য হইতে মাথা তুলিব না—তাহাতে বিপর্যয় ঘটতে পারে। সিভিল গুল্মি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথা না তুলার সামরিক কর্মচারীদিগের এক জন আমার জন্ম শঙ্কিত হয়। যে পরিভ্রম আমি ছিলাম, তাহার নিকট আসিলাম। তখন আমি পরিচা হইতে বাহির হইলে তিনি বলিলেন, “কি ভয়ানক দেখাইয়াছেন! আমরা মনে করিয়াছিলাম, হুয়ত আপনি আহত হইয়াছেন।”

এদিকে সময় কাটিতে লাগিল—আমি হেড কোয়ার্টার্স ভারত-সচিবকে এবং ভারত-সচিব তাঁহাদিগকে তার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন নীতিমাত্রা হইল না। শেষে ওরা বৈশাখ তারিখে মিষ্টার ওয়েলসী ও আমি “চরমপত্র” প্রদান করিলাম—আমাদিগকে বিন্দুমাত্র ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এখন যে আমাদিগকে আমাদের পর আর

বাইতে দেওয়া হইতেছে না, ইহা আমরা আশ্চর্যান-হানিজনক বলিয়া বিবেচনা করি এবং চাহিতেছি যে, হয় অবিলম্বে আমাদিগকে ইচ্ছামত সর্বত্র বাইতে দেওয়া হউক, নহে ত আমাদিগকে আমাদিগের ব্যয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া বাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক—আমরা ফিরিয়া বাইবার ব্যয় সরকারের নিকট হইতে আঁহতে প্রস্তুত নহি।

মিষ্টার স্ট্রোকস ও মিষ্টার ডিগবী এই বিষয় বিলাতে সাংবাদিক সম্মেলকে জানাইয়া তার করিলেন। ওরা বৈশাখ সন্ধ্যায় তার আসিল, আমাদিগকে রণতরীতে লইয়া আমাদের পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি দেখান হইবে—কিন্তু বসোয়া প্রদেশের (বিলগোত) বাহিরে লওয়া হইবে না।

অর্থাৎ আমরা যে স্থানেই বাইতে চাহিব সেই স্থানেই বাইতে পাইব না।

আমরা ভারত-সচিবের এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না—সকলে একযোগে পুরোক্ত “চরমপত্রের” অল্পত্বপূর্ণ “চরমপত্র” প্রদান করিলাম এবং ৩৬ তারিখ মধ্য ব্যবস্থা করিতে বলিলাম।

৪ঠা বৈশাখ আমাদিগের এই প্রস্তাব প্রেরিত হইল। ৬ই তার আসিল, সামরিক কর্মচারীরা এই সময়ে উপদেশের জন্ম ভারত-সচিবকে তার করিলেন।

এই দিনই মরু দস্যুরা আমাদের এক পল্লীতে ডাকাইতে আসিয়া গেল।

এদিকে মিষ্টার যোশীর সহচর ইন্দুলাল যাক্কির অস্থ্য হইয়া পড়িলেন এবং ডাক্তার মত প্রকাশ করিলেন—ঔষধ নিউমোনিয়া হইয়াছে। তখন আমরা বিশেষ চিহ্নিত হইলাম। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইবে। ইন্দুলাল এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলে মিষ্টার যোশী, মোলবী মারু আলম ও আমি নদীর পরপারে কর্ণেল ভোলানোবের কাছে বাইরা সব কথা জানাইলাম। শুনিয়া তিনি আমাদিগের সহিত আমাদিগের বাসায় আসিলেন—ইন্দুলালকে পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, তিনি প্রতি

দিন ইন্দুলালকে হাসপাতালে দেখিবেন ও যাহাতে তাঁহার কোন অস্থবিধা না হয়, সে ব্যবস্থা করিবেন—আর তিনি রোগমুক্ত হইলেই তিনি আমাদিগের কাছে বা ভারতবর্ষে যে স্থানে বাইতে চাহিবেন, সেইস্থানে তাঁহার বাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে হাসপাতাল হইতে রোগীকে লইয়া বাইবার গাড়ী ও আর একখানি গাড়ী আসিল। ইন্দুলালকে লইয়া মিষ্টার যোশী ও আমি আমাদের গরপারে—বিকটমুহুরীকীর্ণ দাড়ি ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত

হাসপাতালে গমন করিলাম। তথায় তাঁহাকে রাখিয়া বিধ্ব ননই আমরা বাসায় ফিরিলাম।

সেই দিন অপরাহ্নে মিষ্টার ফিলবী আসিয়া হাসিতে হাসিতে সংবাদ দিলেন, ভারত-সচিবের তার আসিয়াছে—আমাদিগের অনন্য আর কোন বাধা থাকিবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার ফিলবী জানাইলেন, রাজিকালেই একখানি বাগদাদগারী জাহাজ আমাদের আসিবে এবং পরদিন সকালে আমরা তাগ করিয়া বাইবে—তিনি তার করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা সেই ঠানারে বাইব।

আমরা প্রস্তুত হইলাম।

—১০২—

## হিন্দু-স্টেশন

প্রীভাত কিরণ বসু

বাঙ্কিঞ্জি মেলের একটা সেকেন্ডারাস কামরায় মোহন চুপচাপ শুইয়াছিল।

পার্সীপুর স্টেশন আসিতে দরজাটা খুলিয়া নামিয়া পড়িল।

‘ম্যাকম’ ভণ্ডি লোক, বেশীর ভাগ বার্ড ও ইন্টা-বের যাত্রী।

তার বিজার্ভ বার্থ, ভাবিবার কিছু নাই।

নিচতরমেন ফেরিওয়ালার ভিড় কাটাওয়া প্রকাণ্ড লম্বা টেনখানা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, শীতটা মন্দ পড়ে নাই।

এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হঠাৎ একদিকে তার মজর পড়িল।

একটা তরুণী মেয়ে, টকটকে লাল রংএর সাজী তার—রাঙা আঙনের শিখার মত জলিতছিল, বের ডেজার সিগনাল। অনেক দূর হইতে চোখে পড়িবার মত।

একটা হাটসেক সামনে রাখিয়া একটা যুবকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

মাথাটি নীচ, হাতে আঁচলের কালা পাড়ের একাংশ।

বেড়াইতে বেড়াইতে মোহন তাহাদের কাছে গিয়া পড়িল।

পাশ দিয়া বাইবার সঙ্গে মেয়েটির একটা কথা তার কানে আসিল—‘তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে?’

মোহন এমনিই দাঁড়াইয়া গেল।

কান রহিল এদিকে, দৃষ্টি অজ্ঞ—দূরে চায়ের ঠেলে লেখা—‘হিন্দুদের জন্ম’, পানিপাড়ের বাস্তুতে ‘হিন্দু’ ছাপ মারা, ‘হিন্দু-চা’—ফেরিওয়ালার হাঁকিতেছে।

পৃথক-কণ্ঠে শোনা গেল—আন্তে কথা কও, চোঁচালে খুন ক’রে ফেলব, ছোরাটা দেখেচো।

মোহন ফিরিয়া চাহিল সঙ্গে লোকটির দিকে, এত-ক্ষণ ভালো করিয়া চাহে নাই, দেখিল দাড়ী গোঁফ

কামানো একটি যুবক, চুলগোলা অশ্লিষ্ট, একটা চকচকে ছোরা পাঞ্জাবীর তলা হইতে বাহির করিয়া দেখাইকেছে।

চারিধারে অসংখ্য লোক, এখানে ওখানে থাকি



পোষাক লালপাখীওয়া বেলায়ে পুলিশ বেড়াইতেছে, তার সাহস হইল।

অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

পুরুষটি ভাতাভাতি ছোরাটা লুকাইয়া বলিল—হুমনি কিছু।

মেয়েটির ভয়-বিহীন চুনি চোখের দিকে চাহিয়া মোহন বলিল—হয়েছে বৈকি। বলুন আপনার কোন ভয় নেই।

মেয়েটি একবার লোকটার দিকে চাহিয়া একবার মোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি ভয় থাকে মেয়ে আমার ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

ধরে নিয়ে যাচ্ছে কি রকম? বলিয়া মোহন তার দিকে অগ্রসর হইতেই সে পা চালাইয়া দ্রুতপেগে সরিয়া পড়িল।

মোহনও তার পিছনে ছুটিতেছিল, মেয়েটি সহসা হাত ধরিয়া বলিল, থাক। শুধু, আমার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, সব কথা একসঙ্গে বলবার সময় হবে না। আপনি কি কলকাতা যাচ্ছে?

—না আমি যাকি দার্জিলিং।

চলুন আপনি যেখানে যাবেন, আপাততঃ আমাকে সেখানেই নিয়ে চলুন।

—কেন? আপনি বাড়ী ফিরবেন না? বলেন ত পুলিশেরে বিশ্রাম বেখে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

মেয়েটি জবাব দিল—সে পথ নেই। পরে সব বলুন। এখন চলুন—এগিয়ে চলুন।

চার সিট বিল। মোহন বলিল, তবে উঠুন এই গাড়ীতে।

উঠিতে উঠিতেই দার্জিলিং সেল ছাড়িয়া দিল।

বাহিরে অন্ধকার রাত্রি, পথ-ঘাট-নদী-প্রাস্তর কিছুই দেখা যায় না, অথচ জানা আছে, ওখানে স্কন্দী ধরণীর আশ্রয় শোভা জাগিয়া আছে।

কানরার ভিতরের আলো ব্যকে প্রতিহত হইয়া তরুণীর মুখে ছায়া ফেলিয়াছে, আমূল্যকার শালের ফাঁক দিয়া লক্ষ্য মক্ষ চেনের একাধিক চিক করিতেছে, শে

বোঝা বাইতেছে প্রথম যৌবনের মদির-মাধুর্য্য এর অপরিণত মন ভরিয়া আছে, তবু কিছুই জানা বাইতেছে না।

দার্জিলিং মেলের উদ্ভার মত গতি, বস্ত্রের মত আত্মীয় আরো কতকগুলি খরিয়া চলিল, ও-বারের বেঞ্চে মুমুস্ত মাছেরটার নাকভাংকার শব্দ একটানা চলিতে লাগিল, কাচের দিকে মূগ করিয়া মেয়েটি সেই যে স্থির হইয়া বলিয়া আছে তার দিক হইতেও কোন সাড়া আসিল না।

অগত্যা মোহন থানিকটা কাগিয়া থানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—এবার বলুন, ব্যাপারটা কি?

মেয়েটি একবার ফিরিয়া দুইহাত দিয়া থোঁপাটাকে টিক করিয়া লাইয়া গায়ের কাপড়টা টানিয়া বলিতে শুরু করিল—

রংপুরে আমার বাড়ীতে আমি পাক্তাম। যার কেউ নেই, যে গরীব, তার যে কি আদর জানেন ত? সেখানে আমার ওপর কি যে অত্যাচার হত! আপনাকে বলতে পারব না। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল বড় একটা পাত্রের সঙ্গে। বাবের মামা, আমি বলছিলাম, সব দিক থেকে ভালো ছেলে না হলে গিরে করব না। মামা বললেন, ভালো পাত্রের রকম আমি দিতে পারব না। আমি বললাম, না পারেন থাকুন, আমি না হয় আইবুড়াই থাকব। বিয়ে না করলে যে চলবে না এমনই বা কি? মামা বললেন, থাকে কি? বলেছিলাম নিজের যোগাড় নিজেই করে নোব। হেসে বেলায় ঢাকার ফুলে কিছুদিন পড়েছিলাম, সেলাই পানবাঞ্ছনা কিছু কিছু জানা আছে। তারই ছোরে বলেছিলাম যে বাহর একটা কিছু উপায় করে নোব। সেই নিয়ে কি ঠাট্টা, কি টিটকিরি, বাড়ীতক্ক লোকের। তার ওপর কি যন্ত্রণা, সেও আপনাকে সব বলতে পারব না। শুধু জেনে রাখুন সে অসহ্য! কেন? আমি নিরুপায় বলেই না?

বলিতে বলিতে মেয়েটি ঝাঁচল দিয়া চোখ চাপ দিল।

মোহন গলাটা পরিষ্কার করিয়া লাইয়া বলিল, তারপর?

নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লাইয়া মেয়েটি বলিতে লাগিল—

অপ্রকাশ্য আমাদের পড়ায় থাকে, ছেলেবেলা থেকে আমাদের পরপরের বাড়ীতে যাওয়া-আসা। ও-ই একদিন আমরা ঢেকে বললে, তুমি এত সহু করছ কেন? কলকাতায় গিয়ে নিজের একটা পথ করে নাওনা, সেখানে অনেক কীল্ড। আমিও শুনেছিলাম, কলকাতায় মেয়েদের কাজের অভাব নেই, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু আমরা কে নিয়ে যায়? আমি ত কখনো সেখানে যাইনি। বাড়ীর লোককে বলতে গেলে ত মারুতে এলা। কিনা-কি বললে। অগত্যা একদিন অপ্রকাশকে ধরলাম আমরা কলকাতায় গিয়ে এসে। অপ্রকাশকে অবিশ্বাস করবার কোনোদিন কোনো কারণ ঘটেনি, ওকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি। লুকিয়ে ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু তাকে উঠে ও ধরল ভিন্ন মুখি, কি যে সব খারাপ খারাপ কথা বলতে লাগল, যা ও কোনোকালে বলতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। পার্শ্বীপুরে নেবে বললে, তোমার কলকাতায় নিয়ে যাবনা, কিংবা গাঞ্জে নিয়ে যাব, আমরা ছোরা দেখিয়ে বললে, গোলমাল করবার চেষ্টা করলে খুন করে ফেলব। এমন সময় মাগনি এসে পড়লেন।

মেয়েটি চুপ করিতে মোহন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বাড়ী গেলেন না কেন?

—এর পর কি সেখানে আমার জায়গা হবে মনে করেন?

—আমার সঙ্গেই বা এলেন কেন?  
কিছুটা চিন্তা না করিয়া মেয়েটি জবাব দিল—  
উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জঙ্কে। আপনার ভাব হয়ে আমি থাকব না, আমাকে কোনো মহিলার সঙ্গী করে দিন, আমি খোটে বাড়ীতে উপায় করব। আপনার সঙ্গে এসে থানিকটা ভাববার ত সময় পেলাম।

আর—বলিয়া মেয়েটি দাঁত দিয়া নীচের ষ্টেট চাপিয়া ধরিল।

বলুন কি বলছিলেন, আর—  
মেয়েটি বলিল ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী যাচ্ছেন, তাঁর কাছে পরামর্শ পাব।  
মোহন হাসিয়া বলিল, স্ত্রী আমার নেই। আপনি চলুন ত' আমার সঙ্গে দার্জিলিং, সেখানে আমার মাগীমা আছে, দেখি কোন গতি হয় কিনা।

চলুন তাহ।  
কিন্তু একটা কথা, আপনাকে বিশ্বাস করে এলাম, যদি অবিশ্বাসের কোনো কারণ ঘটে তা যে মুখ বুজ সহ্য করে থাকব সে শিক্ষা আমি পাইনি। আমার ভীক হতে পারি, কিন্তু যতটা দুর্বল লোক মনে করে, ততটা মই। দয়া করে ভুলবেন না, আমার মামুষ, পোলায় পুতুল হতে আমাদের অপত্তি আছে।

মোহন বলিল, তা যেন হল। এখন আপনার নামটি কি, বলতে আপত্তি আছে?

—কিছুমাত্র না। আমার নাম শোভনা দেবী।

—ও, আমার নাম মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়, নমস্কার। শোভনা, হাসিয়া বলিল—নমস্কার।

শিলিগুড়ি হইতে পাহাড়ের পথে উঠিতে হিমালয়ান রেঞ্জের অবশীর্ণ্য সৌন্দর্য্য শোভনাকে শুধু বিস্মিত নয় একেবারে স্তম্ভ করিয়া দিল। কত রংএর কত আকারের লতা পাতা ফুল ফল, রেল-লাইনের আঁকা ঝাঁক গতি, দূর প্রান্তরের আলোকলবন পাড়পালা, গ্রাম জনপদ, এখানে ওখানে বর্ণার কসরকলনি, প্রাণীর শিশু, যোয়ের স্থূপ,—কি স্বন্দর, কি স্বন্দর! গায়ে তার একটি মাত্র গরমজামা ছিল আর একখানি গায়ের কাপড়।

উপরে উঠিতে উঠিতে মোহন তার গায়ে থানকতক বন্ধল চাপাইয়া দিল।

মোহন দার্জিলিংএ থিরা মাগীমাকে বলিল—আমার একটি বাচ্চী। আর কোনো পরিচয় দিল না।

ততক্ষণে মাগী মুলিয়া দিয়া বাহিরের দিকে ফুঁকিয়া



পড়িয়া শোভনা দেখিতেছে—টিক যেন একখানি জলজীবী—যিক্রমিক দাঙ্খলিঃ স্রব, আর কাকনজন্মা সে যেন সত্য নয়, ভোরের স্বপ্ন। তার কেবলি মনে হইতে লাগিল—

বুধা এ ধরনী রূপে-বসে ভরা  
বুধা এ প্রকৃতি চির-মনোহরা  
বুধা এ জীবন আপনার জন  
কেহ নাহি ঘার কাছে গো!

সে আপন মনে বলিতে লাগিল—

ঐ যে শ্রামল তুমি তরুল  
ঐ মেঘমালা আলো ফলমল  
ঐ ফুলবাধি নদীকলগতি  
কত কি আমারে যাতে গো!

হেলেনবেলা হইতে সে গান শিখিয়াছে, গান ভালোবাসিয়াছে, আজ গীতিগন্ধমুখরিত পার্শ্বতা নগরী তাকে যেন উদ্ভাব অধীর করিয়া তুলিল।

সে বলিতে লাগিল

কি দেবিত্ব সখি জাঁবার প্রভাতে  
মেঘের ছায়ে ?  
কি দেবিত্ব আজি বিজন বিপিনে  
মুহুর্ত বায়ে ?  
বা দেবিত্ব সে কি স্বপন নয় গো ?

সত্য সখি ?

গোলাপী হরিত স্তনীর সোহিত  
পীত সে ভবি !

হে নগরী আজি ক্রমেও এ মন  
তোমারি হেবি,  
তোমারি আশায় রসোহ্রিঃ, হল  
অনেক দেবী !

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বার্কহিল রোড দিয়া ঘুরিয়া মহা-  
বলের মন্দিরের তলা দিয়া, মাগলের বিকে ঘাইতে  
বাইতে সে তদ্রূপ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গে ছিল মোহন,  
তার মূলীয়া ও মাস্তভা বোনেনা, হঠাৎ 'শোভনা' রাশী  
ভুনিয়া পাড়াইয়া পড়িল।—

মনে হল চিনি চিনি চিনিতে পারিনি তারে  
সে থাকে অনেক দূরে কাজল নদীর পারে;  
তার সে আভিনা তলে জল হল চল চলে,  
শ্রামল বদল মেঘ সে পথ বলিতে পারে ॥  
এ স্বর তার চেনা।

রাজে সে মোহনের মাস্তভা বোন বিভা আর  
শোভার কাছেই ভইবে।

সন্ধ্যা হইতে—কেন সে বলিতে পারে না কেবলি  
তার কপিলে ইচ্ছা হইতেছে, রাশী গুলিয়া আকাশের  
দিকে চাহিতে পিয়া তারা দেখিতে পাইল না, অধু  
চারিবারের স্রবট আলোর মালা পরিয়া হাসিতেছে।

পাশের বাড়ীটার গ্রামোফোন যেমনি চলে, যেমনি  
গান।

আর যে গান গুলি শুনিতেই চোখে জল আসিয়া  
পড়ে সেই গুলি কি ওরাও ভালবাসে ?—

“কথা নয় কথা নয়

শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকা।”

“আমার গানের নেই ক’ মানে

তবু তোমায় গান শোনাই।”

“করাপাতা ওগো করাপাতা

ভুমি এলে কোন্ দেশ থেকে

এলে কার দ্বিতি বয়ে ওগো

কার বসনের বাস মেখে ?”

কত রাত্রি অবধি চলিতে লাগিল।

মোহন কদমিন ধরিয়া শোভনাকে এড়াইয়া এড়াইয়া  
চলে, সে একলা বাহির হইয়া যায়, বাড়ীতে আসিয়াও  
বেশী কথা-বাড়া তার সঙ্গে কয় না, তার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ  
কি করা ঘাইতে পারে, এই হইয়াছিল তার চিন্তার  
বস্তু।

সেদিন সন্ধ্যায় কিছু আগে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল  
সকলে বাহির হইয়া গিয়াছে, শোভনা একলাটি লগে  
বোড়াইতেছে।

মোহন জিজ্ঞাসা করিল আপনি বেরোন নি ?

—না আজ মনটা ভালো ছিলনা তাই।

—কি হল মনের ?

—কি জানি ? বলিয়া শোভনা রান হাসি হাসিল।

বাগানের দুইধারে তারের জাল দেওয়া, একটা  
শেডের ধারে যেঁসিয়া পাইন গাছ উঠিয়াছে, নীচে কাটি-  
রোডে মোটর ছুটিয়াছে, শিশুমাটির দিক হইতে ফগ  
ছুটিয়া আসিতেছে, মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলের দিকটা  
বিকিকি করিতেছে অন্তরাগ রেখার, স্বর্ণদ্বীপ কাকন-  
জন্মা কুরামার আড়ালে চলিয়া ঘাইতেছে, আলোকে  
খাঁধারে শোভনার সহজ শ্রামল রূপ অপরূপ হইয়া চুটিয়া  
উঠিল, মোহন বলিল একটা গান গান না, মনটা হালকা  
হবে।

গান পাহিবার জন্ত শোভনার মনটা অস্থির হইয়া  
উঠিয়াছিল, গলা ছাড়িতে না পাইয়া তার যেন কণ্ঠ অপ্র-  
কৃত হইয়া আসিতেছিল।

তবু সে লক্ষ্যায় চুপ করিয়া রহিল।

মোহন বলিল, ভারতীয় নৃত্যও হয়ত আপনার জানা  
পাঠে পারে ? না, জানেন না ?

শোভনা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, জানে।

বলিল ঢাকায় রীতিমত সে করেছে ঠেক বেখে।

উৎসাহিত হইয়া মোহন বলিল—তবে আর কি,  
বোন না, আমি ওগর ভারী পছন্দ করি ! এই বেলা  
চলুন, বাসীয়া নেই, আসুন ঘরে।

শোভনা মুহু মুহু হাসিতে লাগিল।

মোহন বলিল—লজ্জা করছে ? কত লোকের সামনে  
গড়িয়ে নাহতে পারবেন আর আমার কাছেই লজ্জা ?  
আর ওতে লজ্জা করাই অজায়, ও-ত ভালো জিনিষ !

শোভনা বলিল, চলুন।

ঘরের মধ্যে গিয়া লাইট জালিয়া দিয়া কোমরে সে  
খাঁচলো জড়াইয়া লইল, পানিকটা কাসিয়া, পানিকটা  
চুপ করিয়া পাড়াইয়া থাকিয়া, পানিকটা হাসিয়া সে স্বর  
করিল—

প্রলয় নাচন নাচলে যখন

আপন ভুলে,

নটরাজ, হে নটরাজ

জটীর বানন পড়ল গুলে !

পায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ছুটি মুগল বাহুবল্লরী অপরূপ  
ভঙ্গিমা মোহন মুকুন্দেতে দেখিতে লাগিল।

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে শোভনার সঞ্চোচ, জড়তা ক্রমশঃ  
কাটিয়া ঘাইতে লাগিল, সে সহজ নদীর স্রবতায় উজ্জলিত  
হইয়া দেখলতা ছাড়াইয়া স্বর করিল—

জাহ্নবী তার মুকুধারা

উদ্ভাসিনী দিশাহারা,

দিশাহারা—

সঙ্গীতে তার তরঙ্গবদল

উঠল ভুলে—

এ যেন সে শোভনা নয়, নৃত্যপরা শোভনা যেন নব-  
নৃত্যনের বেশে আসিয়াছে।

শোভনা যখন ধামিল, তখন তার কপালে বিন্দু বিন্দু  
দাম দেখা দিয়াছে, কিন্তু মোহনের ঘোর কাণ্ডে নাহি।

সে তখন ভারিভেতছিল এ যদি তার জীবনসঙ্গিনী  
হইত, তবে এর ঐ কণ্ঠের এমন কপিত স্বর, ঐ তরু  
দেহের এমন লীলাঙ্ঘন—অনবসর দিনের শেষে সন্ধ্যায়  
পরিশ্রান্ত মুহূর্তগুলি চন্দ্রালোকে কি মোহময়ই না হইয়া  
উঠিত !

সে দিন বিছানায় যখন শোভনা সবেমাত্র চুকিয়াছে  
তখন সেই সর্গনেশে বাড়ীটার সামাজিক গান স্বর  
হইয়াছে—

ডেকেনা—ডেকেনা—

ওরে ডেকেনা,

ও আছে ঘুমে ঘোরে,

বৈধোনা প্রেমের ডোরে,

রেখেণা—রেখেণা—

মনে রেখেণা।

রাগুণী গায়ে টানিয়া লইয়া তার মনে হইতে  
লাগিল—

রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে,  
কণ্ঠের হাব না গুলিয়া দিয়া রহিব বল কি নাতে !

শোভনার নীতে কণ্ঠ হইতেছে বলিয়া মোহন তাহাকে



দাক্ষিণ্যিৎ মাফেট্টে ছুইয়া গিয়া বহুমূল্য গরম জামা, পায়ের কাপড়, জুতার জুতা ইত্যাদি কিনিয়া দিয়াছে।

হাতে মাত্র একপাছি করিয়া চুড়ী বলিয়া কিছু কিছু জড়োয়া অলঙ্কার, মুন্নার মালা, তিস্তী কাপড় এক রকম জোঁর করিয়াই কিনিয়াছে।

অনেক রাগ অভিনয়ের পালার শেষে শোভনা সে সবই গ্রহণ করিয়াছে, এবং দাক্ষিণ্যিৎ এর পথে ভ্রমণশীলা কলিকাতার মোটর-বিহারিগণের কাছেও তাকে দেখা-ইতেছে উইবা বটে।

এমনি সময় একদিন দুপুরবেলা মোহন প্রস্তাব করিয়া বলিল, চলুন আজ জঙ্গাপাহাড় ঘুরে আসি।

এই তার মোহনের সঙ্গে প্রথম একলা যাওয়া।

রাস্তা অনেকটা উঁচু বলিয়া পথ হইতে ছুটি ঘোড়া ভাড়া করিয়া লইয়া মোহন একটাতে শোভনাকে তুলিয়া দিল!

সেত ভয়ে সারা, সঙ্গে সঙ্গে সহিস রহিল, বলিল, ভয়ের কোন কারণ নাই।

জঙ্গাপাহাড় হইতে কাটাপাহাড় উঠিয়া সেটমেরি, টাইগার হিল, রেল লাইনের বক্রপাতি, রঙ্গীন শহরটির অর্ধচন্দ্রাকৃতির দিকে চাহিয়া তার মনে হইল—এ মনে নতুন স্বপ্নবৃত্তি।

ফিরিবার সময় ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া হাঁটাইয়া নমিত লাগিল।

যে কথাটা বলি-বলি করিয়াও মোহন বলিতে পারিতেছিল না সেটা আর না বলিলে নয়, হয়ত এমন অর্থও অবসর আর নাও পাওয়া যাইতে পারে।

তার মনে হইল সনাতন নিয়মে যে দুবক সুবতীর একেলা বিবরণ নিষেধ আছে, সেটা খুব ভালো। এই যে মনের অকাণ্ড অশান্তি স্বভাব, এই যে দ্বন্দ্বিসহ অধীরতা, এই যে মাধুর্যের মধ্যে গভীর জাগরণ—এর দাফা যে সবওয়া—যায় না!

পালের ধারে একটা বেঞ্চি দেখিয়া মোহন বলিল—আপনি কি দ্বন্দ্বিতা?

শোভনা বলিল, সামান্য।

আমনি না, বস। যাক এখন, আর পথ বেশী নেই, ওই মোড়টা ঘুরেই ম্যাকাটি রোড দেখা যাবে।

ছুজনে বলিল।

কিছুকণ দুঃসহ নিমুক্ততা।

মোহন বলিল, তোমাকে যদি আমি তুমি বলি আশা করি রাগ করবেন না?

উত্তরটা অপ্ৰত্যাশিত, শোভনা বলিল—করব। বেশী বিনীততা বিপদ ঘটায়, জানেন ত? 'আপনি'ই বললে শুনেই ভালো লাগে। জীবনে এই প্রথম 'আপনি' শুনিছি। এর আগে লোকে বলত মুখি, আর তুমি!

মোহন একটু গুঁড় হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞা আপনিই বলা যাচ্ছে। এখন আমি স্থির করেছি, যান আমি স্থির করেছি, আপনাকে—হ্যাঁ। আপনাকেই যিরে কথা। আপনার তাতে আপত্তি আছে?

শব্দকণ্ঠে শোভনা বহিল—এই জগেই কি উষ্মা করেছিলে?

মোহন বলিল—না না আমি 'তোমাকে' অর্থাৎ করবার জগে কথাটা বলিনি, বিশ্বাস 'করন' আমি আপনাকে প্রার্থণায় মনে করি।

শোভনা বাধা নাচু করিয়া কোলের উপর হাত দুখনি রাখিয়া বানকিতা কি ভাবিল, তারপর অজ্ঞান লইয়া বেল করিতে করিতে উপরের আকাশের দিকে চাহিল, তারপর কিরিয়া মোহনের মুখের উপর স্নিগ্ধ দুটি চোখ রাখিয়া বলিল,—

যেমন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমি বড়ি, সে পরিচয় থেকেই বোধ হয়? বেশ। এখন আপনি যদি আমার আজ বিবাহ করেন সে হবে চোখের নেশায়, সে যে আপনার কেটে যেতে পারে, কারণ আমি জানি আমি স্মৃদ্ধী নই। তার ওপর আমি গরীব, আপনার কুর্মেই অনেক টাকা, আপনি শিক্ষিত, স্মৃদ্ধী শিক্ষিতা গাই উপরস্থ খবরের বড় পরিচয় আপনার পক্ষে লাজ বয় অসম্ভব নয়। এই জগে ভবিষ্যৎ জীবনে, যেখেরই আমি গরীব, আমি সাধারণ, পথে আমার কুড়ির পেয়েই—এইজগে আমার প্রতি বিবৃদ্ধা আসা আপনার গণ্য

যাচাবিক। তখন আমার দশা কি হবে ভেবেছেন কি? তখন এমন ব্যাঘা নাই যেখানে ছুড় গিয়ে আমি জিরেব। আপনার কাছে থেকেই অসহায় জীবন যাপন করা ছাড়া আমার গতি থাকবে না।

এই অবসি বলিয়া সে হোপাইতে লাগিল। মোহন চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল।

শোভনা বলিল—আরও কথা আছে। আমাদের এ মিলন আপনার আত্মীয় স্বজনদের চোখে ভালো লাগবে না। তার জগে অনেক গল্পনা আপনাকে সহ করতে হবে, অথাকোও। সে সময় আমাকে যদি বাঁচাতে চান তা হলে আপনাকে বাপ-মার কাছ থেকে আসা হতে হবে। সে সব কি ভেবেছেন?

মোহন বলিল আমি সব ভেবেছি। কিন্তু তোমার জগে আমি হাসিমুখে সহ করব।

শোভনা বলিল—ও সব কবিত্বের কথা। বাস্তব জীবনে ওর কোনো মূল্য নেই, এ বোকাবার বয়স আমার হয়েছে। মাপ করবেন—চিরদিন আপনার কৃপার পাঠী হয়ে থাকা আমার পোষাবেনা। সে আমার নীতীর অপমান।

এ রকম পরিহার প্রত্যাখ্যান মোহন যথেষ্ট অবমানিত বোধ করিল। তার মনে হইল তার যেন কোন আর্থকর্ষ নাই, থাকিলে একটা সামান্য নারী এমন করিয়া তাকে দ্বিরাইতে পারিত না।

চুপ করিয়া সে ঘুরে চাহিয়া রহিল, অনেকগুলি করণার জল কলকল শব্দ করিয়া গভীর বনের মধ্যে করিয়া পড়িতেছে, নীচে ক্যালকাটা রোড দিয়া কাহারো বেলাই ফিরিতেছে। এক জোড়া সাহেব-মেস পরস্পরের হাতের মধ্যে হাত গলাইয়া দিয়া তাহাদের গিন দিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল।

মোহন বলিল—ওঠো। ভাল ক'রে ভেবে পরে জবাব দিয়া। অবশ্য হয়তো শোভনা। তোমার কিংবদন্তি যে অককার!

শোভনা কথা কহিল না, উঠিল। সারা পথ ছুঁজনে নিশেধ কাটায়া দিল।

বাড়ী আসিয়া সে ডায়েরীখানা গুলিয়া পড়িতে লাগিল—একটি কবির লেখা কবে টুকিয়া রাখিয়াছে—

নিজের কটর উপায় করে নারী

তবেই তোমার ধমক দেওয়া সাজে!

নিজের কটর করতে পার যদি

— তবেই খাতির পাবে সভার মাঝে।

নিজের পায়ে দাঁড়াও দেখি উঠে,

খাশীর কাঁধে, ছেলের খাড়েও নয়!—

সংসারে স্বথ আসবে নারীর তবে,

নিজের বোঝা নিজেই যদি বয়।

সে বার বার করিয়া পড়িতে লাগিল

সবার আগে দাঁড়াও নিজের পায়ে,

নিজের কটর উপায় করে নিজেকে,

জাঁকুড়-ভরে, বাসর-ঘরে যেন

চোখের পাতা আর থাকেনা ভিজে!

নিজের কটর জোড়াগ করে রোজ,

তবেই কট দেবে সবার মুখে।

ভরসা তোমার কাজের হবে, যদি

সাহস আগে আসে তোমার বুকে!

কবির কথায় রাগ রেখোনা মনে—

না-না গো না, রাগ কিসের, শোভনা জুটাইয়া পড়িয়া

কবির মনস্বার পাঠাইয়া দিল। চোখের জলে কাপসা

অন্ধর আর পড়া গেল না।

এমনি সময় মোহন আসিয়া ডাক দিল, এখানে শুনে

যাও!

শোভনা ভাড়াভাড়ি উঠিয়া বাহিরে 'লবি'তে

আসিয়া দাঁড়াইল।

পাটীলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মোহন জিজ্ঞাসা

করিল, ভেবেছ?

প্রশান্ত স্বরে শোভনা জবাব দিল—ভেবেই উত্তর

দিয়ছি; আর আমার কিছু বলবার নেই।

এবার আর মোহনের রাগের অবসি রহিল না, সে

মনে মনে হাসিবার করিয়া দেখিল এই কদমিনী কন-



পক্ষ অস্ত্রতঃ আটশো টাকা এই মেয়েটার জিনিষপত্রে সে খরচ করিয়াছে, অথচ কোনই প্রতিদান নাই। তার ইচ্ছা হইল, বলে এ ব্যবসা করতিনি হ'ল ধরহ? কিন্তু অতীত বলিতে বাবিল, বলিল—আবার কাছ থেকে এতগুলো জিনিষ হাত চুলে নেবার সময় আশ্চর্যান্বিত বোধ কোথায় ছিল? কেউই নাই তোমার? তাহে আঁচল চাপিয়ে শোভনা ঘরে গিয়া চুকিল, লাইটটা 'অফ' করিয়া দিয়া বিছানায় গিয়া পড়িল।

রাত তখন কত জানা নাই, সেই সন্মুখে বাড়ীটা হইতে আবার সন্ধানশা বানীর স্বর উঠিয়াছে, যেমনি করণ তার রেশ, তেমনি গানটোও ধরিয়াকে পাগল করা—  
রাগপুরীতে

বাজায় বাশী

বেলা শেষের গান।

শোভনা ঘুমাইতে পারিল না, উঠিয়া শাশীর কাছে গিয়া কালো পর্দাটা সরাইয়া ঘুমন্ত হিমাঙ্কুর অগ্ন-পুত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল, রহস্তময় আলোকমালার দিকে চাহিয়া যেন মনে হয় পূজার প্রদীপ জ্বালাইয়া অস্পন্দীরল কোন অদৃশ দেবতাব আরতি করিতেছে গভীর নিশীথে—

বিধ যখন নিদ্রামগন

গগন অন্ধকার।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া বিভা বলিল—সাদা, শোভনা কোথায়? সে কি এত ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছে?

মোহন তাড়াহাড়ি ঘরে চুকিয়া দেখিল, শোভনার মলিন স্মৃতিকেশটা নাই, কোণের টেবিলের উপর শুপাকার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে অলঙ্কার, পরিচ্ছদ—  
মোহনের প্রত্যেকটি ক্রীতি-উপহাঃ।

এখনকার একটি জিনিষ সে সঙ্গে লয় নাই, তার অ্যাস-ক্লার গায়ের কাপড় আর সস্তা জাম্বেল পায়ে দিয়া কখন নিঃশব্দে সে বাহির হইয়া গেছে।

পরিচিত অপরিচিত সম্ভব অসম্ভব সকল জাম্বায় সারা সহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোহন বেলিল, যে ট্রেনঙলা দাখিলিং হইতে নামিয়া যায় প্রত্যেকটা অহরহান করিল, কোথায় শোভনা?

খানায় থবর দিতে ভরসা হইল না, বাড়ীর লোককেও বেশী কিছু জানাইতে প্ররুতি হইল না। অধু তাহিতে লাগিল মোহন—কেন সে গেল, কোথায় গেল?

বিকালের আলো মিশাইয়া আসিতেছে, কাঁট রোজ দিয়া একখানি বাস ছুটিয়াছে শিলিওড়ির দিকে। এক কোণে বসিয়া শোভনা সর্বিল পথের দিকে চাহিয়াছিল, তার চুলে ঝড়ো হাওয়া আসিয়া লাগিতেছিল।

অনেক ঘুরে—অনেক নীচে শ্রাবল প্রান্তরে হবাত শোভা—উটককে লাল জন্মশ: ফিকে হইয়া গোলাপীতে নিশিয়াছে, গোলাপী থিয়া কমলায় শেষ হইয়াছে, কমলা হরিরায়, হরিরায় বেগুনীতে, বেগুনী নীলে, নীল ধূসরে—এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ।

শোভনা ভাবিতেছিল

কত অজানারে জানাইলে তুমি  
কত ঘরে দিলে তাই,

দূরকে করিলে নিকট বন্ধ  
পরকে করিলে ভাই!

যতই সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল ততই তার বেশী করিয়া মনে পড়িতে লাগিল, দূর দাখিলিংএ একখানি নিরাপদ আশ্রয়ের ছবি—বাহিরে অন্ধকার, শীত, দুর্ভাবনা—ভিতরে উজ্জ্বল আলো, মনোরম উষ্ণতা, মেঘ-ক্লীতি ভরসা।

সেই শান্তিনিবিক্ত গৃহচ্ছায়া জন্মশ: দূর হইতে দূরত হইতেছে।

আজ তার মনে পড়িল কাঙ্গালিনীর কথা—  
আপনার তাই সেই বলে

ওরে কিরে ডাকিলে না কেহ?

আর কারো জননী আসিয়া  
ওরে কিরে করিবেনা ঘেহ?  
সেও ত' তেমনি দুর্ভাগিনী!

একখানি মাত্র গায়ের কাপড় সঞ্চল করিয়া দাখিলিং-এর দুর্ভয় শীতের প্রভাত হইতে শ্রুত করিয়া ঘুম, সোনাল, কাশিয়া, গয়াবাড়ী পার হইতে হইতে তার মনে শরীর হিন হইয়া আসিতে লাগিল।

মনে হইল যেন অর আসিয়া গেছে, বুকে হ্রয়ত সর্দি বসিয়াছে। একবার ভয় হইল, আপনার জন্ম কেহই রাখে নাই, অনির্দেহ পথে যাত্রা করিয়াছে, যদি পথেই কিছু হয়! কিন্তু—

তুমি আপনা হইতে হও আপনার,  
যার পথে নাই তুমি আছ তার,  
সেকি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে বাবা  
বড় বাজে প্রভু মরমে!

ঠাণ্ডাটা জন্মশ: বেশী মনে হইতে লাগিল, মাথাটা  
আরো ভার বোধ হইতে লাগিল।

শিলিঙডিতে যখন ট্রেন ধরিল তখন আর তার  
বসিয়া থাকিবর ক্ষমতা নাই।

গায়ের কাপড় মাথা অবধি মুড়ি দিয়াও ঠকঠক  
করিয়া কাপিতে লাগিল, অসহ মাথার যন্ত্রণা ও  
নিশ্বাসের কষ্টের মাঝখানে তার মনে হইতে লাগিল  
তার মত দুর্ভাগিনীর কিছুই হইতে পারে না।

এখনো যে তাকে ঢের কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।  
আঁদরের পথে নিজের পায়ে নিজে ঠাড়াইতে হইবে।

কোন একটা জায়গায় তার জড়তা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া  
গেল, দেখিল সবগুলো জানলা খোলা, কাঁচ অবধি  
চুম্বিয়া সেওয়া নাই, ছয় করিয়া শীতের কন্মকনে-হাওয়া  
খানবাব মধ্যে ঢুকিতেছে—দাখিলিং মেলের একটানা  
ঘসাব্দ শব্দ।

হইতে লাগিল, খাড়াটা ভুজিয়া হাতটা ঝাঝিয়া বহিল,  
যন্ত্রণা বোধ করিবার মাত্র অবধি তার রহিল না।

ঠেঁশনের পর ঠেঁশনে চলিয়া যাইতেছে, জননী  
জানাল-কামরায় কি হইতেছে কে জানিবে!

একটা বিপজ্জনক জায়গায় চলন্ত গাড়ীতে লাফাইয়া  
উঠিল জন্মশ: মেয়ে গাড়ীই তার লক্ষ্য। ট্রেন ডাকাতিতে  
সে বহবার জেলে খাটিয়াছে।

ছোরাটা প্ররুত করিয়া অগ্নসর হইতে সে দেখিল  
একটি মাত্র মেয়ে, সেও তুমিমায়া তুমি কি যেন  
বলিতেছে।

সে কান পাতিয়া শুনিল:—

তুমি রাজার ছলল, আমি যে স্বরাহুলের মালা,  
তোমার জীবন কেন বার্থ করে দোব? তাকি পারি?  
তুমি স্বন্দর তুমি মনোরম, কিন্তু আমি যে কিছুই নয়, আমি  
যে কিছুই নয় গো!

জন্মর কিছুই বুঝিতে পারিল না।

সহসা সে পাশ ফিরিয়া বলিয়া উঠিল—মা-গো!  
কি করল! জন্মর শিহরিয়া উঠিল।

—মাগো, জল!

জল? সে কোথায় পায়? ছোরা ফেলিয়া দিয়া  
কল-ঘরে জন্মর ছুটিয়া চলিল—কল জল নাই!

হিসিতে গাড়ী ধামিতে জন্মর লাফাইয়া নামিয়া  
পড়িল।

শীতের রাতে কার জল দরকার? পাঞ্জি পাঁড়েও  
নাই। অনেক ঘুরে কল, আনিবার পাত্র যোগাড়  
করিতে দেবী হইতে লাগিল, যদি বা কোনরকমে  
পয়সা দিয়া একটা ভাঁড় কিনিয়া তীরবেগে ছুটিয়া গাড়ী  
ধরিতে আসিল, মেয়ে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া খালাসীরা  
তাকে জাহাড়াইয়া ধরিল।

সে বলিল হামাংগা মারী হায়!

পুলিশ আসিয়া হাত ধরিল, ধুমার মারী? শালা  
কেমনাংকে জেইল খাটা, চলো কির!

অসহায় আন্তরিক উপেক্ষা করিয়া ট্রেন তখন স্ট্রাটফর্ম-  
ছাড়িয়া গেছে।



শিকারদেহ রেল কর্মচারীরা যখন খবর পাইয়া একটি মুতা মহিলাকে বাহির করিল, তখন হাতের আঙুলে S-লেখা একটি আংটি ছাড়া আর কোনো পরিচয়ই পাওয়া গেল না।

সেই দিন তোর হাতে মোহন স্পষ্ট দেখিল, বিচিত্র ডালিয়া ফুলের ডালি হাতে করিয়া শোভনা তাহাদের বাঁড়ীর দরজার সামনে অস্পষ্ট আলোকে দাঁড়াইয়া আছে। সে উপর হইতে দেখিতে পাইয়া দরজা খুলিয়া দিবার জন্য ছুটিয়া নীচে নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল—আমি জানি, জানি শোভনা, তুমি ফিরবে, অসম্মান তোমার থাকবে না।

তার হাত লাগিয়া বারান্দায় ফোলানো একটা অকিড্ মাটিতে পড়িয়া গেল, বোপহয় ত্যাহারই শব্দে শোভনাকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না।

হিল্ট-স্টেশন দাঙ্কিলিং তার রং ও রূপের গর্ভে কোলাহল মুগ্ধিত হইয়া মনো করিতেও দিল না স্বপ্ন সমতল ভূমিতে

আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুলমাত্রা সব গেছে চুকে; রাজিদিন ধুক্ধুক তরঙ্গিত স্বপ্ন চুখ ধনিয়াছে চুকে।

## বৈদেশিক বাতী

শ্রীপ্রমোদ সেন

### সাম্রাজ্যবাদের মরম

প্রাচ্য ও পশ্চাত্যে দুইটি জাতি সাম্রাজ্যবাদের নেশায় একেবারে মশগুল হয়ে উঠেছে। প্রথম হচ্ছে জাপান, দ্বিতীয় ইটালী। বনেদী শক্তিবর্গ তাদের সাম্রাজ্যগুলোকে পাকা ভিত্তির ওপর গড় করিয়েছে বলে এই দুই শক্তির অভিযানকে বরদাস্ত করতে পারছেন না; কিন্তু এদের বিক্ষেপে ঠাঁড়াবার শক্তিও ওদের নেই। কারণ ওরা নিজেদের মধ্যেই দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত। তবুও ওদের অশঙ্কা আছে যে এই নূতন সাম্রাজ্যবাদীরা যদি বিজয়ী হয় তা হলে তাদের জয়ধ্বজ গতি গিয়ে হয় তা ওদের সাম্রাজ্যগুলোর সীমানায় পৌঁছবে।

এই ক্ষেত্রে রুটেন ইটালীর আফ্রিকার সাম্রাজ্য-প্রসারের চেষ্টায় বিশেষ অধিক্তি বোধ করছে, এবং অসম্মান অধিক্তি বোধ করছে আমেরিকা ও রুটেন জাপানের চীনপ্রাসাদের উত্তাপ দেখে। রুটেন



গিন্স হুগেলিন

আন্তর্জাতিক সংস্থার কলকাতা নেড়ে ইটালীকে ধরবে আনতে চেষ্টা করছে—এমন কি রুটেন এ জটিল পরিস্থিতিতে স্বার্থভাগ করতেও প্রস্তুত হয়েছে। রুটেন বলেছে যে আফ্রিকার সম্পদ শোষণ করে তা'রা রাজ্যকে পূর্ণ করতে চায়।

দিত প্রস্তুত, এমন কি একটা দম্বরও গড়ে দেবে, বিশেষ বৃদ্ধ করে ইটালী বলেছে সে তা'র সঙ্গে যাবে ইটালীর সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে আলোচনা করে। রুটেনের এ প্রস্তাবে আফ্রিকার ইয়ত রাজি হত, কিন্তু ইটালী একেবারে অসন্তোষ। ইটালী এখন একেবারে মুগ্ধ হলে বলেছে যে, আফ্রিকার সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি নয়—সে চায় আফ্রিকার উপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব করতে। গত ডিসেম্বর ইটালী যে রকম



যুদ্ধ-ভয় ভয় পুণ্ডরী কপ্পমান।

তোড়তোড় করছিল তা'র দেখে তার অতিশয় সন্তোষ বোধ করেছিল না, কিন্তু এখন ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে মনে হয় ইটালী একেবারে আফ্রিকার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। অবশ্য তা'র অজ্ঞান পশ্চাত্য জাতিবাদের মত ইটালীরও একটা সাধু-উদ্দেশ্য আছে আফ্রিকার সম্পদ সত্তা করা—কিন্তু এ সত্তা করার অর্থ—বিলাসী সত্তা করা। ইটালী অজ্ঞান সাম্রাজ্যবাদীদের মত তা'র আসল উদ্দেশ্য গোপন করে নি যে, সে আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে তা'র রাজ্যকে পূর্ণ করতে চায়।

রুটেনের কাজ থেকে কিছু বাধা ও জগতের সাধারণ লোকের নিন্দা পেলেও, ইটালীর সমস্ত সিদ্ধির পথে বিশেষ বিঘ্ন হতে না। কারণ আন্তর্জাতিক সত্তা যদি

বিশেষ বৃদ্ধ করে ইটালী বলেছে সে তা'র সঙ্গে কোন যশস্বয় রাখবে না। জাপান চীনের সাম্রাজ্যিক প্রদেশ প্রাসাদের সময়ে ঐ পথ দেখিয়েছে। সত্তা তা'র একটা বৈধক মাত্র; স্বার্থ-সিদ্ধির সময়ে বৈধকের মতোই বিশেষ লোভনীয় নয়।

তবে আফ্রিকার ইয়ত স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। আফ্রিকার সম্রাটের কথায় মনে হয় যে ঐ অর্ধসত্তা নরনারী বর্ধের রক্ষার জন্তে দুট-প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, এমন কি তা'রা বিশ্ব সংঘর্ষের জন্তেও প্রস্তুত। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ইটালীর মত আফ্রিকার নেই—যদিও ইটালী অনবরত গর্জন করছে, যে শক্তিবর্গ আফ্রিকাকে বেশ ভাল করেই শত্রু জোগাচ্ছে; কিন্তু পাহাড় পর্বত ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করে অতি সহজেই আফ্রিকাকে গ্রাস করা ইটালীর ভাগ্যে নেই।

তবুও ইটালীর আফ্রিকার চাই। কারণ আর কোথায় ইটালী সাম্রাজ্য বাড়াই? পৃথিবীর অধিকাংশই তা'র পাণ্ডা শক্তিশালী ভোগবন্দন করছে, আর ইটালী শক্তিমানে হয়েছে মাত্র গত দশ পনের বৎসরের মধ্যে। পৃথিবীর মধ্যে এক আফ্রিকা সাম্রাজ্য বিস্তারের অব্যবহিত ক্ষেত্র। তাই রাজনীতিক পণ্ডিতরা মনে করেন যে বর্তমান শতাব্দীতে ইয়তপন্থী শক্তিবর্গ আফ্রিকা নিয়েই কামড়া-কামড়ি করবে। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা রুটেন অনেকদিন ভোগদখল করছে; পশ্চিম আফ্রিকার কিয়দংশ গ্রাস ও রুটেন ভাগাভাগি করেছে। উত্তর আফ্রিকার দ্রুতগতির চুচুটি আছে, এবং দ্রুতগতির আফ্রিকার সাম্রাজ্য স্থাপিত করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও মধ্য আফ্রিকা পশ্চাত্য সত্তাভার সংস্পর্গে পায়নি। সেখানে এখনও প্রাকৃতিক কল্যাণে ছেলে মেয়েরা অবশেষে বিবরণ করে এবং তা'রা প্রাকৃতিক শোষণ করতে জানে না। ইটালীর চোখ পড়েছে ঐ দিকেই।

আধুনিক কোন শক্তির কোন দেশের ওপর চোখ পড়া মানেই তা'র সর্বনাশ।



## জাপান চু মারছে চীনে

ইতালীর চেয়ে আগেই জাপান শক্তমান হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর সাম্রাজ্যবাদের নেশা অনেক দিনই ধরেছে। কিন্তু সে বেচারারও সাম্রাজ্য বাড়ায় কোথায়? কখন জাপান যুদ্ধের পর সে বানিকটা রাজ্য পেয়েছিল এবং

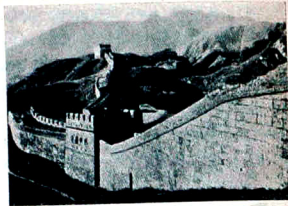


কোরিয়া গ্রাস করে তার সাম্রাজ্যের ক্ষুধা কিছু পরিমাণে মিটেছিল। কিন্তু সে যে ক্রমাগত শিম-বাগিচা উদ্ভিজ্জিত করত লাগল ও জনসংখ্যাও বেড়ে চলল বিপুলভাবে। এত মালের কাটুতি হয় কোথায় এবং এত লোকের বসবাসের স্থানই বা পাওয়া যায় কোথায়? দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়ার ওপর হুয়াত 'সে' গোপনে দৃষ্টিপাত করেছে, কিন্তু সেখানে যে বুটান সিংহ 'দিলে হানা'।

কাজেই তাঁর প্রোথ ফেরাতে হ'ল পূর্ণ এশিয়ায়ই ওপর।

চীনের কর্ণার—সেনাপতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বৃষ্টি পল্লবের চ্যাংকাইসেক পর কশিয়ার বিশৃঙ্খলতার সুযোগ নিয়ে সে সাইবেরিয়ার বানিকটা ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু শেষ বন্ধ হ'ল না। তাঁর পর কশিয়া হয়ে উঠল শক্তমান, কাজেই ওদিকে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না বুঝে জাপান নজর দিল চীনের ওপর। চীনে তাঁর কাজ হ'ল সহজ—অবশ্য ইদানীং। কারণ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে চীনের জাতীয় অভিযান জাপানকে এরকম দাঙ্গা দিয়েছিল যে, বাস্তবিক জাপানের জাহি জাহি করত হয়ে ছিল এবং চীনের বয়কটের ফলে জাপানের বাবসা বাগিচা একেবারে নির্মূল হয়েছিল বললেই হয়।

কিন্তু চীনের জাতীয় অভিযানের প্রথম উজ্জ্বল পূর্ব হবার পরই দেখা দিল চীনের সেই সনাতন আত্মবাস্তবী ৬২



চীনের মহাজাতীর—এখান থেকে জাপানী সৈন্যরা সব সময়ে উত্তর চীনে হানা দিতে প্রস্তুত।

গৃহ-বিবাদ। চীনে হয়ে পড়ল দুর্বল। কশিয়ার সঙ্গে মনোমালিঙ্গ করে চীন আরও হ'ল সহায়হীন। পূর্বে ছিল রুটন ও আমেরিকা চীনের মুক্শি, কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আর্থিক কঙ্কার পরে তাঁরা নিজেদের ঘর সাম্রাজ্যেই বাস্তব হ'ল। কাজেই জাপান পেল সুযোগ এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মাকুরিয়াকে অনার্যাসেই চীনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারল। তারপর থেকে জাপান ধীরে ধীরে উদ্ভবফিন চীনে অধিকার বিস্তার করে এখন একেবারে বাস চীনের ওপর এসে পড়েছে।

সম্পত্তি ব্যাপার এই রকম দাঁড়িয়েছে যে জাপান যে কোন মুহূর্তেই চীন কবলিত করতে পারে। মাল থানকে আগে সে চীনকে বেশ নাজেহাল করেছে এবং ফলে চীন পরবর্তীতে জাপানী-বয়কট আইন করে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এর পরও জাপান শাস্ত ফহিন, এবং নানা অজুহাতে চীনে একে অপদ্রব করে একেবারে মুঠের মধ্যে আনার চেষ্টায় আছে। চীনের কিছু করার ক্ষমতা নেই। একে সে জাপানের তুলনায় একেবারে দুর্বল, তার ওপর গৃহ-বিবাদের ফলে একটা স্থগিত সামরিক অভিযানও তারপক্ষে অসম্ভব। চীন পরবর্তীতে সর্বসেসর্বা চ্যাংকাইসেক জাপানের সর্বশক্তি হওয়ার চেয়ে সামান্যবানীদের সঙ্গে সংগ্রামেই বীর্য প্রকাশ করতেন। ক্রমশঃ বোধ হয় জাপান চীনে জাতীয় পরবর্তীতে থাকতে দেবে না। চীনের মহাজাতীয়ে

প্রাবণ—১৩৪২]

ঐতিমোদ সেন

ওপরই জাপানী সৈন্য সমবেত রয়েছে, কাজেই তাঁর কোন দাবী উপেক্ষা করা চীনের সাধ্য নয়।

জাপানের এই অভিযানে আন্তর্জাতিক সঙ্গ প্রতিবাদ করছিল ব'লেই জাপান সঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারপর জাপান নৌ-শক্তি ছিড়ে ফেলে বড়ো নৌ-বহর বাড়ানো। এতে আমেরিকা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, এবং সেও নৌ-শক্তির তোড়াছোড়া করতে লেগেছে। রুটনও পুর্নীরে সাধনান হচ্ছে। ইতিপূর্বেই সিঙ্গাপুরে রুটন বণোপাত বহরের বিরাট খাটি তৈরী হয়েছে। এমন রুটন সাম্রাজ্য রক্ষার জন্তেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে এবং এই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যচুক্ত দেশগুলির সঙ্গে শলাপরামর্শ চালাচ্ছে।

কশিয়া ওপর্যাপ্ত জাপানকে নানাভাবে তুণ করেছে, এমন কি চীনের দানী রেলটা পর্যাপ্ত জাপানের নিকট মাটির দরে বিক্রী করেছে। কিন্তু তবুও জাপান তাকে বহুতুণ দেখাতে ছাড়ছে না। কশিয়া ও মাকুরিয়ার নীচায়ে ছোট-খাট সংগ্রহ মাকে মাকে লেগেই আছে এবং কশিয়া জানে যে জাপান স্বেযোগ পেলেই তাঁর যাতে পড়বে। কশিয়াও তাঁর জন্তে প্রস্তুত। কিন্তু ঈগনের কথা “No thought of attacking others but to get to the last each inch of Soviet soil”—কড়িকে অক্রমণ করুন না, কিন্তু দেশের হুচারা হুচিও বিনা যুদ্ধে দেব না—এই হ'ল কশিয়ার মূলনীতি। তা' না হ'লে এতদিন প্রাচ্যে রণরঙ্গের খটা দেখাত।

## রাজতন্ত্রের স্বপ্নসমর

এ বঙ্গের গ্রীষ্মের সিংহাসনচ্যুত রাজা জর্জ ও ঈদয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্কডিক অটোর স্বপ্নসমর। উভয়েই বোধ হয় সিংহাসন ফিরে পাবেন। গ্রীষ্মের পন্থতী নেতা ডেনিকিলোস কয়েকমাস পূর্বে যে সিংহাসন হারিয়েছিলেন তাঁর বার্ষিকার সঙ্গে সঙ্গেই যেনে হয়েছিল রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন আসল। সম্ভবিত গ্রীষ্মের জাতীয় পরিষদই এ বিষয়ে উদ্যোগ হয়েছে এবং আপানী নাজবহর শীঘ্রই জনসাধারণের মত

এষণ করা হবে। যখন রাজবিরোধী নেতা বিরোধিতা ত্যাগ করেছে তখন নির্বাচনের ফল সুস্পষ্ট। তবে ভারী রাজা একটা কেলেক্সারীর মধ্যে পড়েছেন। তাঁর রাণী, কমানিয়ার রাজা ক্যারলের ভগ্নী, তাঁর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন।

ঐদয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অটোর মুক্শি হচ্ছেন প্রবল প্রতাপাধিত মুসোলিনি। ঐদয়া অবশ্য এখন ইতালীর একান্ত অগ্রগত, তবে পণতর থাকলে হয়ত' দল বিশেষের প্রতিপত্তিতে পরবর্তীতে বিগড়িয়ে



হিটলারের ছই মুঠ—মুখ খাওয়ার বাটা, ভিতরে পল সম্ভব।

যায় এই আশঙ্কায়ই মুসোলিনি রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন করতে চান। ঐদয়াকে নিয়ে মুসোলিনির আশঙ্কা যে ও জাপানীর বন্ধনে না পড়ে, কারণ ঐদয়া ও জাপানী মিলিত হ'লে ওরা গত যুদ্ধের পূর্বের ভায় একটা সম্মিলিত দুর্বল শক্তি হয়ে উঠবে।

ঐদয়ার কর্ণার ডাঃ উলকারের হত্যার আগে মুসোলিনি জাপানীর ওপর বেশ স্তম্ভর ছিলেন, এমন কি গত বঙ্গের হিটলারের সঙ্গে ডেনিসে তাঁর জীবিত



পূর্ব আলাপ আলোচনা হয়েছিল। তারপর হ'ল অষ্ট্রিয়ার নাজি বিপ্লব, এবং সেই থেকে মুসোলিনি জার্মানীর ওপর গোপনে বিপ্লবে। মুসোলিনি যখন এই নাজি বিপ্লবের স্বযোগে জার্মানী অষ্ট্রিয়া গ্রাস করেই ফেলবে।

মুসোলিনির রক্তকুসুম দেখে হিটলার খুব কাকুতি মিনতি করলেন। এবং তারপর থেকেই হিটলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন যে, অষ্ট্রিয়ার ওপর জার্মানী চোখ দেবে না। তবুও মুসোলিনির বিশ্বাস—সেই—সেই জেহেই তিনি পাকা বন্দোবস্ত করতে চান অটোকে সিংহাসনের ওপর বসিয়ে। অটো খুব অসহন সাবালক হয়েছেন এবং অষ্ট্রিয়ার বর্তমান পর্যবেক্ষণই তাঁকে সারের ডেকে আনছে, কাজেই মুসোলিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে অষ্ট্রিয়ার ইটালীর প্রতিপত্তি কিছুকাল অব্যাহত থাকবে।

গ্রাম মহা ইয়ুরোপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইয়ুরোপের (বলুন উপদ্বীপের) মোজলি ইটালীর হাতে চেড়ে দিয়েছে, কাজেই ও-বিক্রে মুসোলিনির অর্থ প্রতিপত্তি। ইয়ুরোপে ইটালীর কোন আশা নেই ব'লেই, মুসোলিনি এখন অসিসিনিয়ার দিকে ভাল করে নজর দিতে পারছেন।

### লয়েড জর্জের অভ্যুদয়

বিলাতের রাজনীতির এক সঙ্কটক্ষেপ লয়েড জর্জের অভ্যুদয় হয়েছিল, এবং তিনি সেই দাপ্তর সময়ে যে রকম ভাবে দেশে রক্ষা করেছিলেন তাঁর জন্তে বিলাতের লোক তাঁর কাছে খুব কৃতজ্ঞ। তাৎপর্যকরোক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কবেই ম'রে পড়েছিল, কিন্তু আবার তাঁর অভ্যুদয় হয়েছে এক সঙ্কটক্ষেপে। যুদ্ধের সময়ে তিনি হয়েছিলেন সম্মিলিত দলের প্রধান মন্ত্রী; এখন তিনি

আবার যুদ্ধ নিরাপন্ন করার উদ্দেশ্যে নানা দলের লোক নিয়ে এক দল গড়েছেন। তাঁর দলে যোগ দিয়েছেন ভূতপূর্ব শ্রমিক নেতা লুই থোডেন ও মধ্যপন্থী নেতা গুর হারবার্ট স্মার্ময়েল।

পন্থীদলে আর ক'জন নেতা ভিত্তিভেদ সম্ভব। কার্য বিলাতের জনসাধারণকে এখন দেশ রক্ষা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং দেশেরকার জন্তে সামরিক বায়ের অল্প ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। লয়েড জর্জের নব-নীতির সমর্থন করেছেন ধর্ম্মযাজক সম্রাট, কার্য অনুদান তাঁরা শাস্তির পক্ষপাতী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে লয়েড জর্জের নতুন দল জনসাধারণের সমর্থন পাবে কিনা। জনসাধারণ বিশেষ কোন মত নেই, তাদের যে রকম বোধান যার তাঁরা তাই বোঝে। সম্মতি লর্ড সিমসের প্রচেষ্টা ওপর নরনারী বলেছে যে, তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমর্থক এবং শান্তি রক্ষার পক্ষপাতী। এরপর ফ্রান্স সম্মেলন-বিশেষীদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু এতে কি বলা চলে যে, রুটেন কোন অবস্থায়ই যুদ্ধ করবে না। কাশ যদি কোন কারণে রুটেন কাঁপেও বিলুপ্ত হবে যোগ্য করে তা হ'লে এরাই বলবে, হী যুদ্ধ কাই টিক। তা ছাড়া পর্যবেক্ষণ যা করে জনসাধারণ কিছু কালের জন্তে তা মেনেই নেয়। এই যে বর্তমান পর্যবেক্ষণ জার্মানীকে নৌবহর নির্মাণের ও নানাবিধ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রশ্ন দিয়ে অশান্ত করছে করছে এমসিই অজ্ঞাহতে রুটেনের সামরিক শক্তি বিধ্ব ভাবে বৃদ্ধি করছে, এর বিরুদ্ধে জনসাধারণ কি করছে!

অন্য এ হ'লে পারে যে লয়েড জর্জের প্রচেষ্টা ফলে হয়ত আবার নীলচন্দনে তাঁর দল জুটুক। তা হ'লে লয়েড জর্জ তাঁর নবনীতি চালাতে পারবেন। কিন্তু অকলঙ্ক ও ত' চূপ করে বসে থাকবেন। এ বর্তমানে রক্ষণশীলদের প্রতিপত্তি বেশ তাই। লয়েড জর্জের জাতীয় উন্নতির জ্ঞান অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর ত্যাগের আদর্শ খুব প্রশংসনীয়, কিন্তু জনসাধারণ দ্বারা দলটির মোহ তুলে এই উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জার্মান উন্নতির সাধু চেঁচায় কি রকম পড়ে পড়ে বিচিরি হচ্ছেন সেখান যেন হয়, লয়েড জর্জের চেঁচা সফল হয়। অব্যাহতি পাবে না। তবুও দেখা যাক তিনি কতটা এগুতে পারেন।



মিঃ লয়েড জর্জ

তবে এরকম উদার-

## = কাব্যের জ্ঞান =

নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত

কাব্যার্থ বিচার নিয়ে পণ্ডিত পণ্ডিত মতবৈধ। একদল আদ্যে যারা অলঙ্কার-চ্যুত্যা, ছন্দ-নৈপুণ্য, বাচন কৌশল প্রভৃতিকেই কাব্যের প্রাণবন্ত বলে মনে করেন। অল্পগ্রাস বা যমক বা মেঘোজ্জ্বল বাক্যসম্পর্ক রচনা-জ্যোৎস্না তাঁরা উচ্চ অঙ্গের কাব্য বলে চালিয়ে থাকেন। আর একদল আছেন, যারা বিষয়-গৌরবকে বড় বলে মনে করেন—দেশভাবোপ, ধার্মিকতা প্রভৃতি অবলম্বনে লেখা রচনা জেলাই তাঁদের মতে শ্রেষ্ঠ কাব্য—বস্তুত এছাড়া মতই অসংখ্য এবং রসজ্ঞতার অভাব হতক।

দেহ ও প্রাণ উভয়ের সমন্বয়েই মানুষ—প্রাণ-বর্ধকে অধীকার করে কেবলমাত্র দেহসৌন্দর্যকে প্রাণান্ত বলে যেমন মাহুষের বিচার হয়না, এক্ষেত্রেও তাই। আবার যদি ভালোমন্দ মাহুষের প্রকৃতি ও তৎক্ষণিত ক্রিয়াকলাপ ভঙ্গিকেই মাহুষ বলা হয় তা হ'লে ত ভুলটা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু মাহুষের কাব্য-বিচার চিরদিনই এই রকম—তাই দেখা যায় যে সমস্ত কবিতা বাবারে খুব স্থগিরিত হয়, যার ঘরে যা সমাপ্ত, রচনা হিসাবে সেগুলি একান্ত তৃতীয় শ্রেণীর—দুর্দৃষ্ট উল্লেখ করে ব্যস্ত প্রাণে বাখা দেওয়া নিম্নোদ্যোজন। তবে প্রাকৃতিক, যে মাঝিই হ'ক আর অমার্জিতই হ'ক—প্রকৃত কবিতার মধুরী ধ'বুতে না পারে এমন নয়; প্রাণে একটা অস্পষ্ট আনন্দহুতি যে সঞ্চারিত না হয় এমন নয়, তবে প্রাণলব্ধ সংস্কারে ভারে তাঁদের চিত্তভ্রষ্ট বিবেচনী শক্তি হ্রাসিয়ে ফেলে। তাছাড়া রসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে কিছুটা অসুশীলতাও প্রয়োজন ব'কি। এ ছ'য়ের অভাবে তাঁরা কাব্যে ও অকাব্যে তলাউটা কৌন্থানে সেটা স্পষ্ট ক'রে বোঝেন না—ফলে তাঁদের কাব্য-বিচার হয় এক-মুখী আন্তর্জাতিক পর্যাযসিত হয়, না হয় মুড়িমুড়ির এক কবীর তৎপর হয় ওঠে।

বস্তুত আধুনিক সমাজ-তত্ত্ব যেমন ecology বা পারস্পর্যকে মানব-সভ্যতার গোড়ার কথা বলে স্বীকার ক'রছেন, কাব্যেও তেমনি একটা পারস্পর্য আছে ব'লে কিছু দোষের হয়না। Ecology শব্দের প্রকৃত অর্থ বৃক্ষ-সংস্থান—এই বৃক্ষ সংস্থানকেই আজকাল সভ্যতার প্রধান উপকরণ বলে ধরা হ'চ্ছে। বৃক্ষবাছল্যের সঙ্গে প্রকৃতির জলবায়ুর সঙ্গম খুব নিকট—জলবায়ুর সঙ্গে কৃষি-পাণ্ড জীবিকার সঙ্গম ঘনিষ্ঠ—জীবিকা কৃষি হ'লেই সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তার অঙ্গরূপ হ'তে বাধ্য। তখন শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম সবই তদনুযায়ী খাতে প্রবাহিত না হ'য়ে পারেনা। এখন যেখানে বৃক্ষ-সংস্থান কম, সেখানে জলাভাষা-কৃষি-ব্যবস্থাও তদনুযায়ী খাতে প্রবাহিত না হ'য়ে পারেনা। এখন যেখানে বৃক্ষ-সংস্থান কম, সেখানে জলাভাষা-কৃষি-ব্যবস্থাও তদনুযায়ী খাতে প্রবাহিত না হ'য়ে পারেনা। এখন যেখানে বৃক্ষ-সংস্থান কম, সেখানে জলাভাষা-কৃষি-ব্যবস্থাও তদনুযায়ী খাতে প্রবাহিত না হ'য়ে পারেনা।

কাব্যে টিক এই জাতীয় ecology আছে ব'লুছিনে। কথাটার উল্লেখ ক'রুনাম শুধু আমার বক্তব্যের দ্বারাটা স্পষ্ট করার জন্তে। আমি বা ব'লুতে চাচ্ছি তা হ'চ্ছে এই যে কাব্যেও একটা অংশের সঙ্গে আর একটা অংশ এরিতর অঙ্গাঙ্গী সঙ্গকে জড়িত—কোনটাই নিজের প্রয়োজনে আসেনি, বা স্বতন্ত্রভাবে কেউই সার্থক নয়। ছন্দ যেখানে শুধু মিলিতা স্বজনের জন্তে আনন্দানি হ'য়েছে, বিষয়বস্তু যেখানে বহু প্রচারের অপেক্ষা ক'রছে, কৌশল যেখানে চমকপ্রদ হবার জন্তে ব্যর্থ—সেখানে তারা বাইরের জিনিষ। তাদেরকে ভেবেচিন্তে ধ'রেবোঁদের আনা হ'য়েছে—সেখানে কাব্য প্রাণ-সম্পদে শুভ হয়ে ওঠে নি। অর্থাৎ কাব্য সেখানে জীবন্ত হয়নি—তার আত্মবিকাশ স্বাভাবিক প্রবাহে শূন্য হয়নি; সেরকম কবিতা



বহিঃস্থের চরিত্রার্থ করেই ছুরিয়ে যায়, অতঃপর আনন্দলোকে তার প্রতিষ্ঠার দাবী নেই।

প্রাথমিকী তার বলেন—কাব্য এতটা organic সৃষ্টি। এর সেইটাই আটপাট বেঁধে গড়ে তুলতে পারলে, প্রাণটা আপনা থেকেই রসায়নিক প্রক্রিয়ার গজিয়ে ওঠে তা নয়। হেহ এবং আত্মা দুই নিয়েই সমগ্র জীবন কাব্য জন্মায়—অর্থাৎ জীবের জন্ম ও শিল্পের জন্ম দুয়েরই রীতি ও পদ্ধতি অনেকটা এক রকম। স্তব্ধতা, দ্রব, অলঙ্কার, styleই হ'ক, আর আবেগ, অহুত্বিত, মোজাজই (mood) হ'ক, প্রকৃত কবিতার সমস্তই কাব্য-কারণ সম্বন্ধে জড়িত থাকে—এই সমগ্রতাই হ'চ্ছে কাব্যের প্রাণ, এরই নাম বলা যেতে পারে রস। কিন্তু এই রস স্বল্পটির স্বরূপ কি তা বুঝিয়ে বলা কঠিন। সমগ্রতাগে অস্তর একে অহত্বত্ব করে, কিন্তু বিশেষণ বা ব্যবচ্ছেদ করে একে দেখানো যায় না।

তবু মোটামুটি হিসাবে বিশেষণ ক'রলে তিনটি জিনিষ কাব্যে পাওয়া যায়—সঙ্গীত, চিত্র ও ব্যঙ্গনা। লৌকিক স্তরের স্থলত শব্দ-গুণনকে সঙ্গীত, স্থল বর্ণনাকে চিত্র এবং কোন তত্ত্ব, তথ্য, মত বা আদর্শকে ব্যঙ্গনা ব'লে সাধারণের মনে হবার সম্ভেই অবশ্যক রয়েছে। কাজেই দৃষ্টান্তের আশ্রয় নেয়া প্রয়োজন—

একদিন ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে, চলার যোকে চলিতে চলিতে এসে পড়েছি মারের মাঝে—  
সবুজ সবুজ প্রকাণ্ড মাঠ, মেঘের পানে  
গলাগলি করে ঘুমায় তখনো কুয়াসা তলে!  
যতদূর চাই, লোকালয় নাই—হয়ত কেউ  
কোন দিন ভুলে সে পথে হাটে না; মণ্ড বিলু  
মিলু করে সে মাঠের কোলে ঢুকল বেলে!।  
তারি বুক জুড়ে অতুত এক কাঠের সেতু,  
কতদিন আমি কাটা গড়েছিল কেউ বা জানে?  
ভোর বাতাসের আঘা ছোঁয়ায় আপনি বোলে,  
কুহকী ছায়ায় কোঁথা নিয়ে সে কোন পানে!  
খেলায়-খেলায় পায় পায়ে ভাই সে সেতু ব'য়ে,  
পার হয়ে আসি হুলুদে বেণীকী মুল্লার দেশে,  
পার'দৈর্যে কোথা পাখা কাপটার কিনারা জুড়ে,

ভীক প্রজাপতি সীতারিয়ে ফেরে পাখনা মেলে—  
ছুটি হাত ভরে তুলে নিতে নিতে রৌদ্র হ'ল।  
কিনারায় ফিরে গাও শালিকের জটলা করা  
ঝড় ঝড় আর শরবন ভেঙে বালির বকে  
খুঁজে হারারণ, কাঠের সে সীকা পাইনে আর।  
সীতার জানিনে কুলে ব'সে ব'সে কাটা আসে,  
মুল্লের সুরেই মনে তুলে ক'রে কোণে অপার আশা?  
এই কবিতার স্থলিত শব্দবিন্যাসকে অর্ধক্রম করে  
একটি বিভিন্ন মধুর স্বর অস্তরে ধ্বনিত হচ্ছে, তার ফলে  
ছবির পর ছবি কল্পনার ফলে জন্ম জন্ম করে উঠছে—  
কিন্তু এ ছ'য়ের সংযোগে আমাদের শোধ-কেন্দ্রে যে  
suggestion সঞ্চারিত হচ্ছে তা এই প্রাথমিক বিল, এই  
অসুখি উদাহরণ, এই কাঠের সেতু ও পুষ্পচরনের  
অতিক্রম করে একটা গুঢ় রহস্যময় কিছুই দিকে—একটা  
অহুত্বিত দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। আমাদের সচেষ্ট  
চিন্তাশক্তিকে লোকান্তর করে তুলছে—এই তিনটি বস্তু  
তাহলে পরপর কি রকম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত  
আশাকরি উপলব্ধি হ'য়েছে—এদের কোনটাকেই প্রা-  
সঙ্গের দ্বারা আনা যায় না। কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিত বা  
বিশ্লেষক কবির চিন্তা আঘাত করুণা মাত্র তাঁর অস্তরে  
ভাববৃত্তি আলোড়িত হ'য়ে উঠে এবং তাঁর নিজের বসন্ত  
কল্পনার রঙে সেই প্রত্যক্ষ মধ্য কপাটীত হ'য়ে পড়ে,  
তাঁর অস্তরের স্বরে তা স্বরেণা হ'য়ে পড়ে—এটা সম্পূর্ণ  
আত্মস্বতন্ত্র ব্যাপার, intuitional—এই ভাবেই রসজিত  
কবিতার জন্ম।

কিন্তু তৈরি করা কবিতার সঙ্গে এই রকম কবিতার  
তফাৎটাও দৃষ্টান্ত সাহায্যে বোঝানো আবশ্যক।  
যেমন—  
সবুজের ঘর খানি উলুখাড়ে কোন মতে ডাঙা,  
বাতির দেওয়ালে ক'টা কীক দিয়ে আসে আলো—  
হাওয়া—  
বাশের গুটিতে আঁটা, পাশে ছুটি দাওয়া পরিপাটি  
নিকানো গোবর জলে, ধারে ভাঙ্গা সপারটাটি!  
—যাত্রীসম্মোহন পাঠ্য

কিংবা—  
আহা! ঠুঁকিয়ে মধু কুলকুলি  
পালিয়ে গেছে বুলবুলি—  
টুটুটাল তাজা ফলের নিটোলে  
টটটো ছুটিয়ে গুলুগুলি!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এর প্রথমটিতে নিম্নত পরিপাটি বর্ণনার পেছনে স্বর  
নেই, আর দ্বিতীয়টিতে অগ্রপ্রাসঙ্গিক নিম্ন শব্দবিন্যাসের  
সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট স্বরধ্বনি ছবি নেই—তাই ছোটোর একটা-  
ওয়ে ব্যঙ্গনা নামক পদার্থের সাফল্য মেলে না। এই  
হ'লো লৌকিক স্তরের কবিতা—আর তত্বমূলক কবিতা  
ত বলা সাহিত্যে রাশি রাশি—তার আর দৃষ্টান্তের  
প্রয়োজন কি?

এবার আমরা সঙ্গীত ও চিত্রের প্রাণবস্তুর সঙ্গে  
কাব্যের সম্বন্ধটা কি তাই নিয়ে অকটু আলোচনা করবো।  
সঙ্গীতের স্বর একটি নির্দিষ্ট বস্তু। সেই একটা  
কোন বিশেষ রাগিণীর আলাপ শুনে পাওয়া গেল, তার  
কথা শুনে লোক বোঝা বাক বা না বাক, সেটা তাল-  
মান মতামত হ'ক বা না হ'ক, অমনি প্রাণের নিতৃত  
কোন একটা আত্মপূর্ণ আনন্দ জেগে উঠে—এ  
আনন্দ সম্পূর্ণভাবে স্বরগত। স্বরের ধর্মই হ'চ্ছে অন্তরকে  
সমগ্রভাবে অবিশ্রাম করা, মনোযোগকে কেন্দ্র-চ্যুত করে  
কিছুক্ষণে জগৎ সম্বোধনের স্বপ্নায় নিয়ে পাওয়া। কিন্তু  
এই উঠে—যখন কোন বস্তুরের কালোয়াতের গান  
হয়, মনস্তত্ত্বের উদ্যোগ হার হার করে থাকেন, তখন  
সাধারণ শ্রোতার মনস্তত্ত্ব হ'য়ে ওঠেন কেন? আমরা  
মনে হয় এই শ্রেণীর শ্রোতা আর যে শ্রেণীর পাঠকের  
কথা আমি গোড়াতেই ব'লেছি, তাঁরা এক দলের লোক।  
কোন কবাবিজ্ঞানকে সহিষ্ণুতা ও সংযম সহকারে উপলব্ধি  
করা হবে তা চিন্তাশক্তি-তাদের নেই—নাইলে আমি  
নিজের কথা বলার অপরাধ মার্জনা করি ত বড় কালোয়া-  
তের গান, শুধু গান কোন নিছক তেলানো আলাপ পর্যন্ত  
অতঃপর আমাদের সঙ্গে উপভোগ্য করেছি। কথার পনের  
আনাই বৃত্তে পারি নি, রাগ-রাগিণী তাল-মান সম্বন্ধে

কিছু জানিও না, কোন দিন ওসব নিয়ে মাথাও ঘামাই নি  
—কিন্তু আমার মনে হ'য়েছে যেন চারটি স্বরে  
মেতে উঠেছে, ঘর বাড়ী সমস্ত স্বরময় হ'য়ে উঠেছে, গাছ-  
পালা জল স্থল সমস্ত সনে স্বরের অসহ পূলাকে উদ্ভত হ'য়ে  
উঠেছে—যেন নিরাশ্রয় শরণার্থীর স্বর মুগ্ধ হ'য়ে ছবির  
পর ছবি একে চলেছে, অজস্র স্বতিকে জগিয়ে তুলছে—  
এমন সমস্ত কবিতার কথা নয়, এ আমার ব্যক্তিগত অভি-  
জ্ঞতা। শুধু দেশী সঙ্গীতের কথা কেন, ইউরোপীয়  
সঙ্গীতও আমার সম্বন্ধে ভালো লাগে—আর আমার মনে  
হয়, এমন রসজ্ঞ ব্যক্তি কমই আছে—যিনি রাগনায়ের  
অপেরা কিংবা বের্ডোভানের গিম্পটনিকে স্বরের স্বপন না  
দেখেন! অবশ্য এ উপভোগ্য অগ্রব্রুত এবং অনেকাংশে  
অবুঝ—যাকে বলা যাবে primitive—যাতে সাপ, হাতী  
উট পর্যন্ত সম্বোধিত হয়। ওজাহারা কি ব'লছেন  
জানিনে, তবে আমার বিশ্বাস সঙ্গীতের যদি কোথাও  
প্রাণ থাকে ত এখানেই। গলায় আওয়াজের আরোহ-  
অবরোহের সঙ্গে নিজ লবণা গতি ও তার হৃদয় চান্দ-  
গুলোর এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা চিত্রকে  
মাতাল করে—সেই উদাহরণ, বিদ্যুতআনন্দকর  
নির্ভীশেষ গুণটার নামই সঙ্গীত। নইলে বড় কালোয়াত  
কথাকে প্রাধান্য দেন না কেন? অভি প্রসিদ্ধ হিম্মত্বানী  
গান গুলোর কথা এত দরিত্র কেন?

রবীন্দ্রনাথের যুগে আমাদের বেশে যে গান সমাদৃত  
হ'য়ে উঠেছে, তা খোল আনা সঙ্গীত নয়—তা কাব্য সম্পদে  
গদ্য, তার কথাকেই আমরা দিয়েছি প্রাধান্য। তাই  
রবীন্দ্রনাথের গান গাইয়ে শুনে কিছুমানী ওস্তাদ বলেন  
“হীয়ে বাংলা দেশকা গানোআলা বহৎ মিঠি বেলাটা!”  
বস্তুতঃ কাব্যের সার্থকতা কাব্যেই, সঙ্গীতের প্রাণ  
পদার্থকে কাব্যের জুলুসে কোনটাই করা ঠিক নয়।  
কথাটিকে অশ্রয় করে স্বর শৃঙ্খল হ'য়ে—স্বরটাই আমাদের  
প্রয়োজন—সুসংগত কথাটা স্বরের বাহন, কিন্তু গৃহগত  
অভিধার চেয়ে তাঁর মোটার পাখীখামির সম্পর্কে উচ্ছ সিত  
হ'য়ে ওঠা আমাদের স্বভাববিশিষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—  
কাজেই স্বরের চেয়ে স্বরের বাহন হ'য়েছে গদ্য। কথা



উঠবে, তা হ'লে রবীন্দ্রনাথের গানে কি আমরা আনন্দ পাইনে? নজরুল ইসলামের গল্প কি আমরা উপভোগ করিনে? তা পাই, তা করি—কিন্তু সঙ্গীত বলে কবির, কবি কাব্য বলে। যেমন আমরা উপভোগ করি কীর্তন—বস্তুতঃ কীর্তনের সঙ্গে তুলাবন মীলার অস্থান রোমান্সের সম্যোগ থাকার, অনেক পূলক অনেক বেদনার ভাববৃত্তির নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকায়, আমাদের মন স্বভাবতই আত্ম হ'য়ে পড়ে—তার ওপর আঁখর বিভ্রাস, মূগ্ধাশ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধ হ'য়ে একটা কবিত্বময় আবহাওয়া গড়ে ওঠে—একেও ঠিক সঙ্গীত বলা যায় না। নিগূঢ় নির্মিশ্রণে মূগ্ধ হ'য়ে সঙ্গীত, তার অন্তিম ভাষণত হ'লেও, তার বাজনা লোকাতীত—নাইলে যর সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ হ'ই কেন? মুক প্রাণীরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয় কেন? এই যে একটা তৃতীয় ব্যাপার, একই ব'ল্‌হিলাম লোকান্তরতা যায়।

আবার কব্যার কথায় নমো আসা যাক। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে কব্যার গোণ ব'ল্‌হিলাম—কাব্যের ক্ষেত্রে তাই মুখ্য হ'লেও গীতই কাব্যের জ্ঞান। এই গীতধর্ম—হীন চট্‌কদার ছন্দ-মালিঙ্গা যে কবিতাকে হত্যা করে তার পরিচয় পেয়েছি আমরা মতোশ্রদ্ধ দ্বয়ের বহু কবিতার। আর এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল গীত-গোবিন্দ—যাতে গীতও নেই, গোবিন্দও নেই। কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার তফাৎ হ'চ্ছে এই যে সঙ্গীতের কথাকে অবলম্বন করেই সুরের দৃষ্টি, আর কবিতার ক্ষেত্রে অন্তরের সুরকে কেন্দ্র করেই কথার উদ্ভব—তাই সঙ্গীতের স্লেমান সুর হ'ল abstract (নির্মিশ্রণ) আর কাব্যে তাই concrete হ'য়ে দেখা দেয়। এই প্রাণগত গীতধর্মের নমুনা সোব?

মুখী-পরিমল আসিছে সজল সপীরে,  
তাকিছে দাড়ুই তমাল কুজ-ভিতরে,  
জাগো সহচরী, আঁজিকার নিশি তুলোনা,  
নীপ-শাখের বাঁধা স্থলনা।

কুমুদ-পরাগ করিবে অলকে অলকে,  
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,

কোথা পুলকের তুলনা।

নীপ-শাখের সখী সুলভেরে বাঁধা স্থলনা।

—রবীন্দ্রনাথ

এটি প্রাধান্যতঃ ছবির কবিতা—ছবির পর ছবি, বর্ষার প্রাকৃত অবস্থাকে রূপে রসে অপরূপ করে একে চলেছে, তারই সঙ্গে তলায় তলায় ব'য়ে চলেছে বর্ষার স্থানিক-মিলনাকৃতি—কিন্তু সমস্ত কিছুকে পরিপূর্ণ করে এক ভেতর থেকে বর্ষার একটি উদ্ভাস গভীর অপরূপ সুর-উচ্ছ্বাসিত হচ্ছে; এই সুরই এই ছবিকে ক'রুছে প্রাণবন্ত, রক্তিতাবকে ক'রুছে জীবন্ত—নাইলে এটি হ'ত অপর-বড়ালের 'শাবণের' মতো তালিকার কবিতা।

ওড়ি ওড়ি সৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে সোলে,  
দুলগুলি প'ড়েছে বসিয়া—  
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে প'ড়েছে সৃষ্টি,  
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।

এ বর্ণনা, এ সুলর pen-picture, কিন্তু রসময়িত সুরেলা কবিতা নয়। সুর আছে এর শেষ ছই অংশে, কিন্তু তখন আর কাব্য জ'মে ওঠবার স্বযোগ পায় না। অন্তরানি নীরস বর্ণনার চড়াই উৎসাহকেই তার অপসৃত্য ব'টেছে।

তারপর ছবি। অনেকের বিশ্বাস ছবি একটা concrete জিনিষ, তাতে perspective (আবৈষ্টী) বসে পড়ে হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যত দেহতত্ত্ব হিসাবে নিচুন্দ্র হবে, ততই ছবি হবে মনোজ্ঞ; তার সঙ্গে বর্ণবিশ্বাসের কোন থাকলে, একটু কবিত্বের আমোজ থাকলে ত আর কথাই নেই। কিন্তু ছবি কি সত্যিই আমরা এই জন্মে তালা-বাসি? 'মোনালিজা', কি 'ম্যাডোনা', কি রেমব্রান্ট বা বতিশ্চেন্সীর কোন ছবি কি এই জন্মেই জগৎবিষয়তা? যদিও শুনেছি রাকফারেলের ম্যাডোনার মতো হ'বারি হাত নাকি পৃথিবীর কোন শিল্পীই আঁকতে পারেন নি এবং মোনালিজার মতো নিগূঢ় দেহ-সৌন্দর্যও নি গিলবার্ডো ছাড়া আর কারো তুলিতে দরা পড়ে নি, ত্রু ওদের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ ওখানেই নয়। অপর ম্যাডোনার মধ্যে মাতৃত্বের ভাব অথবা মোনালিজার অন্তত হাসি-করি

ভাবের কথাও আমি ব'ল্‌ছি নে—অঙ্গ-সৌন্দর্য, বর্ণবিশ্বাস বা নিচুন্দ্র পরিবেশ সংহতান ত আচ্ছন্ন, হয়ত ও 'জান' হুটো আছে—কিন্তু এই জিনিষকে লক্ষ্য করেই শিল্পীরা তুলি ধরেন নি, তাঁদের অন্তরে মারীত্বের যে অপকল্প ideal ছিল, তাকেই একে রূপ দিয়েছেন বাস্তবকে, অপর রূপ দিয়েছেন সখী রূপে—এই যে মা ও সখী রূপে মারীর যন্ত্র, বার গানিকটা বাস্তব, বেশীর ভাগটাই অতি প্রাকৃত, তাকেই রূপান্তরিত করে দিয়ে এসে প'ড়েছে অঙ্গ-সৌন্দর্য, এসে প'ড়েছে বর্ণ সমাবেশ, অপরূপ আবৈষ্টী—হুহুবা এগুলি চিত্রের স্থল উপলান, কিন্তু এর উর্ধ্বে একটা বাজনা র'য়েছে—যেটা স্থল বা সুর দিয়ে তৈরি ও বৃষ্টি দিয়ে দেয়া; স্বতরাং abstract—মোট কথায় এইরকম রূপ।

কিন্তু আমরা বক্তব্য সম্ভবতঃ পরিপূর্ণ হয়নি—impressionistরা বলেন যে, চোখে আমরা বা দেখি লহে তারই নকল ক'বুলে কোন লাভ নেই, কারণ সে দেখা দর্শনালী নয়—কারণ চিত্র-নিরপেক্ষ বস্তু ত বিশ্ব ধারার সেই; সমস্ত কিছুর ওপরই আমাদের অন্তরের ভাববৃত্তি সম্বন্ধ হ'বে র'য়েছে—এই চিত্রযন্ত্রিত্ব বাস্তব মঙ্গর অনবকাশে বাস্তবাতীত—এই বাস্তবাতীত অন্তরের রূপটিকেই ছবিতো মোটামোটা প্রয়োজন—তাই দেহটাকে বিচ্ছিন্ন প্রাথমিক দেবার দরকার নেই, দেহটাকে গোণ ব'লে ব'লে নিয়ে প্রাণটাকে মুখ্য ব'লে ব'লে নিয়ে হতে হবে ছবিতো। যদি এই চিত্রযন্ত্রিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মঙ্গরকে রূপ দেওয়া হয় তা হ'লে ভোগ্য, মানে', এবং তাঁরারের ছবিতো আর ফটোগ্রাফে কোন তফাৎ থাকে না। জানিনি ছবি সম্বন্ধে এই টুকুই শেষ কথা কিনা—তবে ছবির প্রাথমিক সম্ভবতঃ এই কথার মধ্যেই নিবদ্ধ। এই যে নিকপাদিক abstract ছবি, এর সমগ্র প্রকাশ হয় কলা-মূর্তা (acrobatic মূর্তা ঠিক মূর্তা নয়—ওটাকে 'মূর্তা' বলা যাক; এ ছুইয়ে তফাৎ অনেকটা কবিতা ও গুপ্তের ক্ষেত্রেও মতো)। সেখানে প্রাণের গভীরতম গুপ্তি গুলিকে দেহ-ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে রূপ দেওয়া হয়, যথাসে সেখানে সার্থক করার আয়োজন চলে, এই হ'ল

abstraction। নটরাজ কিংবা প্রজাপারমিতার উদ্ভব হ'য়েছিল এই অস্ত-বৃত্তিকে রূপ দেওয়ার প্রয়াস থেকেই—সমস্ত প্রাচ্যকলার উদ্ভবই এই থেকে।

অনেকে বলেন পাছপালা, জীব-জন্তু, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত কিছুকে বিস্তৃত ক'রে আঁকিই একটা বিশেষ ধরণ, বার নাম প্রাচ্যকলা। কিন্তু তাঁরা ঠিক সমস্তবার নয়—অবনীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ ছবিগুলিকে মনোযোগ দিয়ে দেখলেই তাঁরা দেখবেন আমরা বা ব'ল্‌হিলাম তা সমস্ত কিনা। পাছকে বিস্তৃত করা হ'ল কেন—এ প্রব্রের উদ্ভব অবনীন্দ্রনাথ হয়ত ব'ল্‌বেন, একটা বিশেষ ভাবাবেগে চিত্র বার আলোড়িত হ'য়েছে, তার আশে পাশে যে পাছপালা, জল, আকাশ র'য়েছে, সমস্ত কিছুর ওপরই তার সেই অপ্রাকৃত, আলোড়িত উদ্ভাস দৃষ্টি প'ড়েছে—তার চিত্রের ভাববৃত্তি তার পারিপার্শ্বিক জগৎটাকে সেই রকম চোখেই দেখছে—এটাকে আমরা শাদা চোখে দেখছি বিস্তৃত, কিন্তু তার রঙীন চোখে ওর চেহারাটাই হ'ল। এইটা যে outlookও দেখা তারই নাম রসদৃষ্টি। এই দৃষ্টি সময় সময় symbolএরও আশ্রয় নিয়ে থাকে, সময় সময় বিশেষ কোন 'স্লেয়ার' ধারাকে অঙ্গসমগ্র ক'রুতে পারে—কিন্তু সে হ'ল ছবির techniqueএর কথা, যে সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত দেবার অধিকার নেই। সঙ্গীতের মধ্যে যেমন একটা নির্দিষ্টভাবে বাজনা আছে, চিত্রের মধ্যেও একটি তেমনিই বাজনা আছে দেখা গেল—এই বাজনার আমি নাম দিলাম tone বা সুর—এই ছুরেরই কিরা এক। ছুইই আমাদের রসবেধকে লোকায়ত আবেষ্টীর উর্ধ্বে নিয়ে যায় এবং চিত্রকে অজ্ঞাত ব্রহ্মের সাধিধ্য দেয়। তা ছাড়া অতিথের দিক থেকেও এরা অচ্ছেদ্য—(আপনারা সন্দেহই হয়ত এক সঙ্গে ব'লে উঠবেন, কি করে? এ কি করে তার উত্তর দিচ্ছি।)

সঙ্গীত আমাদের চিত্রকে দূরদূরান্তে টেনে নিয়ে যায়। এই বাজার পক্ষে ক'ত ছবিই আমাদের মানসচক্ষে মূর্তে ওঠে, সুরের মীড় আপন আপনিই এগুলি সৃষ্টি ক'রে চলে—আবার ছবিতো সর্ব



মোট। তুলির দাগ যখন আমাদের সমগ্র মনের বহু  
বিকশিত, বহু সংস্কারকে অতিক্রম করে নিতৃত রসলোকে  
এসে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তাও মুখর হয়ে ওঠে—নাইল  
চিত্রাঙ্কনই বৃথা।

কাব্যের ক্ষেত্রে এই সঙ্গীত ও চিত্র-বর্ণ্য পরস্পর  
অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। একে অপরের অন্তর্গত পুষ্ট  
করে চলে, এবং উভয়ের সমবায়েই কাব্য রসের পর্যায়  
ওঠে। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন, যে সঙ্গীত আগে, না  
চিত্র আগে, তাহলে আমাকে আবার পূর্বের কথায় ফিরে  
যেতে হবে—কবির অন্তরে পূজীকৃত ভাবমূর্তি বাইরের  
কোন সংঘাতে আলোকিত হ'লেই তাতে নানা ছবি বক-  
নক ক'রে ওঠে এবং অমূল্য ও ভাবাবগের সমিশ্রণে  
তারা স্রিত হয়ে বাইরে আসবার জন্যে ছড়ানুছড়ি পড়তে  
থাকে। কবি তখন স্বকীয় অস্বাভাবিকের অস্বাভাবী ধারায়  
তাকে বাইরে আনেন—ভেতরকার সেই 'রূপ' তখন  
নির্দিষ্টের অবস্থা ছেড়ে স্রবের অববাহিকা বেয়ে শবিস্থ  
স্তরে এসে পড়ে, এবং তাতে বাইরের রঙের গালিস  
থানিকটা লেগে যায়। কিন্তু ঐ রূপ ও স্রব এদের প্রাণের  
ভেতরেই প্রচ্ছন্ন থাকে, রসজ্ঞ পাঠকচিহ্নের সম্পর্কে এলেই  
তারা মূর্ত হ'য়ে ওঠে।

আমি এবার হয়ত আশা করিতে পারি যে নিছক  
বর্ণনাকে ছবি এবং নিছক শব্দচাতুর্যকে আর কেউ সঙ্গীত  
ব'লে নিচ্ছেন না—আমি ব'লছিলাম প্রাণ-বর্ধনের কথা  
(সঙ্গীত ও চিত্রের) বাদেই যুগপৎ সংযোগে কাব্য রসায়িত  
হয়। এবার দৃষ্টান্ত দিই—

কত বাতুলের পাখা, বাপটি তরু শাখা,  
গতি করি বাঁকা ব্যক্তিগা যায়—

কত বা বন বিভাল, লাক্ষ্যে উঠি ভাল,  
ক'য়ে মূঠের মাল, লাক্ষ্যে যায়।

গর্জন শ্রুতিকট, হইল সিকট,  
গোমুগ কটপট বেজে আড়াল—

কত বা কোপলাড়, কবিয়া কোপলাড়,  
পালায় ছুড়ায় মুগের পাল।

—বিজ্ঞানশ্রদ্ধা ঠাকুর।

পড়ি জলনীলে, ধবল সৌখ্যছবি,  
অমুকরিছে নত অঙ্গন—  
মৃগ মৃগ বাহী এবাহ তোমার  
দেখিল কত শত ঘটনাও।

কত নর-পজরে, নির্মিল উহারে,  
শোষি শোষিত মৃগ কোষে—  
দর্শাইতে সব দর্শক লোকে  
প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

—গোবিন্দ চন্দ্র রায়

উক্ত কবিতাংশ দুটির মধ্যে প্রথমটিতে কেবলমাত্র  
ছবিকে আশ্রয় করে রস সৃষ্ট হ'য়েছে, আর দ্বিতীয়টিতে  
স্রবের মারফতে ছবির ভেতর দিয়ে রস সৃষ্ট হ'য়েছে—  
কাজেই প্রথমটিতে অরব্যের প্রত্যেক রূপকেই প্রশংসা  
করে, তার পেছনে অন্ধকার রহস্তময় একটি ছুঁচোপের বান  
সংযোগ করা হ'য়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে কবির চিত্র  
মুকুরে যুগ্মসংবাহী যমুনার প্রবাহ ও তার স্রব জটিল  
বহু সভ্যতার উত্থান পতনের যে সমস্ত চিত্র ছায়া বেলুণে,  
তার ওপর এসে পলি তাঁর অন্তরের প্রাকলজ ভাবমূর্তি—  
জীবনের নবরতা, দুর্জলের ওপর শক্তিমানের অত্যাচারে  
বিকল প্রতীতি প্রভৃতি; তারপর পূর্ববৎ প্রকিয়া  
কাব্যের জন্ম হ'য়েছে। তাই প্রথম কবিতাটিতে  
প্রাণসম্পদ 'অস্পষ্ট' এবং দেহ-সম্পদ প্রচুর—তার  
কিছুটা ক্ষতি পূর্ব হ'য়েছে; একটা mood সৃষ্ট হ'য়েছে  
কিন্তু সেটা আগাগোড়া স্বত-স্বত কিনা সংঘ;  
আর দ্বিতীয়টি একটি উঁচুদরের কবিতা।  
অর্থাৎ এখানে দেহ ও স্রব, তবে ও অমূল্য  
অপূর্ণ সমন্বয় সাধিত হ'য়েছে—একটি সমগ্রতার আবে  
আছে, যা আগাগোড়া কবিতাটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছে।  
তাই এতে সঙ্গীত আছে, চিত্র আছে—আবার এ দু'য়ের  
সমন্বয় লোকাতীত একটি বিচ্ছিন্নতার বাক্য  
পড়ে উঠেছে। তাই যমুনা, তার জীবন্ত  
রাজগৌরব ও তাজমহলের আপাতসৌন্দর্য

অতিক্রম ক'রে পাঠকের চিত্ত ধ্বংসনীয়  
নির্বচি কালের অগ্রগতির আভাস পাচ্ছে—তার  
কৃষ্ণ শায়ে দিয়ে বাস্তবের এই বিপুল পৃথিবীর বাস্তবীয়  
গৌরব ও গরিমাগুলি ভেঙেচুরে ভেঙে হ'য়ে পড়ছে—  
প্রত্যেক প্রেরণা আসছে যে বাস্তব অবস্থা থেকে, তার মধ্যে  
কোথাও এসবের ইঙ্গিত নেই। এ বস্তু-বর্ণ্য নয়, এই প্রাণ-  
বর্ধন ছিল কবির প্রাণে—তাই রূপায়িত হয়েছে এই ছবি ও  
স্রবের ভেতর দিয়ে—ফলে কবিতাটির মধ্যে এমন একটি  
বেজাভিমান উঠেছে, যাকে বাধ্য ক'রে বোঝানো যায়  
না। এরই নাম রস। প্রথমটিতে যে শব্দ-চাতুর্য আছে  
রাকেই আমি প্রশংসা ক'রেছি ভাববেন না—তাহলে  
যদি সমস্ত দৃষ্টান্ত চরকা, দু'য়ের পালা, কুহুম-পকাশ  
এবং জরদান ক'রানাম। যে গীতবর্ধ ও চিত্র

বর্ধনের কথা আমি ব'লছিলাম, তার কিছুটা ওর মধ্যে  
কোথায় যেন আছে ব'লেই কবিতাটা আগাগোড়া  
বর্ণনা হয়নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ যেন না ভাবেন যে আমি  
abstractionএর পক্ষপাতী। বহুপূর্বেই রূপহীন তত্ত্বকে  
আমি কাব্যের এলাকার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি—  
mysticism, symbolism, intellectualism প্রভৃতি  
বহু ismকেই বর্জন করে শেষ পর্যন্ত ত এই বাস্তব  
হ'য়েছে যে Romantic idealism বাস্তবীত শিরিক  
কবিতা হয় না—শিরিক কবিতার প্রাণ এবং প্রকৃতি  
নিয়মে যথেষ্ট আলোচনা হ'য়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে তার  
প্রাণকে বাক্যসম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে আমরা 'রস ও  
রীতি' শেষ করলাম।

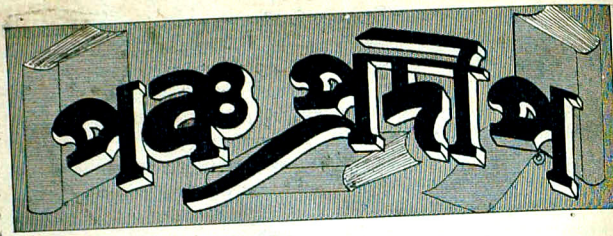
## বাস্তব-মন্দিরে

শ্রীঅমলেন্দু অধিকারী

পূর্বার শুভ রাজি বাঙালি-মন্দিরে  
বিশেষ পূজার কথা—আলোকের ভীরে  
সদা আসে—গোষ্ঠ-গামী রাখালের দল  
যে-মুখের হয়ে ফিরে আসে শান্ত অতল  
হুত্রে শুভ সুবাসিত মেঘ-লোক খিরে  
রূপ-পাণী-লব ফিরে আসে নীড়ে  
নীলান-মুখি ও চন্দ্র সূত্রে ওঠে হীরে  
জগৎ-মুখের মন্দিরের শিরে।  
পূজারতি বেজে ওঠে পূজারী সে সৌম্য ও স্নেহ  
সুখে তার আনন্দের ছবি  
ফনা-উজ্জল চোখে মন্দিরের বাতায়নে ঘুরে  
কুসুম করে পান—কি বিচিত্র স্রব  
ফুরে বীণা গীণা। মহসা অপুরে  
আচার্যের উচ্চ-কণ্ঠ পশে কর্ণপূরে  
ফিরে আসে—মন্ত্র কণ্ঠে শুভাল আদেশ  
সে কথা কটমি অতি-পূজারতি হবে যবে শেষ

সমাদৃত হবে বিপ্র—অম্পশ্যের নাই অধিকার  
একথা তুলিল মনে করণ দারুণ হাহাকার।  
রাজি হলো ঘন আরো খেনে গেলো পূজার আরতি  
পূজারী দেবীর পদে ধীর-হস্তে জানার প্রণতি।  
বাহিরে প্রচুর বিপ্র—বাঙালির প্রাসাদের আশে  
আর দূরে গু—ওই দূরে—বাখা-ভরা চোখ ছাউন  
অশ্রম-সাধারণ-বক্ষে—সে মিনতি-খানি  
অমঙ্গল-ছায়া আনে মঙ্গলের সমারোহে টানি  
সব কথা গেলো ভুলে—তোলা-মান সৌন্দর্যের প্রাণী  
“এসা রাশী পূজা দেবে” শিখে যেতে দিল হাত-ছানি  
সহসা পিছনে যেন রাশীর করণ-কণ্ঠ-চিরে  
“রক্ষা কর” ছুটি কথা হানা দিল ভাবমূর্তি  
পিছনে ফিরিল কবি—শেষের নিষ্ঠুর নরপতি  
শিখা দেয় অম্পশ্যার—সমাজের স্বয়ংস্ব অতি।





## ওত্তর প্রেমিক

ম্যাক্সিম গোর্কী

গল্পটা ব'লেছিলো আমারই এক বন্ধু—  
মস্তোতে যখন পড়ি তখন একবার একটি মেয়ের  
সংসর্গে আসতে হ'য়েছিলো। তার গিরির সন্দেহজনক  
ছিলো। গোলাওগাসিনি সে—নাম টেরেসা। লম্বা-  
চওড়া শঙ্কসামর্য তার চেহারা, বড় কানো, কালো ঘন  
তার ক, কঠিন মুগাকৃতি—যেন কুড়ুল দিয়ে খোদাই  
করা। তার কালো চোখের বিস্তীর্ণ দৃষ্টি, তার মোটা ভারী  
শর, সহস্রাব্দের মত তার চালচলন, জেলেনীর মত পেশল  
শরীর আমার মনে ভিত্তির সঞ্চার করতো।

আমি থাকতাম সর্বোচ্চতলার একটা ঘরে—তার  
সামনের ঘরেই সে ছিলো। সে ঘর আছে জানলে  
আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধই রাখতাম—অন্য তার  
বিশেষ যে প্রয়োজন হতো তা নয়। মাসেক যাকে  
সুচিভিত্তি বা উঠানে দেখতে পেতাম। সে আমাকে দেখে  
কুটিল ঠাঁইর হাসি হাসতো। মদ খেতেও তাকে মাঝে  
মাঝে দেখতাম—তখন তার চোখে জল আসতো—চুল  
ছড়িয়ে পড়তো—হাসতো বীভৎসভাবে; যে সময় আমার  
আমার সঙ্গে কথা ক'হতে আসতো, “পাড়ুয়া-বাবু! আছেন  
কেন?”—তার নির্দোষ হাসিতে আমার রূপাই  
হোতো। এক এক সময় মনে হোতো বাসা বদল করি  
এইরূপ অস্বাভাবিক হাত থেকে রক্ষা পেতে, কিন্তু আমার  
ছোট দরজা ছিলো বেশ—জানলা দিয়ে দেখা যেতো  
চন্দ্রাবতার ছবির মত দৃশ্য—রাশুটিও ছিল নির্জন—তাই  
সহ ক'হেই ছিলাম।

একদিন সকালে কৌতুকে ভয়ে ওপর দিকে চেয়ে নিজে  
মনে ভ্রাসে যাইনি কেন তারই নানারূপ বৃথা ওজর দেখছি  
—হঠাৎ দরজা খুলে টেরেসা ভারী গলায় চৌকটি খেতে  
বললে:—“আপনার স্বস্তি স্বাস্থ্য কামনা করি, মশায়!”  
“কী চাও?” ব'লে তার বিব্রত ভাব দেখে বুঝল  
যে যেন কিছু অস্বস্তি করবে। এমন ভাব তার দৃষ্টি  
একটা নজরে পড়ে না।  
“আপনার অস্বস্তি ভিক্ষা করি—দেবেন কি?”  
নিজের মনে নিজেকে সাহস দিয়ে চুপ ক'রে পাঁচ  
দইলাম।

“আমি বাড়ীতে একটা চিঠি দিতে চাই—এই মার্চ,  
তার শুরুে অনুন্নয়, কমনিয়তা ও ঊর্ধ্ব  
বৃদ্ধপত্র প্রকাশপেদো। মনে মনে তার মুগুপত রক্ত  
আমি লাকিয়ে উঠলাম। টেবিলে গিয়ে কাগজ নিয়ে  
বসে বসলাম, “এখানে বোসো, কী লিখতে হচ্ছে বোনা  
অত্যন্ত সতর্ক-সঙ্কোচের সঙ্গে একটা চেয়ারে বসে বোনা  
মত সে আমার দিকে চেয়ে দইলো।

বললাম “কাকে লিখতে চাও?”  
“বোলসাত ক্যাপুটেক—ওদার ম রোড—মুসি  
জিয়ানা সহরে থাকে সে।”  
“ব'লে খাও.....”

“প্রিয় বোলস, প্রিয়তম—বিশ্বাসী প্রেমিক আমার  
ঈশ্বর-মাতা তোমার দক্ষা করুন। তোমার চেয়ে  
দুঃখ, তবু কেন ভুসি আমাকে এতদিন ছাখ বিসে—

শ্রাবণ—১৩৪২]

ম্যাক্সিম গোর্কী

শ্রাবণ

কেন তোমার চিরহুঁসী ছোট “বুদু”টাকে কিছু লিখলে না!  
টেরেসা।

আমি হেসে কেলি আর কী! “হুঁসী ছোট বুদু!”  
বুদুই বটে! পাঁচ ফিটের বেশী লম্বা.....পাখরের মত  
মুঠো—ভারী কালো.....বুদু!! মনে হয় “বুদু”টা  
চিনীরা মধ্যে সারাজীবন কাটিয়েছে.....চান করতেও  
কুলে গেছে। কোনো রকমে হাসি চেপে জিজ্ঞেস  
করলাম:—

“বোলটে কে?”  
“বোলস মশায়, বোলস”—ভুল ক'রে “বোলটে”  
বলার তাকে যেন ক্ষম করা হয়েছে।—“আমার বালক-বন্ধু  
বোলস।”

“বালক বন্ধু!”  
“আচর্য্য হচ্ছেন কেন?—আমার মত বালিকার  
একটা বালক-বন্ধু থাকতে নেই?”

টেরেসা বালিকা! বেশ!! বললাম:—  
“কেন থাকবে না?—সবই সম্ভব। বেশী দিন কী  
সে তোমার বন্ধু ছিলো?”  
“ছ বন্ধুর।”

“ও বেশ! এখন তোমার চিঠিটা লেখা বাক!”  
মতি কথা বলতে কী, এই বোলসের সঙ্গে আমি  
আমার অবস্থা পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলাম যদি  
টেরেসা একটু অস্বস্তি হতো।

টেরেসা নত হ'য়ে বললে “আপনার এই দয়ার জন্মে  
আমি আশ্চর্য্যিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনার  
কর্ম কাজে লাগতে পারি কী?”

“নিশ্চয়! আমারও ধন্যবাদ নাও এজন্মে।”  
“হয়ত আপনার মার্চ বা পাজামায় একটু অধটু  
সেলাই প্রয়োজন।”

আমি বেশ বৃত্তকে পরলাম যে এই পেটিকোট পরা  
মেটো আমাকে লজ্জার লাগু ক'রে দিয়েছে। বেশ  
কঠোর ভাবেই তাকে জানিয়ে দিতে হোতো।  
তার কোন প্রতাপকারের প্রয়োজন আমার নেই।  
সে চলে গেলো।

ছ তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। সন্ধ্যার সময় আমি  
ব'লে ব'সে শীঘ্র দিচ্ছি আর ভাবছিলাম আশ্র-বিচার  
থেকে কী ক'রে অস্বাস্থ্য পাওয়া যায়। আমার কিছুই  
ভালো লাগছিলো না। বিস্তীর্ণ আবহাওয়া—বাড়ীর  
বাইরে যাবার প্রবৃত্তি নেই—ক্লান্তি বশত: আশ্র-বিরোধে  
নিমগ্ন ছিলাম। ভালোও লাগছিলো না—অল্প কিছু  
করতেও ইচ্ছা ছিলো না, হঠাৎ দরজা খুলে কে যেন  
চুকলো।

“আপনার কোন কাজ নেই মনে হচ্ছে.....”  
আবার টেরেসা। উঃ।  
“না, কী চাই?”  
“আমাকে আর একটা চিঠি লিখে সেন যদি.....”  
“বেশত! বোলসকে বুঝি?”  
“না, এবার তার কাছ থেকে আমাকে।”  
“কী?—?”

“আমার বোকামি হয়েছে মশায়.....আমাকে নয়,  
ক্ষমা করবেন। আমার এক বন্ধুর জন্মে—না ঠিক বন্ধু  
নয়—পরিচিত, পরিচিত বন্ধু—তার এক প্রেমিকা আছে  
আমার মতো, তারও নাম টেরেসা, এই মার্চ। আপনি  
দয়া ক'রে চিঠিটা লিখে লেবেন বাবু?”

আমি তার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করলাম—তার আশ্র-  
ভুলো কাঁপছে। প্রথমে আমি ধীরে গিছলাম—পরে  
ব্যাপারটা বুঝ হ'য়ে গেলো। বললাম—

“দেখো, আমি বুঝেছি বোলস বা টেরেসা ব'লে  
কেউ নেই।—তুমি আমাকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথো বলছো।  
আমার এখানে আর ঘুর ঘুর করতে এসো না।—তোমার  
সঙ্গে পরিচিত হ'তে আমার আপত্তি ইচ্ছা নেই,  
বুঝেছো?”

হঠাৎ সে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠলো। সে  
চলে না গিয়ে এক পা থেকে আঁচু এক পায়ে নিজের  
দেহের ভার পরিবর্তন করতে লাগলো।—কী বলতে চায়  
অথচ বলতে পারছে না এমনিই তার ভাব। শেষ পর্যন্ত  
কী দেবতার জন্মে “আমি আশ্র-বিচার করেছিলাম।  
বুঝলাম যে সে আমাকে আমার জায় গ'লে থেকে উঠে



করতে চাচ্ছে এমন সন্দেহ করা অন্তর্য হয়েছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে সে তা চায়নি।

“বশ্যই” বলে কী বলতে গিয়ে হঠাৎ দরজা খুলে সে বেরিয়ে গেলো। মনের মধ্যে দীর্ঘস্থির হয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে বসেছিল। তার ঘরের দরজা বেশ বেগেই বন্ধ হ’তে শুনেলাম—স্পষ্ট বুঝলাম বেচারী ভয়ানক চটেছে। তার কাছে আমার মাথা উচিত ভাবলাম, কী লেখাতে চায় থেকে এনে লিখে দেওয়াই উচিত বিবেচনা করলাম।

আমি তার ঘরে ঢুকে দেখি সে হুহুতে মাথা ধরে টেবিলের সামনে বসে আছে। “শোনা” বলতেই সে তার আসন ছেড়ে চমকে লাফিয়ে উঠলো। চোখ চুটো তার জ্বলছিলো। সে আমার কাঁধের ওপর হাত দিয়ে মোটা স্বরে ফিস ফিস করে বললো :—

“শোনা—বোলেশ বা টেরেসা? ব’লে সত্যিই কেউ নেই। কিন্তু তাতে তোমার কী? এক কলম লিখে দেওয়া কী তোমার পক্ষে এতই শক্ত ব্যাপার? শেষে তুমিও.....তোমার এমন স্বপ্নের চুল.....বোলেশ নেই—টেরেসা নেই.....ভুলে ত? তোমার খুব কাছে লাগলো এ ভুলে?

তার কাছে এ রকম অন্তর্ধান পেয়ে হতভম্ব হ’য়ে গিয়ে বললাম “কমা” করো। ব্যাপার কি? বোলেশ নেই?”

“না, নেইই ত.....”

“টেরেসা নেই?”

“না, আমিই টেরেসা”

বুঝলাম না। তার দিকে চেয়ে ভাবছি কার মাথা পাগল হয়েছিল—ওর না আমার, সে টেবিল হাতড়ে কী একটা এনে ক্ষুণ্ণ স্বরে বললো :—

“এই দেখো তোমার চিঠি। বোলেশের হ’য়ে তোমার লিখতে যদি এতই কষ্ট—অপরে লিখে দেবে।”

আমি দেখলাম আমি বোলেশকে যে চিঠি দিয়েছিলাম সেটা! বদলায় :—

“শোনা টেরেসা.....এ সবের মানে কী? আমি তোমাকে যখন লিখে দিয়েছি, অপরে লিখবে কেন? পাঠাওনি যে ওটা?”

“কোথায় পাঠাবো?”

“কেন বোলেশের কাছে।”

“বোলেশ বলে কেউ নেই”

সত্যিই আমি এ সবের একবর্ণও বুঝছিলাম না। এ সব নোংরামী থেকে ব’রে পাড়ানো ছাড়া কী করতে পারি! এমন সময় সে ক্ষুব্ধ করে বললো :—

“কী ব্যাপার ভুলতে চান? বোলেশ বলে কেউ নেই।” হঠাৎ সে তার হাত ছুঁতে দিয়ে এমন এক তরী করলো যার মানে এই যে—কেন যে বোলেশ নেই তা সে নিচ্ছেই জানে না, সে বলে চলেলো—

“কিন্তু আমি তাকে চেয়েছিলাম। আমি কী অপরে মত মানব নই? জানি, জানি; কিন্তু তবু কারও কোন কতি হ’তো না আমি যদি তাকে লিখতাম।”

“কিন্তু কমা করো.....কাকে আর লিখবে?”

“বোলেশকে বলছি”

“কিন্তু বোলেশ বলে যে কেউ নেই.....”

“হায়, হায়! কিন্তু তাতে কী? সে নেই কিন্তু থাকতে ত পারতাম। আমি তাকে লিখি কেন সে আছে। আর আমি? সে আমাকে লিখতো আবার আমি তাকে লিখতাম।”

ব্যাপার বুঝতে পেরে লজ্জিত কুণ্ঠিত হলাম। আমারই পাশে হাত ছয় হ’লে একজন থাকে—তাকে এ দুনিয়ায় এমন কেউ নেই দয়া করে—তার প্রতি দয়া ব্যবহার করে। তাকে ভালোবাসতে কেউ নেই—তাই এক বন্ধু সে সৃষ্টি করে নিয়েছে।

সে বলল, “শোনা, তুমি আমার হ’য়ে বোলেশকে লিখে দিয়েছিলে, আমি সেটা অপরে দিয়ে পড়িয়ে দিই, যখন সে পড়ে তখন আমার মনে হয় বোলেশ আছে। আর আমি তোমাকে বলেছিলাম বোলেশ নেন টেরেসাকে লিখছে এমন চিঠি দাও—নাহে বোলেশ আমাকে লিখছে। যখন কেউ এমন চিঠি দেয় তখন নিশ্চিত ভাবি যে

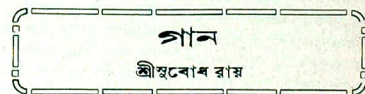
বোলেশ আছে। এমন ক’রে জীবনটাকে সহনীয় ক’রে তুলি।”

এর কথায় নিজেকে নিরীধো ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলাম না। তারপর থেকে সম্ভ্রমে ছুবার নিয়মিত ভাবে আমি চিঠি লিখে বিতান, একটা টেরেসার কাছ হ’তে বোলেশকে আর একটা বোলেশের কাছ থেকে টেরেসাকে। উদ্ভবগুলো বেশ ভালো করেই লিখতাম। সে এগুলো শুনে সুপ্রিয়, চাঁৎকার ক’রে কাঁদতো, কারনিক বোলেশের কাছ হ’তে এমনই প্রাণবন্ত চিঠি দিয়ে তাকে কাঁদাতে সে আমার জামার, মোজার, অজ্ঞাত গোষকের ছেঁড়া শেলাই ক’রে দিতো। এমনই ভাবে তিন মাস চলবার পর তার জেল হয়—কেন জানি না। এতদিন সে কেঁচে নেই।”

বন্ধু সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে মান ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে শেষ করলো :—

জীবনে যে যত দুঃখ পেয়েছে—স্বপ্নের আশায় সে তত ব্যাকুল হ’য়ে পড়েছে। আমরা ধর্মের বোলসের মধ্যে থাকি—পাপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখি—ব্যাপারটা বুঝি না। সমস্ত ব্যাপার বোকামী বা নিন্দার তার চরম হ’য়ে পাড়ায়। আমরা বলি “পতিতা” কিন্তু কারা পতিতা জানতে পারি কী? তারা আমাদেরই মত রক্ত মাংসে গড়া। এ কথা বুঝে পর বুগ ব’লে আসছি। শুনে বাই—কিন্তু সত্যতাই জানে ব্যাপার কী? মস্তাফিরের গর্বে, ধর্মের নামে আমরা একেবারে গেছি, সত্যি কথা বলতে কী আমরাই “পতিত”। মনে হয় আমরা আত্মগুরিতা আর আত্মজ্ঞাতের গর্বে পড়ে আছি। বাগ্গে, এ গুলো পাহাড়ের মতই পুরাতন। এ মরুতে কথা বলা এখন লক্ষ্যের ব্যাপার! পুরাতন—অতি পুরাতন !!

• ম্যান্নিম গোষ্ঠীর “Her Lover” গল্পের অম্বাবাদ।  
অম্বাবাদ : শ্রীমোজ রায়



তাই বুঝিগো চলার পথে

আমায় তুমি ক’রলে একা?

তোমার সাথে নিরালাতে

হ’বে আমার প্রথম দেখা।

বন্ধু ছিল নিলে কাড়ি,

সখী যারা গেল ছাড়ি,

অন্তাচলের শিখর আড়ে

জুড়লো দিনের আলোক রেখা।

রাষ্ট্রপদে দাঁড়িয়ে আছি

আঁধার পারাবারের কুলে,

আলোর খেঁরা বেয়ে কবে

নেবে তোমার চরণ মূলে।

সেই আমাদের মিলন কবে

জানবে না কেউ ত্রিভুবনে,

প্রাণের আলোয় পড়ব ধোঁহে

সৌহার গোপন প্রণয়-লেখা।



# আইটাল জাটিকা

বিরূপাক শর্মা

“অর্দ্ধাঙ্গিনী”—অপরাজিতা দেবী

ভারতবর্ষের উৎকর্ষের উপর যে কল্পনাময় প্রভাব (কল্পনাময়ী নয় ?) অপ্রতিহত গতিতে লেখনী-রূপ হল চালনা করিয়া চলিয়াছেন, ‘অপরাজিতা দেবী’ তাদের অঙ্গভঙ্গ। সভ্যকথা বলিতে গিয়া, তাঁর হাতখা লেখাগুলি মাঝে মাঝে আমাদের ভুলই লাগিত। পুত্র আবার মনে ভাবতবলি কিন্তু ‘অপরাজিতা দেবী’ দেখা দিয়াছেন “অর্দ্ধাঙ্গিনী” রূপে। এক স্থানীয় কবিতায় তিনি ‘অর্দ্ধাঙ্গিনীর’ তিমি রূপ—সব, সচিব ও গৃহিণী অভিত করিয়াছেন। নব-পরিশীলিত প্রী যামীক একান্তভাবে পাইতে চায়, তাকে দেখার সমীক্ষণে কাছে কাছে রাখিতে চায়, এবং যামীক অপর সমীক্ষা নিম্না করিলে নব-পরিশীলিত প্রী মনে যে ভাবের উদ্ভব হয়, সেমিকা ‘অর্দ্ধাঙ্গিনীর’ সানী’তে সেই ভাবটা চুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—

“মিষ্টা ভিত্তি বেল ঠিক  
বর তাদের বৈবাহিক

বেলা-মুখে বেশেবনিকা মোটে এক রঙি।”

বেশ লাগিল একটু, কিন্তু তারপর রোমাঞ্চ যখন আর থাকে না, যৌবনের প্রথম জোয়ারের যখন ভাটা পড়ে তখন নব-যুগ যখন জগৎ হইতে যাবৎ জগতে মামিয়া আসে। অর্দ্ধাঙ্গিনী তখন সচিব-রূপে যামীকে উপদেশ দেয়—

বেলা আটটার ভালভাত পেয়ে ছুটী  
ট্রেস বরবার জগতে চুটীছুটী।  
রাত আটটার ফেরা কলভাতা থেকে  
এতে কি কখনো শরীর বাঁধা টেকে ?  
কাজ দেই আর চাকরী করে।”

তার চেয়ে—  
সচিব অর্দ্ধাঙ্গিনী একটা কারবার পুণিবার এবং সংসারের পরত  
কম্বার পরামর্শ দিতেছেন—

“এই বাড়ীর যদি ভাড়া বাও আশখানা  
খোটা কুড়ি টাকা ঠিক পাওয়া যাবে।  
মনে জোর নিয়ে লাগো, নিশ্চয়ই হবে।  
এই মনে থেকে করো ঠিক-ঠাক ভাব।”

“অর্দ্ধাঙ্গিনী” গৃহিণী হইতে পারিয়াছেন, এ গৃহই যথেষ্ট কণা; শূন্য কাগজ মতো অথবা সংসারের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে, যামী দেবতার নিকট নিরুত্তর নিরাশ্রয় এই ধরণের উপদেশ বিতরণ করাই শোভন হইত। ছড়া তুমিবার আরও ভারবহনের পাঠকপণের পূর্ব বেলাই এই বলিয়াই মনে হয়। আর ছড়া তুমিবার আরও বেশিকার একটু কম হওয়া উচিত। তাতে আর যা যোগ্য আর না যোগ্য, অস্ত্রতপকে কাব্যলক্ষী হাঁক ছাড়িয়া বাঁচেন। পুত্বে কবিতা জিহ্বা পাঠকের কাছে হালকা হওয়ার হাত হইতে বাঁচবার কোন উপায় বাজলার “শ্রমের বৈয়াম” নরেন্দ্র সেন “অর্দ্ধাঙ্গিনী” কবিকে বাতাসাই দিতে পারেন কি ?

আটের আশ্রয়তা

বহুবচন রসীকস্বরের ছন্দিত ‘আশিয়াছে। কবির শারীরিক অবস্থা ভাবসংসার রূপে ভাবই, মানসিক অবস্থা বাহ্যিক বলিয়া ভিনে নাই। আশিক অপরার কণা বলিতে বেলা বলিতে হয়, তিনি ‘সাজার হুলাল’, তাঁর কাব্য-প্রতিভার এমনও দশনিক বিভাসিত। তথাপি তাঁর ছন্দিত উপস্থিত। তাঁর শব্দকে ‘অবশ্যের কীর্তীনা’র দল গাঁদি দিয়া মাঝিবার বড়ুয়া করিয়াছে। আটের এক শব্দের নিরস-শিরাজে সুপক্ষে কেহিয়া তাঁর কাব্য সাহিত্যকে নৃপথভাবে যেন ‘উই-জ্বাই’ করা হইতেছে।

আমার কণা যদি বিধাস করিতে পাঠকপণের একটুও বাণে তাহা হইলে বলি, ‘তারা এই অকুলস্রোত ও অকুল মাঝিহা-মথার অঙ্গভঙ্গ নহেন। আপনারা জোড়ের “মাসিক বহুসতী” পড়িয়াছেন কি ? ইহাতে প্রকাশিত ছুঁশামি রচিন তিন শিল-করার দিক

শ্রাবণ—১৩৪২]

বিরূপাক শর্মা

আজ

দিয়া একবারে মৌলিক। একাধিক আঁকিয়াছেন শিল্পী হিসাবে বহুসতীর মৌলিক আঁকিবার ষিঃ উদ্যোগ। শিল্পী আঁকিয়াছেন—  
“বোটা ইংরেজার, গামা পালোয়ানের মত ফুল দেখি, শাড়ী পরিচিতি, এক স্নেহ স্নেহে পশ্চিম দেশীয় গায়ত্রী ভরিতে আঁকিয়া পাঠকপণের মত বসিয়া টেটি চালিয়া ছাটতেছে। ছবিদামির নাম দেওয়া হইয়াছে “কুয়ার ধারে।” কুয় হইয়া থাকিলে আরও উপায় অত্যাচার করা হইত না। কিন্তু “বহুসতী” বহিঃ রত করিয়া ইহার নীচে রসীকস্বরের ছুঁশামি লাইন, বসাইবার জোড় মামলাইতে পারেন নাই। বোটা ইংরেজির নীচে:

“তোমায় লিখে পেরেছিলাম  
একটু তুমার জল  
এই কথাটি আমার মনে  
রহিল সখল।”

লাগাইয়া দেওয়ায় ছবির ইচ্ছাৎ একত্বিতও বাড়ি নাই, বরং রসীকস্বরের কবিতার ইচ্ছাৎ নষ্ট করা হইয়াছে।

ছবির ছবিদামির রসীকস্বরের

“শীতের কালো জলে  
সাঁঘের আলো কলং”

এই ছুঁশামি লাইন অলংঘন করিয়া আঁকা হয় নাই, যা তা বসনের একটু ছবি আঁকিয়া তার নীচে এই লাইন ছুঁশামি ছুঁশামি করিয়া হইয়াছে। শিল্পী—আর, মুখাঞ্জী। তিনি আঁকিয়াছেন—  
স্বপ্নার মৌলিক কালো জলে এক কলমস্বরের, বোম্বের মালেকের গোমস্তা, বিশ্বতবোধনা নারী পিছন করিয়া ও গৃহস্থে বসিয়া শাড়ী তৈরি নিখাইতেছে। শিল্পীর দৃষ্টে এই কলমস্বরের নারী পিছন ছবির সৌন্দর্য্য মৌলিক কালো জলে আঁকিত। “বহুসতী” এই শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধন আমাদের তারিখী কবিরাজের মৌলিকস্বরে মত অপর।

চিত্রকলার নামে এই সব অশুভ ‘অপক-রস’ (কীটকলা) “বহুসতী” মালেকের পর মাল ‘বিরচন’ করিয়া চলিয়াছেন আর মালেকের কলম-কৌশল দল তাহা গরম ভুক্তিতে রক্ত করিতেছেন। মালেক হইতে বিপদে পড়িয়াছেন কবি রসীকস্বরের। কখনো মালেক যেন মালেকের ‘পায়ের জোতা, কখনো অধ্যাতনামা শিল্পীর বৃষ্টিভিত ছবির নীচে ফেলিয়া থাকে কী মালেকাঙাই ন। বলা হইতেছে।

আটের বরি সভাকার ‘স্রাণ থাকিত, তাহা হইলে যেন বোম্বের ও অশ্রম হইতে স্রাণ পাইবার জগৎ আঁকিয়া কবিত।

শিল্প ও সাহিত্যের আঁট মাঝিলেও চিম্টি কাটিয়া পালান করার আঁট “মাসিক-বহুসতী” জ্ঞানেন। সমাজ-তাত্ত্বিক দল

সম্পর্কে “মাসিক অঙ্গদে” আলোচনা করিতে মামিয়া মালেকাধী কেমন করিয়া পলায়ন করিয়া বাঁচিলেন পাঠকপণ তাহা ‘জোড়ের “মাসিক বহুসতীতে” দেখিতে পাইবেন। “বহুসতী” বলিয়াছেন “উহা (মামা-জোড়ের) এদেশে চলিলে বিমর্ষা ঘটবে।……এ সকল কলার আলোচনা করার স্থান এখানে নাই।” অর্থাৎ আলোচনা করার শাস্ত্র “বহুসতী” নাই। তাই বৃষ্টি—

“জগৎ থাকিতে মরণ কি ভয়  
নিম্নেবো বোজন ফল।”

শুধু নামকা ওয়াতে!

বি, এ, পাশ করিয়া ছবিদামির যল হইল একটা নতুন কিছু করিতে হইবে। নতুন কোন কিছু আঁকিবারে মত মস্তিষ্ক না থাকায় ছবিদামির ঠিক করিলেন ‘পত্রিকা’ পুস্তক ছাপার ধরণে নাম প্রকাশ করা চাই। এই পত্রিকা মালেকের দিলে কোন না কোনো ‘অশ্রম-ভাণ্ডার পত্রিকা’র লেখা ছাপায়ে ছাপায়ে দল, মালও আঁত দলকে জারির হইয়া যাইলে। অতএব ছবিদামির পর নিদিবার জগৎ কলম ধরিলেন।

পাঠকপণ বোধো ধারণ করণ, আমি যার বলিয়া আপনাদিগকে মহাপত্রিকাতে লিখিতে চাই। না। ঘটনাসী, নতুন এবং এই ঘটনা (“ছবিটকা” বলিলে ‘আইন চোপ রাঙাইতে পারে’) ঘটাইয়াছেন ছবিদামির দলপত্র, বি, এ। ব্যাপারটা আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলি—“বিরচন” শ্রীমন্ত ছবিদামির দলপত্র নামক জৈনিক বি, এ, পাশ করা ভুলকালে একটু বসি নিদিবার ছেলে ‘আশার কণা, ভরলোক ধরার ছলে আমাদিগকে “বিশার যামী” শুমাইয়াছেন। এই বিশার যামী পর যার তিনি সত্য সত্যই যামী ছায়া হইতে বিদায় লয়, তবে মা ভাড়ী তাঁর সখ্যের অধ্যাকার হইতে অধ্যাহতি লাভ করিয়া হাঁক ছাড়িয়া বাঁচেন, আটের আঁচিলাখানিও জগৎ-মুক্ত হইয়া উই ও আঁচিলায় উপলব্ধ হইতে পারা যায়।

ছবিদামির লালু ধরনের যে কাহিনী খাঁটিয়াছেন তাহা পাঠক-পণকে পরিচয়ন করিয়া আর উভায়িগের অকট ধরাই ন।; তবে এক আঁট মনুমা বোমাইয়ার জোড় মথণ করিতে পারিতে ছিল, অশ্রম সেমজ উপস্থিত বোমাইয়ার জোড় মথণের নিকট কমা চাইতেও রাণী থাকি।

“……শুল ছুঁশামি পর তাদের এক সঙ্গে দাঁড়াই, একসঙ্গে বেড়ানো।” শুধু রাস্তে কয়েকটা যটা—তাও সকল দিন না—তাদের ছুঁশামি নব সময় একই সঙ্গে দেখা যেতো।”

ভরলোকের ভাণ্ডার কেরামত এই খানেই শেষ হয় নাই। আরো একটু মনুমা লেনন:









নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, আশা ও নিরাশার ঝঞ্ঝের ভেতর অবশেষে লীগ খেলার অবদান হয়েছে এবং গেল বছরের লীগ-বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং এবারও লীগ-চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাদের পূর্ণ গৌরবকে অক্ষত রেখেছে। ভারতীয় দলের ভেতর লীগ-চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব সর্বপ্রথম মহামেডান স্পোর্টিংই অর্জন করে পর পর দু'বছরই এই ভারতীয় দল সে গৌরবকে অব্যাহত রাখায় কলিকাতার লীগ খেলার ইতিহাসে এ হয়েছে এক নতুন রেকর্ড। এই নতুন রেকর্ড সৃষ্টিতে প্রত্যেক ক্রীড়ামোদীই স্বপ্নী হয়েছেন! কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার বিকাশ হয় না। তার যথেষ্ট কারণও



উপরে—(বামে) হুমিদ  
(মহামেডান স্পোর্টিং)  
উপরে—(দক্ষিণে) লাক্ষ্মীনারায়ণ  
ঠিক খেলল  
নিচে—মাসিম  
ঠিক খেলল

রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে সক্রিয় জাতীয়তা বোধ। এদেশের মুসলমানদের এমন আনানকই আছেন, যারা এখনও স্বপ্ন দেখেন যে, প্রসিদ্ধ তুরস্ক দেশের আদিনি অধিবাসীদের রক্ত তাদের শরীরে উগ্ধবৎ করে বয়ে যাচ্ছে এবং তাদের পূর্ণ পুরুষ সুরতি অধুরী তামাক সেবন করে পারস্যের রাজতন্ত্র অলঙ্ঘন করে গেছেন। এদেশের ভাষায় কি তাদের ভাষা! মহান ফার্সিতেই তারা কথা বলেন। তারা কী করে তুচ্ছ ভারতীয় খেলায় আসবে। তাই মহামেডান নাম দিয়ে যখন ক্লাব হয়েছে এবং যখন সব খেলোয়াড়ই মুসলমান তখন ভারতীয় দল বলতে যে তাদের অপমান করা হয়। খেলার মাঠেও মহামেডান স্পোর্টিং-এর বিজয় সাফল্যকে জাতীয়তার ভেতর টেনে এনে মহামেডান স্পোর্টিং এর ভক্তবৃন্দ উন্মাদে গগন পবন মুখরিত করে বোঝাতে চায়, এ গৌরব শুধু মুসলমানদেরই এবং

## ক্রীড়াচার্য

মুসলমান রক্ত ওদের শরীরে ছিল বলেই এ জয়লাভ। নাচেং খেলার মাঠে সভ্যদের প্যালা-রীতে বসেও মহামেডান দলের জয়ে মহামেডান ভক্তবৃন্দ উন্মাদের যে নিকট নয়রূপ প্রকাশ করে থাকে সুপ্রসিদ্ধ নবীবাশ্বদের বলে গৌরব-বিত্তদের পক্ষেই যৌবন হয় তা সম্ভব। ক্লাব



মাঠ—লোক টা-আউট  
(কালকাস্টা)

কর্তৃপক্ষের ও এবাংগারে কোন নজর আছে বলে মনে হয় না।

যদি ইচ্ছা ও একাগ্রতা থাকে তা হলে আরও অসম্ভবও সম্ভব হয়।

## খেলোয়াড়

মহামেডান স্পোর্টিং তাই প্রমাণিত করেছে। মহামেডান স্পোর্টিং-এর রেকর্ড খুব ভাল ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধে এদল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। প্রথমার্ধে কয়েকজন ভাল খেলোয়াড়ও এদলে ছিল না। খেলার



নর মঞ্চের মোড়ার হাউস  
(ইউ বেঙ্গল)

দ্বিতীয়ার্ধে মহামেডান বেশ জোরের সহিত যেতে থাকে। তখন তাদের দল বেশ শক্তিশালী হয় এবং মহীউদ্দিন, বাস্তম, জুখা খা, কাহু খা



উপরে (দক্ষিণে) রমনা  
(ইউ বেঙ্গল)  
উপরে (বামে) দেলিম  
(আখশাখ)  
নিচে হুমীদ চ্যাটার্জী  
(মোহন বাগান)

প্রকৃতি তখন এসে পড়েছে। এদের একটানা বিজয় গতিতে বাধা পড়েছে ই, বি, আর, এরিয়াস ও কালীঘাটের কাছে। আর সব দল একবার না একবার পরাজিত হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ ইষ্টবেঙ্গল ও মোহন বাগান দু'বার করেই এদের কাছে হেরেছে এবং এই শক্তিশালী দু'দলকে দু'বার করে পরাজিত করে আট পয়েন্ট লাভ মহামেডানের চ্যাম্পিয়ন হবার অন্ততম কারণ। এদের কাছে এক বার বাধা পেলে মহামেডান চ্যাম্পিয়ন হত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই দলে বেলেছেন কাহু খা, মহীউদ্দিন, জুখা খা, বাস্তম, অফিল আমেদ, শাকী, আনাস, রহমত, রসিদ, হাবিব ও সেলিম। এদের মতে রহমত ও বাস্তমের খেলাই বরাবর ভাল হয়েছে। এক্ষা বেশ জোর করে বলা যায় রহমত এদলে না খেলে দলের অবস্থা অজ্ঞান হত।



ইউবেঙ্গল এক পয়েন্ট কম পেয়ে এরা রানাস-আপ হয়েছে। এক পয়েন্টের ব্যবধানে তিনবার এদল রানাস-আপ হল। চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিবারই এদের হাতের কাছে এসে ফিরে যায়। মনে হয় এতে এদের একটা অভিশাপ আছে।

স্নাক ওয়াচ সৈনিক দল তৃতীয় হয়েছে। শুকনো মাঠে নয়রূপ বাস্তমের কাছে সবুজ ইউরোপীয় দল তত সুবিধা কোন সময়েই কর্তে পারে না। বিশেষতঃ লীগ





লীগ-বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং

সাদাওয়া—রশিদ, সত্তর, সেলিম, মহাউদ্দিন, সাহিত হুসৈন, কুয়ামাম, বশীর, ফাজলুল্লাহ, বসিরা—খান, মাহমুদ, আব্দুল হক, রশিদ, জাকারিয়া, রহমত, এল এ রশিদ, আব্বাস, সারোয়াৎ, হুসৈন আলি মোহাম্মদ সন্তোষ—মাসিফ, আব্বাস, শিরাজী, কে বা জুহা খাঁ, ইয়াসিন।

খেলার সময়ে এবছর রুটি মোটেই হয়নি। তাই এরা তত সুবিধা কণ্ঠে পায়নি। ফরওয়ার্ড লাইনে এদের ক্যান্টনীর, রিচি, ও টুয়াটেই খেলা খুব চমৎকার হয়েছিল।

**কালীঘাট** লীগ খেলার প্রথমকে প্রধান স্থান অধিকার করায় এবং যে সকল খেলোয়াড় নিয়ে এ দল গঠিত তাতে খুবই আশা করা গিয়েছিল যে এ দল লীগেতে জোর “ফাইট” জনে, অন্ততঃ লীগের অনেক

উপরে স্থান পাবে। কিন্তু এদের চতুর্থ স্থান লাভ বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। এ দলের সাধারণ, মিচ্ছা, সিরাজুদ্দীন, জিব, প্রেমলাল, প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। গোলে এস, ব্যানাজির খেলা বরাবরই সুন্দর হয়েছিল।

**ই, বি, আর** দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে সন্ম-আগত। এরলে সামাদ, মোনা দত্ত, টি সোম, জি কার্ভে, স্পীক, প্রভৃতি খ্যাত-নামা খেলোয়াড় সকলেই খেলেছিলেন। এবং এ দল চ্যাম্পিয়ান মহামেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত



অলিম্পিকের ১মং আটীর-পত্র

করতে সক্ষম হয়েছিল। তবুও এদের স্থান এত নীচে হওয়া মোটেই গুস্তিকুল হয়নি।

**মোহন বাগান** এ বছর ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এবং প্রথমে এ দল খুবই ভাল খেলা দেখিয়েছিল। মোহনবাগান বাঙালীর গৌরবের বিষয়। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র মোহন বাগান সুপরিচিত। ব্যাকে মন্থক দত্ত, সেক্টার হাফে হানিদ ও বিমল মুখার্জি ফরওয়ার্ডে কে, ভট্টাচার্য্য ব্যতীত এ দলে তেমন নাম-করা খেলোয়াড় এবছর কেহই ছিল না। তবুও এ দলের খেলা হয়েছিল চমৎকার। নিজেদের জুনিয়র



শীত-বিজয়ী ইষ্ট ইয়ং  
দাঁড়াইয়া—রেলক, হীপ, পটার হাকিন, কাম্পবেল।  
বসিয়া—ইয়ং কারপেন্টার, গীল, রবসন, সেনাথান, লু।



অলিম্পিকের ২মং আটীর-পত্র

খেলোয়াড়দের কোন সুযোগ না দিয়ে কিংবা কোন খেলোয়াড় তৈরী না করিয়ে টাকা পর্যন্ত খরচ করে বাইরের খেলোয়াড় আনা সম্ভবিত্ব সব টিমেরই যেন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু মোহন বাগান এ সব অভ্যাসের বাইরে। এবং এ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে বলেই সকলে আজও মোহন বাগানকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে। গোলে কে, দত্তের খেলা ভালই, ব্যাকে খেলেছেন মন্থক দত্ত ও তোলা সরকার। হাফ লাইনে মিশ্র, হানিদ, বোথরা, ও বিমল মুখার্জি। ফরওয়ার্ড লাইনে খেলার পর হাফ লাইনে বিমল মুখার্জির খেলা চমৎকার হয়েছে। তারপর ফরওয়ার্ড লাইনে খেলেছেন ওই, কে, ভট্টাচার্য্য, নন্দ, কুমার, সন্তু চৌধুরী।

**কষ্টমস**, “Shocking team” বলেই বিশেষ পরিচিত। তাদের এ নামকে হাজার রেখে এরা অনেক ভক্তিশালী দলকেও হারিয়ে দেয়। পুনরায় অতি গারাপ টিমের কাছেও হেরে যায়। সিয়ান ও জার্ডনের খেলা এ বছর ভালই হয়েছে।

**ড্যালহৌসী ও ক্যালকাটা** পূর্ণ পূর্ণ বারের হানিদ, সেক্টার হাক মোহন বাগান



ডেভিস, গোল-কীপার (ড্যালহৌসী)



চেয়ে এবছর একটু শক্তিশালী দল হয়েছে। বিশেষতঃ ক্যালকাতি গোল কীপার আর্মস্ট্রংকে পেয়ে খুব সুবিধা করেছে।

**এরিয়ানস** কোন প্রকারে নিজের মান বাচিয়ে চলেছে। এদের বিখ্যাত খেলোয়াড় এস, মজুমদার এবছরের সকল খেলায় যোগদান করতে পারে নি। তা ছাড়া এস, ভট্টাচার্য্য, রহমান ও গাফুরী খেলা এ বছর তেমন ভাল হয়নি।

**ভিননস** নবাগত সৈনিকদল। লীগের প্রথমার্ধে এদের খেলা একপ্রকার চলছিল, কিন্তু শেবার্কে তা অল্প-রূপ ধাউয়ে যায়।

**হাওড়া ইউনিয়ন** সর্বশেষ স্থান পেয়েছে। আসছে বছর এদল দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলবে।

## আই, এফ, এ শীর্ষ

এ বছর শীর্ষ প্রতিযোগিতায় মেরুপ জোরে প্রতিযোগিতা হবে বলে আশা করা গিয়েছিল, মেরুপ মোটেই হয় নি।

নবাগত “চাইনিজ” ও “আফগান” এ দুটদল সম্বন্ধে খেলার পূর্বে পর্যাপ্ত কত না জ্ঞান। কল্যাণ শোনা গিয়েছিল। শেষ পর্যাপ্ত “চাইনিজ দল” প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে অক্ষম হয় এবং “আফগান দলও নিতান্ত সামান্য ধরনের খেলা দেখিয়ে চার গোলে হেরে যায়। বাইরের আগত সৈনিক দলের মধ্যে জিটারশায়ার, এইচ, এল, আই; লয়াগস; ওয়েট কেট; ইষ্ট ইয়র্ক প্রভৃতির সম্বন্ধেও খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু আগত সৈনিকদল মধ্যে কোনও দলের খেলাই তাড়ুশ উল্লেখ যোগ্য নাহে।

স্থানীয় দলের মধ্যে মহামোডান, ইষ্টবেঙ্গল, মোহন-বাগান ও ক্যালকাতি প্রভৃতির ওপর আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল দ্বিতীয় রাউণ্ডে, মোহনবাগান ও ক্যালকাতি চতুর্থ রাউণ্ডে এবং মহামোডান সেমি ফাইনালে হেরে যায়। এর মধ্যে মোহন বাগানের জিটারশায়ারের কাছে এবং ক্যালকাটার “ইষ্ট ইয়র্কের কাছে হেরে যাওয়া খুবই আশ্চর্যজনক হয়েছে। অথচ এ দুইটি দলই তাদের প্রতিদ্বন্দী দলের

চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল এবং ভালও খেলেছিল। উন্নত দলই তাদের গোলকীপারের দোষে হেরে গেছে।

## শীলড, ফাইনাল

ইষ্ট ইয়র্ক ও লয়াগস রেজিমেন্ট দুটি সৈনিক দলের মধ্যেই শীল্ড ফাইনালে খেলা হয় ও ইষ্ট ইয়র্ক ১-০ গোলে জয়লাভ করে। স্থানীয় দল মহামোডান, মোহন বাগান প্রভৃতি সম্বন্ধে আশা করা গিয়েছিল হয়ত এবার ওরা কেউ শীল্ড বিজয়ী হবে, কিন্তু তাতে নিরাশ হতে হয়েছে।

ইষ্ট ইয়র্ক রেজিমেন্টকে ৪-০ গোলে; কিংস রেজিমেন্টকে ৪-০ গোলে; ক্যালকাটিকে ২-২, ১-০ গোলে; মহামোডানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। রেকর্ড ভাল তাত সন্দেহ নেই।

লয়াগস কালীঘাটকে ২-০ গোলে; এরিয়ান্সকে ২-০ গোলে; এইচ, এল, আইকে, ২-১ গোলে; জিটারসকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে।

ইষ্ট ইয়র্ক এবছরই প্রথম আই, এফ, এ শীর্ষ পেল।

## হকি খেলা

পৃথিবীর হকি চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ থেকেই একটি টিমকে নিমন্ত্রিত করে নিউজিল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। এদল তাদের যাত্রাধায়ে মুক করে সব কটি খেলাতেই জয়ী হয়ে এসেছে। সমগ্র নিউজিল্যান্ডের সাথে তৃতীয় ও শেষ টেট খেলাতেও ভারতবর্ষ ৭-১ গোলে জয়ী হয়েছে। হকি খেলার যাদুকর ধ্যানচাঁদ এ ভ্রমণে এ পর্যন্ত মতামতিক গোলাব করেছে। তারপরই তাঁর ভাতা রূপ সিংহের নাম উল্লেখ যোগ্য।

## ক্রীড়া টেবল

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় টেট খেলার দল “ডু” হয়েছে। এবং এজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রশংসা না করে থাকার যায় না। ইংলণ্ড এত অধিক রাখে “লিড” করছিল যে সকলেই ভেবেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা এবার নিশ্চিতই পরাজিত হবে। কিন্তু ফুল হ’ল অক্ষরপ।

টসে জয়লাভ করে ইংলণ্ড প্রথম “ব্যাট” শুরু করে

এবং দ্বিতীয় ইনিংসে “ডিক্লেয়ার” ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকা শুধু অধাবসায় ও মনোর জোরে দিয়েই ফেলার দল “ডু” রাখতে সমর্থ হয়। অনেকে বলেন, ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন মি: ওয়াট আরও পূর্বে দ্বিতীয় ইনিংস “ডিক্লেয়ার” করলে ইংলণ্ড হয়ত জয়ী হত।

## টেনিস

এ বছরও ডেভিস কাপ ইংলণ্ড পেয়েছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় মি: পেরীর নাম এ জন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

## অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

বাংলা যে বিরাট অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হবে তার ভোক্তাভোক্ত পূর্ণ উদ্যমেই চলছে। অলিম্পিক গেমস, বাইরের আগত প্রতিযোগীদের থাকবার স্থান, দর্শকদের জন্ত সুবন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষ সকল দিকেই তার ব্যবস্থা করছেন। প্রতিযোগিতাটি যাতে সকল রকমে সাফল্য মণ্ডিত হয় তার জন্ত তার কোথায়ও ক্রটি রাখা হচ্ছে না। যে বিরাট স্টেডিয়াম বীরে বীরে গড়ে উঠছে তার নিউকমস্ট্রী স্থান সমূহে, যা এককালে শুধু প্রান্তর ও বন ছিল, স্বন্দর ছোট ছোট সড়র তৈরী হচ্ছে শুধু বাইরের আগত অতিথিদের থাকবার জন্ত। সেখানে জলের সুবন্দোবস্ত হচ্ছে, বিজলী বাতির ব্যবস্থা থাকবে, দোকান, পার্ক, নৈশ ক্লাব, লাডায়াখানা—মোটের উপর সবই থাকবে। জিমিখণ্ডের দর অবশ্য একটি আঁকা হবে কিন্তু পাওয়া যাবে সবই। ‘তিন হাজারের অধিক নবাগত অতিথি এই সব সহরে থাকতে পারবেন।

১৯০২ সালে যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে এবং তাতে যে পোড়ার ব্যবস্হত হয়েছিল ১৯০৬ সালে কিন্তু তা আর থাকেনা। এবারকার পোড়ার হবে একটু অনুরূপের, তাতে থাকবে শরীর চর্চার আশ্রয়। যে

নীতিক পঠন করে মাছ তার শরীরকে তৈরী করবে সেই নীতি জাতীয় জীবনেও অবলম্বিত হবে—পোড়ারের ফলশ্রুতিই হচ্ছে তাই। প্রতিযোগিতার সময় নির্দেশ জাপক আসা জালান হয়। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তা নির্দোষিত করা হয়। বাগানের কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন “প্রোপ্যান” নামক একপ্রকার গ্যাস আলোর পরিবর্তে জালান হবে।

এ বছর অলিম্পিকের একমাত্র কথা হচ্ছে জাপান নিয়ে। জাপান থেকে যোগদান করা হয়েছে ওখান থেকে ৩৭৩ জন প্রতিযোগী অলিম্পিকে যোগদান করবার জন্য যাবে। জাপান প্রমাণ করত চায় খেলা দুলাতেও অন্যায় জাতির চেয়ে সে কম নয়—তাইনা তার এ বিরাট আয়োজন। ১৯০২ সালে কালিফোর্নিয়াতে যে দল জাপান থেকে পাঠান হয়েছিল এ বছর তার তিনগুণ অধিক দল পাঠান হবে। এতে কত খরচা হবে জানেন? মোট খরচ হবে ১২৪০০০০ ইয়েন অর্থাৎ ৩৫০০০ ডলার। জনশিষ্ট পড়বে ৬০০ ডলার। অবশ্য এ খরচের বেশীরা চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য অধিক চেষ্টা করবে। বিভিন্ন বিষয়ে তদারক করবেন, ২৬০জন প্রতিযোগী এবং ২২জন টেকনিসিয়ান ও ১০জন সহকারী। এবং সাতারাই চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য অধিক চেষ্টা করবে। বিভিন্ন সাতার প্রতিযোগিতায় ৫৯জন প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন এবং তারমধ্যে মহিলা প্রতিযোগী আছেন ১৬জন মোটের উপর প্রত্যেক প্রতিযোগিতায়ই জাপান যোগদান করবে।

অলিম্পিক টিকেট বিক্রয় শুরু হয়েছে এবং এরই মধ্যে বহু টিকেট বিক্রীও হয়ে গেছে। সবচেয়ে অধিক টিকেট বিক্রী হয়েছে যুক্ত সাতাচা, ইংলণ্ড ও হল্যান্ড।



দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত ৫ই শ্রাবণ রবিবার প্রাতে ভারতীয় সঙ্গীতের আজীবন সারক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিত্যসহচর শ্রীকৃষ্ণ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সন্ধ্যা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্বর্গীয় বীণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী সত্যবতী ঠাকুরের পৌত্র ছিলেন।



দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাল্যকাল হইতে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীতের উপর ঐক্য ছিল। ৪ বৎসর বয়সের সময় তিনি নির্ভুল স্বরে গান গাহিয়া সকলকে বিম্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতাও সঙ্গীত বিদ্যা বিশেষ স্বনাম অর্জন করিয়াছিলেন। লাকুটিয়ার (বরিশাল) জমীদার স্বর্গীয়

রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহার মাতামহ এবং স্বর্গীয় দেবকুমার রায় চৌধুরী তাঁহার মাতুল ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি লরেন্টো কনভেন্টে শিক্ষালাভ করেন। সেখানে তিনি খুব ভাল করিয়া পিতামহে বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। তিনি শ্যাম স্কন্দের কাছে ব্রাহ্ম শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি সেন্ট জেভিয়ার কলেজে প্রবিশ্ট হন। দিনেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্ত দুইবার বিলাত গমন করেন। প্রথমবার বিলাত বাইবার পর তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়বার বিলাত বাইয়া তথায় কিছুকাল অধ্যয়নও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতের নেশাই তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলে। ১৯০৮ সালে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়া ছাড়িয়া দিয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা আরম্ভ করেন। এইভাবে তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় প্রকার সঙ্গীতই অস্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল।

অভিনতা হিসাবে দিনেন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে তাঁহার নির্ভূত অভিনয় দর্শকের শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করিত। কয়েকমাস পূর্বেও তিনি 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির অভিনয় করিয়াছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী এখনও জীবিত। তিনি অপুত্রক ছিলেন।

আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি এবং তাঁহার পরিবারবর্গের এই গভীর শোক আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

হেমেন্দ্রলাল রায়

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও কথাশিল্পী হেমেন্দ্রলাল রায়, গত ২৭শে আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি ৪-১৫ মিনিটের সময় দেহ

মাস কাল টাইফয়েড্‌ জ্বর ভোগের পর অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন।

হেমেন্দ্রলাল পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার মুলকোচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জগদ্বলাল রায় একজন সাহিত্যসেবী ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। হেমেন্দ্রলাল পিতার কনিষ্ঠ পুত্র।



হেমেন্দ্রলাল রায়

হেমেন্দ্রলাল বাল্যকালে সিরাজগঞ্জ ও তৎপরে রাজসাহীতে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অন্যান্য পুস্তক বৈমলিক সংবাদপত্র 'হিম্মতাবাদ' সহকারী সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁহার কবিতা ও লেখা প্রকাশিত হইতে থাকে। সাপ্তাহিক 'বাশরী' প্রকাশিত হইলে হেমেন্দ্রলাল প্রথম হইতেই তাঁহার ভাষা গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'ফুলের বাধা' প্রকাশিত হয়। দেড় বৎসর পরে হেমেন্দ্রলাল সাপ্তাহিক 'মহিলা' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'মহিলা' বন্ধ হইয়া গেলে তিনি 'বাদি প্রতিষ্ঠানের' প্রকাশিত গৃহসমূহ রচনায় বিশেষ সহায়তা করেন। সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রবাণী'র এবং 'হরিজন পত্রিকা'র তিনি সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার 'কড়ের দোলা' উপন্যাস, 'মায়াভাঙ্গল' 'মনিলাপা' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ এবং কয়েকখনি গল্পপুস্তক প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রলালের বিধিত 'আরব্য উপন্যাসের' রাজসংস্করণ সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। হেমেন্দ্রলালের গল্পের 'মায়াপুত্রী' ও শিশুসাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। মৃত্যুর পূর্বে হেমেন্দ্রলাল বেঙ্গল কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের বিজ্ঞাপন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কন্ট্রোলার

ছিলেন। কিন্তু সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার লেখা বন্ধ ছিল না। হেমেন্দ্রলাল নিমেষস্থান ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। হেমেন্দ্রলালের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াই বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পী তাঁহার আবেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শবদাত্তায়ও অনেকে বেগদান করিয়া শ্মশানঘাটে পিয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

'ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া'র দিল্লী-সিমলা অফিসের প্রধান সম্পাদক ও 'মানদবাজার পত্রিকা'র দিল্লী-সিমলার সংবাদদাতা শ্রীকৃষ্ণ সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু সিমলার গত ২৭শে জুলাই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বঙ্গোপসাগর নামের একজন কবি ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু পিতার কবিতা-পুস্তক 'ফুলের বাধা' প্রকাশিত হয়। দেড় বৎসর পরে হেমেন্দ্রলাল সাপ্তাহিক 'মহিলা' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'মহিলা' বন্ধ হইয়া গেলে তিনি 'বাদি প্রতিষ্ঠানের' প্রকাশিত গৃহসমূহ রচনায় বিশেষ সহায়তা করেন। সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রবাণী'র এবং 'হরিজন পত্রিকা'র তিনি সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার 'কড়ের দোলা' উপন্যাস, 'মায়াভাঙ্গল' 'মনিলাপা' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ এবং কয়েকখনি গল্পপুস্তক প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রলালের বিধিত 'আরব্য উপন্যাসের' রাজসংস্করণ সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। হেমেন্দ্রলালের গল্পের 'মায়াপুত্রী' ও শিশুসাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। মৃত্যুর পূর্বে হেমেন্দ্রলাল বেঙ্গল কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের বিজ্ঞাপন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কন্ট্রোলার



সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

কাজে তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। 'ফরওয়ার্ড', 'লিবাটি' প্রমুখ সংবাদপত্রে দায়িত্বপূর্ণ কার্য অতিশয় যোগ্যতার সহিত তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট অগ্রগতি ছিল। স্বভাবের সৌন্দর্য্য তাঁহার মূগের অনাবিল মিষ্ট হাসিতে সর্বকণ্ঠের জল্প ফুটিয়া থাকিত। এত অল্পবয়সে অসামান্য



যে তাঁহাকে হারাইলাম, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই হৃদ্যিনে সাহসনা দান করুন।

### নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

প্রসিদ্ধ দেশকর্মী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়



নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল সর্পভ্যাতি অক্লান্তকর্মী পুণ্য জন্মভূমির সেবার আয়োজ্য করিয়াছিলেন, নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁহাদেরই অঙ্গতম। তাঁহার চরিত্র ছিল ক্ষটিকের মত নির্মল—হৃদয় ছিল সিংহের মত নির্ভীক, প্রকৃতি ছিল নিরীহ মেঘশাবকের মত মৃদু। গান্ধীজীর আদর্শে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অপরিদীম। সাধারণ নরনারীর ভীষনের সহিত গভীরভাবে তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন, আপন রূপের বিশাল অহঙ্কৃতি

দিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের একেবারে আপনার জন হইয়া গিয়াছিলেন। দেশ সেবার পুরস্কার স্বরূপ কারাবাসও তাঁহার ভাগ্য ঘটয়াছিল। পুত্রলিয়া তাঁহার কর্মস্থল ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে একজন অকৃত্রিম নীরব-কর্মীর তিরোভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

### মনোরমা দেবী

প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী মনোরমা দেবী এক্ষণি বৎসর বয়সে গত পূর্ণিমাঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা শোক-সন্তপ্ত রামানন্দ বাবু ও তাঁর দুই পুত্র শ্রীকেশব নাথ ও শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়কে আশা করি যে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং পরলোকগতের আত্মার শান্তি কামনা করি।



মনোরমা দেবী



ম্যাডামের “অপরানী অবলা”র মিস্ রোজ  
মুদ্রণ—বেঙ্গালী প্রেস







With best wishes  
Sincerely,  
Norma Tesser

যদি ফিল্মের রাজার রাজ্যের অনন্যতম ডেবের  
অ্যাকট্রিস আলবুটিন হাফে একজন। আকাশের  
তারার মত আলুয়াল উল্লস এর ভবিষ্যৎ।

পতনিন নদী শিয়ারকে দেখা যায় নি, তার কাছের  
তার জন্মদা-জন্ম। এই কিশোরী আগে হাফে তার  
দ্বিতীয় মস্তাবের জন্ম। ভারী ছবি 'রোমিও জুলিয়েট'।





খলার গমি অমর খালার পুরুষের জ্যোতি নেল্সন এডির আগে  
আর কোন অভিনেতার দেখা যায় নি। এর আগের পরিচয় গুলি  
প্রথম পায় জেনেট ম্যাগডোনাডের 'মট ম্যাডিয়েটাই'।  
নেল্সনের নামডাক আজ অনেক, অনেক আদর, অনেক লক্ষ্য।

# কৃষ্ণ ছায়া

শ্রীমিলন মিত্র

হলিউডের বিবাহিত জীবন। সিনেমার রাজধানীতে 'অভিনেত্রী' হয়, স্বামীকে হতে হবে অজ্ঞ আরেকটা কিছু।  
ঐ বিশেষ জিনিষটি কেন যে সাফল্য লাভ করেনা, তা এ মতের সঙ্গে মেলবার জঙ্ক তাঁরা প্রথম নম্বর উদাহরণ দেন  
নিয়ে অনেক কথাবার্তা অনেক লেখালেখি আজ পর্যন্ত ওয়াশিংটন বিয়ারী ও রিটা গিল্ডম্যানের।  
হয়েছে। কতো লোলা লেন  
কতো জন মিল্‌জানের হঠাৎ  
বিয়ের খবর যেমন রোজ আমরা  
গাচ্ছি, ঠিক তেমনি কতো না  
মি: আর মিসেস জাম্পারের  
অকাল বিচ্ছেদ-বার্তা আমাদের  
কানে এসে না পৌছোচ্ছে!



রিটা অভিনেত্রী ছিলো, কিন্তু  
বিয়ের পর সে অভিনয় জীবন থেকে  
বিদেয় নেয়!—হয় সম্পূর্ণ রকম  
স্বাভাবিক এক স্ত্রী। তার মলে ওয়াশী  
আর রিটা আজ স্বামী স্ত্রী হয়েছো  
এগারো বছর, কিন্তু তবুও তাদের  
ভিতর একদিনও মনোমালিন্যের  
ছায়া পড়েনি। সম্ভব তাদের হয়নি  
ওয়াশি তাই একটি মেয়েকে গোপা-  
কথা নিয়েছে। শ্যারল অ্যান্‌ বিয়ারী  
সে' সে আজ বিখ্যাত।

## সাগরের পারে

হিসেব করে' দেখা গেছে, হলি-  
উডের শতকরা আটখটি বিবাহিত  
জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য মোটে আটঘ  
দিন। কিন্তু তার কারণ কী?

এই একটি বিষয় নিয়ে  
চলিশ ঘণ্টা মাথা ঘারা যামাচ্ছেন  
আমাদের মতে এই অদ্ভুত  
আচরণের একমাত্র অর্থ হচ্ছে  
ইউরোপ থেকে বাড়ী ফিরে এসে  
স্বামী কিংবা স্ত্রীর ভেতর  
অন্ততঃ একজনের ঐ একই  
স্বাভাবিক। স্বামী হয়তো  
ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী না হওয়া। তার মানে, স্ত্রী যদি  
তখনো শেষ হয়নি। তবুও অকারণে - স্বামীটির

দোষারোপ দের বিরুদ্ধে আধুনিক ছবি 'দ্য  
স্বাকেনটাইন'।





কলিঙ্গার 'বিল গিগার্ড' মনে হয় সাগরের নীচে দাঁড়িয়ে। কিন্তু, সাক্ষরিক তার ছবি তোলা হয়েছে সুখীরাণী গুপ। এর ভাষায় জোখামার মত উল্ল।

মনের কোণে এক মেঘ জন্মে। স্ত্রীর নাম তার চেয়ে অনেক হয়তো বেশী। কাজেই তার স্ত্রীর জীতি-কিন্তুখণীর সংখ্যাও অনেক বেশী। অনেক দীর্ঘ যুবক তার সঙ্গে একটু কথা বলবার জন্ম কতো হয়তো টেলিফোন করে, তার দর্শনলাভের জন্ম কতো হবেই স্বপ্নের ভ্রমলোক ছুঁ একবার তার বাড়িতেও বোধহয় আসে। স্বামী বেচারার মনের চশমা কোণে ঈষৎ কোন সন্দেহ করা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। তাই মুখ তার করে' সে থাকে, স্ত্রীর সঙ্গে ভালো করে' কথাও হয়তো কখনো। স্ত্রীর তা ভালো লাগে না। সে সরলপ্রণে বার বার কারণ জিজ্ঞেস করে। মনোমালিন্যের স্বরূপাত হয় সেইখানে।

ঐ কারণের কতো প্রমাণ আপনি দেখতে চান? ১৯০৪ খৃঃ অব্দে জন গিলবার্ট্‌ আর ভারজিনিয়া ক্রসে বিচ্ছেদ ঘটান কেন জানেন? ঐ একমাত্র এক কারণে। আবার, ঐ একই কারণ তার আগের ছুঁজন স্ত্রীও দেখিয়েছিলো—ইনা ক্রসার আর লিটল জয়। ১৯২৯ খৃঃ অব্দে ২৫ মে থেকে ১৯৩২ এর আগষ্ট পর্যন্ত জন হুগের সেরা স্বপ্নের জন্ম নিয়ে করেছিলো তিনবার। বিবাহিত জীবনের অবিক্রি শান্তির কালো এখনও সে করে।

গ্যোরিয়া সোয়ানসনএর ভূতপূর্ণ স্বামীর সংখ্যা চার একো জানেন? ১৯১৬ সালেও ৩ ছিলো ওয়ালেস বিয়ারীর স্ত্রী। তারপর হারবার্ট্‌ মনবর্ন, তারপর ১৯২৫এ মার্কুইস্ট্‌ হেনরী ডিলা ফেলাইস—গ্যোরিয়ার সঙ্গে ১৯৩০এসম্পর্ক ছিন্ন হবার পর সে কন্সট্যান্স বেনেটকে বিয়ে করে। তারপর মাইকেল কারমার সেও গতবছর সোয়ানসনের স্বামীরকের বার থেকে রেহাই পেয়েছে।

**জি**—হাস্‌লো ইতিমধ্যে স্ত্রী হায়েল তিনবার। চালস্‌ ম্যাকগু, পল বার্ল আর হল কদন হচ্ছে এর তিন স্বামীর নাম। লু অরাস্ট্‌ স্ত্রী বদলেছে ছবার

প্রথমে লোলা লেন, তারপর সেদিন জিন্‌জার বোজার্স।

কণ্‌ চ্যাটারটন রাল্‌ফ্‌ ফুবোবো কিং জর্জ ব্রেট—কারো ভেতরেও স্থখ পায়নি। রাল্‌ফ্‌ এর ঘর এখন করছে হিটার এন্‌জেল।

সোলোরেস্‌ দেল রিয়োর প্রথম স্বামী জেম্‌স্‌ মারটিনেজ দেল রিয়ো স্ত্রীর সিনেমা জীবনকে কখনও শান্তির চোখে দেখেনি। কিন্তু ভ্রমলোক যারা যাবার পর সোলোরেস্‌ এখন আর্ট্‌ ডিরেকটর কেডিক গিবন্স্‌ এর সঙ্গে সম্পূর্ণ রকম সুখী।

কিন্তু, একটা জিনিষ হলিউডে খুব সুন্দর। স্বামী জীতে এই যে ঘন ঘন অঙ্গলবদল—এই ঘটনার পর তাদের ভেতর আর কোনো মনোমালিন্‌ নেই। কণ্‌ চ্যাটারটন এখনও কোনো সময়ে রাল্‌ফ্‌ ফুবোবোয়ের সঙ্গে দেখা হলে' তার কুশল জিজ্ঞেস করে, বলে 'হালো, রাল্‌ফ্‌? ভালো? ভালো? রাল্‌ফ্‌ ও কাছে আসে, বলে 'হ্যাঁ, দয়বাহ কণ্‌ তুমিও ভালো তো? এমনি মিষ্টি ব্যবহার তাদের সবার সঙ্গে।

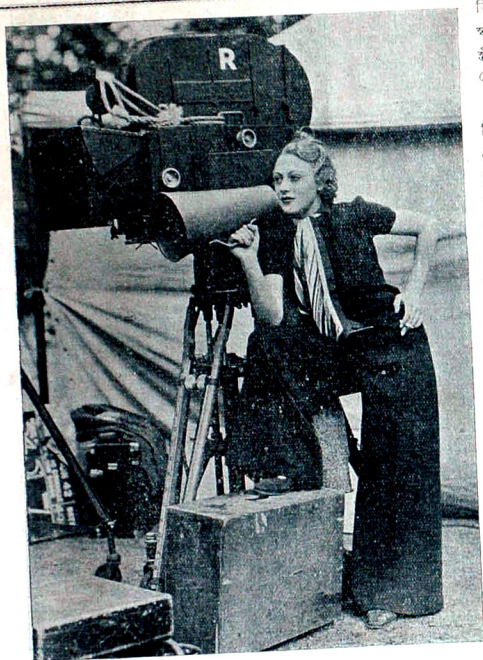
**অ**বিশি, ওপরে অতোগুলো উদাহরণ দেখে আপনারা ভাববেন না যেন হলিউডে সুখী স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা একেবারেই কম। জর্জ্‌ আব্রলিসের আজ বিয়ে হয়েছে কতো বছর জানেন? বত্‌সি বছর। জর্জ্‌ ব্যাঙ্কক্রফ্ট্‌ বাইশ, ওয়ার্ল্ডার ব্যাঙ্কটার আর তার স্ত্রী উইলিন্‌গ্‌ ট্‌ ব্রাইসন, আন্দর্য্য লাগুচে—সুড়ি আশ, মিল্ড্রেড ডেভিস্‌ আজ বারো বছর ধরে মিসেস্‌ হারল্ড লয়েড্‌।

স্বামী স্ত্রী ছুঁজেনই অভিনয় করে, অথচ তারা সুখী এমন উদাহরণ হলিউডে খুব বেশি আজ নেই, তবে আছে। যেমন ধরন, জোয়েল ম্যাককিন্সি আর হ্যামিল্‌ ডি। বিগ্‌ জর্জবির আর ডিক্‌সী লী। এদের জীবন সাধারণ স্বপ্নের তরী চিরকাল খাতে বয়, তার-ছাড়া এরা প্রতিজ্ঞা করেছে পরস্পরের কাঁধ-পঙ্‌কতি নিয়ে পরস্পর সমালোচনা কখনও করবেনা। ঐঁতিরোতে বত্‌কণ্‌ তারা থাকবে, ততকণ্‌ তারা অভিনেতা আর অভিনেত্রী, কিন্তু, বাড়ীর ভেতর এসে সে কথা তারা দুঁলে ঘাসে ঢুলে থাকে আর্ক্‌ ল্যাম্প ক্যাবেরা আর



মেট্রোর মাজ ইডাম্‌স্‌ কিছুদিনের জন্য এখন হলিউডের হাওয়া থেকে মুক্তি পাবে। চুক্তিক হয়ে ও এখন বিলেতে। ইডাম্‌স্‌ জন্মো-জিট শের অভিনেত্রী এখন।





জুজি স্টেজ বিল্ডিংয়ের ডায়াল এক অভিনেত্রী। কিন্তু, এখানে আমরা তাকে দেখতে পারছি মেগাফোন হাতে ডিরেক্টর। ভারী মজা না ?

বিখ্যাত দার্শনিক ও ভাবকের কথাগুলো অত্যন্ত যে সূচী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে আজকাল সবচেয়ে প্রিয় অভিনেত্রী বোধহয় শার্লি টেমপল, এ মিষ্ট মেয়ে; তার হাসি, তার ভঙ্গী, তার কথাবার্তা আজ পর্যন্ত যত লোককে এক

ডিরেক্টরের কথা। তারা তখন স্বাভাবিক, সাধারণ স্বামী স্ত্রী—চোখে তাদের শক্তির মোনালী মীল আনো!

এক জি ওয়েলস্ ও সিনেমা শির। এই স্ববিখ্যাত লেখক সম্প্রতি সিনেমা যন্ত্রে নিজের মতামত সাধারণের কাছে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতামতের সারাংশ হচ্ছে, যে-ভবিষ্যৎ জীবন তিনি জুড়িয়ে রাখবেন ছায়াছবির মাধ্যম, কোন বই লিখবার জন্য কলম তিনি আর ধরবেন না। তাঁর কতোগুলো বইয়ের যে সমস্ত চিত্র সংস্করণ ইতিমধ্যে তোলা হয়েছে সেগুলো পুণই যে প্রকাশ্যাজনক এ তিনি বিশ্বাস করেন না। যে কোনো লোককেই যে কোনো বইই লেখকের অসম্প্রতিভা চিত্র-রূপে সর্বাস্বত্বলব্ধ করবেই সেত পাবে না। আর ইংলও, আমেরিকা থেকে ভালো ছবি না তুলেও প্রতিরুদ্ধ হবার শক্তি তার থাকবে। যদি প্রকৃত নিপুণ হাতে এই শির দিয়ে পড়ে তা হ'লে এর চেয়ে ভালো শিক্ষক ছবিতে আর ছুটি থাকবে না।

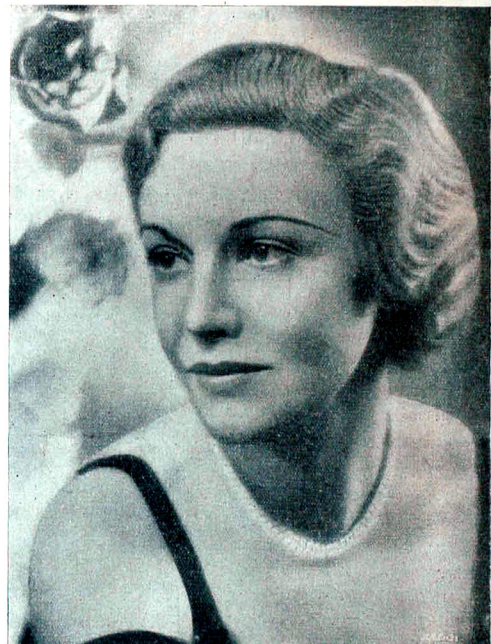
অভিনব আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছে—এবং আপন আর কেউ ছয়তো পারেনি। কিছুদিন আগে মিঃ আর মিসেস টেম্পল তাঁর মেয়ে শার্লিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। একদিন তারা সেই দেশের গভীর দ্যায়

মেরিয়ারে বাড়ি গেলেন তা খেতে। গভীর বজরের বৃদ্ধ ভরলোক শার্লিকে বেধে চেঁচি, একটি জেলের মত আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। কোলে তুলে নিয়ে কতনা আদর! বললেন সিনেমা তিনি কোনদিন খুব পছন্দ করতেন না। কিন্তু, সহরে শার্লির ছবি এলে হাজার কাজ থাকে সঙ্গেও তাঁকে একবার না একবার সেই সিনেমায় যেতেই হয়।

বাড়িতে ফিরে এসে মিঃ আর মিসেস টেম্পল দেখলেন শিল্প-মোহর করা একখানা চিত্র। তাঁদের মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। চিত্রখানা মেইনের গভীরের কাছ থেকে, তিনি লিখেছেন—

“জীবনে বোধহয় এই প্রথম কোনো অভিনেত্রীর কাছে

আমি চিত্র লিখছি। কিন্তু, তবু আমি তোমায় জানাতে চাই ছবিই আমার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় অভিনেত্রী।” উত্তরে, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে মিঃ আর মিসেস টেম্পল তাঁকে একখানা শার্লির সই করা ছবি পাঠিয়েছেন।



সম্প্রতি এক প্রতিযোগী তার আজ (লিন কারার বিল্ডিংয়ের সর্বশেষ) যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। রবার্ট, জোনাট্রের সঙ্গে এর স্যানিক টবি 'পার্টটাইম' টেম্পল।

অর্থের অভাব শুধু আমাদের স্মরণেই বাড়ে না। এর জেরে চলছে সাধা জগতে। সবাই সাধারণ হবার সঙ্গ সঙ্গে হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অনেকদিন থেকে সাধারণ হতে আরম্ভ করেছে। এই সমস্ত সাধ-



হাশীমের ভেতর সবচেয়ে আগে নাম আমরা 'কবুত' পারি মালিন ডিট্রেশের। ছবি দেখতে মালিন এতো ভালোবাস্তো—যে—সে নিজের জন্ম ছোট একটা সিনেমা হলু কিনেছিলো। সেখানে বর্ষে বর্ষে 'সে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে নির্জনে অতি আধুনিক দেখবার মত ছবিগুলো প্রতি সন্ধ্যায় দেখতো। কিন্তু, যখন সে জানতে পারলে এরজন্যে প্রতিরোধ তার খরচা হয় একশো ডলার, সে তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে দিতে ছক্কন করলে।

মায়াবনের সঙ্গে বর্ষে মালিন এখন সিনেমা দেখে।

গুণু তাই নয়। ইন্ডিয়োর রেইনফোর্টএ রোজ পেতে গেলে খরচা পড়ে বেশী—মালিন তা বুঝলে। তাই সে এখন বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে 'নিজের সঙ্গে আনে।

মায়াবনের কপাল সময়ের চেয়ে কোথা থেকে কোথায় যে ছুটে না যায়—তা কেউ বলতে পারে না। 'বিশেষ করে' হলিউডে। সেখানে আজকে যে অভিনা, কাল তার সম্রাটের মত সম্মান। আবার তার পরদিনই হয়তো দেখতে পাবো—সে কোন অভিনার অন্তরালে চলে' গেছে।

নিরীক্ষাযোগ্য আরম্ভ হোর নাম ছিলো বুবা। জোয়েল ম্যাকক্রিয়া সেই সময় ইষ্টলে পড়তো। একটা গুপের প্রশংসা জোয়েলের সবাই তখন করতো, সেটা হচ্ছে তার মোড়ার চড়ার কাঁদা। জোয়েল আরম্ভকে

তাই মোড়া চড়তে শেখায়। কাজেই বন্ধু হ'লো। সে ম্যাকক্রিয়াকে উপদেশ দিলে ছায়া ছবিতে নাবুতে।

কিছুদিন পরেই এলো সবাক-গুণ। সবাব মন থেকে গের নাম গেলে মুছে'। তাকে কেউ আর চিনুইই পারতো না। আজ আরম্ভ জোয়েলএর সহকারী! ছবির জন্ম পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ত' হ'লে জোয়েলএর বদলে লাফায় আরম্ভ।

সার গুন্টার হুই, কী করে বিয়ে করেছিলেন আপনারা বোধ হয় জানেন। একদিন, ঐষণ বাহা।

জেন পাকটার জাতি ইংরেজ। অভিনয়ে বুবা মৌ দরতা তার নৈক, কিন্তু সৌন্দর্য সেখানে মুগ্ধ করবার গমতা তার আছে। সৌন্দর্য ও অভিনয়ে জোয়েল দিতে জেন কিছুদিন হলো পায়ে আমেরিকা।



হার গুন্টার বেরিয়ে ছিলেন বেড়াতে। দেখতে গেলে হঠাৎ—সুন্দরী অসহায় এক মহিলা অকাতর এক গাছের তলায় পড়িয়ে ভিজছে। তার এ বিপদ থেকে হার গুন্টার উদ্ধার করলেন নিজে তাকে ছাতার তলায় নিয়ে। তারপর অবিশি তাদের বিয়ে হয়।

সম্প্রতি অনেকটা এরকম একটা ব্যাপার হলিউডে ঘটে' গেছে। কনস্টান্স বেনেট একদিন এক ছবি দেখানোর বিশেষ অধিবাসনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলো। বেকবার সময় হঠাৎ একদল

ছেলের কাছে সে পড়ে বরা। মত্ত প্রকাণ্ড দলটি তাকে ঘিরে ফেলে। উদ্ভ্রম আর কিছুই না, গুণু যই নেমা। কনির তো মহা বিপদ।

অসহায় কনির এ বিপদ পড়লো গিল্‌বার্ট রোনাল্ডের কাছে। সে এলো ছুটে। এসে, কনিকে কোলে তুলে' নিয়ে ভয়ানক জোরে ছুটে' তাকে পৌড়িয়ে দিয়ে এলো তার মোটরে।

কিন্তু, তাদের বিয়ের খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

গুণু জোরে যে চাকা চলে, তার চেয়েও জোরে চলছে নিট থিয়েটারএর 'ভাগ্য-চক্রের চাকা। আকাশের রোদ রালো করে' গরম হ'তে না হ'তে পরিচালক নীতীন বহর নীল গাডিকে দেখা যায় ইসিউয়ের ইন্ডিয়োর দিকে কু'করে' চলতে। পরিপ্রশ্নের মত নেই কারণ, 'ভাগ্য-চক্র'

প্রায় ভালোয় ভালোয় শেষ হ'য়ে এলো। 'জিজ্ঞাসা' দেব দাসের লগ্না দৌড় শেষ হ'লেই, পূর্ব সম্ভব 'ভাগ্য-চক্রের চাকা' গুণানে ঘুরতে আরম্ভ করবে। 'বি' ইউনিটে প্রমথেশ বাবুর ফিল্ম 'দেবদাস' শেষ হয়েছে। সবাই বুঝে আশা করছে—যে চিত্রটি বাংলার মতই বাংলার বাহিরে

দার নাম কী মন্ত পারেন? একজন হিন্দী ফ্রান্সের জে'ক মল্লের নেই কিন্তু আর একজন তারই মোহের গ্রহিণী। মেট্রোর একটি চিত্রে অভিনব এক বৃন্দার জন্ত ই পুতুলটির হয়েছ লক্ষ।







যেটা থাকে আর আধুনিক ছবি 'স্মান' কার্টুনিশ'র কোনো ঘটনাক্রমে  
এর মধ্যে আর কারো কাছে আসেনি। ওপরে থাকেও আসেনি।

সেই পাজি ফেঁচু বাসুলাসিটির মত।

সমাদর লাভ করবে। আমরাও তাই আশা করি।

'বাসুনের মেয়ে' হচ্ছে প্রাথমিক বাবুর এখন মন-  
সংযোগের বিষয়। কোন অংশে কে নাওবে, কার কী  
কাজ এখনও ঠিক হয়নি। তবে ঐ মেয়েকে 'রূপসী'  
সম্প্রদায়কে দেখাবেন সেটা ঠিক হয়ে গেছে।

"কাল-পরিণয়" এর কাজ বালী ফিল্ম সূত্রের আরম্ভ  
হয়ে গেছে—এ বছর আমরা সেদিন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল  
বোর্ড দেখেই বুঝলাম। 'মদন'র হয়ে নির্দীপ মুগে এর  
পরিচালনা করে গাঙ্গুলী মশাই খুব নাম করেছিলেন।  
আমরা আশা করি তাঁরই তত্ত্বাবধানে এর সবাক-রূপ ঠিক  
সেই রকমই মাফলাভ করবে। "বিজ্ঞানসুলভ"র কাজ  
কিছু কিছু বাকী রয়েছে। সেগুলো পপুলার পিকচার্স-  
এর 'মদনজি'র মত উজ্জ্বল শেষ হ'লেই আরম্ভ হবে।

'কালী ফিল্ম সূত্র'ই 'ক্রাউন' নতুন নাম 'উদ্ভার'  
পপুলারের 'মদনজি'র হবে শুভ উদ্বোধন।

পপুলারের ছবি কত দূর পপুলার হয়  
বেখবার জাচ্ছে আমরা বেশ বাস্তব হয়ে  
আছি। ই।, কর্ণওয়ালিশের নব-নামকরণ  
গাঙ্গুলী মশাই করেছেন 'ক্রী'।

ক্রী ফিল্ম নাকি ছুটা বাংলা ছবি  
একদমে তুলবে। 'রুম-মুদমা' আর  
'কণ্ঠহার'। পরিচালনার খুব সম্ভব  
জ্যোতিষ বানার্জী মশাইকেই দেখা  
যাবে। 'রুম-মুদমা'র অতীত বাবু  
ও কাননবালা নাওবেন প্রধান ভূমিকায়।

ই ইন্ডিয়ান "বিভোহী" মুক্ত  
হয়েছে। পরিচালনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে  
চিত্রখানি যে চিত্রমোদীদের সম্বল করবে  
এ আমরা বলতে পারছি। "পায়ের ধূলা"ও  
শেষ হ'য়ে এলো। জ্যোতিষ মুখার্জি  
এর পর নাকি 'পথের শেষ'এর পরিচালনার  
হাত দেবেন।

এ ভারতীয় পিকচার্সের অধ্যবসায়ের অন্ত নেই।  
'পঙ্কবানু'এর প্রায় আড়াইখানা বান্ধ'এর ছবি তোলা এরা  
শেষ করেছিলেন। কিন্তু, মনোমতা হওয়ার ঠিক



আবার আর  
করুন লেন  
নতুন উদ্যমে—  
'পঙ্কবানু'এ  
আরো উন্নত  
তা হ'লে আর  
আমরা সী  
আশা করছি  
পারি।

শ্রীমতী উমাপাণি—এমন নিউমিটেজ'এর 'ভাগ্যচক্র'ও  
অভিনয় করেন। বিনী ছবিও ইনি মায়িকা,  
নাম, "খুশাওনা"।



আমরা টেন ও গার্লি কুপার  
'গডফ্রি মাইট'এ।  
৩









সিনিলা বি ডি বিলার 'সুন্দর' এর ছবি ভাস্কর্যের এখানে প্রথম। উপরে লেটো ইটা আর শেনকী উইলকাম।

## সম্পাদকীয়

বর্ষার প্রারম্ভেই আমরা হারিয়েছিলাম আমাদের বাঙালার চিত্তরঞ্জনকে। চিত্তরঞ্জনের ব্যাপক কন্ঠকীবনে, ভারতের অস্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ নেতার জীবনে, তাঁর গৌরবময় সাহিত্য জীবনে তিনি যে বাঙালী তা তিনি ভোলেননি।

মহান

সাহিত্যিক জীবন গতি বয়ে যায় বাঙালীর অথচ তার যে ছাপ তা মহাকালের পাতায় অঙ্কিত হয়ে থাকে। চিত্তরঞ্জনের প্রাণের যে আবেদন তা আমাদের জিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে।

আর এক বর্ষায় আমরা হারাই চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী ও শিষ্য যতীন্দ্রমোহনকে। চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের পর মাত্র আট বৎসরকাল বাঙালী তাকে নেতাজ্ঞেপ পেয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের মত যতীন্দ্রমোহনের প্রাণে বাঙালীর রূপ, রস ও গন্ধ ফুটে উঠেছিল, তাই তাকে "দেশপ্রিয়" বলে অভিহিত করে বাঙালী আপনার অক্ষয় করে নিয়েছিল।

সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর দূর পরীতে যে কন্ঠী আপনার ধ্বনি দেশজুড়ে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন তিনি আজ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পুরুষিয়ার নিবারণ, দাসত্ব বাঙালীর গৌরব, আদর্শ শিক্ষা ও সমাজ সেবক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালার, বিহারের তথা ভারতের যে অপরূপ ক্ষতি ঘটেছে তা কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদের শ্রদ্ধাজলিতে স্পষ্ট।

বাঙালী সাহিত্যে, বাঙালী ঋগ্বেদে ঠাকুরবাড়ীর দান অক্ষুণ্ণ। আজ রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীত সারাজগতে স্বপ্ৰতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের মনোহারিত্ব যে সুবিশীর্ষ সোনার কাদির স্পর্শে সম্ভব হয়েছিল, সেই স্তম্ভ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ পরলোকে। শাস্তি নিকতনের জীবনধারার সঙ্গে তাঁর যে নৈকট্য তা কবিজগৎ কথায় প্রকাশ, "প্রতি বৎসর যখনই আমাদের শালগাছে নবগণ্ডোলাস হইবে, যখনই দারুণ গ্রীষ্মের

পর আকাশে জলভরা মেঘ ভাসিয়া উঠিবে, সেই উৎসবের দিনে আমাদের আনন্দ অভিল্যঙ্গির সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে।"

কবি হেমেন্দ্রলাল রায় স্কবির ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর অল্প বয়সে মৃত্যুতে আমরা সকলেই ব্যথিত।

এঁদের সকলের আচার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের অর্থ্য জানাই।

**মানবজীবনে** নীতির প্রয়োজন শুধু সমাজ রক্ষার জন্য নয়, নিজের আত্মোত্তির জন্য তার চরম সার্থকতা। তাই যে নীতি সমাজের, যুগের ও দেশের বেড়াজালে বদ্ধ নয়, তাই সত্যজ্ঞের নীতি। বর্তমান জড়বাহী জগতেও আধ্যাত্মিক সত্যাহুসন্ধিৎসা মোটেই বিরল নয়। তাই আজ ভারতের শ্রেষ্ঠতম মনীষিহর মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দ জগৎপূজ্য।

ভূমিকম্প-বিশ্লগত কোয়েটার কথা বলতে গিয়ে মহাত্মাজী বিহার ভূমিকম্পে যে কণা বসেছিলেন তার পুনরুত্থান করেছেন—মাহুষের রক্তকর্ণের জন্য একজন নৈসর্গিক শাস্তি ঘটে থাকে, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। প্রায়শ্চিত্ত ও অহমোচনায় আত্মজঙ্ঘি হয়। আমাদের দেশে কণ্ঠবান নতুন কথা নয়। এটা আমাদের আনন্দটা জাতীয় সংস্কার। তবু আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে। মাহুষ আজ বিজ্ঞানে করায়ত্ত করতে চায় অপরিমিত শক্তি, যার বলে সে একদিন অতিক্রম করতে পারবে সকল রকম জড় ও অজড়শক্তি। মনোবাক্স মাহুষ ছুটে চলেছে, সে তার জীবনে ভূমিকম্প এড়াতে চায় না, তবে তার সঙ্গে যুঝে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে চায়, যাতে ভবিষ্য মানবজীবনে ভূমিকম্পের অত্যাচার নিরশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই হ'ল আজকের সাধনা—



সভাতার-বেদী মূলে উৎসর্গীকৃত মানব ব্যক্তির ও সমাজের দৈহিক ও মানসিক শক্তির হোমায়ি। তাই বেশী করে আশ্চর্য লাগে যখন সমসাময়িক কৃষিকর মুগনোতা বিপরীত বর্ণী শোনায। তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে না পারার বিপর্য আশ্বাদের মনোভঙ্গিতে আশ্রয় লাভ করে। অহুশাচনা ও প্রার্থনার মধ্যে যে শক্তি উপাসনা নিষিদ্ধ তা আমরা সহজে বুঝতে চাই না, অন্ততঃ মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা নিজেদের জীবনে নিয়মাহুতী না হয়ে সমাজ রক্ষকের বক্তৃত্ত্ব অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারি নিজেদের শক্তিতে। তাই আমরা আশা রাখি যে কোন শক্তি আমাদের পরাজিত করতে পারবে না যদি আমরা অন্ততঃ সমশক্তিমানী হই। তার উপর বিহারের বা কোয়েটার কুমিল্পু আদ্যদের রূপ বা শ্রুত নিজেদের বা পূর্ববর্তীগণের কর্মকল নয়। সম্পূর্ণ কালনিক ভিত্তির উপর আশ্রয় করে আধির্নৈবিক ঘটনার সাপে মানব-জীবনের কর্মপ্রচেষ্টার সংযোগ ঘটান, অন্ততঃ অশ্রুত বলে মনে হয়। নাহর দাবী রাগে আজকের অক প্রকৃতিকে বজ্রতার আনতে, হয়ত তাকে বুর্তেও। মাহুতের নতুন বিজ্ঞানে হয়ত একত্রিত চক্ষুমানুজে পরিচিত হাবে। কিন্তু তবু তাকে স্রষ্টার ও জগৎস্রষ্টকের অজ্ঞত সেনানীকূপে ভাবতে আজও ছাড় যায় না। যেদিন মাহুতের জীবজগতের জ্ঞান বহু ছিল সেদিনের আধির্নৈবিক ঘটনা কি আজকের আধির্নৈবিকের সমরূপ ছিল না?

Cosmic শক্তির সঙ্গে মানবজীবনের ঘনিষ্ঠতা বুঝ নিকট। মূলরসাধারের সঙ্গে প্রতি পজের ও শাখার যে নৈকট্য তা দরবাহী নদের আপেক্ষিক। আমাদের মনে হয় প্রতি মাহুতের জীবনে নীতিও সমান আপেক্ষিক। নীতি নৈকট্য আনে মাহুতের সঙ্গে সর্বজন্যধারের, বিভিন্ন ভঙ্গীতে, ও বিভিন্ন গতিতে। সার্কজনীন নীতি মানবজীবনের অভিশ্রপমাঝ। তা বলে গীতার ধর্মেরও স্থান আছে যেখানে মাহুত তার নিজের মধ্যে সর্ব-শক্ত্যধারের আশ্রোপ করতে সমর্থ হয় ও কর্ম করে।

যেখানে কর্মপদ্ধতি ও নীতিবিচার শাস্ত্রোক্ত হ'তে পারে সম্ভব নেই।

মহাত্মা গান্ধীও যে নিজেও সার্কজনীন নীতিতে বিশ্বাসী নন, তা আমরা দেখি যেদিন তিনি বোরসাদে গিয়ে মেগপ্রান্ত মাছি ও ইন্দুর মারার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে নিজের আত্মবল্লীর কথা স্বর করেছিলেন। তিনি নিজের মধ্যে স্রষ্টার আরোপিত শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাই তাঁর অহিংসা রুটি তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চক্ষল করে।

মহাত্মদের পরবর্তী চেষ্টা হয়েছিল শান্তিস্থাপনে। এতে একমত হয়ে গিয়েছিল পাশ্চাত্যের বিধুত নব যুগ ও জয়যুক্ত জাতি। তাই সভা সমিতি ও নানাপ্রণার ছুট্টি। সেদিনের জগতের আশা আভ্যকের জগতের আশঙ্কা নয়, সেদিনের জগতের আশা আজকের জগতের আশা নয়। মুহমান মানবজাতি মহাত্মদের বিজীকাময় পরিণতি মর্মে মর্মে অহুত করেছিল—মাহুতের মনের যে কোপে অসমসাহসিকতার বাসস্থান তাও বিপর্যন্ত হয়েছিল তার জীবনের উপর প্রবাহিত নিষ্ঠুর কালবেশাণী রুড়ে। তখনও নন রুড় থেমে যায়, রুটির আনির্ভাব হয়। তখনও নন ভরাক্রান্ত থাকে। কিন্তু কবে শরৎপ্রভাতে কোন মারি কালবেশাণীর রুড় স্বর করে গাড়ে, নৌকা বেয়ে যায় না—কণ্ঠে ভাটমালী সুর নিয়ে? তাই শান্তিস্থাপনের সুর পাশ্চাত্য জাতির কণ্ঠে বেশীদিন সমালর পেলো না।

অস্বাভাবিক পারিপাখিকে যে বর্ণী স্বাভাবিক মনে হয়েছিল আজ তাই অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হ'চ্ছে। ইতালীর Duce সেদিন জলরগণীর স্বরে পাশ্চাত্য জাতির প্রাচ্যে উপনিবেশস্থাপন যে ধর্মের অধীকৃত তা বলতে শুরু করেছেন। এবং সকলের বিশ্বাস, ধর্ম সংস্থাপনায় হিতায় চ মুসোলিনী সব কিছু পণ করতে বাধ্যবদ্ধ হ'য়ে না। তার উপরে উপনিবেশের অধিপণীগণের প্রতি পাশ্চাত্যজাতির অনেক পালানীর কথা কর্ম আছে, থকা, তাদের শিক্ষাদীকার, স্বাস্থ্যের, ধর্মের,

রুটির, ধর্মের, সমাজের অধরূপ ব্যবস্থা। কথা—তাই কর্তব্যপরায়ণ ইতালী সহজে কর্তব্যভট্ট হ'তে পারেন না। আধিসিনিয়া প্রাচ্যের কালাজাতি—যার বাচার অধিকার স্বপরের অধগ্রহণাপেক্ষ। তাই যেদিন ইতালী আধিসিনিয়া মীমাংসার ভার লীগ অব নেশনকে দিতে নাজ হ'লে সেদিন আশ্চর্য হ'বার কিছু ছিল না। আমেরিকার ঔদাসীজ ও ক্রান্তের মনোভাব আমাদের প্রাচ্যের ভূখণ্ডের কথা স্বর করে দিয়ে দেয়। তবে আশার কথা ইংরাজ জাতি এই প্রেরের সমাধান জাতিসংঘ করতে চান। কিন্তু মুসোলিনী যে ভাবে ক্রত রণসজ্জায় ক্ষিত হ'চ্ছেন তাতে জাতিসংঘ যে বিশেষ সমাধানিত হ'য়েনো বলা যায় না। আধিসিনিয়ার যে রণসজ্জা তা আত্মরপের জন্ত, তাতে অপর কোন অসিদ্ধি নাই।

আজ ইউরোপীয়গণের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, যে প্রাচ্যে পাশ্চাত্য জাতির উপনিবেশ স্থাপন প্রাচ্যের কমাণে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্ত্র্যানে। কিন্তু যেদিন ইউরোপে আহার ও বাসস্থান না পাওয়ায় পাশ্চাত্য জাতি সারা প্রাচ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন সেদিনের মনোভাব কি আজকের অধরূপ ছিল? না নামনে প্রচুর আহার ও মনোভায় বাসস্থান পেয়ে ঠাণ্ডা স্রুতাঁর বোধ করেছিলেন? তবে ইতিহাস কষ্ট হয় শক্তিবানের অশূলি ছেলেনে তাই আজ প্রাচ্যে পাশ্চাত্য জাতির উপনিবেশ স্থাপন আত্মোৎসর্গ ও ধর্মের কারণ।

মার যেহাশীষ বহন করে 'চিরাণী' জয়গ্রহণ করেছে বাংলার জনপাত শ্রীমুক্ত শরচ্চল বস সার্ক দিন, বংসর পরে মুক্তিলাভ করেছেন। দেশবন্ধু দ্বিতিপুতঃ মরওভা সন্ধ্যা যে সাংবাদিক মণ্ডলী ঠাণ্ডাই হয়েছায়ায় গড়ে উঠেছিল তাঁর কারাবরণের পর সেই মণ্ডলী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেও জাশানাল নিউজ-পেপার্স' মিটিংটেডের জয়বর্ধননে প্রতিষ্ঠানে বহু কল্পী আশ্রয়লাভ করেছে এবং ঝাড়া জাশানাল নিউজপেপার্স' মিটিংটেডের সেবায় রত তাঁদের মধ্যে দুই একজন



[ কণা গীতা বহুর দৌলজ্ঞ ]

পিতৃহাছের পর কানিয়ায় অস্ত্রীপাশবাসে আশ্রয়-রত

### শরচ্চল বহু

ব্যতীত, নিরতন কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্যন্ত, সকলেই তাঁর স্থপরিচিত ও স্নেহমুদ্র। একদিন তাঁরই অকৃত্য পরিশ্রমে, প্রযোজ্য ও অজ্ঞ অর্থব্যয়ে বাংলায় তিনখানি দুর্ভিক্ষ সাংবাদপত্রের বহল প্রচার হয়েছিল। নিয়তির দুর্জয় পরিহাসে আজ সেই ত্রী-সাংবাদপত্র-সম্মুখি ছিন্নভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। তাঁহারই স্নেহচ্ছায়ায় ঝার সাংবাদিক জীবনের স্বরূপাত, তাঁর প্রচেষ্টার ক্ষুদ্র হলেও বাংলায় 'খোলালী', 'ভারাইটিন্' ও 'চিরাণী' সমন্বয়ে ত্রী সাংবাদপত্রের সৃষ্টি হয়েছ



ও পুষ্টি সাধন হয়েছে। অতীতে আমাদের বহু কুল ভাঙি হয়েছে স্বীকার করি। বাংলায় রাজনীতিক্ষেত্রে তাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ শুভকামনা করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। উপদলগত সংকীর্ণতার উপরে থেকে শরৎচন্দ্র দেশের ও দেশের সেবার আত্মনিয়োগ করন এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

**লাহোরে** শিখ মুসলিম সংঘর্ষ আমাদের জাতীয় জীবনের যে গ্যাংরিপ হ'তে উদ্ধৃত তা আজ আমাদের অস্থিমজ্জা আক্রমণ করেছে। জাতীয় পৌরবর্মণ স্বয়ং

সবল জীবন তাই আমাদের পক্ষে দুসাহায্য। নাহুকের ধর্ম-জীবনের যে প্রেরণা তা মূলতঃ আধ্যাত্মিক। লৌকিক জীবনের সুবিধাবাস্তবের মধ্যে তার কোন সম্বন্ধ নেই। সামাজিক জীবনে যে ধর্মের প্রভাব তাও সম্পূর্ণ লৌকিক ও আপেক্ষিক। কিন্তু যেদিন অবস্থাগতিকে মাছবকে তার প্রাণের ধর্মের বহিত তার সামাজিক-রাজনৈতিক, ও কর্ম জীবনের অসিদ্ধির সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে হ'ল

যেদিন তার ধর্মের প্রতি যে দরদ তা উপলব্ধির আলোয় প্রতিভাত হয়ে উঠল না। প্রাণহীন ধর্মের অমূল্যত্ব তার দৈনিক অমূল্যত্ব হয়ে উঠল।

সম্ভবতঃ জীবনে যে ধর্মের অমূল্যত্ব ঘটে না তা বলি না। তবে যতক্ষণ সে সামাজিক ও রাজনৈতিক জাতি বলে পরিগণিত না হয় তিক ততক্ষণই সে ধর্মকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে। বাহিরের প্রতিষ্ঠার ফলে জগতে কত ধর্মদ্রব্দ সম্ভব হ'ল। শ্রবণীয় হ'লেও তারা কেউ পৌরবর্মণ নয়। ধর্মের বাধী আত্মপ্রতিষ্ঠার, কল্যাণের, আর সেটা সম্পূর্ণ অর্থমুখী—আর ধর্মের বাধী আত্মপ্রসাধনের, ধ্বংসের, আর তা সম্পূর্ণ বহির্মুখী।

ভারতের নব-অত্মদায়ী আজও যে জাতির ধর্মব্রতী গুলল না, তার কারণ আমাদের মধ্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা এখনও সম্ভব হয়নি। জাতীয় জীবনে মন্দির, মসজিদ বা গুরুদ্বার কোন বিশেষ সমজ্ঞা নয়—আমরা যে দেশ-মাতৃকার মন্দিরতলে নিশতে চাই তা তথাকথিত লৌকিক ধর্মের সাহায্যে নয়, শুধু জাতীয় জীবনের অমূল্যপ্রেরণায়।



### চিত্র-পরিচয়

**প্রজ্জ্বপট**—এই ছবিখানি একজন বৈদেশিক চিত্র-শিল্পী অঙ্কিত ইরানি মাস্কুর্ডি।

**ত্রির্ঘর্ষ চিত্র**—৩য় : কর্মতার রটান মোতে গুলিবার বৃক্ক আদিয়া আশিত্তে—আমাদের দ্ব্যে মজ্জা কবিকের জন্য তুলাইয়া দিতে।

পিস, ১০শি, হাজরা রোড "বেঙ্গালী প্রেস" প্রিন্টিং প্রেসে প্রিন্ট করা হয়েছে।  
২। হামমর রোড হইতে প্রকাশিত।



পাথ ও পাথ-সারথি

"কর্মতঃ অমরদৌরলোভা ত্যক্তোদ্ধিত পরম্পরা"

শিল্পী : রামেন্দু নাথ চক্রবর্তী

মুদ্রণ : বেঙ্গালী প্রেস



কলিকাতা শিল্প ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৩/এন, টামার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯



পরিচালক—গ্যাশনাল নিউজপেপাস লিমিটেড

সম্পাদক—শ্রীমুনোন্মদ নাস্তা

প্রথম বর্ষ

ভাঙ্গ-১৩৪২

চতুর্থ সংখ্যা

## ভারতচন্দ্র—সঙ্গীত-পণ্ডিত

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

যারা আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে আমি ভারতচন্দ্রের একজন অকপট admirer। এখানে আমি উক্ত ইংরাজী শব্দটি ব্যবহার করব, কারণ আমি উক্ত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ জানিনে। Admirer-এর অর্থ যে ভক্ত নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইংরাজরা এদেশে ভাগমন করবার পূর্বে বাংলায় বহু culture বলে কোন জিনিষ থেকে থাকে, তাহলে ভারতচন্দ্র ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন highly cultured ব্যক্তি।

ভারতচন্দ্র এই বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন :—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।

অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥

পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারদী ॥

(মানসিংহ)

এ সবই culture-এর অঙ্গ। বলা বাহুল্য যে আমাদের মত ইংরাজীশিক্ষিত লোকদের culture তাঁর তুলনায় হীন। এ প্রবন্ধে আমি তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় কিংবা আলোচনা করব। এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য,

আজ থেকে প্রায় দু'শ' বৎসর পূর্বে বাংলায় কি জাতীয় সঙ্গীতের চর্চা ছিল, তারই পরিচয় লাভ করা। বাংলায় আজকাল সঙ্গীতশিক্ষার মরশুম পড়েছে। এখন ভাষাশিক্ষার মত, সঙ্গীতশিক্ষার কথা উঠলেই ব্যাকরণশিক্ষা লোকের মনে করে অপরিহার্য। নইলে হৃদয়সিঁদ্বি স্বপ্নবস্তুর জ্ঞান হয় না;—অর্থাৎ যে সব স্বর ও বাজ্ঞন আমাদের মুখেও নেই, কাণেও নেই। সঙ্গীতের ব্যাকরণ হচ্ছে সঙ্গীতশাস্ত্র। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীতের ব্যাকরণের চর্চা সূত্র হয়েছে। হেলেবেলায় বোধহয় শিঙবোধ ব্যাকরণে পড়েছিলাম যে “যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বাহুল্য ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে ও কহিতে পারা যায়, তাহার নাম ব্যাকরণ।” বাংলা ভাষা ও বাংলা গানকে শুদ্ধ করবার ঐক্য আমাদের অদ্বয়।

(২)

ভারতচন্দ্র সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন কি না জানিনে, তবে তাঁর যে সে শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল, তার প্রমাণ তিনি সরস্বতীবন্দনায় লিখেছেন যে—



ছত্রিশ রাগিনী মেলে ছয়রাগ সরা খেল  
অছয়রাগ যে সব রাগিনী  
সমুদ্রের তিন প্রাণে মূর্ছনা একুশ নাম  
শ্রুতি কলা সত্যত সঙ্গিনী ॥  
তান মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়াকাল  
তোমা হইতে সকল নির্ণয় ॥

(অরদামঙ্গল)

“নেল” “মূর্ছনা” “শ্রুতি” “ক্রিয়াকাল”, এগুলি সবই শাস্ত্রের কথা। বিশেষতঃ “মূর্ছনা” ও শ্রুতি নিয়ে সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিচারের আর অস্ত্র নেই। ও দুটি বিষয়ে বাগবিশ্বার করবার আমি অধিকারী নই। তবে এইটুকু ভুল বুঝতে পারি যে, মূর্ছনা নীড় নয়, আর তার সংখ্যা যে তিনি একুশ বলেছেন, এ কথা শাস্ত্র-সম্মত। তারপরে তিনি বলেছেন যে বিচার সখীপাণ।

“আরম্ভ করিল গীত যবের বাজন।

প্রস্তাব মূর্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিলাইয়া।

সঙ্গীত পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া।”

(বিদ্যামঙ্গল)

“প্রস্তাব মূর্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিলাইয়া”—এ সব কথাই অর্থ আমি বুঝি নে, কারণ আমি সঙ্গীতে পণ্ডিত নই। আমাদের সঙ্গীতে “শ্রুতি” হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা;—যে কথার জোরে আসত্য অ-হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উপর টোকা দিই। আর উক্ত শব্দের অর্থ বোধহয়, সেই ধনি যা আমাদের শ্রুতিপাচর নয়। সে যাই হোক, মূর্ছনার সংখ্যা একুশ, শ্রুতির বাইশ। সার গানের এই সব ভগ্নাংশের বিচার গণিত শাস্ত্রীরা করেন।

( ৩ )

সঙ্গীত সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেও, ও বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান না থাকতেও সম্ভব। কেননা পানবাঞ্ছনা চোপের বিষয় নয়, কাণের বিষয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের জ্ঞান শুধু সংস্কৃত পুঁথিপড়া বিজ্ঞে নয়, কারণ তিনি নিত্য পান বাঞ্ছন ওনতেন। কলকাত্তের সত্য তাল তাল গাইয়ে বাসিয়ে ছিল যথা :—

“কালোহাং-গায়ন বিশ্রাম থা প্রভৃতি  
মুদঙ্গী সমবধেল কিরয় আকৃতি  
নটক-প্রান সেরামুদ সত্য  
মোহন খোখাল চন্দ্র বিজ্ঞাধর প্রায়।

(অরদামঙ্গল)

নৃত্যগীত ও বাদ্য এই তিনটেই হচ্ছে হিন্দু সঙ্গীতের তিনটি অঙ্গ; আর কলকাত্তের সত্য পায়ক ও ছিল, বাদকও ছিল, নটকও ছিল। ছিল না শুধু নটকী। আর এরা কেউ পাড়াগায়ে গাইয়ে বাজিয়ে নন। বিশ্রাম থা প্রভৃতি ছিলেন কালোহাং, সমবধেল মুদঙ্গী, সেরামুদ ও মোহন খোখাল চন্দ্র নটক। যারা মনে করেন যে, হিন্দু সঙ্গীতকে মুসলমানরা জবরখল করে নিয়ে নিজেদের “রগনা” করেছে, তাঁরাও তখন মনে সোয়াস্তি পানেন যে, উপরোক্ত চারজনের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন ছিলেন মুসলমান। চতুর্থ ব্যক্তির নাম তখন মনে হয় তিনি মুসলমান না হলেও অ-বাঙ্গালী,—হয়ত পাঞ্জাবী। বাঙ্গালীর নাম কি খোখালচন্দ্র হয়?

তাঁরা ছাড়া সেকালে যে সব যবের রেওয়াজ ছিল, তাদেরও নাম বিদ্যামঙ্গলের পাওয়া যায়। যথা,  
“বীণা বাঁশী তবুধা রবাব কপিনাশ  
বাজাইয়া সমুদ্রেরা স্বরের প্রকাশ।”

(বিদ্যামঙ্গল)

বীনকর রবাবী সব ত উঁচুদের বাজিয়ে এবং সম্ভবতঃ অ-বাঙ্গালী। এর থেকে অহমান করছি ভারতচন্দ্রের শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল, সঙ্গীতের কাণও ছিল।

( ৪ )

আর এক কথা, অরদামঙ্গল একদানি গীতিকাব্য। কলকাত্তের আদেশে ভারতচন্দ্র এই গীতিকাব্য রচনা করেন। অরদামঙ্গলের গ্রন্থাঙ্কেই ভারতচন্দ্র বলেছেন যে কলকাত্তকে :—

অরপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া।

স্বপন করিল মাতা শিয়ার বসিয়া।

সত্যসদ তোমার ভারতচন্দ্র নয়।

মহাকবি দ্বিজদাস আমার দয়ার।

ভূমি তারে রায় গুণাকর নাম দিছে।

রচিত আমার গীত সাধকে কহিয়ে।

(অরদামঙ্গল)

তারপরে স্বয়ং অরপূর্ণা ভারতচন্দ্রকে :—

স্বপনে রজনীশেষে বসিয়া শিয়র বেশে

কহিয়া মঙ্গল রচিবারে

সেই আজ্ঞা শিরে বহি নুনে মঙ্গল কহি

পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ॥

(অরদামঙ্গল)

আর ভারতচন্দ্র অরপূর্ণার কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন—

“পায়কের কণ্ঠে কর বাস।”

এর থেকে অহমান করছি তিনি পায়কও ছিলেন। একই ব্যক্তি যে যুগপৎ কবি ও পায়ক হতে পারেন, বীৰশ্রাব্য তার প্রমাণ। আর এ গীতিকাব্য কি ভাবে গাইতে হবে, তাও স্বয়ং অরপূর্ণাই বলে দিয়েছিলেন, কারণ তিনিই :—

“কয়ে মিলা পঙ্কতি গীতের ইতিহাস।”

কি পঙ্কতিতে যে অরদামঙ্গল গীত হয়েছিল তা আমরা জানি নে, তবে অহমান করছি যে কীর্ত্তনরূপ নয়। কারণ রায়গুণাকর যে কীর্ত্তনের সুবক্তা ছিলেন, তা তাঁর কীর্ত্তনের বর্ণনা পড়ে মনে হয় না। যে বর্ণনটি আমি নীচে উদ্ধৃত করে বিধি :—

কীর্ত্তনিয়াগ সঙ্গে গান করে নানা সঙ্গে

বালা গোষ্ঠী লানবেশ রাস

পূৰ্ণর রসাদার মাথু বিরহ আর

হরিতকি যাহাতে প্রকাশ ॥

বাজে বোল করতাল কেহ বলে তাল তাল

কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ

কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ

কেহ তারে ধরে ধরে কোল।

উঁহুকে উঁহুপানে কেহ নাচে প্রেমমদে

কেহ বলে হরি হরি বোল ॥

( ৫ )

অরদামঙ্গল যে গীতিকাব্য, সে কথা কবি তাঁর প্রথম কাব্য অরদামঙ্গলের প্রথমে বলেছেন, আর তাঁর শেষ কাব্য মানসিংহের শেষে বলেছেন। উপরক্ত এ কাব্যের পায়কের নামও উল্লেখ করছেন। কবির নিজের কথা এই—

সেই এই অর মঙ্গলার অহসারে ॥

অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥

উড়সাই নীলমণি কণ্ঠ অতরন ॥

এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥

এই স্পষ্ট প্রমাণ যে, অরদামঙ্গল সেকালে গাওয়া হত।

তবে আমরা গান অর্থে যা বুঝি, সে অর্থে এত বড় গুপ্তক গান নয়। তাতেই মনে হয় যে, বইখানি স্থর করে পড়া হত। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, তাই কেউ কাব্য লিখলে কেণও গুপ্তকবাচক তা পাঁচজনকে পড়ে শোনাতেন,—অবশ্য কিঞ্চিৎ সুরসংযোগে। এই পঙ্কতির নাম বোধহয় পাঁচালি গাওয়া। পাঁচালি গানের কোন শাস্ত্র নেই, সুতরাং তার রাগ তাল আমরা জানিনে। নীলমণি নামক পায়কটি কে, তাও আমরা জানিনে। উড়সাই বোধহয় তাঁর উপাধি, আর কণ্ঠ—অভিন্ন তাঁর যেতাব। এর থেকে অহমান করছি যে, তাঁর গানের গলা ছিল, আর তিনি যে রীতিতেই গেয়ে থাকুন, তাও চং কীর্ত্তনীও নয়, কালোয়াতিও নয়।

সে যাই হোক, অরদামঙ্গলে দেবার গান আছে, যা যুগপৎ রাগ ও তাল সম্বলিত। এ বাংলা গানগুলি ভারতচন্দ্রের স্বরচিত, আর স্থর তাঁরই দেওয়া। সেগুলির একটি কণ্ঠ দিচ্ছি :—তার থেকে দেখতে পানেন, প্রায় সবগুলিই আমাদের কাছে—অর্থাৎ বাঙ্গালীদের কাছে—স্বগরিষ্ঠিত, অন্ততঃ নামে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যদি হিন্দুস্থানী গানের অংশলীন ব্যতীত বাঙ্গালার সঙ্গীতের মোক্ষলাভ না হয়, তাহলে সে অংশলীন বাঙ্গালী অনেক কাল থেকে করে আসছে;—তাহলেও বাঙ্গালী গান তার স্বধর্ম হারায়নি। সে স্বধর্ম কি?—That's another story.

এই ক্ষুদ্র খেঁকে দেখা যায় যে, এর অধিকাংশ তাল, দ্রুত অর্থাৎ চুইরা জাতীয়।



## ভারতচন্দ্রে রাগতাল

রাগ	তাল	রাগ	তাল
সাহানা মল্লার	কৃত্ত জিতালী	তোড়ী ভৈরবী	কৃত্ত জিতালী
ইমন ভূপালী	একতাল	দেও বিভাস	রাগতাল
রামকেশী মিশ্র	কৃত্ত জিতালী	পিলু বারোয়া	ঠুংরী
তোড়ী	একতাল	ভৈরো মিশ্র	একতাল
মালকোষ	আড়া	যোগিঞা ভৈরো	কৃত্ত জিতালী
বসন্ত	রাগতাল	খাখাজ	ঐ
মূলতান	দাদরা	লুম	একতাল
পরজ	ঠুংরী	বসন্তবাহার	কৃত্ত জিতালী
খট	পোস্তা	বেলাবলি মিশ্র	ঠুংরি
পুরবী	কৃত্ত জিতালী	দাখাজ	একতাল
সিঁসিউ	একতাল	পুরবী	ঠুংরি
গোড় সারঙ্গ	ঠুংরী	সিঁসিউ	একতাল
লুম সিঁসিউ	কৃত্ত জিতালী	পিলু বারোয়া	ঠুংরি
বেহাগ	একতাল	কুপ কল্যাণ	কৃত্ত জিতালী
ভূপালী	একতাল	খাখাজ	মরাদান
পুরবী	কৃত্ত জিতালী	পিলু	দাদরা
সোহিনী বসন্ত	কৃত্ত জিতালী	সিঁসিউ	কৃত্ত জিতালী
বিভাস	ঠুংরী	তোড়ী	ঐ
ভৈরবী	কৃত্ত জিতালী	লুম সিঁসিউ	পোস্তা
সিঁসিউ	একতাল	দেও বিভাস	একতাল
আশা ভৈরবী	ঠুংরী	সিঁসিউ খাখাজ	কৃত্ত জিতালী
ঐ	ঐ	যোগিঞা মিশ্র	ঐ
শঙ্করা	কৃত্ত জিতালী	পরজ	কৃত্ত জিতালী
কালান্ডা	একতাল	খট ভৈরবী	ঐ
ভৈরবী	ঠুংরী	মালকোষ ভৈরো	রাগতাল
হাথীর	একতাল	ভীমপল্লী	কৃত্ত জিতালী
কেন্দুয়া	কৃত্ত জিতালী	পিলু সিঁসিউ	একতাল

## ইরাকে

( মদন কাহিনী )

কীহেমচন্দ্রে প্রসাদ ঘোষ

( পূর্ণপ্রকাশিতের পর )

( ৪ )

পরদিন ( ২২শে এপ্রিল—২ই বৈশাখ ) আমরা আবার যাত্রা করিলাম।

নদীর উত্তর কূলে যষ্টমধুর কোণ—মাঠে ঘোড়া, গরু ও ঘেঁষ চরিতেছে, মধ্যে মধ্যে মস্কভুমির আরব অধিবাসী—দিককে দেখা যাইতেছে। অদূরে গ্রাম দেখা যাইতেছে—আর আরবদিগের ঘূর্ণ। এ দেশে সকল গ্রামেই ঘূর্ণ দেখা যায়। ঘূর্ণ বলিলে কেহ যেন কলিকাতার কোট উইলিয়ম অথবা দিল্লীর বা আগার ঘূর্ণ মনে না করেন। মুংপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত কতকটা স্থানেই ঘূর্ণ—দুয়ার আক্রমণ কালে গ্রামবাসীরা তাহার মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়; আর প্রাচীর হইতে গুলী চালাইয়া হয়। এইরূপ ঘূর্ণের প্রাচুর্য্যেই এ দেশের অস্থির অথবা সঙ্গ্রাম।

আমরা আলি মারগী অতিক্রম করিয়া যাইলাম।

টাইগ্রীস নদী বাকিয়া বাকিয়া গিয়াছে; কূলে অনেকটা স্থানে সেচ সম্ভব হইয়াছে। যে দেশে সেচের এত সুবিধা সে দেশে যে কৃষিকার্য্য দেশকে সমৃদ্ধ করিতেছে না, ইহা বিশেষ ক্ষুণ্ণের বিষয়, সন্দেহ নাই। ইহার কারণ—কুশাসন। দেশে যদি মাল্লয়ের ধনপ্রাপ্ত নিরাপন্ন না থাকে, তবে দেশে কখন কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনে লোকের উৎসাহ হয় না—সভ্যতারও বিকাশ হয় না।

আমায়ার অবস্থানকালে বাঙ্গালী সেবকবাহিনীর যে বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা অবলম্বন করিয়া একটি ছোট্ট গ্রন্থ লিখিয়া জাহাজে সময় কাটাইতে আরম্ভ করিলাম।

পরদিন প্রভাতে নীচে নিম্না তরু হইল। বসোরায় উপনীত হইবার পর হইতে কখন এমন শৈত্যময়ত্ব করি নাই। দূরে পারস্যের অধিকারে পুষ্টিকো পর্ব্বত-মালা মেঘের নত লঙ্কিত হইতেছিল। বোধ হয়, তথ্যার গুটি হইয়াছে। উত্তীর্ণা গরুটি শেষ করিলাম। আমাদিগের দক্ষিণে নদীর কূলে মাইলদ্বয় পর যাইল বাধ, পরিণা আর ইংরাজ পক্ষের সৈনিকদিগের কবর। এই অঞ্চলে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—সমগ্র দেশ রণক্ষেত্র ছিল। ফাও হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ইংরাজকে অগসর হইতে হইয়াছিল—জয় ও পরাজয়ের মধ্য দিয়া সময় কাটিয়াছিল। জয়ের পশ্চিম বাগদাদের পতনে। একদিন বাগদাদের পথে প্রাচী জয়ের বলবতী বাসনা নেপোলিয়ানকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ত ইংরাজ বাগদাদে রাজদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজও ইংরাজ দূতের গৃহপ্রাচীর-সম্বন্ধ প্রান্তর-ফলকে তাহা লিখিত। আর পরাজয়? পরাজয়ের ইতিহাস—কুটে আহার্য্যভাবে অবরুদ্ধ সেনাদল সহ ইংরাজ সেনাপতি টাউনসেন্ডের তুর্কদিগের হস্তে আত্মসমর্পণে সঙ্গ্রাম। জয়পরাজয় যুদ্ধে অনিবার্য্য। ইংরাজ সশস্ত্র একমাত্র ইংরাজ-রচিত পুস্তকে লিখিত আছে, ভারতবাসীরা তাহাদিগের প্রাণ দিয়া এ দেশ ইংরাজের জন্ত জয় করিয়াছিল। কুটে যাহারা তুর্কদিগের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কতজন বাঙ্গালী যুবকও ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই নবদেশে বন্দিত্বশায় প্রাণ হারাইয়াছিল।



জাহাজে একটি লুইস অটোপান ছিল। এই কামানটির এক এক চক্রে ৪৭টি টোটা থাকে—সুতরাং কত দ্রুত ইহা হইতে গুলী ফিল্পিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। জাহাজের কন্দচালীরা আমাদিগকে তাহার গঠন ও ব্যবস্থা দেখাইয়া দিলেন।

সকাল ৮টার সময় আমরা শেখসাদে উপনীত হইলাম। জাহাজ কুলে ভিড়িবার সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। কুলে যাইয়া জাহাজের কাছি ধরিয়া, জাহাজ বাঁকিবার জন্ত যে কয় জন খালসী নানিয়াছিল, তাহা-দিগের মধ্যে দুই জনকে পাওয়া গেল না। টাইগ্রীসের ধরস্রোত তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার কোন দেশের লোক তাহা জানিতে কোতুলস হইলেও কোতুলসপরিভূষণ কোন উপায় করিতে পারিলাম না; কারণ, সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। জাহাজে তাহার তাহাদিগের সংখ্যার হারাই পরিচিত ছিল। কিন্তু এই সব নদীগামী জাহাজে খালসী খালসীর অভাব নাই—ইহারা ভারতবর্ষ হইতে জাহাজের সঙ্গে আসিয়াছে। খালসী খালসীরা সবই পূর্ববঙ্গের মুসলমান।

শেখসাদে বিরাট তাজু শুকাবার। তাজু বলিলে ট্রিক হয় না; কারণ, ইহা কেবল তাজু হইতেছে। এখনও এই স্থানে প্রায় ১০ হাজার লোক—অংশাংশ সৈনিক, অপরাক্ত তাহাদিগের সঙ্গী—সামরিক প্রয়োজনে নিরুজ্জ্বল। সহস্রের অস্ত্র অবিবাসী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবিবাসীরা গৃহ তাগ করিয়াছে—সামরিক প্রয়োজনে সে সব অধিকার করা হইয়াছে এবং আরও অনেক কুটীর নির্মাণ করিতে হইয়াছে। সহস্রটি ধূলিগূর্ণ।

এই স্থান হইতে কুটে সমর-সরঞ্জাম প্রেরিত হইত। এখন বন্ধিস্থায় বন্দীদিগের মধ্যে কয় জন আকজিরিয়ান দেখিতে পাইলাম। ইহার তুর্কিদিগের সেনাদলে ছিল। কয়টি আরব কামান ও ইংরাজদিগের কতগুলি কামান দেখা গেল—শেখোক্তের মধ্যে কয়টি লুইস গান ছিল।

এখন রেল লাইন জুলিয়া ফেলা হইয়াছে—অবশিষ্ট সমর-সরঞ্জাম পাঠাইয়া দেওয়া চলিতেছে।

সর্বত্র যুদ্ধের ও অপ্রত্যাশিতভাবে স্থান ত্যাগের চিহ্ন বিজ্ঞমান। পশ্টুনবোটি অর্থাৎ জাহাজ হইতে নানিবার নৌকা, ভয় যান, শূণ্য পাত্র, বরফের কল, কাঁটা তার ও খুঁটি, জল জুলিবার পাশ্প—পড়িয়া আছে। কেবল এই স্থানেই নহে—এ অঞ্চলেই এইরূপ দৃশ্য।

কুট শূন্য—যেন শ্মশান। যে স্থানে অবশুক রূটি-বাহিনী দিনের পর দিন সাহায্য প্রার্থিত আশায় অনাহারে দিনপাত করিয়াছে—এরায়েনের জন্ত আকাশের দিকে চাহিয়াছে, রূটিশাহিনীর দুঃপাণ্ড বাক্ষরানি উনিবার জন্ত উৎকর্ণ হইয়া ছিল—সে স্থানে “শাকি সব নিবর”—কেবল তাজু পরিবায় সেই তুর্কিদের স্মৃতি রহিয়াছে। এই সব পরিবায় মৈনিকরা শত্রুদের অধিবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত আশ্রয় লইয়াছিল।

এই দিন সন্ধ্যা হইল। কড়ের সঙ্গে রুটি নাই—আছে কেবল ধূলি—তাহাতে দিক অন্ধকার হইয়া যায়। এই কড়ের ফলে এ দেশের দারুণ তাপ প্রশমিত হয়।

পরদিন যখন প্রভাত হইল, তখন দেখিতে পাইলাম, টাইগ্রীসের সঙ্গীর্ভা আর নাই, বিস্তার বন্ধিত হইয়াছে—মলিন জলরাশি প্রবলভাবে বহিয়া যাইতেছে। নদীর উভয় কুলে গ্রাম। গ্রামে কিছু চাষ আছে। ধানসে রূপ হইতে ঢাকা বুঝাইয়া জল কুলা হইতেছে। কুলে অর্ধজন লোকেরা ভিক্ষার্থী হইয়া ছুটিতেছে। আর্য ভাত অগ্রসর হইতে লাগিল। তুর্কি দেশের নিরাভরণ ভাত দূর হইতেছে, দেখিতে পাইলাম—বৃক্ষলাতা ও শতশ্রেণে দেখা যাইতে লাগিল।

দূরে পাহাড়ের মত বিলকিত হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ টেঁসিকনের ভগ্নাংশ। আমাদিগের অমুরোখে জাহাজের ভারপ্রাপ্ত কন্দচালী টেঁসিকনে জাহাজ অন্ন সময়ের জন্ত থামাইতে সক্ষম হইলেন।

টেঁসিকনে এই ভগ্নাংশেই বিশ্বযুদ্ধের পুরাকীর্তি।

তার—১৩৪২]

শ্রীহেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

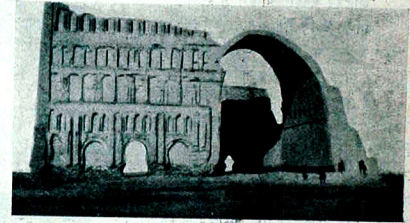
বাগদাদ হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে টাইগ্রীসের তটে অবস্থিত এই নগর ভারানেস নামক এক জন পাখিয়ান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই কিয়দন্তী। কিন্তু এই ভারানেসের সখ্যে ইতিহাসে নির্ভরক—ইহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। নদীর পরপারে সেলিউকা নগরের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সমৃদ্ধিও হইয়া গিয়াছিল। নূপতিরা প্রথমে ইহা শীতকালে বাস জন্ত ব্যবহার করিলেও পরে, ইহাই স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত করেন। পাখিয়ানদিগের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সমৃদ্ধিও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর পারস্যের সামান্যদিগের রাজত্বকালে ইহা নূপতিগণের শিকার জন্তও প্রমোদ-কমনক্ষেপে ব্যবহৃত হইত। যখন রোমের সম্রাট সেভারাস (২০২ খৃষ্টাব্দে) ইহার অধিকার করেন, তখন ইহার লোকসংখ্যা যে অধিক ছিল তাহার প্রমাণ, এই নগর হইতেই

৩ ১ শত ৫০ ফিট উচ্চ ছিল। গৃহের সমুদে অলিম মন্দিরনিষ্ঠিত ১২টি স্তম্ভের উপর রচিত ছিল।

ঘিলান করা। দূরটি প্রস্থে ৭২ ফিট ও ৮৫ ফিট উচ্চ।

ইহা স্বর্ণের গঠনভারী ছিলে শোভিত ছিল।

দেখিবা মনে পড়িল, ললিতগিরির শিখরদেশে “রুকিতপ্রোথিত ভয়াবহীষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্তিরাশি” দেখিবা বন্ধনচক্রে লিখিয়াছিলে—



১০ হাজার লোককে যুদ্ধ বন্দী করা হইয়াছিল। ২৩০ খৃষ্টাব্দে ইহা শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত ও পরে ইরাকের এক জন প্রসিদ্ধ সৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হয়। ইহার পর সম্রাট জুলিয়ান এই স্থানে যুদ্ধ জয় করেন ও কিছুকাল টেঁসিকনে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আরব সেনাপতি সাদে যখন ইহা অধিকার করে, তখন তিনি যে ঐশ্বর্য্য হস্তগত করেন, তাহার এক-পঞ্চমাংশ বলিফক দিয়াও তিনি তাহার ৬০ হাজার মৈনিকের প্রত্যেককে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার টাকা দিতে পারিয়াছিলেন।

এখন ক্ষুদ্রস্তুপের মধ্যে একটিনাশ গৃহ দণ্ডায়মান। রৌদ্রকট ইষ্টকে রচিত এই গৃহই এখন টেঁসিকনের পূর্ব-প্রাণের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ইহা সম্রাট চশারেশের সিংহাসন ও ঘিলান বলিয়া পরিচিত। সম্পূর্ণ গৃহটি নাকি ৪ শত ৫০ ফিট দীর্ঘ, ১ শত ৮০ ফিট প্রস্থ

টেঁসিকন,

“পাতর এমন কেরিয়া যে পাশিল করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে পাখিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তি সকল যে কোঁসিয়াছিল—এই দিবা-পুষ্পালাভ্যভরণভূষিত, বিকশিতচোলালগ্নপ্রবন্ধসৌন্দর্য্য, সর্বাঙ্গসম্পন্নগঠন, পৌকুমের সহিত লাভাশের মূর্তিমান শিল্পিন ব্রহ্মপুত্রসমূহে বাহার্য্য গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোণপ্রেরণসর্বসৌভাগ্যমুখিতাবরা—চীনাশ্বরা, তরলিতরহারা-শীতবর্ষ্যবনভারাবনতদেহা—

তথী শ্রামা শিখরশনা পঙ্কবিধারোজা

মধ্যে শ্রামা চকিতহরিপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি—

এই সকল শ্রীমুখিতা গড়িয়াছে, তাহা কি হিন্দু? ”

আজ যে সকল সম্রাটমিতানী জাতি পৃথিবী জয়ের দূরশায় সাম্রাজ্যবাদের দিগদামনমন্ত হইয়া মনে করে,



সভ্যতার তাহারা ই নিম্নতা তাহারা দুসিয়া যায়, কাল-সমুদ্রের বেলাবানুবিচারে কত-জাতি কীর্তির স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে। কাহারও কীর্তির চিহ্নমাত্র না রাখিয়া কালসমুদ্রের তরঙ্গমালা তাহা ধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে; কাহারও কীর্তির সামান্য চিহ্ন আজও বিমোহন—সে সকল দেখিয়া আমরা বিষয়ে নিমগ্ন হই। বাঙ্গালার কবি হেমচন্দ্র এক দিন ইহা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছিলেন:—

“জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি;

আলিল উন্নতি-স্থাপি অক্ষয়ের ভাতি—

অকুল অবনীতলে এখনো মহিমা জলে,

কে আছে সে নরধ্বজ কুলে দিতে বাতি?

এই কি কালের গতি—এই কি নিয়তি!”

ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে কি ইহাই বলিতে হয় না? দিল্লীর উপকণ্ঠে যে শৌভম্য বর্ষার বারিধারা, নিদাম-স্বর্ধার কিরণ, জন্মাবত, করকোপাত সব সহ করিয়া কত কাল ঝাঁড়াইয়া আছে, তাহা কৃতদিনের তাহা কে বলিবে? কাল তাহার পাশ্বে দোষটিও অঙ্কিত করিতে পারে নাই। অজ্ঞতা, ইলোরা, কালি—এই সব হানে ডহানিমির কি অসামান্য শিল্পকৌশলই পতিত প্রদান করিতেছে। উড়িয়ায় কাককর্মাধর্মিত প্রান্তর দেউলের বৃহদাকার প্রস্তরগুলি নিরুপে উচ্চ উচ্ছালিত হইয়াছিল, তাহা প্রতীকার স্বপতিরা এখনও স্থির করিতে পারিতেছেন না।

চৈনিকনে এই প্রাসাদাবশেষ দেখিলেও বিম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়, বাহারা এইরূপ বিরাট বিলান গঠিত করিয়াছিল, তাহাদিগের সভ্যতা কত প্রাচীন? গৃহাদেশে দেখিলে যেমন কলোনিয়মের কথা মনে পড়ে।

বুঝোময় পতিতদিগের চেঁচায় ইরাকেও পুরাবস্তুর সুস্থান মিলিতেছে—অশ্বস্থান আরও অগ্গর হইলে, বোম্ব হই, প্রাচীন সভ্যতার বরুণ বৃষ্টিতে পরা যাইবে।

চৌলকন ছাড়াইয়া আমরা বৃত অগ্গর হইতে লাগিলাম, ততই নদীর দুই কুলে কবচিগের ক্ষেত্র

দেখা যাইতে লাগিল। ইহাতে বুঝা গেল, কুবীর অধিকারে বাগদাদ ইরাকের রাজধানী ছিল বলিয়া তাহার নিকটবর্তী স্থানে কতকটা শাসনপ্রভাব অস্বত্ব হইত এবং লোকের ধনপ্রাণও নিরাপত্ত থাকার সুবিধাও লোক মন দিত। বসোয়ার নিকটবর্তী ভূমি একে মরুর বাস্তুবিস্তার, তাহাতে আবার সেই দুই প্রদেশে শাসকরা শাসক-সম্বীর চাষের জন্য জমীর অধিকার আদায় করিতেন—সর্বোপরি সম্মত স্বত্বের উপভোগ অধিক ছিল; এই সকল কারণের সমন্বয়ে দেশ শ্রীহীন ও শেখাবাসীরা দরিদ্র ছিল এবং তাহাদিগের দারিদ্র্যও বোধ হয়, তাহাদিগের প্রকৃতির উচ্ছালকতার উৎসাহিত করিত।



বাগদাদের নগর

রাতি ১০টার সময় আমাদের জাহাজ বাগদাদের উপকণ্ঠে মোড়র করিল।

আজ আমার দীর্ঘকালের সঙ্গী শিরঃপীড়া অতিক্রম আবির্ভাবে আমাকে শয্যাশায়ী করিল। শয্যা যে আরামপ্রদ নাহে, তাহা পূর্বেই বিস্ময়। জাহাজের “ডেকে” বেহের উপর কোনরূপে শয়ন করিতে হয়। জাহাজে কেবল যে এজিনের শব্দ, তাহাই নাহে; পরঃ বাতীদিগের কোলাহলও অল্প নাহে। একে শিরঃপীড়ার প্রাবল্যদায়ক নিদ্রাকর্ষণ হয় না; তাহাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিজের পক্ষে সুবিধাজনক নাহে। আমাকে কাজ দেওয়া সঙ্গীরা চিন্তিত হইলেন। আমি উদাহরণ

আখ্যাস দিলাম, শঙ্কার কোন কারণ নাই, এইরূপ আক্রমণ আমি অভ্যস্ত। পরে আছে, রুমদগরের রাজসভা যখন বহু কোবিদের কেন্দ্র তখন মহারাজ।



বাগদাদের নগর

এক দিন সভায় পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই আমার সংসারের সারস্বত কি? পণ্ডিতগণ উত্তরে মোক রচনা করিবার পূর্বেই রাজজামাতা শোকাব্দ বলিলেন—

“আমার যত্নসংসারে সার স্বতর-বানিনী।”

—জামাতার এই উক্তি ব্যস্তপূর্ণ ও ষষ্ঠাষ্ট মনে করিয়া মহারাজা বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিলে জামাতা মোকের অপরাধ বলিলেন—

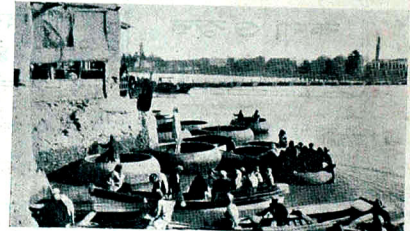
“দগাধে রমণী জাতা মরণে সহগামিনী।”

এখন আর স্বীকৃত সেক্ষণ ব্যবহারের কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এই যে শিরঃপীড়া যৌবনে আমার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ইহা মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আমার সঙ্গী থাকিবে।

আমারায় ইন্দুলাল যাত্রিককে হাসপাতালে রাখিয়া অগিত হইয়াছিল। তাহা স্মরণ করিয়া মিটার যোশী কিছু অধিক ব্যস্ত হইলেন। তখন আমি বাতায় জল

দিতছি। আমি—বলিলাম, উপজ্ঞানের মনিসম্মত বাগদাদের দ্বারে আসিয়া আমি তাহা দেখিতে পাইব না, এত বড় চূড়ঙ্গা, বোধ হয়, অদৃষ্টদেবতা আমার ললাটে লিখেন নাই। আমি যে সকল কারণে, নানা অসুবিধা অনিবার্য জানিয়াও ইরাকে আসিয়াছি সে সকলের মধ্যে বাগদাদ দেখিবার বলবত্তী বাসনা অন্ততম। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি আসিত হইয়াও আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করিলে তাহা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের মর্যাদাহানিকর হইবে—ইহা আমার ইরাকে আগমনের অন্ততম কারণ ছিল। নহিলে—আমি কখনই দেশ-সময়ে বিশেষ আগ্রহশীল নহি।

শেখরাজিতে আমি স্তব্ধ হইলাম এবং স্তব্ধ হইয়া সাগ্রহে নিশাশয়ের প্রতীক্ষা



নদীতে ডুকা

করিতে লাগিলাম—সকালেই জাহাজ বাগদাদে যাইবে।

দ্বিবালাক-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অধুর বাগদাদ নগর দেখা গেল। প্রথমেই দেখা গেল—নগরমধ্যে বহু মসজিদের গম্বুজ; এ সব গম্বুজের বৈশিষ্ট্য চিকন পাশিশ দেওয়া উজ্জলবর্ণের বা চিত্রিত টালি। তাহার উপর রবিকর পঙ্কিতে দেওয়া ফিটজ জিরাভের গম্বর বৈয়মের, অহুসরণে লিখিত কবিতার প্রথম সংস্করণের, প্রথম পদটির শোষণ মনে পড়িল:—



"And Lo! the Hunter of the East has caught  
The Sultan's Turret in a Noose of Light".

নদীর উপর ভাসমান সেতু, আর নদীর জলে "গুফা"  
—এই গুফা নল রিয়া বুনা গোলাকার নৌকা। উত্তর  
বঙ্গে স্থানে স্থানে লোক যেমন বর্ষাকালে গভীরতীরে জল  
মুক্তিকানির্ধিত "চাঁড়ী" (গাম্ভী) ব্যবহার করে, এ দেশে  
তেমনই "গুফা" ব্যবহৃত। নদের এই সুউজ্জ্বল  
আলকাতরা প্রকৃতি মাথাইয়া লওয়া হয়—তাহাতে জল  
প্রবেশ করিতে পারে না।

## কথা ও স্বর

### শ্রীমুখীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

যে গান গায় বিরহিনী বাদল দিনে বসি—  
হোতে যদি তুমি প্রিয়ে সেই সে গানেন্তি কথা,—  
মধুরিত বাখা,  
আমি হোতাম সুরখানি তার ব্যথার জীবিত।  
ছন্দ্যার-ই টোটে টোটে লাগত শুধু হোয়া—  
মুহূর্ত্ত তালে বইত সেখা দক্ষিণের-ই ছাওয়া;  
অসীম হোত সকল চাওয়া পাওয়া।  
তোমার টোটে সকল কথা স্বরের পরশ লাগি';  
বাদলা দিনের ব্যাকুলতায় বইত শুধু জাগি';  
স্বরগুলো সব পড়ত ক'রে তোমার কথার পরে—  
যেমন ক'রে পৃথিবীকে বাদলধারা স্বরে

নদীর উভয় কূলে বসতি—নদীকূল পোস্ত বাধান;  
বারাণসীর নিয়ে গঙ্গার কূলের মত। প্রভেদ এই যে,  
বারাণসীতে ঘাটের পর ঘাট—সোপানশ্রেণী নদীর জলে  
নামিয়া আসিয়াছে; বাগবাগে সোপানশ্রেণী অরু—যে স্থানে  
আছে তথ্যও অপ্রশস্ত। নদীর কূলে বাগান, তাহাতে  
গোলাপ ও করবীর গাছ—করবীর গাছগুলি সত্য সত্যই  
কূলভারে নমিত। তাহার পর গৃহ—গৃহগুলি দেখিতে  
সুন্দর, কিন্তু মজবুদ বলিয়া মনে হয় না। পাকা কূপে  
চাকা ঘুরাইয়া জল তুলি হইতেছে।

মধ্যাহ্নের পর আমরা বাগবাগে অবতরণ করিলাম।

## বিরহাবসানে

### শ্রীজীবনানন্দ রায়

নীল গগনের নয়নকোণে  
সজল মেঘের পাঞ্জল ছায়া;  
ধরার বুকে ছড়িয়ে গেল  
সবুজ শোভার নিবিড় মায়া।  
বাদল হাওয়ার পরশ লেগে  
বিরহের গহন মেঘে  
সরলো বারি, ভরলো আজি  
দ্বন্দ্ব-নদী শীর্ণকায়।  
কেদারকূলের গন্ধ আকুল  
কন্দম্বেশ্বর বরা পথে  
আসবে কি আজ পরাগ প্রিয়  
পুষ্পবহর পুষ্পরাগে?  
অশমাখা পৃথিবীর সূখে  
ভ্রমহাসি মুটুলো স্বখে  
তাই কি বিরহিনীর বুকে  
কারাহাসির আলো-ছায়া?

## = দাদু =

### শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বাগচী

ষোড়শ শতকে যে সব ভক্ত সাধক উত্তর ভারতে  
জয়প্রার্থ করে ও ভক্তিরসে নানা বর্ণের লোকের হৃদয়  
উল্লসিত করেন তাঁদের মধ্যে দাদুর নাম চিরস্মরণীয়  
হইবে রয়েছে। অষ্টাদশ ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে দাদুর জন্ম ও  
১৫০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মস্থান বেনারী ভাগ  
পটভূমির মতে হচ্ছে আমোদাবাদ। তিনি ছিলেন দুই  
সম্ভবতঃ নীচ জাতীয় লোক। কিছদহী হইলে যে তিনি  
ছিলেন জাতিতে মুচী। উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক  
কবীরের পুত্র কমাল তাঁকে উদ্ধৃত করেন, কিন্তু তিনি  
দীক্ষা লাভ করেন ঐ সম্প্রদায়ের আর একজন সাধক  
ব্রজেনের হাতে।  
কবীরের মত দাদু তাঁর বাণী রচনা করেন ভাষায়।  
কবীরের মতে "সংসৃত কৃপজল ভাষা বহুতানীর" অর্থাৎ  
সংসৃত হচ্ছে বদ্ধ কূপের জলের ঝায় কিন্তু ভাষা  
প্রবহমান জলের মত প্রাণবান। সেই জন্তই তিনি  
ভক্তির বাণী ভাষায় রচনা করেন। দাদুও সেই পন্থা  
অনুসরণ করেন।

দাদুর বাণী ইতিপূর্বে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে।  
সম্প্রতি অধ্যাপক কিত্তিমোহন সেন বিশ্বভারতী হ'তে  
দাদুর বাণীর এক নতুন সংস্করণ বের করছেন। এ  
সংগ্রহে দাদুর বাণী, প্রেমোক্তবী, মাধুকরী ও সহজ ও শুল্ল  
সংগ্রহে নানা পদ সরিষিত হয়েছে। এ সব বাণী ও পদের  
বালা অম্ববাদ ও বিশদ ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।  
অধ্যাপক কিত্তিমোহন সেন মধ্যমণের সাধকদের সংগ্রহ  
বহুদিন ধরে বহুসংখ্যক ভ্রমণ করে নানা তথ্য সংগ্রহ  
করেন, সুতরাং তাঁর থেকে দাদু সংগ্রহে আমরা যে  
অনেক নতুন তথ্য পাব তাতে আর সন্দেহ কি? তিনি  
প্রায় ২০০ খৃষ্টাব্দী একটি উপজন্মনিবাসি শুধু যে  
দাদু সংগ্রহেই নানা কথা বলেছেন তা নয়, দাদুর

সমসাময়িক ভারতীয় সাধনা সংগ্রহেও অনেক তথ্য প্রকাশ  
করে বাঙ্গালী পাঠকের রুচিজতা অর্জন করেছেন।  
দাদুর ধর্মমত কবীরের ধর্মমতেরই অম্ববর্তী। কেহই  
জাতিবিশার মান্যতেন না, বাইরের আচার ব্যবহারে  
বিধাস করতেন না। শাস্ত্রপাঠেও তাঁদের আস্থা ছিল  
না। তাই দাদু বলছেন—  
দাদু পাঠী প্রেমকী বিরলা ষাট কোই।  
বেদ পুরাণ পুস্তক পড়ে প্রেম বিনা ক্যা হোই।  
"সেই প্রেমের পত্র কতিতই কেহ পড়ে, বেদ পুরাণ  
পুস্তক পড়ে সবাই, তবু প্রেম বিনা কি হইবে।"  
কবীর ও ঈশ্বরের অজ্ঞাত সাধকের জায় দাদুও  
তীর্থসংগে যে পুণ্যলাভ হয় তা' বিশ্বাস করতেন না—  
কোই দৌড়ে ধারিকা কোই কাশী জাঁহি।  
কোই মথুরা কোই চলে সাহিব ঘরীকা মাছি।  
"কত লোক দৌড়ায় ধারিকায়, কত লোক যায়  
কানীতে, কত লোক চলে মথুরায় অথচ স্বামী রহিলেন  
অজ্ঞার মধ্যে।"  
এ স্বামীকে বাইরের পূজায় পাওয়া যায় না, নানা  
তীর্থ ঘুরলে পাওয়া যায় না, মালা জপেও তাঁকে পাওয়া  
যায় না—তাঁকে পাওয়া যায় প্রেম ও ভক্তি দিয়ে,  
পাওয়া যায় অস্তরের সাধনায়। সেই জন্তই দাদুকে  
বলা হয় 'মরমিয়া' বা 'মরম্বাদী'। দাদুর মতে বাইরের  
জগৎমালা ছেড়ে দিয়ে সমস্ত দেহকেই করতে হবে  
জগৎমালা—  
"সব তন তসবী কইহে করীম ঐয়া করলে জাগ"  
"এমন জগৎ করিয়া লও যেস সকল তত্ত্বমালা কহিতে  
থাকে দয়াময় পরমেশ্বর।"  
দাদুর সাধনা সহজ সাধনা। এ সহজ সাধনা কি  
তা' দাদুর বাণীতে স্পষ্ট করিয়া বলা নাই। কিন্তু সহজ



সাহসায় সিদ্ধ হলে সাধকেরা কি আনন্দের অধিকারী হ'ন তার পরিচয় বহুদ্বন্দ্বেনেই পাওয়া যায়।

বাদ বিবাদ কাহ সৌ নাহী

মাহি জগতে যৈ ভারী।

সমদৃষ্টি সভাই সহজ নৈ

আপহি আপ বিকারী।

“কাহার সঙ্গে বিবাদে কাজ নাই, জগতের মধ্যে থাকিয়াও থাকিতে হইবে নিঃশিখ। আপনার মধ্যেই আত্মবিচার করিয়া স্বভাবে সমদৃষ্টি সাধনা করিয়া থাকিতে হইবে সহজের মধ্যে।”

সহজরূপ অস্তরের নগনে অস্তরের মধ্যে দেখতে হয়। সে সহজরূপ অল্পম, তা' দেখলে মন মুগ্ধ হয়, সেখানে ভগবান বিরাজ করেন। সে স্থান ভয়ের অতীত, সাধক সেবক সেখানে অস্ত্রাধীনকে গেয়ে তাঁর সঙ্গে বিরাজ করেন—

মহি নৈন নিরপৌ সো সো সহজ রূপ।

বেখত হী মন মোহিয়া, হৈ সো তন্ত্র অম্প।

সেবগ স্বামী সংগি রহৈ বৈঠে ভগবান।

নিঠে স্থান সুহাত তো হৈ সেবগ স্বামী।

অনেক জতন করি পাইয়া নৈ অস্তরজ্ঞানী।

সহজ ধাম কায়ার ও জ্বলের অতীত। সহজ সর্বদা স্থির নিশ্চল, তাতে কোন চঞ্চলতা নাই। বিখনিখিল সহজে পরিপূর্ণ।

এই সহজ ধামে যখন সাধক তাঁর ইষ্টদেবতার সঙ্গে মিলিত হন তখন তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁর সে অবস্থা দাবুর কথায় বলতে গেলে—

রগ ভরি খেলৌ পীর সৌ তই বাইজ বেন রসাল।

অকট পাট পরি বৈঠা স্বামী প্রেম পিলাবৈ লাল।

রগ ভরি খেলৌ পীর সৌ কাহ ন হোই বিরোগ।

অধি পুরুষ অংতির মিল্যা কু পুরবলে সংযোগ।

রগ ভরি খেলৌ পীর সৌ বারহ মাস বসন্ত।

সেবগ সদা আনন্দে হৈ জুগি জুগি দেবৌ কংত।

[ রঙ্গ ভরি খেলিতেছি প্রিয়তমের সঙ্গে, বাজিতেছে রসাল বেহু; অথও সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রেমস্বামীর, প্রিয়তম পান করাইয়েছেন প্রেম। রঙ্গভরি খেলিতেছি প্রিয়তমের সঙ্গে, সে মিলনে কখনও হইবার নাহে বিরোগ; অধি পুরুষ মিলিলেন অসিয়া অস্তরে, ইহা কিছু প্রাক্তন সৌভাগ্যের সংযোগ। রঙ্গ ভরি খেলিতেছি প্রিয়তমের সঙ্গে, বারমাসই (সেই লীলা রসের) বসন্ত, সেবকের সদাই এই আনন্দ যে ত্রুণ গুণ দেখিতেছি কাঙ্কতে। ]

দাবু জাতিবিচার মানুতেন না, হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও প্রভেদ করতেন না। তাঁর নিজের শিষ্যদের মধ্যে অনেক ছিল মুসলমান ধর্মাবলম্বী। জাতিবিচার সংঘে দাবু নিজই বলেছেন—“আমি হিন্দু ও বৃষ্ণি না, মুসলমানও বৃষ্ণি না। এক তিনিই সকলের স্বামী; সর্গদায়িত, জলে, স্থলে, সর্গের তিনিই সমাহিত। স্রীর, ঐশ্বর্যধর, দেব, দানব, নীর, মালিক, মুনিজন, এ সব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে কে? তিনিই কর্তা ঠাহাকে চিনিয়া লও, কেহ মনে ইহাতে কোঁচ না করে। স্বরূপে আরদী মর্জিত করিয়া রাম-বহিম প্রকৃতি সর্দম স্বরূপ ধুইয়া ফেল। পাইয়াছ যে ধন তাহা কেন হারাও, স্বামীরই কর সেবা। যে দাবু হরিকৈ ব্রুনি জপ করিয়া লও, জনমে জনমে যে তোমার পরম পুরুষ।”

দাবুর এই বাণীর মধ্যে যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয়ের একটা চেষ্টা ছিল সে কথা মনে করা নিতর অযৌক্তিক নয়। প্রবাদ আছে সম্রাট আকবরের সার দাবুর সাক্ষাৎ হয় ও সিকরীতে উভয়ের প্রায় ৪০ দিন ধর্মোলাচনা চলে। দাবুর প্রভাব পেয়েই হয়ত আকবর তাঁর মৃত্যু ধর্ম প্রচারে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন।



সত্যানন্দ শাস্ত্রী

বেধেতে জানে ক'জন ?

বড় আশা লইয়া আমরা “প্রবাসী”তে সাংবাদিকভাবে প্রকাশিত শ্রুত যৌক্তিক্য চট্টোপাধ্যায়ের “আমার দেখা লোক”—বরক মাদ পড়িয়াম কিন্তু ছায়েবর সহিত পরিচিতে হইতেছে যে, তিনি আমাদের সম্পূর্ণভাবে হতাশ করিয়াছেন। অবশ্য Unconscious Humour এর স্বায় তিনি আমাদের আশা হ্রাসের এই যে ছায়েবরিয়াম তাহা হুজতো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতমারেই দিয়াছেন। অর্থাৎ আমরা বলিতেছি না যে, তিনি ইহা অশেকা মন্দ করিয়া লিখিতে পারিলেন কিন্তু ইচ্ছা করিয়া বলেন নাই।

এখন হতাশার কারণটা বলি। তাঁহার ছাত্র প্রাচীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকের নিকট হইতে আমরা বিখ্যত সিমের এবং পরামর্শগণত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংকে অনেক মৃত্যু কথা শুনিয়া আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু হু-একজনের বিষয় ভিন্ন অধিকাংশকেই সেই মামূল কথা—তাহাকেও তিনি একবার দেখিয়াছেন—কেহ তাহাকে একটা কথা বলিয়াছে ইত্যাদি। তাঁহার নিম্পথ স্মৃতির দিক হইতে ইহার একটা মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু জন্মসাধারণের নিকট তাহার মূল্য কি? তাঁহার এই লেখা পড়িয়া প্রাচীন-প্রবাসী মনে পড়িল :—

ভৌতা শাবীর সূজন,

ইকটরিন পুজন,

বেধেতে জানে ক'জন ?

খলায় বড় বড় কথার আসোচনা করিয়াছেন। সেই ভালোচনা বা আশালনের ছ' একটা মনুষ্য :—“আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা মেয়েদের একটু জ্বলের নামেও চমকে ওঠেন.....আমরা বলি—প্রত্যেক জীবনের পরজন্মে আশা কর। জীবনো যা' দরকার তা' বহুক্ষেত্রে পাচান একটু ইচ্ছা। বৈদিক পণ্ডিতরা নয়, জীবনে দরকার অসংখ্যক লোক, কৃষ্ণসিংহ থেকে আনন্দময় জীবন বেছে নেয়ার শক্তি বিকাশ। আমাদের বিশ্বাস যুগক শিক্ষার চেয়ে সম্বন্ধিকাই এই চরম লক্ষ্যে পৌছাবার শক্তি দেখী রয়েছে।”

বৈদিক পণ্ডিতকে অজ্ঞাত ক'রে, মেয়েদের জ্বলনকে প্রকাশ দিয়ে কি ক'রে “অসংখ্যক লোক এবং কৃষ্ণসিংহ থেকে আনন্দময়” জীবনে পৌঁছানোর যাবৎ লেখক মহাশয় তার একটা মৌলিক ব্যাখ্যা হিসেবে ভাল হইত।

পরিশেষে বীরেন্দ্রাবু বিদ্যায়ছেন :—“বর্তমানে বিবাহপ্রথা বদলানে প্রসারিত হুগল ও নারীর জীবন বানান প্রণালী যে মানুষের জীবনে বর্ধ হইয়াছে একথা চিন্তাশীল মানুষমাজেই স্বীকার করেন। মানুষের জীবনের এই বর্ধতার সীল, এই বিবাহপ্রথা এবং পুঙ্গল ও নারীর জীবনমাধ্যম প্রণালীর মধ্যে যুগান্তিত, একগুণ তো আজ আর চিন্তাশীল মানুষের অজানা নাই।”

বীরেন্দ্রাবু কি সম্বন্ধিকার নামে Trial Marriage বা Companionate Marriage চালাইবার গল্পশ্রী? সে কথাটা দুইটিয়া বলিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়াই বৃষ্ণি আনন্দিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

বীরেন্দ্রের বীর্য :

বহিরা পরিচালিত মাসিক পত্র “জরনী”তে শ্রুত বীরেন্দ্র হুজরার “সম্বন্ধিক” (সেম চাই) শ্রুত প্রত্যেক গুণ শ্রুত বীরেন্দ্রের উল্লেখ।







## জন্মদিনে

শ্রীসুবোধ রায়

লোক-লোকান্তর আর যুগ-যুগান্তর  
হ'তে কাণে ভেসে আসে বীরোপাভ স্বর—  
“শুন শুন হে মানব অমৃত-তনয়  
দিব্যধামবাসী যত—জেনেছি নিশ্চয়  
জ্যোতিষ্য পুরুষের আলোর পাখারে  
নীমাইন অন্ধকার-মৃত্যু-পরপারে।”

শুনি বাণী, তবু যেন ক্ষীণ তার স্বর;  
শোক-তাপ-ব্যথি-দীক্ষ বেদনা-বিধুর  
এ যুগের নর যত হৃত-চিত্ত-বল  
ক্ষণস্থায়ী প্রাণধর্ষে করিয়া সঞ্চল  
জীবন-সমুদ্র-পথে দিতে চাহে গাড়ি;  
কালবৈশাখীর ঝড়ে দেয় হাল ছাড়ি'  
ভয়ে ভীত—জানেন না সে কোন্ শক্তির  
উত্তরিবে পরপারে নির্ভয় অন্তরে।

হে মহামানব তাই তব আগমন  
বিশৃঙ্খিত-সাগর হ'তে সত্যের রতন  
আহরি' দেখাতে তার জ্যোতিষ্ময় রূপ,  
মানবের স্বতস্ফিক স্বয়ম্ভু স্বরূপ।  
বাণে তব নবযুগে কণ্ঠস্থকৌশল  
নীতার সঙ্গীত কার্যে করিয়া সফল

আনিবে ফিরিয়ে পুন হারাণো বিপদ  
আশাহীন মানবের দানিবে আশা।

নাই আত্ম-অত্যাচার কুচ্ছের সাধনা  
জড়তা-সংস্কারগত পূজা-আরাধনা  
তোমার শিক্ষার মাঝে—সহজ জীবন  
সানন্দ-রুদয়ে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ  
জননীর হাতে। সেখা দ্বিধা-বৃন্দ-ভয়  
মৃত্যুভের মাঝে পায় চিরন্তরে নয়।

ধরণীরে মাটা বলি' কর নাই হেলা  
নরকের দ্বার বলি' যুগা অবহেলা  
দেখাইয়া রাখ নাই কাহারেও দূরে।  
সাম্যতন্ত্রে বীণা তব গাছে মধুতরে  
অপার্বি বীণাগান পার্বি সমাজে।  
তুমি বল—“সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজে  
তাই কিছু দ্ব্য নহে।” তব শিক্ষা বলে  
স্বরূপ মিলিবে আসি ধূলির ভূতলে  
এ ধরণী হ'বে নিত্য ব্রহ্মবরের স্থান  
নর হ'বে নারায়ণ পূর্ণ মইয়ান। ০

০ [১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন উপলক্ষে রচিত]

# দুঃখের বরষা

উপন্যাস

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাশী পৌষিয়ার সময় যতই নিকট হইতে লাগিল,  
গ্রামাঙ্গিনীর মন ততই ভয়-ভারে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসে।  
সন্ধ্যার, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া গাড়ি  
চুটিয়াছে, চলার শেষ নাই, দেখার শেষ নাই, চিন্তারও  
শেষ নাই। অবশেষে আকাশের আলো কমিয়া আসিল,  
গাড়ির গতি কমিতে কমিতে একটা প্রকাণ্ড ইষ্টাশানে  
আগিয়া গেল। মূব বাড়াইয়া গ্রামাঙ্গিনী চিনিতে  
পারিলেন, যোগল সরাই; এখানে গাড়ি বদল করিতে  
হইবে। গ্রামাঙ্গিনী উঠিয়া পাড়াইলেন, পা-ছুইখানি যেন  
জনীয়া পাথর হইয়া গেছে, আদৌ চলিতে গেলে উঠিয়া  
গড়িয়া যান, আর কি!

মনে আশা ছিল, সংবাদ একটু ভাল হইলে, একটা  
লোক ইষ্টাশানে নিচুস আসিবে, গাড়ীর মধ্যে পাড়াইয়া  
গ্রামাঙ্গিনী যেন সেই প্রতীক্ষায় ছিলেন। নায়েব  
মশাই কথকে যথাসাধ্য দ্রুত এবং কোমল করিয়া, বলিলেন,  
মা, এবার আপনাকে নেমে আসিতে হবে।

গ্রামাঙ্গিনীর কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছিল না,  
তবু মুখ হইতে অতকিতে বাহির হইয়া গেল, কেউ  
আসিনি নাই?

নায়েব মশাই বলিলেন, আসবে এখন, ওপারের  
গাড়ি দেখি, এখানে এসে পৌছনি।

বিদ্যায়ের মত মনের মধ্যে কি একটা খেলিয়া গেল,  
অব এখানে আশা আছে!

দামী শাল বেধিয়া গ্রামাঙ্গিনীর চতুর্দিকে ভিরাবীর  
দল আসিয়া জমিল। এক বুড়া, ভালো করিয়া পাড়াইতে  
পারে না; একটা ডোট লাঠির উপর ভর করিয়া, জান  
হাতটা বাড়াইয়া দিয়া আপাইয়া বলিল, মা তোমার ভাল  
হবে।

পরিষ্কার বাংলা কথা, একটুও টান নাই, উচ্চারণের  
কোন বিকৃতি নাই। গ্রামাঙ্গিনী তাহার দিকে কিরিয়া  
তাহার হাতে একটা সিকি ফেলিয়া দিলেন।

তামার বদলে রূপা পড়িতে দেখিয়া তাহার চতুর্দিকে  
একটা কোলাহল জমিয়া উঠিল; কেহই পিছনে থাকিতে  
চাহে না।

কুলিয়া মোট-ঘাট লইয়া অগ্রসর হইল। নায়েব  
বলিলেন, আপনি এগিয়ে চলুন, মা। যতই পাড়াবেন  
তত ভিড় করবে ভিয়ারির দল।

ওপারে নামিতে নামিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল।  
নায়েব মশাই দেখিলেন, ভুগু সিং গাড়ি হইতে নামিয়া  
সেই দিকে আসিতেছে। তিনি পিছন হইতে বলিয়া  
উঠিলেন, লোক এসেছে, মা; ভয় নেই; বাবু ভাল  
আছেন।

ঠিক সেই সময়ে গ্রামাঙ্গিনীর জান চোখের পাতা  
নাড়িতে লাগিল। জানহাতের উটো পিঠি দিয়া চোখের  
পাতা বার ছুই ঘুরিয়া দিতে, সেটা বন্ধ হইয়া বামচক্ষু  
নাড়িয়া উঠিল। এইবার গ্রামাঙ্গিনীর হরেন্দ্রনারায়ণের  
কথা মনে পড়িল, তিনি কতদিন বলিয়াছেন, ওগুলো  
নিছক মেয়েলি-সংস্কার। বিশ্বাস করিলে চাপিয়া ধরে,  
মনকে অবসর করিয়া তুলে! গ্রামাঙ্গিনী বামচক্ষুর স্পন্দন  
বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন না কিছ!

ভুগু সিং সেলাম করিয়া নায়েব মশাইএর সঙ্গে কথা  
কহিতে কহিতে চলিল। সে সবচেয়ে বড় এবং  
প্রয়োজনীয় সংবাদ দিল কাশীর মহারাজ রাজাকে  
দেখিয়া গেছেন। সে নিজে রাজাকে দেখে নাই;  
কারণ শয়তান ডাক্তারেরা কাহাকেও সেই ঘরে ঢুকিতে  
দিতেছে না; ছুইটা মেম-সাহেব আসিয়া যাহা কিছু



করিবার করিতেছে; কারণ মহারাণী এখনো বিছানা হইতে উঠিতে পারেন না।

গাড়িতে বসিয়া শ্রামাস্থিনীর হৃৎস্তার আর শেষ রহিল না। ইচ্ছাখানা অথবা আফ্রিকান করিয়া এমিক-ওমিক করিতেছে; বহুমূল্য সময়ের এক-একটি মুহূর্ত যেন এক এক কোঁটা হুর্জর রক্ত হেলায় স্রবিত হইয়া বুকের মধ্যে শূন্যতার দুস্তর স্রাতার স্রষ্ট করিতেছে। নিশ্বাস যেন আর পড়িতে চাহে না। এত কাছে আসিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া থাকার শাস্তি ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠে। তখনো গার্ড সাহেব পা ফাঁক করিয়া পাঁজিয়া নিরুৎসাহে চুপট টানিতেছে। সুস্রিয়া হাসা-হাসি করিয়া এ-ওর গায়ে পড়ে। শ্রামাস্থিনী এই দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া অজবিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। লাইনের ওপারে সেই রক্ত-স্রাবিত পাঁজিয়া কি বসিয়া, বুঝা যায় না; শুধু ভানহাতখানি তুলিয়া যেন বলিতে চায়, তোর ভয় নেই, তোর ভয় নেই!

হুঁসার ভয়ের মধ্যে শ্রামাস্থিনীর মনে ধীরে ধীরে কোথা হইতে যেন সাহসের আলো আসিতে লাগিল। গাড়ীর অন্ধকার রাতে দিনের পরিচিত জিনিষগুলো যেন কিছুত-কিমা-কর মুষ্টি ধরিয়া পাঁজায়; তাহার পর ধীরে ধীরে চার উট্রিয়া অন্ধকারের সহিত ভয়কেও বুর করিয়া দিয়া প্রকটিকে অপূর্ণ সৌন্দর্যপূর্ণ করিয়া তোলে, তখন গাছকে গাছ বলিয়া চেনা যায়—তেমনি করিয়া শ্রামাস্থিনীর মনের মধ্যে ঘটনার প্রকৃত স্থানান তাহার স্বাভাবিকতা প্রকাশ করিয়া যেন সহজ ভাষার বলিল, ভয় কি? এ-ইতো নিয়ম, এমন করিয়াইতো সংসার চলিয়াছে! তাহার মনে হইল, ইজ, চক, বদরাজ মাছের কল্লনার সম্পদ রাজ-শ্রী পাইয়াছেন; কিন্তু রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের কাছে নিকল কল্লা বার্ষ হইয়া, প্রতিহত হইয়া মাটিতে সিক্ত বিসৃষ্ট। তাই তিনি চরাচর নিখিলের অধিপতি হইয়াও ভিয়ারীর সঙ্গে জগতবাসীর নিকটত বন্ধ বোধে তাহার হারে আসিয়া পাঁজিয়া বলেন, তোর ভয় নাই; দেখ দেখ আমার ভুখণ, বিপদ আমার দীতি-

নীতি! তাহার বুকের উপর পাঁজিয়া কালী বলেন, আমাকে বঞ্চিত করিয়া দেখিলে আমি বঙ্গ-ধারিনী, মুগ্ধাঙ্গিনী। কিন্তু আমি পূর্ণতা হইতে উট্রিয়া, তাই ওই, আমার বরাভয়ের নিচে, শান্ত-সমাহিত! আমাকে দেখিলে ভয় হয়, আমি দুখ্যাতের মুষ্টি ধরিয়াছি কিন্তু আমার আধার শিবম্, সত্যম্, স্মরণম্!

পাঁজীখানা নড়িয়া উঠিতে শ্রামাস্থিনীর ধ্যান ভাঙিয়া গেল; তিনি দেখিলেন ভিয়ারিনী কখন সরিয়া গেছে, সেখানে আলো পড়িয়া মুখ-থোত মধুর রূপ ধরিয়াছে। দুইহাত তুলিয়া শ্রামাস্থিনী বার বার প্রণাম করিয়া বসিলেন, বিধান, আজ আমাকে নূতন রূপ দিলে; এক্ষণ যেন কোন দিন না ভুলে যাই!

কানীর অর্ধ-চক্র ললাটের উপর চাঁদ ভাসিতেছে, ঘাটের উপর বাজীগুলো আলো-ঈশ্বরের এক হইয়া মহাকাশের গলায় রক্তাক্তের মালার মত দেখায়!

শ্রামাস্থিনীর সমস্ত দেহ পুনঃ-রোমাঞ্চে কটকট হইয়া উঠিল।

১১

ক্রতপদে বহুপথ অতিক্রম করিয়া বসিলে, সমস্ত দেহ-মন যেমন আরামের সম্মারে সম্ভবিত হইয়া উঠে, মানি কাটিয়া যায়; যেমনি নিরাবিল দেহ-মন হইয় শ্রামাস্থিনীর! মনের সঞ্চিত ক্রোধ কোথা দিয়া বহি হইয়া গেল! তিনি এমন স্তম্ভতা বোধ জীবনে আর কোনদিন করেন নাই। মনে হইল, এ পৃথিবীতে মায়া কোনদিন করেন নাই। মনে হইল, এ পৃথিবীতে মায়া বুঝ কলহ করিয়া কেবল নিজের আত্মাকে আত্মকার পক্ষে নিমজ্জিত করে। তাহার কোন প্রয়োজন নাই; কোন অবসর নাই। পথ সুপ্রশস্ত; পথে পারি বিরোধ স্রষ্ট, শুধু বিরোধের জহই। মাছের পর স্বাভাবিক অবস্থা নহে; একটা ব্যাধি, বাতুলতা মাত্র।

গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে শ্রামাস্থিনী শুনিবে বুঝা-রাণী তাহাকে অগ্রসর হইয়া লাইতে আসিয়াছেন! একদিকে মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল, আবার ভয়ে মন মধ্যে একটা কাঁপনি আসিয়া ছুটিল।

বিজির মনকে তিনি কুড়াইয়া জমা করিয়া তুলিলেন। এ আবার কিসের ভয়? তাহার মন বলিল, ভয় নয়, এটি অবাচিতের নিজেকে অপ্রস্তুত-বোধ। অবাচিতের সহিত বিশ্বয় মিশ্রিত একটা হৃৎকিত্তা থাকে, ইহা ওয়াই।

কিন্তু আর চিন্তা করিয়া সময়ক্ষেপ করা চলে না। শান্ত মনে, ধীর পদবিক্ষেপে শ্রামাস্থিনী অগ্রসর হইয়া, গাড়ির সম্মুখে গিয়া পাঁজীহাতে সহিস দরজা খুলিয়া দিল, ভিতরে অন্ধকার কিছুই দেখা গেল না; কেবল একটা কোমল কণ্ঠের তাহাকে সম্মুখে আদ্যমান করিল, উপরে উঠে এসে না। কণ্ঠস্থের বয়সের পরিণতির পরিচয় আছে; জীবনের বন্ধুর পথের উপান-পতনের আঘাত কাহত্যতা তাহাতে নিবিড় ভাবে জড়িত!

শ্রামাস্থিনী গাড়ির মধ্যে উঠিয়া প্রণাম করিলেন, অঙ্গল দিয়া সবরে দুইখানি পা মুছিয়া সেই ধূলি নিজের মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

রক্তা সরিয়া বকিয়া বসিলেন, বোসো না!

কণ্ঠের বাহির হইল না, কিন্তু কথাগুলি পরিষ্কার শোনা গেল: শ্রামাস্থিনী কহিলেন, এইদিকে বসি: উজ্জনের সঙ্গে একাসনে যে বসতে নেই না!

বুঝা দুইহাত দিয়া শ্রামাস্থিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া সবরে নিজের জন্ম চাপিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের জল শ্রামাস্থিনীর মুখের উপর, বুকের উপর টপ টপ করিয়া পড়িয়া বহিয়া বাইতে লাগিল।

জীবনে পরম্পর পরম নিকট হইয়া এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ। শ্রামাস্থিনীর চক্ষু সরস হইয়াছিল বটে কিন্তু অধঃবিপ্লবিত হয় নাই। কিন্তু রাণীমার বিরক্তির ব্যাপারই আজ কল্লনার ফস্ট উৎকর্ষ হইয়া উঠিল। বোধকরি, সেই সঞ্জয় কলাহের জ্বলন্ত বাতুলার পিত্তগানও হইয়া গেল।

অবশেষে রাণীমা কথা কহিলেন, আমি এমন মনকে বাইরে ফেলি। ঝাঁচলে ফস্কা পেরো দিয়ে এতদিন ফিঙ্গিছিলুম। বোমা, আমি তোমায় চিনুতে পারিনি এতদিনে, আজ যখন কপাল পুড়তে বসেছে...

তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শ্রামাস্থিনীর কোলে এলাইয়া পড়িলেন।

শ্রামাস্থিনী তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিলেন, না, আপনি যে, সব অস্থখ থেকে উঠেছেন, আপনি কোন ব্যস্ত হজেন! ভয় কি? বিশ্বেশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন।

গাড়ির একটা জানালা খুলিয়া দিতে রাণীমা কিস্তিঃ স্রষ্ট হইয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। বোমা, বোমা কি হ'বে আমাদের, যদি হক আমাদের ছেড়ে...

এত বড় অস্বাভাবিকতার কথা তাহার মুখ দিয়া তিনি বাহির করিতে পারিলেন না।

শ্রামাস্থিনীর চক্ষের জমা-অশ্রু এবার শ্রাবণের বারার মতই বরষার করিয়া বকিয়া পড়িল। রাণীমা ঝাঁচল দিয়া ত্যাগ। মুহূর্তা দিতে দিতে বসিলেন, কেঁদে অধীর হ'লে চ'লবে না, তোমাকে শক্ত হ'তে হবে, মা। এই দুজনের হাত থেকে হরকে আমার উদ্ধার ক'রে আনতে হবে; আমি মা, আমাকে ওরা একবার চোখের দেখা দেখতে দিলে না? ...আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দেয় না! আজ আমি পা-লিয়ে এসেছি? হুও সিং পুরাণো লোক; সে বোধে...

অন্তরের চাপা হুংহুং আবার তাহার কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিল; রাণীমার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু উচ্ছলিত হইল।

শ্রামাস্থিনী বসিলেন, বুঝিয়া পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া গেলেন। ডাক্তারি বিজ্ঞান মাছেরের জন্মের মুখ-জন্মকে অগ্রাহ করে; যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি চলিয়াছে, সেখানে নিয়ম, বজ্রপাত হাতে রক্তের মত হারে পাহারা দিয়া ফেরে; সেখানে আত্মীয়-বন্ধনের কামা কাটির স্থান নাই।

গাড়ী আসিয়া ফটকের বাহিরে পাঁজীহাল, ভিতরে বাইতে বায়। রাণীমার সেখানে হইতে ইটিয়া যাওয়া সম্ভব নয়, শ্রামাস্থিনী বসিলেন। নিচে নামিয়া এক-খানা সোফা আনিবার জন্ত ভূগর্ভস্থকে বলিয়া দিলেন।

শ্রামাস্থিনীর দৃঢ়তা দেখিয়া রাণীমার আশা হইল।



একালের মেয়েরা এক একটা পুরুষের সমান; আর সেদিন রাই!

হািমাকে ঘরে তুলিয়া, বিজ্ঞানায় শোয়াইয়া মাথায় পাখার বাতাস করিতে করিতে তিনি তজ্রাচ্ছন্ন হইলেন। সত্যই, তাঁহার ইষ্টাশানে ধাওয়া করিবার অবস্থা নাহে; কিন্তু তাঁহাকে বশে আনাও, ভক্তার নাসের কণ্ঠ নাহে।

শ্রামাস্ত্রিনী বীর হইতে পাখা দিয়া বলিলেন, না উঠলেই আমাকে ডাকবি; আমি বাবুর ঘরে যাছি। কি বলিল, তাহলে আর তোমায় এ ঘরে আসতে দেবে না গুণা...

সে আমি যুবক বলিয়া তিনি নিশ্চয়ই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাবুরা বাইয়া তিন চার খানি ঘর অতিক্রম করিয়া শ্রামাস্ত্রিনী বুলিলেন কোন ঘরে হরেন্দ্রনারায়ণ আছেন। সে ঘরের আলোও যেন স্নায়ু হইয়া চুপি-চুপি কথা কহিবার আদেশ পালন করিতেছে। ঘরের বাহিরে, প্রকাণ্ড কাঠের বায়ক পর্দা-প্রমাণ বরফ, চারিদিকে কাঠের গুঁড়া ছড়াইয়া আছে, সেখানে একটা লোক প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, কখন বরফ দিবার চতুর্মুখ হয়। সে শ্রামাস্ত্রিনীকে দেখিয়া উঠিয়া গাড়াইয়া সেলাম করিল।

দোরের সানি লাগান ছিল। তাহার কাছে যুগ লইয়া বাইতেই ভিতর হইতে একজন যুবক বাহির হইয়া আসিল। সোহা-পোষাক দেখিয়া শ্রামাস্ত্রিনী অস্থান করিলেন, জুনিয়ার ভক্তার।

যুবক কাছে আসিয়া বলিল, আপনাকে...সে বলতে সম্ভাচ করিতে লাগিল।

শ্রামাস্ত্রিনী বলিলেন, আমাকে সব কথাই আপনারা নিমস্কেতে বর্ণে পারেন...

উত্তরে যুবক বলিল, এইটেই আশা করছিলাম। শ্রামাস্ত্রিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, অবস্থা কি ভাল নয়? সে মাথা চুলকাইয়া বলিল, ভক্তার সারো ভয় করছেন, ইউনিয়ন স্টেট নি...

শ্রামাস্ত্রিনী আন্দাজ বুলিলেন, বলিলেন, সে আর আপনারা কি করবেন? আমার কপাল!

যুবক বলিল, কিন্তু এর চেয়ে খারাপ অবস্থা থেকেও ভক্তার সারোব ঘটান।

শ্রামাস্ত্রিনী বলিলেন, কিন্তু আমাকে কি একবার দূর থেকে দেখে আমার অস্থানত আপনাদের ভক্তার সারোব দেখেন না?

নিশ্চয়; আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

শ্রামাস্ত্রিনী কাঠের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিলেন, যুবক দীর্ঘ-পদ বিক্ষেপে সারোবের পাশে গিয়া গাড়াইল, সাহেব একখানা বই পড়িতেছিলেন। যুবককে দেখিয়া

কাণে একটা ময় লাগাইয়া শুনিলেন, তাহার পর যখন ঘান ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। যুবক ফিরিতেছিল,

সাহেব তাহার কোট ধরিয়া টানিয়া, কি জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার যুবক একটু প্রসন্ন হইয়া থাওয়াইয়া

আসিয়া শ্রামাস্ত্রিনীকে ইঙ্গিত করিয়া ঘরের ভিতর

ডাকিল; শ্রামাস্ত্রিনী নিশ্চয়ই ঘরে প্রবেশ করিয়া হরেন্দ্র-

নারায়ণের গায়ের দিকে প্রসন্ন হইতেছিলেন, যুবক

আগাইয়া আসিয়া বলিল, ওদিকে নয়, আপনাকে দেখতে

পেলে, সাহেবের আন্দাজ বোধি অবস্থা হঠাৎ খারাপ

হয়ে পড়তে পারে; হাটের কর্মভিখন...

মাথার শিরের কাছে গাড়াইয়া শ্রামাস্ত্রিনী লগা করিলেন হরেন্দ্রনারায়ণ নিজের মনে কি যেন কিছু কিছু করিয়া বলিতেছেন। জিজ্ঞার অবস্থা এমন জড়িত যে

সে কথা বোঝা একান্ত কঠিন। তাঁহার কথা শুনিতে

বাহারা চির অভ্যস্ত তাহারই বোঝে না; বাহিরে লোকে

কি বুঝিবে! হয়ত তিনি কোন বিশেষ ইঙ্গিত

প্রকাশ করিতে চাহেন, হয়ত শ্রামাস্ত্রিনী পাশে বসিয়া

শুনিল বুঝিতেও পারেন; কিন্তু হয়!

সমস্ত যুবককে বিদীর্ণ করিয়া দমকা ঝড় বাহির

হইতে চায়। হুই চোব মায়িয়া অশ্রুর প্রপাত উজ্জ্বলিত

হইতে চাহে। কঠে নিম্নে লগা মালাইয়া তিনি ঘর

হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হান করিয়া, ঘরে ফিরিয়া শ্রামাস্ত্রিনী দেখিলেন রাখিয়া তখনো ঘুমাইতেছেন। পাশের ঘরে তাঁহার

পরিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; সেই ঘর দিয়া একটু ছোট

ঘরে পাওয়া যায়, সেখানে একপাশে তাঁহার বাল্ম-পেটের

গুলি রাখা হইয়াছে, তাহারই অপর পাশে একখানি

গালিচার আসন-পাতা কোশা-কুশি-তাম্রকুণ্ড, পুজার

পরিপাতি ব্যবস্থা। জগৎ সারিয়া লইবার জগৎ শ্রামাস্ত্রিনী

বিস্মিত প্রবেশন। যেন মনে হয়, সময় অল্প, তাঁহাকে

তাহারাই গেলেন হইয়া লইতে হইবে।

কুল-দেবতা কালী। বীজ-ময় জগৎ করিতে করিতে

তাঁহার মূর্ত্তিমান চিত্ততলে অবিষ্টিত হয়; কিন্তু সেদিন

কিছুতেই তাঁহার দেখা পাওয়া যায় না। চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া জমাট কালো অন্ধকার ভেদ করিয়া একটু উজ্জ্বল

আলোকে বিদূর অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু

তাঁহার দেখা আজ কিছুতেই পাওয়া যায় না। অথু সেই

জমাট অন্ধকার ভীমাবর্ত্তে ঘুরিতেছে। শ্রামাস্ত্রিনী

অন্ধকারে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কঠিন

অন্ধকারে দিয়া পলীক করিয়া, অগাধান করিয়া সেই

দেহবিশুদ্ধ সন্ধান মিলিল না। কপালে শ্বেদ-বিন্দু

কমিয়া গড়াইয়া নাকের উপর মরিয়া পড়িল; কিন্তু

কোথায় সেই আশার বিদ্যুৎ আজ?

মোহিনী বিবদা রাশ্মণ-কস্তা; যয়স অল্প, নিমস্কেতান;

রাষ্ট্রার সোবার জগৎ নিমুক্ত ছিল। শ্রামাস্ত্রিনীর দেরি

দেখিয়া সে পিছনে দোরের কাছে আসিয়া দেখিল,

বোধি পাথরের প্রতিমার মত বসিয়া আছেন। মনে

হয় পথ-সন্ধান ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু ডাকিতেও

সাহস হয় না। কি জানি! যদি ধ্যানের

ব্যবস্থা হয়! মোহিনী বারম্বার দরজার কাছে আসিয়া

ফিরিয়া যায়; অবশেষে সে রাষ্ট্রাকে তুলিল, বলিল,

বোধিমা যুগ্ম পুজার বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন!

রাষ্ট্রা উঠিয়া বলিলেন, বলিলেন, তাইতো ওয়ে

নবত্বদীন এককোটা জলপর্শ করেনি; কিন্তু মোহিনী,

ও পুজার বসে ঘুমিয়ে পড়ার মতো নয়; ওকে ডাকতে

হবে না; তুই খাবার গরম রাখবে যা। ডাকতে বলতে

আবার সাহস হয় না; কাজ নেই, কি করতে কি হবে।

এদনি করিয়া ধ্যান-রাষ্ট্রের সময় বহিয়া বাইতে

লাগিল। কালী তাঁহার বিরাট অন্ধকারের মধ্যে আশ্র-

পোষন করিয়া শ্রামাস্ত্রিনীর পরীক্ষা গ্রহণ করিতে

লাগিলেন।

অবশেষে অন্ধকার কাটিল, স্নান-জ্যোৎস্না আসিয়া

পথের ধুলার উপর পড়িল এবং তাহার মধ্যে সেই

দীন-ভগ্নিরিণী দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া আছে।

শ্রামাস্ত্রিনীর সমস্ত দেহ কাটা দিয়া উঠিল। না, এ

কিসের খেলা আজ তুমি আমার সঙ্গে খেলতে বসেছ?

তুমি কি আমার দেখা দেবে না?

দেখিতে দেখিতে চতুর্দিক আবার ঘনতমসার

আবৃত্ত হইল। নিরুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আলোর সেই

বিদ্যুৎ আসে, আবার লুপ্ত মিলাইয়া যায়। যেন

অন্ধকার সমুদ্রে ডেউও ফেলা, আবার নাই!

এই আসে, আবার মিলাইয়া যায়। বাহ্যের অদৃষ্ট

দোয়ার সৌভাগ্যের বিদ্যুৎ এদনি অধির চকল; কে

তাছাকে ধরবে, কে তাছাকে ধরবে!

কোণ জন্মে বিস্তৃত হইয়া শেষ শতদলে পরিণত

হইল।

শ্রামাস্ত্রিনী নির্ভর বিষয়ে সেই বিরাট পদাটর

দলগুলি গণনা করিতে লাগিলেন। একশত নাহে;

একশত আট! শতদলের মাঝখানটিতে তুব্বার-গুণ

নীহারিকা, হির নহে; প্রবল গতির আবর্ত্তন তাহাও

ঘুরিতেছে। সেই চির চকল পুঞ্জিত জ্যোতির উপর

দৃষ্টি কেনিবে চোখ খলিয়া যায়! দৃষ্টি অবনত করিয়া

তিনি পরিণতির জগৎ দৃঢ় প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া

রহিলেন। মনে হইল, সৃষ্টির অনন্ত রহস্তের মধ্যে

মহাঘের সীমা ইজ্রিওলির প্রবেশ অধিকার নাই!

কত সময় কাটিয়া গেল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

অনারি অনন্ত কালপ্রাচীরের তীরে বসিয়া বুদবুদ-মাঝে

জন্ম-জন্মান্তর বদল করিয়া চাটিয়াছে; বহু কেল এককই

পট পরিবর্তন, বেশ-পরিবর্তন বহু; কিন্তু তাহা একই;



বশিত কাল, বশিত দৃষ্টি, বশিত বুদ্ধিতে তাহা পৃথকের  
মায়ামাত্র। কালকে বশিত করিতেছে মাহুদের আয়,  
যেমন ইচ্ছাময় শাস্তি হংগ তাহা বশিত দেবায়;  
কিন্তু সেই বশুতা যুবের শুভাঙ্গল কিরণের মধ্যে  
কে বাহির করিতে পারে?

পাশের পাশড়ি হইতে চক্কু তুলিয়া গ্রামাঙ্গিনী  
দেখিলেন, নীহারিকার আর জ্যোতির তীতরা নাই,  
তাহা স্রষ্টা মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। মনে হয়  
কালী; কিন্তু কালো নহে, রাসপুর্ণিমার স্নিগ্ধাঙ্গল  
লাবণ্যের অপূর্ণতায় তাহা নিবিড়। তাহার আর  
ভ্রুবারকাজি নাই, লক্ষ চামেলির কোমলতায় তাহা  
মেঘুর। গলায় দুখোলা নাই, আছে মল্লুর সাতনরী নাই;  
হাতে বস্ত্র নাই, বীণা। মুখে তেলিহান জিহ্বা নাই,  
আছে বিখজী ঈষৎভিত্তি হাসির একটি বন্ধিম রেখা  
মাত্র।

সে মূর্তির কাছে স্বভাবের মাথা আর উঠু হইয়া  
থাকিতে পারে না; গ্রামাঙ্গিনীর শির তাহার পায়ের  
কাছে নামিয়া আসিল। কানে শুনিতে পাইলেন  
বিখনাথের নহবৎ বলিত্তের তান ধরিয়াছে।

সহসা মাহুদের কণ্ঠ গ্রামাঙ্গিনীর তপ ভাঙ্গিয়া দিল।

রাগিনী কখন আসিয়া তাহার পিছনে পাড়াইয়াছেন।

তিনি বলিলেন, বৌমা, হাত যে কেটে গেল।

যাহার কাছে বিশ্ব তাহার সৃষ্টি-হিত্তির কোরক

উন্মোচন করিয়া আশ্র-প্রকাশ করিতে থাকে, তাহার

দিন বাজি নাই। কুমানদের নিম্পল আবেশে কাল

বাধাধীন শ্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলে।

কুশিতে চরণামৃত লইয়া গ্রামাঙ্গিনী যখন বারান্দার

আসিয়া পাড়াইলেন তখন আকাশে শুকতারা উঠিয়া

গেছে; অন্ধকারের নিবিড়তার মধ্যে নীলের যজ্ঞতা

বুজিয়া পাওয়া যায়। ভোর না হইতেই ভোরের

পানী, প্রত্যন্তের বখনা যুগ করিয়া দিবার জ্ঞ তাহার

কণ্ঠের জড়তা দূর করিবার প্রয়াস করিতেছে; কিন্তু

কিঞ্চি তখনও তাহার অবিবিশ্র জড়নে অন্ধকারকে

চানিয়া রাখিতে চাহে।

এবার রাগিনীও সঙ্গে চলিলেন।

বাঙ্গালী ডাক্তার চক্কলভাবে বারান্দার পাশ্চাত্য  
করিতেছে; তাহার কাশো পোষাক এবং শব্দীন চলার  
মনে হয়, দুত্বাত্ত ছিন্ন পুঁজিয়া বেড়াইতেছে; প্রবেশের  
সুযোগ সে আর কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না; সময়  
যে আসার।

রাগিনী সাহস করিয়া কাছে গেলেন না, বানিকটা  
দূরে পাড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু গ্রামাঙ্গিনীর গতি কে  
রোধ করিবে?

চুপি চুপি ডাক্তার বলিল, অবস্থা ঘরাপ; সায়েব  
নিরাশ হয়ে চলে গেছেন। গ্রামাঙ্গিনী কার নাম?  
তাকে তিনি বার বার বেহতে চাইছেন।

আমিই গ্রামাঙ্গিনী। গ্রামাঙ্গিনী যেন আরো কিছু  
বলিতে চাহিতেছিলেন; কিন্তু কে যেন তাহার জিত  
চাপিয়া ধরিল। আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন,  
একবার কি ভেতরের গিয়ে এই চরণামৃতটুকু দিয়ে  
আমতে পাব না?

ডাক্তার বলিল, চলুন না; আর মানা করে লাভ  
নেই।

গ্রামাঙ্গিনী এবার পায়ের কাছে গিয়া পাড়াইলেন।

হারেক্সনারায়ণ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ তাহার কণ্ঠ

হইতে পরিষ্কার স্বর বাহির হইল, গ্রামা, গ্রামা, তুমি

কখন এলে? তোমাকেই তো ভাবছিলাম!

সন্ধ্যার পাড়িতে এসেছি; তুমি যে তখন ঘুমিয়ে

ছিলেন।

হঁ, আমার আবার ঘুম! গ্রামা, আমি তিন দিন

ঘুমায়েছি। হাতে কি গুটা?

ঠাকুরের চরণামৃত; হাঁ কর, খাইয়ে দেব।

চরণামৃত পান করিয়া হারেক্স বলিলেন, তুমি আমার

আবার কাছে থাক, নৈলে ভয় করে।

আজ্ঞা, বলিয়া গ্রামাঙ্গিনী কাছের চেয়ারের উপর

বসিলেন। হারেক্স পাশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাগিনী দোরের কাছে পাড়াইয়া দেবিগেছিলেন।

বীরে বীরে আগাইয়া আসিয়া গ্রামাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া  
বলিলেন, কিছু ধোয়ে আসবে চল, বৌমা!

গ্রামাঙ্গিনী উঠিয়া নিম্নেধে ঘর হইতে বাহির হইয়া  
গেলেন।

বারান্দার পা দিয়া তিনি বলিলেন, না, আমি যাব  
না, এইখানে পাড়াছি, আপনি গিয়ে স্নিকের দিয়ে  
গঠিয়ে দিন; আপনি আর আসবেন না, এই শরীর  
নিয়ে।

গ্রামাঙ্গিনীকে একসা দেখিয়া ডাক্তার বাহির হইয়া  
হলিল। বলিল; আশ্চর্য্য পরিবর্তন; অনেকটা ভাল  
মনে হয়; বোধ করি শেষের ইন্ডেক্সনটায় কাজ

হয়েছে; আর একটা দেব মনে করছি। কি বলেন?

গ্রামাঙ্গিনী বলিলেন, এখন থাক; কোন উপসর্গ

হ'লে, দিতে হবে। বানিকটা গুমোতে দিন।

টুকু বলেছেন, বলিয়া সে ভিতরের গিয়া আরাম

চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

কিরিয়া আসিয়া গ্রামাঙ্গিনী দেখিলেন, ডাক্তার

হস্তান্তরে গুমাইতেছে; কিন্তু স্বানীর নিজা গভীর নহে

যেন কেবোয় একটা অশ্রুতি লাগিয়া আছে, থাকিয়া

থাকিয়া জান পা বানি কাপে, সেই কম্পন, তাহার দক্ষিণ

হস্ত অধি বিস্তৃত হইতেছে; তাহার পর হাত-পা

শিথিল হইয়া যায়।

পায়ের উপর হাত রাখিয়া তিনি অল্পব করিলেন,

তাহা তুমার শীতল; আত্মলগুলির কাঁপনি একবারও

থামে না। একটা গরম কাপড় দিয়া দেহখানি আগ-  
গোড়া ঢাকিয়া দিয়াও কোন ফল হইল না। হাতের

উপর কোন আচ্ছাদন যোগ্য রাখিতে পারেন না; বার-  
বার কজিকা ফেলিয়া দেয়।

কিন্তু ডাক্তার বেচারী সবে ঘুমাইয়াছে, তাহাকেও

চাকিতে যায়। মনে হইল, আঙনের স্নেক দিল

উপকার হইতে পারে; কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু

কিছুও সাহস হয় না। গ্রামাঙ্গিনী বীরে ডাক্তারের

চেয়ারের কাছে গিয়া পাড়াইয়া বলিলেন, আপনি

এবার উঠুন। ডাক্তার শুনিতে পাইল না। আবার

ডাকিলেন, শুনিতে? সেবারেও কোন উত্তর নাই!

কিন্তু কিছু না করিয়াও থাকা যায় না। গ্রামাঙ্গিনীর

দোর ঘুলিতে গিয়া যে শব্দ হইল তাহাতে ডাক্তার

মজাগ হইল; বলিল, আপনি যাচ্ছেন? গ্রামাঙ্গিনী

কিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একবার দেখবেন? একটা

উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

ডাক্তার কাছে আসিয়া দেখিয়া বলিল, সর্বশাসন,  
এবে মেনিনজাইটিস; এ কখন হলো; আমায়

ডাকুন নি!

ডাক্তারের কথা শুনিয়া গ্রামাঙ্গিনীর সমস্ত দেহ যেন

পাখর হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির

হয় না।

গরম কাপড় থানা সরাইয়া ডাক্তার ভাল করিয়া

পরীক্ষা করিয়া বলিল, একটা যদি...না...বলিয়া ঘরের

মধ্যে বাত-সমস্ত হইয়া পাচচারি করিতে লাগিল।

নিজকে সামলাইয়া গ্রামাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,

আঙনের স্নেক দিলে...

ডাক্তার হাসিল, আঙন নয়, জল; একটা বড়

রকমের প্রস্তাব হ'য়ে গেলে...বলিতে বলিতে টেবিলের

দিকে ছুটয়া গিয়া, ইন্ডেক্সনদের ছোট পিচকারি টুক

করিতে করিতে বলিল, আগেই একটা দিয়ে দেখো

উচিত ছিল...আপনি মরতে পারবেন?

পাশ বৈকি, আপনি দেখিয়ে দিন।

পাশের ঘরে ফোনের ঘটি বাজিয়া উঠিল। বড়

সাহেব, বোধ হয় জামিনে চাহেন রোগী বাড়িয়া আছে

কিনা। দুইজনের কথাবার্তার পর, ছোট কস্তা বাহির

হইয়া যেন কোন ইতস্তত করিতে লাগিল; যেন কি

বলিতে চাহে; কিন্তু বলা যায় না। গ্রামাঙ্গিনী সেটি

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সায়েব বুঝি আপনাকে

ডেকেছেন?

ডাক্তার বলিল, হঁ, তাই ভাবছি ইন্ডেক্সনটা দিয়ে

যাই; কি ফিরে এসে দেব।

শ্রী। আপনি শুক একথা জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেন

না কেন?



ডা। করেছি; ওর মতে অল্প একটা বেওয়া...  
শ্রা। কিন্তু ওর অমতে আপনি তো কাজ করতে পারেন না?

ডা। তা' পারিলে বটে; কিন্তু উনি বলছেন এ কেসে আর বুঝা চেষ্টা!

শ্রা। আপনারও কি সে মত?

ডা। দেখুন, আমাদের যা করবার তা করেছি...

তার পর ভগবানের হাত!

শ্রা। সে তো আছেই; কিন্তু তিনি মাছের চেষ্টার সঙ্গে হাত মিলান! তা ঠিক, বলিয়া ডাক্তার একটু অপ্রস্তুত হইয়া রহিল।

শ্রামাস্ত্রী বলিলেন, আচ্ছা, বড় ডাক্তার যদি না আসেন, তাহলে আপনি সম্পূর্ণ ভার নিতে পারেন না?

ডাক্তার বলিল, তাও আমার ঠিক করে জানা দরকার। সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা একেবারে অল্প জিনিষ, এ কেদে তিনি আমাকে ডেকেছেন, তাই তাঁর নির্দেশমত আমাকে কাজ করতে হয়েছে।

শ্রামাস্ত্রী বলিলেন, মনে করুন, তিনি যদি অল্প কোথাও চলে যান, তা'লে কি দায়িত্ব আপনার উপর আসে না?

ডাক্তার বলিল, সে আপনারদের ইচ্ছা; কিন্তু আপনি কি ক'রে জাম্বলেন যে, ব্রাউন সায়েব অল্প কোথাও গেছেন?

শ্রামাস্ত্রী বলিলেন, ঠিক জানিনে, তবে অস্থান হয়।

ডাক্তার বলিল, আপনার অস্থান সত্যি, ডাক্তার ব্রাউন আজ সকালের গাড়িতে কাগপূর যাচ্ছেন, প্রয়োজন বৃক্সে আনাকেও ডেকে নেবেন।

শ্রামাস্ত্রী বলিলেন, তাহলে আপনার উপর ভরসা কি? তিনি ডাক্তার আপনাকে যেতে হবেই তো?

তা হবে।  
আপনার না-বাওয়া সম্ভব নয়?  
ডাক্তার বলিল, ডাক্তার আমাকে যেতেই হবে।  
তখন আমাদের আপনি কি বরেন?

কেস হোপলেস!  
শ্রামাস্ত্রী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, তাহলে, এগুলি আমাদের কোন ব্যবস্থা করতে হয়, কি বলেন?

বোধ হয়, তাই করা উচিত।

শ্রামাস্ত্রী বলিলেন, কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার, আপনি ব্রাউন সায়েবের কাছে গিয়ে কথা ক'রে কত-ক্ষণের মধ্যে ফিরতে পারেন?

ডাক্তার হাত খড়ি দেখিয়া বলিল, বাওয়ায় কোন ফল হবে না, সায়েব আমাকে প্রস্তুত থাকতে বলে, ছ'টার গাড়িতে বওনা হয়ে গেছে।

শ্রামাস্ত্রী রাগ করিয়া বলিলেন, আপনি বৃষ্টি চুক্তিতে কাজ করেন?

ডাক্তার খতমত হইল, বলিল, ঠিক তা নয়, কতকটা বটে?

আপনি একটু অপেক্ষা করুন দয়্য ক'রে, বলিয়া শ্রামাস্ত্রী ভাড়াভাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

১৩

বহুক্ষণ হইয়া নাড়ি পরীক্ষা করিয়া প্রাণনাথ কবিরাজ শ্রামাস্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বায়ু-নাড়ির অবস্থা দেখে মনে হয় না, তোমার শ্বাসির এ ব্যাভার জীবনের আশঙ্কা নেই; তবে ব্যাধি কঠিন অবস্থা ধারণ ক'রেছে, ভাত্তও সন্দেহ নেই।

আমি-বোগে আর নেই বলয়ে চলে; ভগবানের ইচ্ছাতে আমি আরোগ্য করতে পারব, এই আমার একান্ত বিশ্বাস। সেবার প্রয়োজন, আশা করি, তার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না, তোমাদের হাতে।

ডাক্তার বলিল, তাহলে আপনি গ'ছে নিচ্ছেন?

বুদ্ধ, ডাক্তারের মুখবলোকন করিয়া বলিলেন, ঈশ্বরেশ্বর, তা ছাড়া অল্প গতিও 'ত' দেখি না, ওটি, ভোমরা তো আর হাতে রাখতে পার না; তোমার সায়েবের হাত বওনা হয়ে গেছেন।

রমেশ ডাক্তার কথার উত্তর না দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অসৌভাগ্যের আশঙ্কায় শ্রামাস্ত্রী পিছনে পিছনে গেলেন। ডাক্তার ফিরিয়া বলিল, যদি

বাঁকিতা ও বেলা এসে দেখে যাব.....সে আর কিছু বলিতে চাহিতেছিল।

শ্রামাস্ত্রীর ইঙ্গিত মত নায়েব মশাই একখানি একশত টাকার নোট রমেশের হাতে দিয়া বলিলেন, আপনারদের বিল এলে বাকি টাকা আমি নিজে গিয়ে দিই আশ্ব।

রমেশ টাকা লইয়া নিশ্চেষ্টে নামিয়া গেল।

প্রাণনাথ ইহাদের কাছে আত্মীয়ের মতই ছিলেন।

আজ বয়স হইয়াছে তাই ভাবিতে হইল, নতুবা তিনি সুবাদ পাইয়া আপনি আসিয়া উপস্থিত হইতেন;

চিকিৎসা না করিলেও, অভিব্যক্তির কবিত্ব আপিসা যাইতেন। শ্রামাস্ত্রীর পিতার সহিত তাঁহার হরিহর আত্ম ছিল।

রমেশ ডাক্তার চলিয়া গেলে, তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমাকে কিন্তু একটা ব্যবস্থা করতে হ'বে, মা।

শ্রামাস্ত্রী ভিজ্ঞাস চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

কবিরাজ বলিলেন, এইখানে একটা বসার জায়গা ক'রে দেও না, মা। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে, আজকাল।

রাখালের কাল হওয়ার পর থেকে আমার শরীরটা একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে গেছে। রাখাল তাঁহার কোঠা পূর।

ঘর হইতে একটা চেয়ার বাহির করিয়া দিয়া শ্রামাস্ত্রী বলিলেন, কোঠামশাই, আমি.....না, এই যে নায়েব মশাই এসে গেছেন।

নায়েব কাছে আসিলে বলিলেন, দেখুন এইখানে একটা বড় চৌকি আনিবে, কোঠা মশাইএর জন্য বিজ্ঞান করিয়ে দি।

নায়েব চলিয়া গেলেন।

প্রাণনাথ বলিলেন, হরেন্দ্র না ভাল হওয়া পর্যন্ত আমাকে এই বাড়ীতেই দিব্যরাজ থাকতে হবে।

আমার জিনিষপত্র যা' যা' প্রয়োজন, সব আনিবে নেও; একবার হরিচরণকে ডাকিয়ে পাঠাও দিকি; সে এলে আমি তাকে সব বুঝিয়ে দেব। আমার বান্ধটা আর

একটু মধু আনিবে দাও; আমি ততক্ষণ বলতে পারো! করি।

শ্রামাস্ত্রী যেন হাতে স্বর্ণ পাইলেন। ভগবানকে অর্ঘ্যচিহ্নে স্মৃতি। তিনি নিজেই ওখানের বাস আনিতে ছুটিয়া গেলেন।

রাখিয়া বসিয়া ছিলেন, শ্রামাস্ত্রীকে জেষ্ঠ-পদে ছুটিতে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ওরে আমার কি সর্বনাশ! হালোরে, হককে যে ডাক্তারের জবাব দিয়ে গেল!

শ্রামাস্ত্রী কাছে গিয়া বলিলেন, মা, অমন ক'রে কাঁদবেন না; ওর জ্ঞান আছে, ভয় পেতে পারেন।

জ্ঞান আছে? আমার চিন্তে পারবে? বলিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, যাই তবে একবার দেখে আসি গে।

মুখিয়ে আসেন, উঠলে আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

আবার তিনি বসিয়া বলিলেন, কি বলেন কবিরাজ-মশাই?

বলেন, ভয় নেই; তিনি না-সারিয়ে, বাড়ি ফিরবেন না।

রাখিয়া বলিলেন, অমন ডাক্তার ক'ব'রেজেরা বলে থাকে, টাকা আদায়ের জন্তে, বললি খেঁরি সায়েব ঐ কথা প্রথম দিনে?.....ওসব ওদের ঢালাকি, আমি চিনি ওদের। এই ক'রে ক'রে হাড় কালি হয়ে গেল।

মধু আছে মা?

মোহিনী জানে, আমার কি ছাই কোন কথা আর মনে থাকে, ও মোহিনী, মোহিনী.....মোহিনী ছুটিয়া আসিল।

শ্রামাস্ত্রী বলিলেন, মধু আছে, ভাই?

রাখিয়া মুখ বেকা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মোহিনী একটা রাধুনি বামনী, তাহাকে ভাই বলিয়া ডাকায় তাঁহার সর্বদেহে বিশ্ব ছড়াইয়া দিয়াছিল।

হুইজনে একত্রে থাকিয়াও কথাবার্তা না হইলে কেমন অশোভন দেখায়; তাই শ্রামাস্ত্রী বলিলেন, মা' বেলা হচ্ছে, আপনি নিয়ে পুজা ক'রে নিচেন...



জা।—বলেন, আজকে একাদশী...  
মোহিনী নিজের অজ্ঞতার জন্ত লজ্জিত হইলেন।  
মোহিনী একটা শূভ-প্রায় বোতল লইয়া আসিয়া  
বলিল, মূহুতো নৈঋত দেখি...

রাণীমা একেই চিন্তাছিলেন, তাহার উপর এই  
সংবাদে অসিয়া গেলেন, বলিলেন, তা জানি আমি;  
এই সেদিন যে ছোবোতল কিন্নর; সত্যি ব'লছি  
মোহিনী, তোর হাতে সমুদ্র তুলিয়ে যায়...নিশ্চয় তুই  
বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিস...আমি জানি...

মোহিনী বলিল, কে আমার বাড়িতে মধু খাবার  
লোক আছে...আর সেদিন নয়, সেওত' ছ'বছর হ'তে  
চ'লবে; কতলোক আসচে, আপনি ত' দিতে  
ব'লছেন...

হীরা হী, সব দেশে আমার, তোর মুখ-নাড়া আর  
সইতে পারিনে, চুপ ক'রে থাক ব'লছি!

গ্রামাঙ্গিনী চোপ টিপিতে মোহিনী সরিয়া গেল।  
নিশ্চয়ে বোতলটা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রাণীমা  
বুক বুক করিতে লাগিলেন।

নিজের বাস্তুসংস্থান করিয়া কবিরাজ একট ছোট  
শিশি বাহির করিয়া বসিলেন, এতই এখনকার কাজ  
চলবে যাক; তুমি একবার হরিচরণকে সন্ধান দাও, সে  
এলে আর কিছুই চিন্তা করতে হবে না।

শ্রোতৃবৃন্দে বসিয়া তিনি ধলের মধ্যে ঐশ্বর্য মাড়িতে  
লাগিলেন। নায়ক নশাই হরিচরণকে ডাকিতে চলিয়া  
গেলেন। গ্রামাঙ্গিনী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একবার কণ্ঠ  
আহ্বান, একবার প্রাণনাথের কাছে আনগোনা করিতে  
লাগিলেন।

কাছে গড়াইয়া গ্রামাঙ্গিনী বলিল, ডাক্তার বন্ধু—  
কাচা-পাকা কর মধ্য দিয়ে দুটি উন্নত করিয়া কবিরাজ  
বসিলেন, কি বলে ডাক্তার? প্রশ্নবোধে কথা; হেলে  
নাহুহ! এখানে বুককের কাজ শুরু হয়নি; এই গুণ্ডুটো  
পড়লে তিন চার ঘণ্টার পর আশা করা যায়...তুমি  
ব্যস্ত হোয়োনা মা, নিরাশ হ'লে বল হ'তে দেবি হয়;  
ভগবান রক্ষাকর্তা; বাহ্যিকের হাতে আছে গুণ্ডু চোঁটটুকু,

দেখতে হবে তাতে না কটী হয়।.....আম্বক হরিচরণ,  
সেই থাকবে হরেক্ষের কাছে, তার বোধ শোধ ভালই  
হয়েছে; তোমাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার!

হরিচরণ আসিল দ্বিগুণের অতীত করিয়া। সে  
রক্ত বেধিতে চলিয়া গিয়াছিল, মানাহার না করিয়াই  
আসিয়াছে। অগত্যা তাহাকে কিরিয়া যাতে হইল  
এরিক গ্রামাঙ্গিনীকে—কিছুকালের জন্ত ছাড়িয়া না  
দিলেই নয়। অবশেষে নায়কনশাই-এর প্রণয়  
গ্রহণ করিতে হইল। তিনি রাজে গুমায়াছেন,  
গ্রামাঙ্গিনী চাকর পলক মুদ্রিত করেন নাই।

গ্রামাঙ্গিনী ঈশ্বর হাসিয়া বসিলেন, আমার কি  
কথানা ঘুম হয়, জোঠানবাই?

তা জানি না, তবু প্রশ্রাম দরকার। আমার  
রাত আসছে, তখন তোমার কাজের আর শেষ থাকে  
না; আমি আছি; তুমি গিয়ে ঘোরে ঘোরে খানিকটা  
বিশ্রাম ক'রে নেওগে, বুকের কথা রাখ, লজ্জা না  
আমার।

গ্রামাঙ্গিনী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।  
রক্তনালায় গিয়া গ্রামাঙ্গিনী বসিলেন যে সেদিন  
নিরামিরের কোন ব্যবস্থা নাই। একাদশীর দিন  
তাঁহার জন্ত মাছ ভাতের ব্যবস্থা; নায়ক নশাই  
তাহাতেই চলিল; কিন্তু কবিরাজ মহাশয় যে বহুত,  
এবং তিথিও আহাির করিবেন। একথা শু  
গ্রামাঙ্গিনীই জানিতেন; সময় করিয়া একথা বলিয়া  
যাওয়া তাঁহার উচিত ছিল; মনের অস্বাভাব্য  
হয় নাই। এখন সে ব্যবস্থা না করিলেই নয়।

মোহিনী তাড়াহুড়ি ভাত বাড়িতে বসিয়া গিয়াছিল।  
গ্রামাঙ্গিনী শিখ কঠে ডাকিলেন, মোহিনী! তাই;  
কবিরাজ নশাইএর কি ব্যবস্থা হবে?

উনি বাবোন? মোহিনী অবাধ হইয়া গেল।  
এত অস্বাভাব্য শুক কি না গাইয়ে যেতে দেওয়া  
যায়? তুমি ভাত বাড়ি রাখ। এমো ছ'জনে দি  
ওর জন্তে খান কয়েক লুচি তৈরী ফেলি।

মোহিনী বলিল, বৌদি তুমি বোস; উত্তর দরতে  
হরতে আমি লুচি বেলে নিতে পারবো।

তা' হয় না, দিদি। উনি রান-আফিক সেরে  
রাজীর বার হন; তৈরী হলেই ওকে বসিয়ে দিতে  
পারবো। আমি পরে খাব, তাজা কিসের?

তুমি যে-কাল থেকে কিছু খাওনি, বৌদি।  
উত্তর গ্রামাঙ্গিনী বসিলেন, খেয়েছি বৈকি মোহিনী,  
রা-আমাকে শেষ রাতে খাইয়েছেন...

মোহিনীর দুইচক্ষু তখনও ফুলিয়া জল গড়িতেছিল।  
কথা কহিতে কহিতে গ্রামাঙ্গিনী তাহা লক্ষ্য  
করিলেন। বলিলেন, তোমার চোখ কি হয়েছে দিদি?  
ও কিছু না, বলিয়া মোহিনী আসল কারণ লুকাইল,  
বলিল, বোধহয়, ফুলকি-টুকি প'ড়েছে।

মোহিনী হাত ধুইয়া আসিতে বাহিরে চলিয়া  
গেল।

গ্রামাঙ্গিনী বসিলেন, এ দৃষ্টা নারী-জন্মে অপবাদের  
অপাত কটিন হইয়াছে। দুই মুঠা অন্নের জন্ত সে স্বাক্ষ  
পরের ঘরে দাসীর কাজ করিতেছে; কিন্তু ভিতরের  
মাষ্টাট এখনো মরিয়া যায় নাই। আজ সে সত্যই  
বিস্ময় করিয়াছে।

মোহিনী কিরিল। যি-ময়রা গ্রামাঙ্গিনীর পাশে  
রাখিয়া, খটি ভরিয়া জল আনিল।

গ্রামাঙ্গিনী তাঁহার কাজের ক্ষিপ্ততা দেখিয়া অরাক  
হইলেন; বলিলেন কতদিন এ কাজ করছ?

মোহিনী একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যতদিন  
এই কপাল ধরেছে; এই সব তিন বছর। দিনকত  
গিয়ে লাহোরে মাসীর বাড়ি ছিলাম; কিন্তু কে  
বৌদি, বসিয়ে থাওয়াবে? যতদিন হাত-পা আছে,  
যেটো খাচ্ছি; তার পরের গতি করবেন বিশ্বনাথ!

তিনি ভালই করছেন।  
মোহিনী একটা ঘোর অবিখাসের হাসি হাসিল;  
বলিল, তাইত তাঁর কাজ বৌদি! ওর হাতে কত  
ইষ্টই বা আছে! বিধাতা-পুরুষ সেই ছ'দিনের রাতে

খা' লিখে দিয়েছেন, তার নড়-চড় কেউ করতে পারে  
না। শ্যামাঙ্গিনী বসিলেন, সেকি কেউ বলতে পারে!  
উনি হ'লেন বিশ্বের মালিক!

সাক্ষেপে মোহিনী বলিল, উনি ভূত প্রেতের সঙ্গে  
ব'সে ভাঙ খাবার মালিক, বৌদি! তুমি আমার কথা  
বিশ্বাস ক'রবে না; কিন্তু ঠিক এই কথাই বলেছিল  
মহেশ পাড়ে, ওর যখন মৃগ দিয়ে বক্তৃতা হইলো।

মহেশ পাড়ে আমার কে? গ্রামাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা  
করিলেন।

জানো না তুমি বৌদি? তার কাছে ভুগুর তৈরী  
কুড়া আছে, তোমার সাত-জন্মের কথা সে সেই কাগজ  
দেখে ছবত 'বলে দেবে; কি দেখে তুমি এই জন্মে  
কষ্ট পাচ্ছ; আবার কি জন্ম হবে। সব নিমো হ'তে  
পারে; কিন্তু মহেশ পাড়ে কাগজ দেখে বা ব'লে দেবে  
তার ভুল নাই! গোড়ার বিশ্বাস হ'তো না; কিন্তু  
দেখতে দেখতে সবই তো সত্যি পাড়াল!

শ্যামাঙ্গিনী অবাধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন;  
মোহিনী বলিল, এতটুর অপবাদও কি সত্যি হ'য়ে  
গেল? আজই আমি চলে যেতুম; কিন্তু তা'হলে যে  
দাদাবাবুর উপর অবিচার করা হয়, তাই ভাবছি!

গ্রামাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া বসিলেন, না ভাই, এমন  
কাজ তুমি কিছুতেই করতে পারবে না, লজ্জা দিদি  
আমার!

আমি কেউ নই; যে ক'দিনের মাগান আছে,  
আছি এখনো। দাদাবাবু ভাল হ'য়ে গেলে, আর  
একদিনও থাকবে না। আমার মন ভেঙ্গে গেছে!

গ্রামাঙ্গিনী আরও করিয়া বসিলেন, পাগলী? বুঝে  
মাহুদ, রাগের মাথায়, কি বলতে কি বলেছেন; তা  
নিশে রাগ করলে চল আমাদের?

সেই জ্বলন্ত চোপ চুপ করে আছি; কিন্তু বৌদি,  
চোখের জল তো কারুর কথা মামনে না? কাঁদতেই  
এসছি জানি; কিন্তু প্রাণে বাধা দিয়ে কথা কওরা কি  
ভাল? গরীব ব'লে এসেছি গরুর খাটোতে; তাই  
ব'লে কি সত্যি চোর? বলিয়া মোহিনী আঁচল দিয়া  
চোখ মুছিল।



শ্রামাস্ত্রিনী মোহিনীর পিঠের উপর ডান হাতখানি রাখিয়া বলিলেন, মোহিনী আজ থেকে তোমাকে আমি মার পেটের বোন মনে করবো, লক্ষী বোন আমার, দিদি আমার; তুমি ভাই আমার উপর রাগ করিতে পারবে না।

যেখানকার আকাশে চাঁদের আলোর মত মোহিনীর ভাবাজ্ঞান মুখে হাসি দেখা দিল; সে বলিল, সত্যি বোদি, তোমার মত ভালো মানুষ এর আগে আমি দেখিনি। কত নিম্নে না শুনেছি; কিন্তু নীল বৃকলুম দেখে ঐ হুড়ী!

শ্রামাস্ত্রিনী মোহিনীর পিঠে আদরের কিল মারিয়া বলিলেন, হুই, আমার মার নিম্নে আমার কাছে? ছিঃ গুরুজনকে অসম্মানে কথা বলতে নেই; অপরাধ হয় যে দিদি!

মোহিনী হাসিল, বলিল, আমি কি চাই বলতে, রাগের মুখে বেরিয়ে আসে; রাগ বড় শয়তান, সত্যি!

বাহির হইতে চাঁৎকারের শব্দ আসিল, তোমাদের গুজুর গুজুর দুসর দুসর কি সমস্ত দিন চলবে?

বাল্যপাণীর আওয়াজে নীড়মধ্যে শাবকের মতই হুইজনে চকিত-সমস্ত হইয়া উঠিল।

মোহিনী বলিল, সব শুনেছে!

শ্রামাস্ত্রিনী বাহিরে আসিয়া বলিলেন, জোঁতাশাই—এর জন্তে একটু খাবার তৈরি করছি, মা!

নায়েব মশাই আসিয়া বলিলেন, না, আপনাকে একবার গুদিকে গিয়ে রাজাবাবুর বিছানা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

শ্রামাস্ত্রিনী আর ঠাঁড়াইলেন না। (ক্রমশঃ)

## গল্পের গ্লট

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

সকাল বেলায় মুখ হুইতে বসিয়া তরুণ ভাবিল, আজ সে একটা গল্প আরম্ভ করিবেই। অনেকদিন ধরিয়া সম্পাদক মহাশয় তাহাকে জোর তগাদা দিতেছেন গল্প-বিবার জন্ত। কথা দিয়াছে, কিন্তু গ্লট সে কিছুতেই জমা হইতে পারিতেছে না। পারিত, লিখিবার অভাৱ তাহার আছে, কিন্তু কদিন হইল কী যে তাহার হইয়াছে একটা জুতসই গ্লট-কিছুতেই সে জমা হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

ভাড়াভাড়া মুখ খুঁজিয়া তরুণ ডেবের কাছে আসিয়া বলিল। এমন ক্ষিপ্ৰকারিতার সহিত সে আসিয়া বলিল যেন কাজীর আদেশ—এক সেকেন্ড এদিক ওদিক হইবার যো নাই। কিন্তু কলম হাতে করিয়াই যেন স্রাট পোপারের উপর এক ফোঁটা কালির মত তাহার সমস্ত আঁখি চুপসাইয়া শুকাইয়া গেল। কী লিখিবে সে? চরিত্র

আঁকিবে? কাহার? কেনন করিয়া? পতিতার? সে অভিজ্ঞতা তাহার নাই; অতএব উচ্চা বাস্তিল। মজুরের চরিত্র আঁকিবে? কিন্তু কুলি মজুর পথে ঘাটে দু'এক মিনিটের জন্ত দেখিয়াছে সে। একবার কেবল হাওড়া ষ্টেশনে বোম্বাই যেন হইতে নামিয়া সে এক কুলির মাথায় বেড়িয়া দিয়া স্ট্রাকেশনটি নিজেই হাতে করিয়া নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার পিঠে ছিল একটা প্রকাণ্ড কুঁহা আউ আনা পারিশ্রমিক দিতেই সে একবারে হাত বোঁট করিয়া পায়ের ধলা তাহার জন্ত তাহার সহিত এক হাসান বামাইয়া দিয়াছিল। তাহার রক্তস্রাব জ্বুম্ব—সে এক মৃত্তিমান মৃত্তিল। কিন্তু সে ঐ পর্যন্ত। কমেডিও নাই ট্রাজেডিও গ্রিক বলা যায় না। বাস্—ভাষণ? তাহার সম্মুখে ত' আর কিছুই সে জানে না। কাহার সম্মুখে কীই বা জানে সে? তরুণ ভাবিতে লাগিল।

লিখিবার সরঞ্জাম ড্রয়ারের ভিতর বন্ধী করিয়া সে সরাসর নিচে নামিয়া আসিয়া হাঁকিল, কি, ঠাকুরকে আজ প্রমার চাল নিতে নিষেধ কোরো, শেষে যেন সব ভুলে গিয়ে সে আমার ভাত কোলে কোরে না বোসে থাকে। শেষের কথাগুলি যখন উচ্চারিত হইল তখন সে রাষ্ট্রায় নমিয়াছে।

সরু গলির পথ অতিক্রম করিয়া বড় পথ ধরিতে যাইবে এমন সময় মোড়ের মাথায় আজ বহুদিনের পর দেখা হইয়া গেল তাহার বাল্যবন্ধু নীলরতন বিশ্বাসের সঙ্গে। নীলরতন বাল্যকালে ছিল খুব সাদাসিধে, কিন্তু আত্মির একটা বিশেষত্ব ছিল। অরণ্যের বংশরাজির বত যেন প্রত্যাগীতা করিয়াই সে সকল বন্ধুর মন্তক চাড়াইয়া বিসমৃশভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রসিকতা করিয়া ছেলেরা তাহার নাম সিয়াছিল চ্যাঙ্গা নীলে। পা ছুটি অতিরিক্ত সরু ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে বগা নীলু বলিয়াও ক্ষাণ্যাইত। সেই নীলরতনের চেহারায়া আজ অতাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে; প্রান্তে সে এত অস্বাভাবিক উন্নতি করিয়াছে যে এমন উল্লেখযোগ্য বৈরাগ্য যেন সেখানে লক্ষ্যায় হেঁট হইয়া পানিকটী খাটো হইয়া গিয়াছে। সেই অল্পপাতে গলার আওয়াজটাও হইয়াছে যেন মোটরকারের হর্ণের মত।

ব্যগীতিত আলাপ আশ্রয়ানের পর নীলরতনের মনে পড়িয়া গেল যে, তরুণ খুব ভাল গাহিতে পারিত। খপ, করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়াই সে বলিল, বহুদিন তোমার গান শোনা ঘনিত তরুণ, আজ শুনতে হবে..... বলিয়াই তাহাকে একরূপ টানিয়া লইয়া গেল। তরুণ ভাবিল সম্মন, সিরিয়াড ড্রেপটি ম্যাঙ্কিষ্ট্রেটের বাড়ী—গ্লট একটা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

চলিতে চলিতে একটা বাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া তরুণ নীলরতনের পাঞ্জাবিতে একটা টান দিয়া বলিল, ঠাঁড়াও হে, গানটা একটু শুনে নিই, থামা গলাত! নীলরতন ক্রমি পাঞ্জাবীর সহিত বলিল, তোমার ভাই বোটেই টেইনেই, ওকি আর শোনার মত হে—বলিয়া সে-ও তাহার হাত ধরিয়া পাচটা এক টান দিয়া

সেই বাড়ীরই বৈঠকখানার মধ্যে একরূপ হিচড়াইয়া লইয়া গেল। তরুণের সুপরিচয় শুধু বাহির হইল, ও!

যতক্ষণ না ফিরি তুমি আমার বন্ধী—বলিয়া মূহু হাস্য করিয়া নীলরতন “জ্বীন” সরাইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

সম্পাদকের দিক থেকে তরুণের গল্প-লিখিবার ভাড়া তা আছেই, কিন্তু আসল তগাদা হইতেছে তাহার অন্তরের ভিতর হইতে—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহাকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেই হইবে। সে বুক পেকেট হইতে সরু কপিত-পেন্সিল-আঁটা একখানি নোটবুক বাহির করিয়া লিখিল—প্রথম নম্বর—অপরচিততার বীণাবিনিমিত্ত কণ্ঠের গীত-ধ্বনি। দ্বিতীয় নম্বর—লিখিয়া একটু লখা ড্যান্স টানিয়া রাখিল।

হঠাৎ তরুণ শুনিল পরদার আড়াল হইতে চাপা-গলার আওয়াজ আসিতেছে—আমায় ছেড়ে দাও দাদা, আমি নিজেই যাচ্ছি—প্রতিবাদও শোনা গেল,—না, ছেড়ে দিলে তুমি পলাবি। হাসি-মুখে নীলরতন এক বিগত-কৈশোর্য মহিলার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে নিলক্ষেত্র মত তরুণের সমুখে অনিমা উপস্থিত করিল। তরুণ ভাবিল, দ্বিতীয় নম্বর স্বয়ং মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া হাজির হইয়াছে। সে একবার সে-দিকে তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া টেবিলস্থিত সংবাদপত্রের উপর অকারণ পেন্সিলের আঁচড় টানিতে লাগিল।

নীলরতন বলিল, কে গাহিছিল এবার বুঝতে পেরেছ বোধ হয়। সে ঘাড় নাড়িয়া সাধ দিল—সঙ্গে সঙ্গে মুখে তরুণাত্মক মূহু হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া একথা উচ্চারিত হইয়াছে তাহার মনোভাবের প্রতিরূপিত মূহমুগ্ধে কিন্তু প্রতিকলিত হইল তাহা দেখিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না।

মুখ তুলিয়া যেমনই তাহাকে দেখিতে যাইবে অমন তাহাদের চোখে চোখে মিলিয়া গেল। তরুণ মুখ নামাইল আগে। কবি-বর্ণিত গোলাপী আভা মহিলার গওদেশে ফুটিয়া কটা তাহা আর দেখা হইল না। নীলরতন কহিল, একটা আমার ছোট বোন বীণা—হীরা, তরু-অতিথিকে নম্রতার কোরে সর্জন্য কোরিতে হয় তাও বুঝি ভুলে গেছিস?



বীণা ছোট একটি নমস্তার করিয়া অপরাধীর মত দাদার মুখের দিকে চাহিল।

—তরুণ, যত ইচ্ছে গান শোনো, ও প্রস্তুত আছে।

বীণা প্রতিবাদের স্বরে বলিল, বা গো, ছপুপ-বেলা কেউ বৃষ্টি গান গায়? তরুণ খুব সপ্রস্তুত ভাবে বলিল—দশ মিনিট আগে বোধ হয় খুব সকাল বেলারই ছিল? তারপর তাহার হাত-খড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, তা-ছাড়া এখন মাত্র সাড়ে নটা—আর মিনিট দশেক আগে যদি সময়ের মানবও প্রাকৃতিকালের গভী পাহার হ'য়ে না থাকে তাহ'লে সে যীমানা এখনো 'অনদিক্রান্ত'—বলিয়া নিজের রসিকতায় পেরদে হইয়া বেশ একটু কথিখানাবো সশব্দ হাস্য করিল।—ওরে বীণা, ও যেমন-তেনম লোক নয়, তাকে ঠকা'তে চেষ্টা করিস্নে। তরুণকে হারাননিম্ন আনুত ব'লে দিয়েছি, আর না হয় বলিসত, এই অর্গ্যান্ট-টাই—হ্যাঁ, ওটা এখন এই ছপুপ বেলায় ব'লিল, ফের! নীলরতন বলিল, তুমি ধবাবর সময় তরুণ ভয়ঙ্কর রকম 'এ্যাক্টুয়েই'—বলিয়া সে উচ্ছ্বাসে কহিল। তরুণ দেখিল বস্তুগুলোর আবরণে বীণাও হাসি চাপিতেছে—তাহার মন আরও প্রসন্ন হইল।

হাসি সাধারণতঃ বীণা কহিল, আপনি বিকেলে বেড়া'তে বেড়া'তে এদিকে একবার আসবেন—সত্যি বলছি আমি আপনাকে রাত দশটা পর্য্যন্ত একপোখা থানা গান শোনাবো। নীলরতনের দিকে কিরিয়া বলিল, দাদা, আমাকে রেডে দাও, আমার কাণ আছে। পরে তরুণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বিকেলের দিকে নিশ্চয়ই আসবেন তাহ'লে নমস্তার।

নাথোটা একটু সামনের দিকে মুকোইয়া তরুণ হাসি-ভ্রুণের প্রতিনিদ্রার জ্ঞানহীনা এবং পরদা সরাইয়া বীণা মুখের দিকে হাবাবার পূর্বেই তাহাকে তৃণাইয়া বলিল, তাহ'লে নীল, এইমাত্র যে-পরগুণা আমার বিরুদ্ধে জারি হ'ল বৈকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত এই আপাসে বন্ধী থাকবার জ্ঞান, তা 'সিটন' না হ'লেও আমি মৌন থেকে একরকম মঞ্জুর করেছি—তবে আমার দিক

থেকেও একটা বলবার আছে, অনেককণ এক ঘাঘরায় বসে থাকলে আমার ভয়ঙ্কর খিদে পায়—বলা বাহুল্য, মানসিক খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে আশাকরি জাটরিকটাও—কক্ষ বিকসিত করিয়া নীলরতন সাধা সাংকার করিয়া উঠিল, বধেই!

তরুণ দেখিল পরদার নিম্ন হইতে দুইখানি চরণ-এই-মাত্র লম্ব-বিক্ষেপে সরিয়া গেল।

—মেনি থ্যাকস্, তাহ'লে এখন উঠতে পারি?—বলিয়া তরুণ একেবারেই চোয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

—'ডাম মি!', ওহে তরুণ, যে-জন্মে তোমাকে আনা ভারত, কিছুই হ'ল না! এ্যাতো বড়ভুল ও মাছেরে হয় রে! আরে ছ্যা! এখন উঠে এসে বোসো দিকিনি এই চেয়ারটা—সামনেই অর্গ্যান্টা তোমার বিজ্ঞ ক'বুদে না নিশ্চয়ই!

তরুণের বিনয়ের নাক্সা জ্ঞান আছে। যে জন্মে এই বাজীতে সে বিনা-অপজ্ঞিতে আসিয়া হাজির হইয়াছে সেই কারণটাইকি অস্বীকার করিয়া অনানুশঙ্গ বিলয়ের দ্বারা বাতির জমাইবার প্ররুতি তাহার হইল না। সে তৎক্ষণাতঃ স্বরচিত একটা গান ধরিল।

গানটা শেষ হইবামাত্রই নীলরতন মুখকণ্ঠে বলিয়া উঠিল splendid হ'ল, তোমার সাধনা সার্থক হ'য়েচে।

উপায়ে ভোজ্যবস্তু হস্তে আনন্দোচ্ছল মুখে প্রবেশ করিতে করিতে বীণা কহিল, সত্যি দাদা, এমনটা আর কখনো শুনিমি—তরুণ বায়ু, আপনি যেন একটা 'ম্যাক্সিমাল' এ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করলেন—আপনি এ্যাতো ভাল...

বায়ু দিয়া তরুণ কহিল, থাক থাক অতো কোরে স্বখ্যাতি কোরে আমাকে যেন আক্রান্ত হুলে দেবেন না—অর্থন ঘটতে পারে। তারপরে বীণার হস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—এ: আপনাদের দেখিচ সব তাতেই বাজবাড়ি! আচ্ছা, আমাকে ঠিক চিনতে পারুলেন কি কোরে বলুন তা। ঠিক পেটের বোল বুলতে না পারলেত এতগুলো খাবার একজনের জন্মে আনা সম্ভব হ'তনা।

বীণা খুব ক্রত উত্তর দিল—কি কোরে বুঝলেন যে এগুলো শুধু আপনার জ্ঞানই এমনটি?

তরুণ বেশ সপ্রস্তুত ভাবেই বলিল, তবে আর পেটের বলে ক'কে!

বীণা এইবার লজ্জিত হইল। সে বলিল, দাদা, উনি যেন একটাও না কলে রাখেন, আমি এগুনি আসছি। ক্ষিপ্রে সে চলিয়া গেল।

নীলরতন হাসিয়া বলিল, বীণা আরও খাবার আনতে গেল। এই বোন্টি আমার এ্যাতো বুদ্ধিমতী ও এ্যাতো 'গয়েদ-বিহেভড' যে আমার কেবলি মনে হয় আমি যদি ওর পরে জন্মাতুম তা হ'লে বোধহয় আমার অনেক লাভ হ'ত।

মিনিট দুই পরে বীণা আসিয়া দেখিল তাহার দাদা একটা সিগাড়া মুখে তুলিয়া কামড় দিয়াছে। ক্রান্তি জ্ঞে প্রকাশ করিয়া সে কহিল—কেন ভূমি ওর খাবারে লাগ বস্ছা দাদা?

—একখানা গান শুনেই অতিথির উপর দরদ বৃদ্ধি তোর বেড়ে গেলের? তুইত ওকে না খাইয়েই প্রেম্ করি! অনিচ্ছিত বৈকালের লোভ দেখিয়েই বিদেয় বৃষ্টিছিল—আমিই বরং গান গাইবার জন্মে আটকে রাখবুম!

বীণা অধোবদনে নিজের ক্রীড়া স্বীকার করিল। নীল-রতন বলিয়া যাইতে লাগিল, এই বন্ধুটি আমার ছেলে-বেলায় পাঠের সাথী। কি লেখাপড়ায়, কি খেলায়, কি গানে কেউই এর সঙ্গে পেরে উঠে না। ওর সঙ্গে এখন যেদিন আলাপ হয় সে দিনের ছবিটি যেন আমার চোকের সামনে এখনো ভাসছে। বাবা যেবার ছপালীতে বসি হ'য়ে যান, আমাকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে কোরে—তুই হইসি মায়ের কাছে—তখনকার কথা বলছি। যাগোল চার্ড বুলে ভর্তি হ'লুম। ষষ্ঠের তরতর দিয়ে অকসের সঙ্গেই হ'ল প্রথম আলাপ। এখনকার ছেলেরা কি করে জানি না, তখনকার ছেলেরের রসিকতার ধরনই ছিল আলাদা—মাথায় টাটি, গালে চড় আর তার চেয়ে আর একটু নীরব কাণ মলা দিয়ে হ'ত তাদের প্রথম

সম্ভাষণের সূচনা। বিনা কারণেই ও আমার মাথায় টাটি মেরে পালিয়ে যায়—তারপর খানিকপরে ফিরে এসে বলে, তাই লেগেছে? কি জানি কেন মার বেয়েও ওকে আমার ভালই লেগেছিলো—এখন বুঝছি, আমিই জিতিতে। তারপরখীর তীরে ছিল আমাদের স্থল। ছেলেরা যে সময় বল নিয়ে খেলতে যেতো মাঠে আমার তখন যেতুম বাধী হাতে নদীর ধারে গান গাইতে। সে-দিন-গুলো স্বীকৃত্যর ভাবেই না কেটেছিল! তখন ও কিছু আমার চেয়ে ভাল গাইতে পারতো না—বলিয়া নীলরতন বীণার দিকে চাহিল।

বীণা বলিল, আর এখন?

—এখনকার কথা আমিই বলছি, রেকর্ডের বিখ্যাত গায়ক স্বরেন রায়ের মতন গাইতে পারিনা একথা স্বীকার করায় নীলরতনের পৌরষ ছাড়া লজ্জা নেই—স্বরেন রায় আমার বীণাবন্ধু।

বিশ্ববিখ্যাত দৃষ্টিতে বীণা বলিয়া উঠিল, স্বরেন রায়? এই তরুণ বাবুই? কৈ তাতো আবার বলোনি দাদা! স্বরেন বাবু, আজ 'আমি' নিজেকে ধ্বংস করেচি—আপনার গান আমার বস্তু ভাঙে লাগে, সত্যি কথা বলতে কি, 'আপনার গানের ক্রটিই আমাকে সাধনার উদ্ভূত করেছে—আপনি আমার ষড়'!

—বাজে কথা! এই একটু আগেই বললেন না যে ও-রকম গান কখনো শোনেন নি?

—সত্যি কথাই বলছি; মূলতঃ এক হ'লেও রেকর্ডের স্বরেন রায় আর আমাদের গৃহে সমুপস্থিত বর্তমান তরুণ বাবুত আর এক হ'তে পারেন না। নানাকল্প ক্রটিভার ভিতর নিজেকে বন্ধী রেখে যে গান সে গান হাজার ভাল লাগলেও, আজ যেমনটি শুন্লুম তেমনটি আর কবে শুনেছি বন্ধু!

—তা বটে, তাহ'লে সত্যিই আজ আমার গান পাওয়া সার্থক হ'য়েছে—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—কিন্তু আপনার চরিত্রাচারের কারণে বুদ্ধিমত না। প্রকটিকে আমনি না দিয়া তরুণ উঠিয়াই বলিল, গান যখন শুনেই ফেললেন তখন আজ আর বৈকালে নয়—



কাজ আছে—আসা যাবে একদিন—এখন আসি—  
নমনস্বার।

ইহাবিগলক কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সে  
বাহির হইয়া গেল।

এই নব্য মুকটটির সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিবার কাহার-  
ও উপায় নাই। বহুগণীর নানান গোপ্য পরিচয়ের  
মতন উহার অনেকগুলি নাম আছে। যিনি রেকড? গায়ক  
স্বরেন রায়ের সম্বন্ধে জানেন তিনি মজলিসী গায়ক তরুণ  
রায় সম্বন্ধে হয়ত কিছুই জানেন না; আবার কেহ তরুণ  
রায়কে হয়ত চেনেন কিন্তু কবি প্রদোষ ওহকে চেনেন  
না। একই ব্যক্তির অনেক গুণ থাকিতে পারে  
কিন্তু অনেকগুলি নাম থাকিলেই গোলেযোগ বাধে।

বস্তুতঃ কবি প্রদোষ ওহ যে বিখ্যাত রেকড গায়ক  
স্বরেন রায় একথা কাহারও জানিবার উপায় ছিল না।  
কেবল সম্পাদক মহাশয়গণ জানিতেন যে প্রদোষ ওহের  
নামে যে সব কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প মাসিকে বাহির হয়  
তাহারদের প্রকৃত রচয়িতা এক যুঁহুভারী স্বদেশী মুকট—যিনি  
তরুণ রায় বলিয়া গায়ক সমাজে সমাহৃত। এই কবি  
প্রদোষকে নীলরতনও চিনিতে না।

একদিন ‘শঙ্কর’ পত্রিকার সম্পাদককে প্রদোষ ওহ  
নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠাইল।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,  
কিছুদিন হ’ল আমার কী-যে অবস্থা হয়েছে আমি  
কিছুতেই একটা গল্পের প্রত জন্মতে পারছি না—গল্প-  
লেখা এখন আমারকে ব্যাধি হ’য়ে স্বগতি রাখতে হ’ল।  
দেখুন, পারিশ্রমিকই বহুদূর আর সম্মান মূল্যই বহুদূর, ওটা  
আগে থেকে কাঁধে চাপিয়ে দেবেন না। ওত আপনাদা  
মনে করেন খুব চাড় হবে। চাড় হয়ত একটু হয়, কিন্তু  
কল দাঁড়ায় উঠে। প্রয়োজনবশত তাগিয়ে আর দারিহ  
বোধের চাপে প্রদোষের সহজ পুরণটুকু মুলেতেই পায়  
বাধা, আর নষ্টভরবে যে কী অবস্থা হয় তা আপনাদা  
বুঝবেন না। তাড়া দিলে হয়ত আর সব কাজই আবার  
করা যায়, সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাদা শরদের জন্ম একটা ভাল

গল্পই পাঠাবো কিন্তু এসংখ্যায় নয়। একটা প্রতের সকান  
গেয়েছি বলে মনে হ’চ্ছে—তবে শেষের অর্ধেকটা এখনো  
পাড়ে ওঠেনি।

প্রদোষ ওহ গল্প শ্রুত বেশী লেখেনা; তবে বাহা দু’-  
একটা লেখে তাহা ভালই। তারই কাছে শোনা, সে  
নাকি প্রতের জন্য শ্রুত ভাবে; কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার  
লেখায় প্রতের কোন গল্পই পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন  
অবস্থার মানব মনের বিভিন্ন ভাববৈচিত্র্যের লীলা  
প্রকাশই তাহার রচনার অঙ্গ। মনস্তত্ত্ব আর দর্শন তাহার  
রচনার প্রাণ।

একবার তাহার লেখায় পড়িয়াছিলাম, কোন এক  
নায়ক তার নায়িকাকে বলিতেছেন—“অসীমা, মাহুয এই  
সহজ জিনিষটা বুঝতে পারো না কেন যে, আজ বা’ তার  
পক্ষে সত্য, কাল তাই তার কাছে একবারে মিথ্যা  
হ’য়ে যেতে পারে। জাঁকড়ে ধ’রে থাকা স্বভাবটা কি  
তাদের ম’লেও যাবে না? ঐ যে তোমার মেয়ের ওপর  
পড়ে রয়েছে পা-বন্ধন—ওটা কি ঐ জন্মেই তৈরী  
হ’য়েছিল? আমি ত জানি তোমার বুকের প্রত্যেকটি  
রক্তবিন্দু দিয়ে—না, বোধহয় ঠিক বলা হ’লনা—তোমার  
জীবনকে গলি’য়ে গলি’য়ে গলিচার যে ফল একদিন সত্য  
হ’লে, চরম সত্য হ’লে তোমার হস্তের সামনে দুইটি  
উঠেছিল তোমার জীবনের আনন্দকে কানায় কানায়  
ভরিয়ে দিয়ে—একদিন যার প্রতি তোমার মমতায় সীমা  
ছিল না সেই তোমার অমূল্যনিমিটি আনন্দের অবলোকে  
ধূলোয় লুটোচ্ছে আজ, অথচ তুমি তাকে দেখেও দেখ  
না। এটা কি অসীমা? এসব চোখে দেখেও কি মাহুযের  
জান হয় না যে, মাহুযের বর্তমানটাই সবচেয়ে সত্য, শুধু  
বর্তমানের আনন্দটাই সব চেয়ে বড়, আনন্দই সার্বিকতা  
এবং তা শুধু বর্তমানেরই গভীরতম সীমানক।”

এই হইল প্রদোষ ওহের রচনার ‘স্পেসিয়েন’।

প্রদোষ ওহ কাব্যাবির রচনা করে আর তরুণ তরুণীর  
রচিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা সমস্তই আনন্দের সহিত পড়  
করে।

কিছুদিন হইল আর একখানি নূতন পত্রিকা বাহির

হইতেছে—নাম তার দীপিকা। লেখা পাঠাইবার জন্ম  
মনিরঞ্জন অম্বারোহ করিয়া সম্পাদক মহাশয় এক-কপি  
দীপিকা প্রদোষ ওহের নিকট পাঠাইয়াছেন।

দীপিকার লেখা নিতান্ত গতাহুগতিক নয়। এবার-  
কার লিখিত সবচেয়ে বেশী দৃষ্ট আকর্ষণ করবে অনামিকা  
বহু লিখিত ‘বিধবা’ শীর্ষক কবিতা। পড়িতে পড়িতে  
মধ্যস্থানে উত্তেজিত হইয়া প্রদোষ ওহ আনন্দিত করিয়া  
উঠিল—

কেমনে বুঝিবে বল বিধবার ব্যাধা, ক্ষত মর্শ্বনাহ-আলা?  
পুরুষে স্থানীয় কবি নৃষ্টির সমাজ শুধু শাসিতেই বালা  
নিগড় পরায়ে পায় নিরঙ্কর শত্রুর হানি কশাঘাত,  
হানি বহু রক্তক্ষয়……

শেষের দিকে—

নারীকে করিও ক্ষমা হে পুরুষ, নাহি দোষ তার, শরীরের  
দুখা

উদ্বার করিল তারে, নামাইল পত্নপথে, পুরুষ-অধর-সুখা  
পানে মগ্ন……

অসহ্য। অনামিকা বহু যিনিই হউন বিধুদী মহিলা  
ত। তাহার লেখনী দিয়া এমন কদম্বা মনোহরিত প্রকাশ  
পাইল কেমন করিয়া? ‘নারীকে করিও ক্ষমা……’ অসহ্য!  
ক্ষমা যাহাকে করিতে হইবে তাহার আনন্দিত কি এই?  
ইহাকে ক্ষমা করিতে হইবে? অসহ্য! অসহ্য! বহু তার  
চেয়ে উহার কট বিধ……

সে ইহার তীত প্রতিবাদ করিতে চায়। নারীর এ  
জাতীয় উক্ত নিলজ্জতা যে কিছুতেই সহ্য করিবে না,  
কিছুতেই ক্ষমা করিবে না সে। বেহাঙ্গানারও একটা  
দীপা আছে।

এখনামি প্রতিবাদ পত্র লিখিয়া প্রদোষ ওহ  
সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া দিল। তাহা যথারীতি  
প্রকাশিত হইলে অনামিকা বহু তাহাকে কটাক্ষ করিয়া  
এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিল। তাহারও বাদ প্রতিবার হইল  
এং এই ‘বিধবা’র বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও কবিতা ছাপিয়া  
অপেক্ষে হর্যাপ হইয়া সম্পাদক মহাশয় একদিন

লিখিলেন—বিধবার সম্বন্ধে কোন লেখাই আর দীপিকাতে

প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। দেখক লেখিকা-  
গণ দীপিকা সম্পাদককে ক্ষমা করিবেন।

অনেকদিন পরের কথা।—

সেদিন ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখিয়া তরুণ শয্যা ছাড়িয়া  
মস্তকে বেশ একটু জড়তা ও মনে অবসাদ অহুত করিল  
অনেকদিনের পর নীলরতনকে আজ হঠাৎ তাহার মনে  
পড়িয়া গেল। হাতে তার কোন কাজই ছিল না।  
হু’এক নিমিষের মধ্যেই সে বাহির হইবার জন্য তৈরী  
হইয়া মনে মনে বলিল, এ ভালই হ’ল, হু’চারখানা গান  
শুনে বেশ ‘রিফ্রেশমেন্ট’ হ’য়ে আসা যাবে’ন।

নীলরতনের বাটার সদর দরজার সম্মুখে আনিতই  
তরুণের মূলের উপর দরজা খুলিয়া গেল। সে একটুও  
বিশ্রিত না হইয়া সমুখবর্তিনী নারী মস্তিকে লক্ষ্য করিয়া  
বলিল—

নমস্কার নিম্ন বীণাদেবী!

মানস্কার, কিন্তু ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই আমাদের  
আপনার প্রতিবাদ করতে হচ্ছে—মাফ করবেন—আমার  
নামের আগে ওরকম নিম্ন টিম্ স্কিউ জুড়ে ওটাকে ভার-  
গ্রস্ত করবেন না। শুসব সাহেবী কায়দা আমি মোটেই  
পছন্দ করি না। কিছু মনে করবেন না।

—যথেষ্ট। অপরাধ করুণ্য আমি, আবার কিছু  
মনে করি আমি? আচ্ছা সে যাহাকে হবে, নীলরতন  
কোথা?

—দাদা বাটার সকলকে নিয়ে গুরী গেছেন বেড়াতে  
—আপনি কি? আচ্ছা মাহুয বা’ হোক। যাবার সময়  
বলে গেলেন, সময়মত আসা যাবে একদিন,—এই বৃষ্টি  
আপনার সেই একদিনের সময় হ’ল? আচ্ছা, মনে  
কোরেন দেখুন ত’ সে আজ কতদিনের কথা। হয়ত মনেই  
পড়বে না। এসেছিলেন কতদিন আগে, সে যেন কত  
হৃৎ-গুণ্ধার—

—গুণ-গুণ্ধার বলে একটা অনিচ্ছিত, অনিশ্চিত  
হিসাবের ‘ডায়ারী’ টানতে হবে কেন? মনে না থাকে  
আমায় বহুদূর, আমিই বলে দিচ্ছি। আপনি শুধু বহুদূর  
আপনার ক’দম্বীয়া বা ক’দিনে এক হৃৎ হয়।



—যান, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না। আজ নদীর মাস হল—এই সময়টাই কি কম ?

—না, কম নয় : সে জন্তে কটা স্বীকার কোরে কম চাইছি।

—কিন্তু কম চাইলেই কি তা পাওয়া যায় তরুণ বাবু ? আপনি আমার কতটা ক্ষতি কোরেছেন জানেন কি ?

—আম্বা! নাজ একদিনের পরিচিতি মহিলার মূখ হইতে ঠিক এই ধরণের কথা তরুণের নিকট নিতান্ত অপ্ৰত্যাশিত; তাই সে প্রথমটা একটু ধমতম খাইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিল—

—জান্নাটা অসম্ভব বলেই জানিনা, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণটা জানতে পারলে তা' পূরণ করবার চেষ্টা করতে পারি।

তরুণ বেশ একটু চাপিয়া চাপিয়া হাসিতে লাগিল।

—আপনি নিষ্ঠুর তাই হাসতে পারছেন না। কথা কয়টা অতি সাধারণ তবে বলিয়া বীণাদেবীর উল্লিঙ্গা গেল। মূগে তাহার প্রজ্ঞর কৃষ্টির সেই জাতীয় স্বচ্ছ হাসি যাহার ভিতর বিরাট অন্তরের মাছঘাটকে সুসুৰ-বিস্মিত ছবির মত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম যেদিন বীণাদেবীর কতক দেখিয়াছিল সে আজ দশমাস আগের কথা। তরুণের মনে পড়ে সে দিন তাহার চেহারা আর মাই থাকে তাহার মধ্যে ছিল এক দুঃস্থ বালিকার ঢাঙ্গা যাহার অস্বাভিক্রিয় শীতলা নদীর অবাধ গতি-বেগের নতই সেহের দুই কুলকে স্বচ্ছন্দে আন্দোলিত করিয়া বহিয়া নাইত আপার আন্দোল।

কালের দূত আজ তাহাতে আনিয়াছে যেন এক দুঃগর পরিবর্তন। অনন্তকালের হিসাবের খাতায় এই দশমাসের দিনগুলি হয়ত তেমন বিশেষ কোন রেখা পাতাই করিল না কিন্তু বীণাদেবীর মনের পাতায় বিশ্বকর্ষের অদৃশ্য দৃশ্য আদিয়া কত যেন রক্ত-ফ্লাইল, কত যে কাহিনী লিখিল, কত যে ছবি আঁকিল তাহার অদৃশ্য ভুলি বুলাইয়া—তাহার কে ইয়ত্তা করিবে ?

ধরণেপে সাদা জরীর পাড় কাপড়খানির মধ্যে বীণাদেবীর কী যে খুঁৎ দেবিল তা সেই জানে। সে-খানা ছাড়িয়া সে একখানি দামী গোলাপী রংয়ের রেশমী কাপড় পরিল। একখানা বড় আয়নার সম্মুখে ঠাড়াইয়া সে প্রসাধন করিল। একথা মুহূর্ত্তের জন্তেও ভাবিল না যে, মহাশা তাহার বেশের এই আনন্দময় পারিপাট্য আর একজনদের চোখে কিছু বিস্ময়-চৈকিতেও পারে। মুহূর্ত্তান্তে সে নিজেকে বার বার দেখিতে লাগিল। তারপর সে তরুণের কাছে আসিয়া বলিল, অনেকটা দেরী হ'য়ে গেল, মাফ চাইছি এখন, আলুন আমার সঙ্গে, আমি একলাটা চাইতী করুণে আর আপনি যে আরাম কোরে এখানে বসে থাকছেন সে আমার সহ হবে না—আপনাকে লুচি বলেতে হবে।

তরুণ হাসিয়া বলিল, আমি বুঝি জানি তা ?

—জানিনা বললে ছাড়তে কে ? আজ, না হয় নিয়ে যেতে গেলো বাবে, আপনি উঠুন তা' আগে।

তরুণ নেতকণ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, বলিল, উঠতে ত আর আমি নারাজ নয়, কিন্তু—

—কিন্তু কোন কিছু করতে নারাজ—এই ত ?

—তাও নয়।

—তাও নয় ? তবে কি আমার সঙ্গে একলা উপরে যেতে ভয় করচে ?

—বিলক্ষণ ! ভয়ই করচে, কিন্তু এ রহস্ত কেন দেবি ?

এই অভিনব সম্বোধনে বীণা চমকিয়া উঠিল কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিল; তাহার যৌবনান্দোলী চকল রক্ত-ধারার মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ এক অশূন্য পূন্য-সঞ্চারে সমস্ত দেহ-মনকে আলোড়িত, মগ্নিত, উদ্ভাস করিয়া তুলিল। সে তরুণের চোখের উপর তাহার অনিমিত্তদৃশ্যের আয়ত চক্ৰ ছুটীত ব্রিহদী নিমগ্ন করিয়া বলিল, তরুণবাবু, একে কি আপনার সত্যিই রহস্ত বলে মনে হচ্ছে—তার বেশী কিছু না ? কেন, আপনাকে আমি খুব সহজভাবে গ্রহণ করছি এ বিশ্বাস কি আপনার করুতে পারে ?

—হিঃ দেবি, আপনি এ সব কী বলছেন ? আজ, আমার না হয় অন্তর হ'য়েচে, মাফ করুন।

বীণা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এখন আমি কিছু আদায় না কোরে যে মাফ কোরতে যাবে তেমন বোকা আমাকে পাননি। আজ, সত্যি কথা না হয় বলছি, লুচি বেলা-চোলা কিছু নয়, আপনাকে উপরে গিয়ে পান শোনাতে হবে।

—ওঃ, কিন্তু আমার যে আজকাল গলাটা তেমন মুখে নেই, সম্ভাব্যনকে হ'ল 'রেকর্ড' কোরে কোরে গুণী ওটার আর কিছু পদার্থ রাখেনি।

—এ যেন পণেশের লিখতে যাবার সময় কলম-ভাঙ্গার গুজরের মত শোনাগেলো।

নিতান্তই যখন ছাড়ছেন না—চলুন—বলিতে বলিতে তরুণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

যথারীতি ঠিকি-বাগ ও চর্চাচোড় ইত্যাদি সম্পন্ন হইলে পর একবিধি পান হাতে করিয়া তরুণ বলিল, দেবি, নিমন্ত্রণের নাম শুনেল আমি সব ছুঃম ভুলে যাই—আচমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের বেদনার গান কেমন কোরে যে ধুরে মুছে সাফ হ'য়ে যায়—তার টিকানাই পাই নে। আমার জীবনের এমন একটা 'মিট্রিয়াস্ মেসেজ' দিয়ে চম্ভম, অশা করি, যথাসময়ে এর ফল ফলুবে—এমন উঠি।

বীণা বলিল, যদি বলি আজ রাতেই আপনায় নিমন্ত্রণ।

তরুণ সহান্তে বলিল, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য যে হবে এ কথা জোর করে বলা যায় না—তবে কিনা, ঐ যে কলেক কোন একখানা বইয়ে পড়েছিলাম—'হোষ্ট' এর ব্যাচীতে যে 'পেট' নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরে উল্লাস প্রকাশ করে তাকে নিয়ে ভ্রমসমাজে চলা যায় না—এই নাকি 'রিক'ব' এরও মত—তাই আমিও—বুঝলো কিনা—তবে আজকের দিনটা বাদ দিলেই যেন ভালো হ'ত, আজ থাকলে বৈঠকে একটা engagement আছে।

—বেশ, তবে কাল।

—হ্যাঁ, সেই ভালো।

তরুণ চলিয়া গেলে বীণা ভাবিল, এমনটা হয় কেন ? যা এত দিন ধরিত্য সে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে তাহা কোন কাজেই লাগিল না, আর ঘটিল এমন সব ব্যাপার যাহা সে একটবারও ভাবে নাই—কথনো ধারণাও করে নাই যে এমন কিছু ঘটা কোনদিন সম্ভব। জগতের নিয়মই কি এই ? ইহাই কি পরম এবং চরম সত্য হইবে যে, অদৃষ্টই চালাইবে নাহয়কে, তার উপর মানুষের কোন প্রভুত্বই থাকিবে না ! ঐ যে তাহার ঢাঙ্গা বাহা তরুণের চোখে আজ স্পষ্ট বরা পড়িয়া গিয়াছে—উহা কি তাহার স্বপ্নেছার ঘটিল ? তবে অদৃশ্য এমনটা হইতে পারিত না যদি না সে মনকে আজ শৈথিল্য দিত। কিন্তু সেইটাই কি তার হাতে ? কেন, সে কি এতদিন মনের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মনকে বোকাই নাই ? কী ফল হইল ? কিন্তু এ কথাও ত' বৃষ্টিতে বাকী নাই যে, তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে বস্তুটি প্রতিনিয়ত বিরাজ করিতেছে—তাহাকে যতই কেন ছল-বন্ধনার আবরণে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা সে করুক না, সে আপনাকে আপনি জাহির করিবেই আর তাহাকে তখন যে আখ্যাই সে কিছু না কেন, তরুণের প্রতি তাহার যে প্রতির অভাব, একথা বলা চলিবে না।

—তখন ?

নানাজপ বিরুদ্ধ চিন্তায় তাহার মনটা খুব বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে করিল, একটা গান গাহিয়া সে মনটা কে হাল্কা করিবে। কিন্তু হারমনিয়নের নিকটে গিয়া সে গান ভুলিয়া গেল। অবশেষে তার বাজা গুলিয়া অনেকগুলো লাল মলাট-বেঙা পত্রিকা বাহির করিয়া আনিল; তারপর "বিশ্বনা-বিবাহ" সফল লিখিত বাণ-প্রতিবাদের পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে প্রচণ্ড গুহরে সেই লেখাটার উপর নজর পড়িল। প্রচণ্ড গুহর দেখিয়াছে—

বিবাহ বিবাহের পক্ষপাতী কোন পুরুষেরই হওয়া উচিত নয়, কেন না তাহাতে সমাজ অথবা একটা বিশৃঙ্খলতা দেখা দিবে। স্বৈচ্ছাচারিতার পক্ষ আর



অশান্তির রেল ফেনাইয়া উঠিয়া প্রতি ঘরে ঘরে এমন বিরক্ত আবহাওয়া আনাচে-কানাচে ঝুঁয়াই বেড়াইবে যাহাতে কচি শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বালক-বালিকাদিগের পর্যন্ত শাস-রোষ ঘটবে এবং ইহা অনিবার্য...

জাপুর অনানিকা বসুর লেখাটাও বীণা পড়িল এবং প্রদোষ গুহ তাহার যে-উত্তর দিয়াছিল তাহাও পড়িল। প্রদোষবাবুর উপর তাহার সমস্ত মন যেন সহসা বিস্বাসী উঠিল। কি? এতদূর সন্দ্বিগ্ন? একজন অপরিচিতা মহিলার মধ্য দিয়া সমগ্র নারীজাতিকে সে অসম্মান করিয়াছে! নারীজাতির অপমান? বীণার অন্তরের সনাতন নারী মাথা খাড়া করিয়া ছুঁসিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহা পাগ।

ইহার পর তরুণের উপর হইতেও তাহার মনটা বেকিয়া দাড়াইল। সে ভাবিল, সে-ও ত পুরুষ, সেও ত না বীণা না ভাবিয়া নারীর মর্যাদা রক্ষার ভার অর্পিতভাবে একদিন...না, তাহাকেও বিশ্বাস নাই।

সে-দিনই বৈকালে তরুণ আসিয়া বলিল, দেবি, গানের বৈঠকে যাওয়া হ'ল না; তারা টেলিফোনে জানিয়েছে, কাগল গান হবে। তাই তাবলা, দুর্লভই হারাই কেন? মেসস্তরটা আজই বেরে আসিগে।

একজন অতি আগ্রহ ও ব্যস্তের সহিত যে-কথাগুলি বলিয়া গেল, আর একজন তাহাতে যেন কাণাই দিল না, শুধু ইঙ্গিত করিয়া টেবিলের সামনের চোয়ারখানি দেখাইয়া বলিল, বহন।

তখন বিস্মিত হইয়া বলিল, বলিল, আপনি কি এবেলা অস্থগ?

—না, আমি বেশ ভালই আছি—বলিয়া মুহু হাত করিল।

—কিন্তু আপনাকে ত ঠিক ওবেলাকার মত দেখাচ্ছে না! গোপন করবেন না, বহন।

বীণা পুনরায় মুহু হাত করিয়া বলিল, গোপন আমি কিছুই করি না তরুণবাবু, আমার শরীর ভালই আছে, তবে বা' কিছু পরিবর্তন দেখছেন তা' এর জেতেই।—

বলিয়া সমুদ্রের পত্রিকাগুলি তরুণের দিকে অপাইয়া দিয়া বীণা বলিল, দেখুন।

উৎসব দৃষ্টিতে সেগুলি দেখিতে দেখিতে তরুণ বলিল, ওঃ এ যে 'দীপিকা', আপনিও এর গ্রাহক না কি? তা বেশ। কিন্তু এতে আপনার শরীরিক না হোক মানসিক পরিবর্তনটাই বা হোলো কি কোরে?

মুখে কিছুই না বলিয়া বীণা দেবী প্রদোষ-অনানিকা লিখিত বাদ-প্রতিবাদ বাহির করিয়া দিল। তাহাতে চোখু বুলাইয়াই তরুণ কহিল—

—আপনি কি বলতে চান?

—আপনাকে প'ড়তে দিয়েছি—এ সম্বন্ধে আপনার মত কিছু আলোচনা করব।

—করবেন বলবেন না—কবুতে চান বহন—কারণ আলোচনা এক পক্ষে হয় না; আর, অপর পক্ষে যে বাদ-বিতণ্ডায় যোগ দিতে পরামুদ্র নয়, এরকম কোন প্রমাণ আপনি পান নি, কেমন?

—হ'তে পারে, কিন্তু আপনি তা' নিজ তর্ক ছাড়া কথাই বন না—তখন অপরের বিতর্কিত আলোচনায় আপনার যোগদান করার আশপিত নাও থাকতে পারে—এ রকম ধারণা করা কি আর একজনের পক্ষে সম্ভাব্যিক?

—মানি ঠিক অসম্ভাব্যিক নয়—কিন্তু গুর বাতাবিক ও নয়, বিশেষ কোরে আপনার পক্ষে। যাক সে কথা হঠাৎ প্রদোষ-অনানিকা আপনার স্বক্কে চাপলো কেন?—স্বক্কে চাপবার কথা নয় তরুণবাবু, আমি ওর লেখা প'ড়েছি। প্রদোষ গুহের প্রতিবাদ করতে চাই।

—শেষ, করুন।—বলিতে বলিতে তরুণ দাঁত দিয়া টোটে ছুটী চাপিয়া চাপিয়া একটুখানি হাসিল, একটু নড়িয়া চড়িয়া বলিল, পরে পাজ হইতে কেন-দী উত্তরীয়াট নামাইয়া কোরের উপর রাখিতে রাখিতে বলিতে লাগিল, আপনি দেখ'চি কারুর চেয়েই কম নয়! তবে আলোচনা যদি সম্ভবী করতে চান ত আজ নয়, কাগল প্রদোষ গুহের উপর আজ আপনি কিন্তু হ'য়ে আছেন। মনের ঠিক ঐ-রকম অবস্থায় মাছ্য কারুর প্রতি স্মৃতির

বসতে পারেন না। তবে, আজ আমি খুব বিশ্বাসের সঙ্গে গানসমূহ অহত্ব করছি; আপনি যে এ সব বিষয়ে এতটা interested তাত জানতুম না—তা হ'ল কি খার খাজে-বাজে তর্ক করতুম এতদিন।

তরুণবাবু, আমি বিধবা...

—তরুণ অগলক দৃষ্টিতে নির্লীক-বিশ্বাসে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা বাহির করিবার সময়ই হোক বা যখন যেন করিয়াই হোক বাইবার সময় তরুণের পক্ষেই হইতে একখানি সম্পর্ক-প্রেরিত চিঠি পড়িয়া গিয়াছিল। বীণা সেখানির শিরোনামায় নাম দেখিল, প্রীতু তরুণ বাবু, এম, এ,...

মনের অসাধারণ দ্বন্দ্বল যুদ্ধেই সে চিঠিখানি খুলিয়াই বিষয়াভিভূত, স্তম্ভ হইয়া গেল। চিঠিখানির প্রারম্ভ এইরূপ:—

শব্দর-অক্ষি  
২৩/৩০

প্রিয় প্রদোষ বাবু,  
বাবাহাবাদের পর আপনি একেবারেই নির্লীকবাদের নির্লীক থাকবেন—এরকম কথাবার্তা ত আপনার মনে ছিল না। একটা গল্প দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নন করিয়ে দিচ্ছি। সেটা এ-সংখ্যাতেই চাই...

বাঁকীটা আছি পড়িতেও হইল না। বীণাদেবীর হুট জুড়। সে অস্পষ্টবরে বলিল, বটে! তুমিই প্রদোষ গুহ! আবার রহস্য কোরে বলা হ'লি, প্রদোষবাবুর উপর আজ আপনি কিঞ্চি হয়ে আছেন! এইবার বীণা সত্যই কিঞ্চি হইয়া উঠিল। সমস্ত পুরুষ জাতির উপর যখন দারাব সর্বস্বাধি রি রি করিতে লাগিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে শুইয়া পড়িল।

পাঁচ দিন পরে বীণা দারাব নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইল:—

No access for Torun Roy  
Take care  
Nilmtan

টেলিগ্রাম পাইয়া বীণা অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেনন করিয়া যে এমনটি হইল তাহা ভাবিয়া সে কুল কিনারা পাইল না?

আরো ছুইদিন পরে বীণা সুই করিয়া পিতনের কাছ হইতে একখানি রেজেন্সী চিঠি লইল। চিঠিখানি তাহার দারাব পুরী হইতে লিখিয়াছে। চিঠির সামর্থ্য এই:—দিনকতক হইল তরুণ নীলরতনের কাছে বীণাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছিল; তাহাতে সে এইরূপ আশার কথাও উল্লেখ করিয়াছিল যে, বোধ হয় অপর পক্ষের অসম্মতি হইবে না। তাহাকে নীলরতন জবাব দিয়াছে। ও-রকল মনোভাব লইয়া বীণার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়া নিরাপদ নয় তাহাও জানাইয়াছে।

চিঠিখানি পড়িয়া বীণা অশ্রুজ্বলের ভায় বসিয়া রহিল। আজ কয়েকদিন হইল তাহার মাথার ভিতর দিয়া যে-চিঠির কাড় বহিতে শুরু করিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে তাহারই বেগ সে সামলাইতে পারে নাই, তাহার উপর দারাব এই চিঠি। সে একেবারে ভাসিয়া পড়িল। অশ্রুপূর্ণ চোখে সে আকুল স্বরে আপনা আপনি বলিল, কেন, আমি ওদের কি কোরেছি, ওরা যে আমার এমনি কোরে অপমান কোরে!

কিছুপূর্ণ পরে একটু প্রকৃত্তি হইয়া বীণা তরুণ বাবুকে একখানি পত্র লিখিল:—

তরুণবাবু,  
কেনন কোরে চিঠিখানা আরম্ভ করি ভেবে পাচ্ছি না, বহুবাবু জেজ্ঞ অনেকদিন ধ'রে অনেক কথা ভেবে বেখেছি—বলা আর হোলো না। আজ কিন্তু সে সব আর নয়। আজ ছুচাটে অজ্ঞ কথা বলেলে শেষ বিদায় নেবে। আপনাই যে প্রদোষবাবু, দুর্ভাগ্যকমে তা' কেনে ফেলিল। দারাব চিঠিতেও আজ আপনার নতুন আর এক রূপের পরিচয় পেলাম। বড় দুঃখ হ'চ্ছে, তরুণবাবু, সব কথা আপনাকে জানাতে। যৎগজ্ঞে-কলমে প্রকাশ্যভাবে যে-মুষ্টি আপনার দেখেছি তাতে



নদীর প্রতি প্রভাবান্বিত আপনাকে কোনদিন মনে হয় নি। আপনার ব্যক্তিগত বৈষ্ণব তাত্ত্বিক আমার দেখতে বাকী নেই। তাতেই কুটেছে আপনার আসল রূপটি। আশ্চর্য্য অভিনয় কিন্তু করতে পারেন আপনি! কিন্তু কী হীন আপনি! ঘুমা কববার মত সাহসও আপনার নেই অথচ অপমান করবার কি চরম প্রবৃত্তি!

বড় কঠিন জুড় কথা আপনাকে বলে ফেললাম। বোধ হয় এতটা উচিত হ'ল না।

যে কথা দাবাকে জানিয়েছেন, তা কি নিজে আমাকে বলতে পারতেন না? এখানে পারলেন, আর এটুকুই কি খুব শক্ত হোতো?

বিবাহ-বিবাহের পক্ষপাতী ত' আপনি কোনদিনই ছিলেন না। চিরদিনই ত চাক-পিটিয়ে জাহির করেচেন, ওটা নিষিদ্ধ ব্যাপার : অথচ...

আমার দাদা বিবাহ-বিবাহের বিপক্ষে। কিন্তু তাঁকে কখনো বক্তৃতা দিয়ে এ কথা কারোর কাছে জাহির করেতে দেবে যেহেতু কি? তিনি ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারেন তা' বোধহয় আপনার অজানা নেই। প্রাদেশ গুহের বিরুদ্ধ-মত তিনি মুখ বুজে সহ্য করে গেছেন— অথচ একটি দিনের জেজ্ঞেও কলম ধরেন নি? আর আপনি?

আপনি একাই, না আরো আছে দলে বারো বলেন এক, করেন আর এক?

আমার বিবাহের কথা ভাগ্য-নিয়ন্ত্রাই জানেন, কিন্তু প্রাদেশ-গুহের কাছে আমি চিরদিনের জেজ্ঞে বিদায় নিচ্ছি। ইতি—

প্রতিবাদিনী

অনামিকা বসু

চিঠিখানি আত্মোপাস্ত পাঠ করিয়া বিজ্ঞের মত মুহু মুহু মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে তরুণ বলিল, বটে! তারপর নোটবুক খুলিয়া লিখিল—৩ নম্বর। নোটবুকের সেই পৃষ্ঠায় চিঠিখানি পিন দিয়া আঁটিয়া রাখিয়াই সে লিখিতে বসিল।

মাননীয় শব্দ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমার চিঠি যথা সময়েই পেয়েছি। উজ্জর দিতে লজ্জা হ'লো কথার ত্রিক রাগেতে পারিনি বেলে। একটা গল্পের অঙ্ককটা তৈরী ছিলো বলেছিলুম। আজ হঠাৎ তার বাকী অঙ্ককটার সন্ধান মিলে গেল। শেষ দিকটায় অপ্রত্যাশিতভাবে জমে গেছে। কাল পরশুর মধ্যেই আপনি তা' পাবেন। আমার সম্রাজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ কলন। ইতি—

বিনীত

ঔপ্রদেশ গুহ

# সিমলা-শৈল

শ্রোমণী চিনু মজুমদার



সাহারনপুর

১৮১৪ সালে—অর্থাৎ শতাব্দীরও পূর্বে ভারতে সাহায্য করে। পরশাসনপ্রিয় জাতি সানকচিত্তে ইংরাজ-শাসনের ভিত্তি যখন স্ফুট হয় নাই, সেই তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিল এবং এইরূপে জন্মে ক্রমে সমস্ত ভূগর্ভ প্রজাতি আশপাশের শৈল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

মহিত এক দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ইতিপূর্বে নেপাল-রাজই ঐ সমস্ত জমীন্মার এবং মালিক ছিলেন। সিমলা শৈলের একটা বাণিক ইতিহাসের গদন করিবার পূর্বেই যাবার এখানে বলা উচিত যে, ইংরাজ এই প্রথম সিমলা শৈলের যন্তির জানিতে পারেন। নেপালরাজের প্রজা-পিতাকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিবার যন্তিবারে ইংরাজ গবর্ন-মেন্ট প্রায় সমস্ত প্রবর্তন সামন্তদের তাহাদের পূর্বতন ক্রমতা ফিরাইয়া দিত স্বীকৃত হইয়াছিল। শুধু এই সর্থে, তাহারা শাসনভুক্ত করিয়া লয়ন। যে যদি তাহারা ইংরাজ-বাহিনীকে সকল দিক দিয়াই উপস্থিত যে স্থান সিমলা শৈল নামে অভিহিত



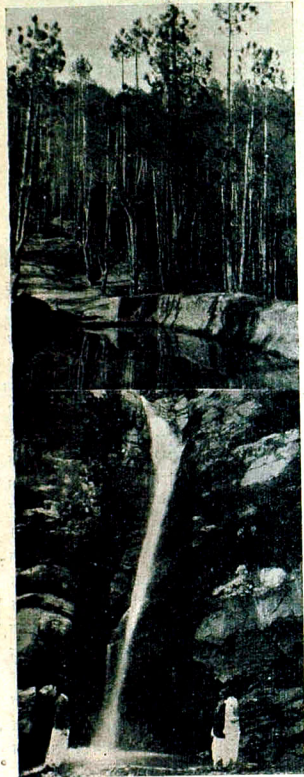
১৯১২ নং টানেল (সাহারনপুর রেলপথের নিকটবর্তী)

১৯১২ নং টানেল (সাহারনপুর রেলপথের নিকটবর্তী)

মুদ্রাক্ষানে ঐ সমস্ত জমিদারগণের বিবিধ রক্ষণাবেক্ষণের এক সুচলিত উদ্যানে রূপান্তরিত করিলেন যে, এই সমস্ত পার্শ্ব জমীর ভিতর কতগুলি স্থানে তাহারা তাহাদের নিজস্ব সৈজ জমায়েত রাখিলেন। বাগছাট ও কিকনবলের জমীদারগণ দুইকালীন সামান্য ওদাসীক দেখাইলে মুদ্রাক্ষানে প্রায় অধিকারী তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। অবশেষে পাতিলিয়া কিছু নজর দিয়া ঐ সমস্ত অধিকার







উপরে : তাল পাহাড়ের নিম্নের দৃশ্য। নিচে : কী কুইল ফল

হইয়াছে সে স্থানটা পাতিলার মহারাজ ও কিওন-পলের রানা উভয়েরই আংশিকভাবে ছিল। ১৮২৪ সালে এই সমস্ত রাজ্য মহারাজার ইচ্ছামুতরাই অল্প ইংরাজ ভ্রমসহায়গণ বিনা করে এই স্থানে বসবাস করিবার সুবিধা পান। এই স্থানটি স্বাস্থ্যোপযোগী ও বাসোপযুক্ত ভাঙ্গিয়া এবং উহা ধীরে ধীরে নিজেরে ক্রমান্বয়ে করিবার অভিলাষে ১৮৩০ সালে, অর্থাৎ এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে, গবর্ণমেন্ট মেজর কেনেজী নামে এক দৃতকে ঐ সমস্ত সামন্তদের সহিত পরামর্শ করিতে পাঠান।

এই উপায়ে সিমলা শৈলের পদন্ত হইল। তারপরে বহুদিন পরে লর্ড আমহার্স্ট ও ভাইকাউন্ট কথারমেয়ার ঐ স্থানে পরামর্শ করেন। লর্ড আমহার্স্ট ই প্রথম ইংরাজ গবর্ণর-ইন্-জেনারেল ও ভাইকাউন্ট কথারমেয়ারই প্রথম ইংরাজ কমান্ডার-ইন্-চিফ। এখনও স্থানীয় ব্রীজ ও ইউ, এম, ইন্সটিটিউশনের কাছে পোষ্ট অফিসটি সেই দৃতিবাহক করিয়া আসিতেছে।

ভিত্তিটা দৃঢ়ভাবে বসিবার পর গবর্ণমেন্ট ট্রক করিলেন যে, গবর্ণমেন্টের প্রধান গ্রীষ্মাবাসের উপনিবেশ স্থাপন এই স্থানেই করা হইবে এবং আজও পর্য্যন্ত, সুদের বিষয়, তাহাই হইয়া আসিতেছে। শৈলের পরবর্ত্তী ইতিহাস শুধু লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিয়াছে।

শৈলের আবহাওয়ার বিষয় কিছু বলিতে হইলে, বলিতে হয় এখানে চারি ঋতু—প্রত্যেকটা তিন মাস করিয়া বিস্তারন। প্রথমভাগ অর্থাৎ জাহুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে অনবরত তুষারপাত হয়। দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ এপ্রিল, মে ও জুন প্রথম রৌদ্রবীণ, ঠাণ্ডা দুদিন ও ক্রিষ্ণে শুষ্ক। তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর প্রায় তিনমাসের জন্য বহিষ্ঠ ও বর্ষাঋতু। শেষভাগ অর্থাৎ অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর বহিষ্ঠ-কিরণোন্মিত, শুষ্ক ও আদাময়ক। মে ও জুন মাসে

যদি ভারতের প্রায় অজ্ঞাতস্থানে অসহ গরম, সেই সময়ে এখানকার আবহাণিক উদ্ভাব, মাত্র ৩৬ ডিগ্রি। বর্ষা প্রায় ষাড়াই মাস এখানে দেখা যায় এবং সারা বর্ষাতে মোটামুটি ৬৪ ইঞ্চি বারিষাত হয়। শৈলের সৌন্দর্য্য বাড়ে সব চেয়ে এই বর্ষার আগমনে। বোধ করা যায় জগতের কোনও স্থানে বর্ষা এত সৌন্দর্য্য আনিতে পারে না। দূরে—উত্তরে যেথায় তিস্তের শৈলমালা অনন্তের সহিত লুকাচুরী বেলে, সেইরকম তাকাইয়া থাকিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গভীর উপত্যকা ও অনুরূপ শৈলমালা এক অভিনব রংয়ের খেলায় উদ্ভাস। সে শুধু উপত্যকা করিবার সৌন্দর্য্য; লেখনী তাহা আঁকাও পর্য্যন্ত মর্মীভূত করিতে পারেনাই। যেথায় বর্ষা লেখনী বরিলেও আঁটিষ্ট নই, সুতরাং এই ছবি আঁকিয়া দেখাইবার প্রচেষ্টা বাতুলতা বার।

সেপ্টেম্বরের শেষাংশেই হইতে ডিসেম্বরের আরম্ভ পর্য্যন্ত শৈলের আবহাওয়া গৃহই চমৎকার। এই চমৎকার কথার সৌন্দর্য্য পরিদৃষ্টন হইয়াছে এক ইংরাজ লেখকের লেখনী হইতে। লেখক বলিয়াছেন :—

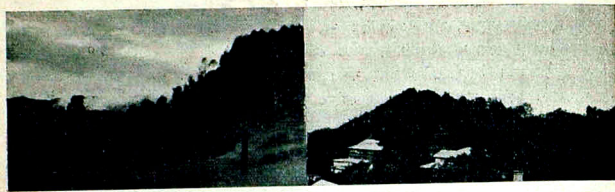
"Towards the end of September commences the most delightful climate in the world. In October and November clear, bracing and exhilarating air invigorates the body and makes the soul rejoice. The sportsman carries his gun over mountain ranges that would have appalled him a few weeks earlier and cavalries of men, women and children stream out along the road on ponies, on foot and in rickshaws to the glorious wood of "Mathiana" and Huttoo some forty miles distant on the Hindusthan-Tibet High Road. Life is no longer existence, it is life."

সিমলার ধারাবাহিক জীবন হইতে প্রশান্তপথে শেষ হইয়াছে—একটা কার্যকরী ও অপরটা সামাজিক, একটা কর্ম-ভংগর মুকুর ও অপরটা স্থখপতি প্রজাপতি। মুকুরের দল সামাজ্যশাসনের উপায়ে বর্ধনপ্রাপ্ত আর প্রজাপতির দল স্বাধীন, ভবনুর প্রামাণ্য।



উপরে : সামারহিল টেম্পল। নিচে : চ্যাড উইক ফল





বর্ষীয় সিমলা

সিদ্ধ নিদ্রাঘের প্রমোদ-উজানে ( ফুটবল, ক্রিকেট, পোলো, টেনিস্ রাইফেল ইত্যাদি বড় বড় জীড়ার সহিত বড়লটি-আবাসে বা পাঞ্জাব গবর্নর অথবা কমান্ডার-ইন্-চীফ আবাসে মধ্যে মধ্যে খুব উঁচুদরের নাটগানও দেখা যায়।

দুরন্ত বর্ষীয় বারো মাইল দূরত্ব অন্দর গলুক ময়দানে মধ্যে মধ্যে ছুই একটা আরাম-দায়ক সরকারী উজান-ভোজে এক অভিনবের ভিতর আদ্যেবনেন আনিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া সিনেমা তা আছেই। কিন্তু পরিশেষে প্রাতঃ শীতের প্রাবল্য ইহাকে অনেকটাই পরিভ্রান্ত করিয়া দেয়। তখন গবর্নর ও সরকারী কর্মচারীদের আবাসস্থান দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

এই বিভিন্ন ক্ষুদ্র পরিবর্তনের সামঞ্জস্যের ভিতরের সবচেয়ে আমোদজনক জীড়াইতেছে ‘শুটিং’। কাছাকাছি অনেক বড় বড় সংরক্ষিত বনবিভাগ আছে এবং হিল ষ্টেটের স্থপারিনটেন্ডেন্টের কাছে আবেদন করিলেই



ভাইসরয়্যাল লজ

ইলিসিয়াম হিল

বোলেগঞ্জ বাজার হইতে এসপেট হিল পুত্র শিকারের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। ভান্সুক ও নেকড়ে ছাড়া সব পশুই বৎসরের ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত শিকার করিতে পারা যায়। কেবল ঐ ছুটির বেলায় সারা বৎসরে কোনওরূপ বাধা দেওয়া নাই। তবে মুগনাভীবাহী হরিণ ও বনকুক্কুট বৎসরে কোনও সময়েই হারিবার হুকুম বেওয়া হয় না।

পেলিসি, গ্রাণ্ড কাক, সেসিল, ফ্রেগ থু, এলিসিয়াম, সেণ্ট্রাল, পাঞ্জাব, হিন্দু, মুসলিম ইত্যাদি অনেক বড় বড় বোর্ডিং, হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট এখানে আছে। খোঁজা হিন্দু, বা খোঁজা মুসলমানোপযোগী খাজানাখাও এ স্থলে পাওয়া যায়। ইম্পিরিয়াল, লয়েন্ড, গ্রিভেল, মার্কে-টাইল, টমাসকুক ইত্যাদি অনেকগুলি নামজাদা ব্যাঙ্কও এখানে আছে। বিজাতীয়ই হুকু আর ভারতীয়ই ইউক—পুত্রকল্যানে যোগ্যপতা শিখাইবার এত সুন্দর শিক্ষামন্দির ভারতের আর কোনও হিল ষ্টেশনে আছে কিনা সন্দেহ!

## চন্দ্রল মুহূর্তে

শ্রীমণীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমের এক বড় সহরের অধ্যাপক চন্দ্রকান্ত মুন্ডার নিৰ্জন পথের বারের ঘাসের উপর বসিয়া একদৃষ্টে অন্তগামী হৃদয়ের পানে তাকাইয়া ছিলেন।

বৃক ঠেলিয়া তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

দিন পাঁচেক পূর্বে সান্দ্রা-স্রমণ সারিয়া ফিরিবার মুহূর্তিক এই জায়গাটাতেই বাড়ীর পূর্বতন পাটিকা ‘আমোদী’ চোখমুগ্ন পুরাইয়া যখন শাসাইল “গভীর নিদ্রা নেয়ের জাতকুল থেকে খুঁটি মাধু সেজে বেড়াচ্ছ... যথেষ্ট যদি এর না কর, তবে আমিও সমস্ত ছাড়ব না—ছেলেবেলা তোমার দোর গোড়ায় ফেল দিয়ে আসব... যোবার পরিবারকে সব গুলে ব’লব...আলালতে গাভাতে হয় তাও পাড়াব—” তখন তার কয়েকটি কথা বহুক্ষণ বিম উল্লসিত করিয়াছিল তারই জ্বালায় এ কদিনে তাঁকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

আমোদীর কোলে যে শিশু সন্তানটি আসিয়াছে, তার জন্ম দায়ী নাকি সে একাই নয় তাই পুত্রের ভরণ-পোষণ বাদে অন্তঃ পাতটি হাজার টাকা তার নামে ব্যয়ে জমা না দিলে, মুখে সে যা’ বলিয়াছে, কার্যতঃ তা’ করিতে আমোদী একটি দিনও বিলম্ব করিবে না।

—এত যে দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা সেত মূহুর্তের চন্দ্রলটতেই—চন্দ্রকান্ত বাবুর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া গেল। কতক্ষণ পর অশ্লিত চরণে যখন তিনি বাংলার দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন তখন রাত অনেকটা হইয়াছে।

কিন্তু বাড়ীর দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, চন্দ্রলটা তাঁর ততই বাড়িতে লাগিল এবং গৃহ প্রবেশের পূর্বেই নিঃশেষিত সাহসে তিনি দোর গোড়ায় সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন।

এক ফালি চাঁদ ঘনীভূত অন্ধকার রাশিকে ঠেলিয়া গোনকে একটু আলোক দিতেছিল। সন্ধ্যার দীর্ঘ-

পথ জনহীন; শুধু পাশের বাগান হইতে ‘মি’মি’ পোকের একটানা একযোগে স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল।

হুচিন্তা রাশিকে জোর করিয়া বাড়িয়া ফেলিবার জ্ঞান পকেট হইতে একটা সিঁগারেট বাহির করিতে গিয়া চন্দ্রকান্ত বাবুর হাতের কবুইয়ে কি যেন একটা নরম পদার্থ ঠেলিল। একান্ত অলস দৃষ্টিতে গুরিয়া তাকাইতেই, ভয়ে আতঙ্ক চন্দ্রকান্ত বাবুর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—যেন এতক্ষণ তিনি একটা বিষাক্ত সাপের পাশে বসিয়া ছিলেন।

সিঁড়ির উপর দিক চৌকাঠের সামনেই একটি পুঁটিলি, মনে হয় কতকগুলো কাপড় জড়াইয়া সেটাকে লম্বা করা হইয়াছে। পুঁটিলির একদিক ঈষৎ খোলা ছিল—কম্পিত হাতবালা ভিতরে দিয়া স্পর্শ করিতে তাঁর মনে হইল যেন উষ্ণ...নীতলি কি একটা।

আতঙ্কে তিনি লাফাইয়া পাড়াইয়া উঠিলেন; কাছাকাড় গুন করিয়া যেন পালাইতেছেন এমনই সন্দেহ, সতর্ক তাঁর চোপের দৃষ্টি।

‘সর্বনাশ! তবে ত সত্যই আমোদী সন্তানকে ফেলিয়া গিয়াছে—সামনের ঐ কাপড় জড়ানো পুঁটিলির ভিতর তাঁর পাশের চিহ্ন—তাঁর স্তবকার্যের জীবন্ত নিদর্শন—হায় ভগবান—’

লজ্জায়, ভয়ে, ক্রোধে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন জমাট বাঁধিয়া গেল।

‘এখন তিনি কি করিবেন? জ্বর কাছে যদি সব প্রকাশ হইয়া যায় তবে সে কি বলিবে? সহকর্মীদের কানে যখন একথা’ বাইবে তখন তিনি মুখ দেখাইবেন কি করিয়া? কর্তৃপক্ষ যখন মুখ বাঁকাইয়া জবাবদিহি করিয়া কহিবেন “কলেজের শিক্ষক হ’য়ে, পাকা চূপে এমন কাছটা করিতে তোমার একটুও বাধল না চন্দ্রকান্ত বাবু?” তখন তিনি কি উত্তর দিবেন? ছাত্রের দল, সহরগুচ্ছ সকলেই তাঁর দিকে ইঙ্গিত করিয়া



কিছুর হাসি হাসিবে। সমাজের সকল ছুয়ার চিড়-কালের জড় তাঁর মুখের উপর বন্ধ হইয়া যাইবে। এত বড় একটা সংসার ছাপিবার প্রলোভন কাগজ-ওয়ালারা নিশ্চই সাবধন করিতে পারিবে না—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই অদ্ভুত কীর্তি জানিতে দেশ ভুড়ে কারই বা বাধী থাকিবে ?

‘বাংলার দক্ষিণ দিককার খোলা জানালা-পথে তিনি ত নশ্টই দেখিতে পাইলেন ঘরের মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছাঁকি সব কাজ করিয়া বেড়াইতেছে—অদূরে ছোট কুঠারটির ভিতর বসিয়া ধারবান মনোমুগ্ধ পাড়ে মূর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছে।

‘কতকু! এখনই যদি শিঙট জাগিয়া কাদিয়া উঠে তবে ত সব গোপন রহস্যটুকুই প্রকাশ হইয়া যাইবে।’

যা কিছু করিবার তা যে এখনই করা উচিত এই চিন্তাই চন্দ্রকান্ত বাবুর মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

‘শীঘ্র, শীঘ্র, এই মুহূর্তে—অজ কেউ দেখার পূর্বেই একটা কিছু—শিশু শুভ পুঁটলটাকে যদি তুলিয়া লইয়া অপরের দোর গোড়ায় রাখিয়া আসা যায়, বাস! তাহা হইলেই নিশ্চিত।

এত শীঘ্র একটা উপায় হইল ভাসিয়া কতকটা নিশ্চিত আরামেই চন্দ্রকান্তবাবু পুঁটলটাকে তুলিয়া লইয়া নিশ্চয় পথে নামিয়া পড়িলেন।

পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন উঃ! এমন বিপদেও মাঝে পড়ে! একটা এত বড় নামজাদা কলেজের প্রফেসর তিনি—এত রাতে হাতে শিশু লইয়া পথ দিয়া চলিয়াছেন। যদি কেউ দেখিয়া ফেলে এবং তাঁর সত্যকার অবস্থা জানিতে পারে তাহা হইলেই ত সর্বনাশ!.....তার চেয়ে সামনেই যে দোর গোড়া ওই খোলেই নানাইয়া দিলেই হয়—কিন্তু সামনের জানালাটা যেন খোলা আছে, আর কে যেন এই দিক পানেই তাকাইয়া আছে না? তবে কোথায় রাখা যায়?.....ঠিক ঠিক—গঙ্গারাম মাড়োয়ারীর দোর গোড়ায় রাখিয়া আসিলেই চলিবে। ওরা মন্ত বড়

ব্যবসায়ীর আর দয়্যারিচ্ছিতও বটে। মদনলাল ধরমশালা, লক্ষ্মী নারায়ণ শিখরবাপোলেই তার প্রমাণ। ছেলে-টিকে পাঁছা নিশ্চয়ই ওরা আবার বুকে তুলিয়া লইবে—হয়ত পুষ্ট্যেরেই মাছও করিয়া তুলিবে..... গঙ্গারাম মাড়োয়ারীর বাড়ী সহরে শেষ প্রান্তে গঙ্গার তীরে হইলেও চন্দ্রকান্তবাবু সেইখানে যাওয়াই স্থির করিলেন।

স্বপ্ন পথ। তাঁর মনে হইতেছিল শিঙট এর মধ্যেই জাগিয়া উঠিয়া কান্না না শুরু করিয়া দেয়—কিন্তু—শিশু এই কথাটা মনে হইতেছে কি রকম আশ্চর্য বোধ হইতেছে। প্রানবন্ত শিশু—রক্ত মাংসে গড়া দেহ—যে তাঁর মতই অদ্ভুত করিতে পারে—তাকেই তিনি হাতে মুলাইয়া লইয়া চলিয়াছেন যেন কান-ভাসারের ব্যাপ—অথচ যদি গঙ্গারাম মাড়োয়ারী তাকে যত্নে মাছ করে তবে কে জানে বড় হইয়া যে একদিন ডাক্তার, শিল্পী, লেখক, প্রফেসর, ঠিক তাঁদেরই মত বা তার চেয়েও বড় একজন হইবে না? আজ যাকে তিনি ছিন্ন পাছকার মতই ত্যাগ করিতে চলিয়াছেন, সে দিন হয়ত তার পাশে বসিবার মত যোগ্যতাও তাঁর থাকিবে না—

শুভ নির্জন পথ; অদূরে কার বাড়ী—তার দিকে বেরা বেড়া। তারই পাশে দীর্ঘদেহ, ঘন পত্রবল কয়েকটা গাছের তলে পথটা ঘন ঝাঁপারের মাঝে মিশিয়া গিয়াছে।

সেই খানটানে আসিতেই চন্দ্রকান্ত বাবুর দহসা মনে হইল, তিনি যে কাজটা করিতে চলিয়াছেন সেটা অত্যন্ত জঘন্য এবং দোষাবাহ। আর চেয়ে নোংরা কাজ আর কি হইতে পারে? যার জন্মের জন্ত সে এতটাই নাজ দায়ী নয়, তাগের এতটুকু যুগ হাফে যে একদিন শ্রেষ্ঠ সম্রাট হয়েও জন্মাইতে পারিত,—সেই সম্রাট শিশুকে লইয়া তিনি ধার হইতে ধারান্তর করিতেছেন—অথচ এই শিশুটিকুর জন্ত সে এতটুকু খরীদ নয়—বোঝ কার? বোঝত তাঁদেরই। দুর্বল মুহূর্তে তাঁরা যে আমান্দে মথ হইয়াছিলেন—তার শাস্তি আজীবন

হিরে কি এই হতভাগ্য শিশু! নিজেকে গভীর ক্ষমা এবং কলঙ্কের হাত হইতে বাচাইতে তিনি ইচ্ছাকে গঙ্গারাম মাড়োয়ারীর অধঃস্থরের উপর ত্যাগ করিতে গিয়াছেন—কে বলিতে পারে সে একে কোন অনাথ-ব্রাহ্মণ পাঠাইবে না? —সংসারের আবর্জনা রাশির মত সেখানে সেই বাদ্যধারা প্রাকৃতিক নিয়মে কোন রকমে বাঁচিয়া থাক। স্নাত্য প্রাপ্য যে মাতার মেহ, শিশুর আদর—কোনটাই সে জীবনে পাইবে না; পাইবে হয়ত শাসন, তিরস্কার, লাঞ্ছনা। বড় হইয়া যুজোর শিথিলে হয়ত নেশা করিতে, পকেট মাটিতে—অথচ পিতা তার উচ্চ শিক্ষিত, কলেজের অধ্যাপক—ঠারই রক্ত প্রবাহিত যার শিরায় শিরায়—

হাটাল পার হইয়া আবার তিনি পরিচুত হ্রদালোকে, দুল্ল পথের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন। নিজের বশব্দরকে একবার দেখিবার প্রলোভন সন্তুষ্ট হয় তাঁর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

রীরে রীরে পুঁটলটি বুলিতেই, শিশুর যন্ত্রস্ত চেপ, নগার লুল, চিরুকের উপর এক পলক বিদ্যে আলো ঘনিয়া পড়িল। অতিভূত চন্দ্রকান্তবাবু আপন মনে গভীর মাথা মূলে করিয়া উঠিলেন “ওরে ছুঁই, ওরে গভী, ঠিক তোব বাবার ন্যাকটাই চুরি করেছিস যুগি? ওর আমার সোপা, কার কোলে চড়েছিস, তা ছুই ফেলেই পারছিস না—ইচ্ছা করলে এমনই করে তোকে কে জড়িয়ে রেখে দিই—কিন্তু কি করবি বল—যেমন ব্যাচ করে এসেছিস—”

অন্যথাবিত পুষ্ট্যেরেই চন্দ্রকান্ত বাবুর চোখে জল ঘরিয়া উঠিল—মমতায় সর্বস্ব শির শির করিতে লাগিল। মরে পুষ্টকে পুনরায় কাপড়ে জড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

দমন্ত পথটা সমাজ সমস্তা এবং বিবেকে ক্রমাগতই ঠেপাঠাইতে লাগিল—

‘খাজ যদি তিনি সত্যিকার ঝাঁটা লোক হইতেন তা হইলে সংসারের সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া, সোজা শিশু পুষ্টকে বুকে লইয়া, জীবন নিকট গিয়া বসিতেন,

“আমাকে ক্ষমা করো; পাপী আমি, যা শাস্তি হয় মাথা পেতে নেব”, কিন্তু এমনই তাহে নিশাপাণ শিশুর সর্বনাশ করতে পারেন না; তার চেয়ে অধিক আমার—সব কিছু বিধা সন্ধ্যাচ মূখে সরিয়ে দিয়ে, এক একেই আমার মাছব করে তুলি।” তাঁর স্ত্রী কি সে কথা শুনিত না? হয়ত শুনিত এবং তাঁরই সন্তান ঠিক তাঁরই পাশটিতেই বড় হইয়া উঠিত।

গঙ্গারাম মাড়োয়ারীর বাড়ীর সমুখে আসিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু স্থির হইয়া ঠাঁড়াইলেন।

অদূরে গঙ্গা; যোতের সেই একঘেয়ে অসুটী ধ্বনি; কন্ কন্ জোলা হাওয়া তাঁর নখার একগোছা চুল উড়াইয়া দিয়া গেল; ভারী মিষ্ট বোধ হইল—এই শীতল প্রোপেটু—টিক শিশুর কোমল অঙ্গুলিপর্ণের মতই। ও পারে—বহুদূরে একটা অতি কীথ দীপশিখা কপিতো ছিল; সেই দিক পানে তাকাইয়া থাকিয়া খেলিতেছে। এক মুহূর্ত! তারপরই সহকর্মীদের বিজ্ঞপ, কর্তৃপক্ষদের হাতে লাঞ্ছনার ছবি তাইই মাঝে ভাসিয়া উঠিয়া সব যেন ওলোট পালোট করিয়া দিল।

অত্যন্ত সন্তপণে শিশুকে তিনি মাড়োয়ারীর দোরের উপর নানাইয়া দিলেন।

মুখের উপর তাঁর তপ্ত শোমিত অতি দ্রুততালে উঠা নামা করিতেছিল—

গঙ্গারাম মাড়োয়ারীর উদ্দেশ্যে অসুটী কণ্ঠে কহিলেন “আমার মার্ক্সনা কোনো বন্ধু! অর্ধের ভিতর দিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয়—তুচ্ছ সেই সাহসেই—”

—আর বলিতে পারিলেন না; বাপে কঠকন্ঠ হইয়া আসিল। নীরবে অশ্রু মুছিয়া পথে নামিয়া আসিলেন; কয়েকবার অগ্রসর হইয়া দহসা তিনি ঘুরকিয়া ঠাঁড়াইলেন—



‘কিন্তু না, এ হইতেই পারে না। লোক য়া বলে বলুক, সে ভয়ে তিনি আপন পুত্রকে এমনইভাবে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না—’

ক্রমপদে গিয়া তিনি পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নামিয়া আসিয়া দূরের আবহাওয়া আঁধারের ন্যায় মিশিয়া গেলেন।

বাংলায় যখন আসিয়া পৌঁছিলেন—চন্দ্রকান্তবাবু বাহজান তখন প্রায় ছিল না; আশা নিরাশার ঘনেষ, ভয়ে, পুলাকে বোধশক্তিটা কেমন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। বহুর্তের জ্ঞাত ইতস্ততঃ করিয়া তিনি অকপিত পদে সোজা ঘরে প্রবেশ করিলেন; জীর পদচোলা ইটু, গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া শিশু পুত্রকে নামাইয়া দিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন “ওগো, আমাকে য়া ইচ্ছা হয় শান্তি বিত্ত, শুধু তার পূর্বে য়া বলি শোন; আমি পাণ ক’রেছি—ওকতর অপরাধ—আমার নিজের সন্তান এটি—আমোদীকে মনে আছে—শয়তানের প্ররোচনায়, মুহুর্তের ভুলে—” এবং নিজের অসংলগ্ন কথাগুলো কানে বাইতেই, হৃৎসহ লজ্জায়, আত্মকে স্ত্রীকে কিছু বলিতে দিবার পূর্বেই, ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া—যেন কোন প্রবল শব্দর হাত হইতে রক্ত পাইয়াছেন—এমনই ভাবে ইঁপাইতে লাগিলেন। তাবিলেন স্ত্রীর সমুখ হইতে সজিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছেন; এই আকস্মিক আঘাতটা সামলাইয়া লইতে তার সময় লাগিবে; তারপর একটু প্রকৃত্তি হইয়া নিশ্চয় তাঁকে ডাকিয়া পাঠাইবে—তখন য়াওয়াই উচিত—

যে দ্বারদাসকে কিছুকণ পূর্বে তিনি ছোট কুঠরীটির ভিতর রামায়ণ পড়িতে শুনিয়াছিলেন, এখন সে অতি ব্যস্তভাবে পুঁথি হাতে তাঁর সমুখ দিয়া বার কয়েক ছোট্টাছুটা করিল—যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকেই কোন এক অসহক মুহুর্তে সে কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার মত শক্তি বা প্রকৃত্তি চন্দ্রকান্তবাবুর ছিল না।

অরুণ বার কয়েক ঘুরিয়া আসিয়া পাড়ের একসময় তাঁর সমুখে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ভাষা

হিন্দীতে কহিল “লজ্জ, বড় মুশিল হো গিয়া—সহমনিয়া ধোবী খোড়ি আগাড়ি কোঠিয়ে আয়াবা—হামারা কন্থর হুয়াকি উনকা বর্ডন মলনে বোলা হাম—উয়ো নাই এইসাই বেদ্যাকু হায় কি আপনা লেডকাকো বাহারে সিডিকা উপর ছোড়াকে অন্দর চলা গে—ইসিবকং কোই আকর লেডকাকো বেকর ভাগ গৈল—মিলতা নেই—কেয়া জানে কুডা, শিয়াল—”

চন্দ্রকান্তবাবু সহসা অস্বাভাবিক কণ্ঠে চাঁৎকার করিয়া উঠিলেন “কি, কি, কেয়া বোলা? কিসিকা লেডকা?”

পাড়েজি তাবিল মনিব তার মাগকাটতেই সংবাদট গ্রহণ করিয়াছেন; তার বিপুল হিম্মতহীন বক ডেক করিয়া একটি স্থগভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অপরাধীর কণ্ঠে কহিল “কুত কন্থর হামারা হায় চন্দ্রর লোকেন এইসাই ঘড়বত হো যাগয়া উয়ো হামারা মানুস থা নেই—সহমনিয়া এই সাই—”

তাকে শেষ করিতে দিবার পূর্বেই চন্দ্রকান্তবাবু অকস্মাৎ গজ্ঞন করিয়া উঠিলেন “নিকালো, নিকালো, আভি নিকালো হিয়াসে—” এবং চক্কেল নিমিষে পুরার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

চন্দ্র তখন অস্ত গিয়াছিল; বাহিরের দমীহৃত অন্ধকারের পানে তাকাইয়া শুকভাবে দাঁড়াইয়াছিল স্ত্রী অশ্রুমা। মুখখানা তার বাহিরের আঁধারের মতই কালো,—চোখে অন্ধ।

জীর সামনে আসিয়া অত্যন্ত বিবর্ণ রূপে হাসিবার অনর্থক একটা চেষ্টা করিয়া ঠানিয়া ঠানিয়া চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন “তুমি কি আমার কথাটা সত্যি ভাবলে নাকি? এই সামান্য-পরিহাসটাও বুঝলে না—এ! এই তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলছি ও কোন জন্মে আমার ছেলে নয়—যোগানী লছনমিয়া—তারই; রিয়াস না হয় ধনেশ্বর পাড়েকে ডেকে জিজ্ঞেস কর,—হিঃ, হিঃ! বড় বোকামি ক’রেছি দেখছি তোমার সঙ্গে এ রকম গুরুতর ঠাঁট ক’রে—”

হে দ্বীপ, কবি-মহাশয়,  
জীবনের যাত্রাপথ হোক মোর স্তর  
তোমারই জানাইয়া অন্তরের নতি।  
তব পুত্র আশীর্বাদে ধৃত হোক প্রাণের ভক্তি।

অক্ষম তুলিকা-পাতে আঁকি মোর ছবি  
কেমনে কি জানি; রূপজ্ঞানহীন আমি; তুমি মহাকবি  
সে চিত্রে বুলাইলে কী-যে যাত্রমা।  
অলঙ্ক্যে; রেখাপাত হ’ল সেধা নবভাব-ছায়া  
তব কল্পনার; তোমার দর্শন, তব অমুভূতি  
দিল সে মায়াজাল; অলঙ্ক্যে সে প্রেরণার দূতী  
দিয়ে গেল ইন্দ্রিয়ের রন্ধে রন্ধে অনিনব স্তর;  
তন্দ্রাঙ্কুর জিম্ম আমি; সহসা জাগিয়া শেষ চিত্র মোর হইয়াছে বেদনা-বিধুর।  
যেথা যাঁহা প্রয়োজন মিলিয়াছে বর্ষে বর্ষে রেখায় রেখায়,  
তোমারি ভাবের রূপ মূর্তি ধরি কৃটিয়াছে লেখায় লেখায়  
বিচিত্র লীলায়।

হে কবি, ভুলাইয়া রাখিয়াছ যে লেখা-লেখায়  
বিশ্ব ভারতীরে; রূপ রূপে, গানে গানে, স্তরে স্তরে ভরি’  
যে-ভাবে আবার আছ দিবা বিভাবরী—  
সে ভাবের নেশা আছে। ছন্দে গাঁথা মায়ায় তারি স্তরে স্তরে  
বাধা পেয়ে ধাঁধা লেগে আমার ছবিতে নেশা লাগে ঘুরে ঘুরে।  
হবে তাই। কিন্তু কবি, তব স্তর বেদনা-কাতর!  
তাহারি প্রভাবে আঁজি ছবি মোর কবিতা যে হ’ল অন্তর।  
বেদনাই করিয়াছে যুগে যুগে জন্মে জন্মে কবি,  
বেদনাই আঁকিয়াছে রেখা টানি’ বুকে বুকে ছবি।  
তুমি সেই রূপ-স্রষ্টা মহাশিল্পী এ বিশ্ব সভায়  
মহা দ্রাতিময় রূপে; হের তব অনন্ত-বিতায়  
চিত্র-উদ্ভাসিত এই বিশ্বের আঙ্গিনা  
গীতময় সভার আসর; একচ্ছত্র সেধা তুমি বাজাইলে বাঁধা  
অভিনব স্তরে;

তাহারি বন্ধার আজো ধনিতোছে মানুষের অন্তরের মধুময় স্তরে।  
সেই ধনিত হ’তে ধনিত নিয়ে ছন্দে গাঁথিয়াছি মালা,  
সেই স্তর হ’তে স্তর নিয়ে কথা দিয়ে সাঁজায়েছি ডালা।  
রূপহীন, ভাবহীন, অসম্পূর্ণ মোর নিবেদন  
হয় হোক অঙ্গহীন; প্রাণহীন নয় সে কখন।  
তাই দিয়ে নিবেদি এ প্রাণের প্রণাম,  
তোমারি আশীর্বে হোক পূর্ব সনাকাম।





( সমালোচনার জন্ম দুইখানি করিয়া গুপ্তক প্রেরিতব্য )

**পূর্বরাগ**—শ্রীশ্রবণনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীশ্রবণচন্দ্র মজুমদার, দেব  
সাহিত্য কুটার, ২২৪বি, কামাপুকুর  
লেন, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

সাহিত্যিক স্রষ্টার বাবুর লেখনীর মূর্তন করিয়া  
পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিশ্চোজ্ঞ। বাংলার স্বাধীন সমাজ  
উত্থার লিপিকুললতার পরিচয় ইতিপূর্বে যথেষ্ট  
পাইয়াছেন এবং আলোচ্য বইখানিতেও ভাষা ও গল্পের  
মাধুর্য্যে পাঠক পরিতুষ্ট হইবেন,—একথা জোর করিয়া  
বলা যায়। গ্রাম্য আবহাওয়াকে কেন্দ্র করিয়া সামাজ্য  
ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে যে অপূর্ণ রস সৃষ্টি হইয়াছে,  
তাঁহা বাস্তবিকই প্রশংসাহঁ।

গল্পের নামক রসরাজ, আমাদের রাজ্য-পণ্ডিত হইয়াছে  
অনবদ্য। এই রাজ্যপণ্ডিতের কার্যাবলীই সমগ্র বই-  
খানিতে বিশদভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। মাহুষ ত'  
সব সমান হয় না। ভীক কাপুরুষের মধ্যে দুই একটি  
বীরের অবতারণা দেখিতে পাই। আমাদের রাজ্য-  
পণ্ডিত বোধ করি এই বীর জাতির মধ্যে আসিয়া  
পড়ে। ছেলে বয়স হইতে রাজ্যের সত্যের প্রতি নিষ্ঠা  
ছিল অসামান্য। সে সত্য বলিত, এবং সকল সময়ে  
অপ্রিয় সত্যই বলিত। ভাগ্য-দোষে চাপকোর “মাত্রদ্বাং  
সত্যমপ্রিয়ম্” কথাটি তাহার মনে লাগে নাই। রাজ্য  
মনে মনে বলিত, সত্য বলিব, সর্বদাই সত্য বলিব;  
তাঁহার পর অদৃষ্টে বাহা ঘটে যটুক। সত্যের উপর নিষ্ঠা  
রাখিয়া তাঁহার এই অদৃষ্টবাদ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এমন  
এক অবস্থায় উপনীত করিল বাহাতে শেষ পর্য্যন্ত সেও  
বিশ্বাসে হতবাক হইয়া পড়িল।

এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মূলে আমরা দেখিতে পাই  
মেনকা, রাজ্য পণ্ডিতের অত শব্দের মেনকাঁকে। রাজ্য  
মনের নিগূঢ় নিহিত বিশ্বয় বেদনায় বার বার মেনকার  
কথাই জাগে। রাক্ষিত্রে প্রতীপ-শিখার দিকে একদর  
চাহিয়া চাহিয়া শুধু মেনকার ভাগ্য-বিড়ম্বনা  
কথাই রাজ্য চিন্তা করে। কি কপাল তোর মিনি!  
কিন্তু কেন সে অত কথা ভাবে! অথর কুণ্ডুর বলা  
মেনকার সহিত রাজ্য এক সঙ্গে বহুদিন পাঠশালার  
কাটাইয়াছে। শুধু তাঁহার পর পাঠশালার পাঠের  
অবসান ও হরকৃষ্ণের সহিত মেনকার বিবাহ হয়,  
তথাপি শৈশবকালীন যে ভালবাসা একবার  
মনের কোষে শিকড় আকড়াইয়া রহিয়াছে,  
তাঁহাই পরে নিতানৈমিত্তিক ঘটনার মারে  
মাংসারিক জীবনে ফুলে ফলে পূর্ণভাবে বিরশিত হইয়া  
উঠে। তাই না মেনকার অত বড় বিপদের মাঝেও  
রাজ্য পণ্ডিত নিজের বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া  
অমন বদনে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রাজ্য-পণ্ডিত ও মেনকার চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে  
অপরূপ। মেনকার মনের কথা কিছুই যেন তার রাজ্যের  
নিকট গোপন করিবার নাই। মেনকা বলে, ধর্ম্মি-  
লোকে, রাজ্য, আমার কথা শুনেলে কাণে আত্ম  
দেবে; কিন্তু না বলেও আমার নিস্তার নেই! যদ্যে  
আশুন কি চেপে রাখা যায়? রাজ্য! তুমি শত্রু জান  
ধর্ম্মবান! তুমি বলে দিতে পার না, মেনকার উদ্ধার  
পথ?

ছাপা ও ভাষা বেশ সরসরে বাঁধাই ও প্রোক্ত-  
ভালই। বহির তুলনায় দাম ঠিকই হইয়াছে।

শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।







# পুরাতনের পুনরাগমন

উল্লেখ্য

শ্রীহেমেন্দ্র ব্রহ্মদ ঘোষ ।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

মঠ পলিষ্টেড :

পল্লীগামে

মাধুরীর শাওড়ী আশ্বিন মাসের প্রথমেই তাহার ষষ্ঠরবাড়ী ঘাইবার দিন স্থির করিয়া পাত্র লিখিয়া ছিলেন। তাহার পর যে “শুভদিন” যাত্রার পক্ষে অঙ্গুল, তাহা চূর্ণোৎসবের কয়দিন মাত্র পূর্বে; কাষেই মাসের প্রথমভাগে যে “দিন” সেই “দিনই” তাহাকে ঘাইতে হইবে।

লিঙ্গীর সঙ্গে মাধুরীর সুবই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল—লিঙ্গীর চালচলন মাধুরীর কাছে এত ভাল লাগিত যে, দিদি তাহাকে সে সকলের অঙ্গসংগ করিতে নিষেধ করিলে সে দিদির অতিরিক্ত সেকলে ভাবের বিকাশে বিরক্ত হইত; মাধুরী যে তাহার ভালর জন্তই তাহাকে উপদেশ দিত, তাহা সে বুঝিতে চাহিত না। মাধুরী জানিত, মাধুরীর ষষ্ঠরবাড়ী পল্লীগামে—ষষ্ঠরবাড়ীর সকলের চালচলন সেকলে ধরনের, কাষেই মাধুরী যদি সে পরিবারের আবহাওয়ার সহিত আপনার সামঞ্জস্য সাধন না করিতে পারে, তবে উভয় পক্ষকেই যে যে কষ্ট পাইতে হইবে। লিঙ্গী মাধুরীকে বুঝাইত, পল্লীগামের বেহুবন, শ্রামশোভা, “মাঠে মাঠে ধান”—ধর কবিতাতেই ভাল, আসলে নহে। পানাপুকুর, গাঢ়পাক, কাদা, মশা, সাপ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ঝড়কার—এ সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করাই সভ্যতার অভিপ্রেত; আর এই সুবই পল্লীর উপকরণ। কোকিলের কুহুরবে ম্যালেরিয়া জ্বরের বন্দন ও তরুণত্বের মর্ম্বেরে পুষ্করিণীর পান। দূর দূর না। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা গিয়াছে,

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অবনতি ও সহরের সমৃদ্ধিরকি অবশ্যস্বাভাবী। পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে লজ্জাবতীর পরিচয় যে উল্লেখযোগ্য ছিল, তাহা নহে; কারণ, ম্যাট্রিকুলেশনের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িলে সে পরিচয় সম্ভব হয় না। কিন্তু কোন কোন লোক যেমন অতি অল্প পরিমাণে সুবর্ণ পাইলে তাহাই পিটাইয়া—পাত করিয়া অনেকটা স্থান জুড়িয়া রাখিতে পারে, কেহ কেহ তেমনই অতি সামান্য বিজ্ঞা অনেকটা করিয়া দেখাইতে পারে এবং তাহা দেখিয়া লোক যে চমকিত হয় না, এমনও নহে।

লজ্জাবতীর কথায় মাধুরী বুঝিয়াছিল—স্বাধীনতা ব্যতীত স্বপ্ন নাই—পরার্থীনতাই ভ্রম, আর পল্লীগামে পারিবারিক জীবনে স্বাধীনতা দৃষ্ট হইতে পারে না। কাষেই বাহাকে পল্লীগামেই জীবন কাটাইতে হয়, সে নারীর জীবনে অনন্ত ভ্রম।

মনের এইরূপ ভাব লইয়া—পল্লীগামের উপর বিরূপ হইয়া মাধুরী ষষ্ঠরবাড়ী গেল। কাষেই সে পল্লী-জীবনে পদে পদে কেবল ক্রটি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

প্রথমবার সে যখন কয়দিনের জন্ত শুভদ্রালয়ে গিয়াছিল, তখন—সে উৎসবানন্দের মধ্যে, আর সে-ই সে উৎসবের কেন্দ্র। দলে দলে লোক বধু দেখিতে আসিত—কেহ শূভহস্তে আসিত না—সকলেই তাহার প্রশংসা করিত—সে একটা নূতন অভিজ্ঞতা। তাহার উপর তখন সে যেন নূতন জগতে আসিয়াছিল; সহরের সর্কারী স্থান, সর্কারীতর আসবাব—আর পল্লীগামের রূহৎ গৃহ, অসংখ্য আসবাব—সে যেন উপভাসের, রাজত্ব। দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া যে তাহার থাকিবর নিষ্কিষ্ট কয়দিন ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাহা সে যেন



বুঝিতেই পারে নাই। আর সর্বোপরি—তখন লজ্জাবতীর উপদেশের বিধি সে অমুজ্ঞানে পান করে নাই, কায়েই তখন তাহার চিত্ত পল্লীগামের প্রতি বিকল্প হয় নাই।

এবার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এবার সে “ঘর করিতে” আসিয়াছে; শাওভী অনেক সময় তাহাকে স্বরণ করাইয়া দিতেন,—সবই তাহার, সেই এই সংসারের অধিকারিণী, তাহাকেই এই পরিবারের মাসময় মুখলা রক্ষা করিতে হইবে, তাহাকেই এই রহৎ সংসারের ভার লইতে হইবে—তিনি বিদায় লইবেন। তবেই বটে! একদিন যে সংসারের বৈচিত্র্য ও বিশালত্ব সে একটু বাহির হইতে দেখিয়া তুইই হইয়াছিল, এবার তাহার মধ্যে আসিয়া সে কষ্ট হইয়া উঠিল। এত বড় সংসারে মানুষের কি প্রয়োজন? প্রকৃতভাবে সংসারে ত কেবল, শাওভী, স্বামী আর সে। তবে আত্ম-আত্মীয়,—পোখ-কুপোখ—এ সকলের কোন প্রয়োজনই সে অহমান করিতে পারে না। এ সকল এবার তাহার কাছে সত্য সত্যই অনাবশ্যক ও স্বাধীনতার অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

লজ্জাবতী যে বলিয়াছিল, পল্লীগামে সেকেল পরিবারে বধুর স্বাধীনতা থাকে না, তাহা মাধুরী সত্য বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। শাওভী সংসারের কজী—তিনিও কোন দিন অন্ধর মহেশ্বরের বাহিরে যাবেন না; ঠাহারও মাথার উপর অবগুঠন; তিনিও উচ্চকণ্ঠ কথা কছেন না; ঠাহারও হাসি কখন শব্দে আচ্ছন্ন থাকে না। মাধুরীর বাতীতে সে কতকটা এইরূপ চালচলন লক্ষ্য করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার তুলনায় তাহা “পকেট সংসদর” ব্যতীত আর কিছুই নহে। মালতীর বাতীতে এতাব নাই—বুধিগণের শাওভীর সমকণ্ঠ স্বামীর সঙ্গে কথা বাচি চলিতে—তাহার “দাদা” বলিয়া অভিহিত—মিষ্টার চৌধুরী মত বাহিরের লোকের সঙ্গেও আলাপ ঘনিষ্ঠভাবেই হইয়া থাকে;—কেবল দুইই নহে, পটী প্রকৃতিতে গভীরত বধুর আঁকড়ার বলিয়া বিবেচনা করে। লজ্জাবতীর ত কথাই নাই।

মাধুরীর স্বতন্ত্রবাড়ীর বাহিরের মহল আর অন্দরমহল যেন দুইটা স্বতন্ত্র বাড়ী—গভীরতই সময়সাপ্য। দেবদত্তের প্রপিতামহ যখন নতুন করিয়া বাড়ী প্রকৃত করান, তখন তিনি, বোধ হয়, মনে করিয়াছিলেন, ঠাহার পুত্র পৌত্র-প্রপৌত্রের সংখ্যা অনেক হইবে এবং তাহার সকলেই একসঙ্গে থাকিবে। কিন্তু তিন পুরুষ কাহাও একাধিক পুত্র হয় নাই এবং স্বামীর পরিবারে প্রত্যেক বারই বহুদিন করিয়া নাবালক অধিকারী থাকায় সম্পত্তিই কেবল বাড়িয়াছে। রহৎ গৃহ কতকটা পূর্ণ রাবিবার জন্তও আত্মীয়তার বা কুটুম্বিকার স্বর ধরিয়া বহুরূপ হইতে লোককে আকৃষ্ট করিয়া আনিতে হইয়াছে। এই রহৎ গৃহের ব্যবস্থাসমূহের স্বামিনীকর্তে সাপাতেরও যেন একটা মনে নিষ্কিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নিষাধাগে মার কাছে সময় প্রয়োজন না থাকিলে দেবদত্ত কেবল আহারের সময় অন্ধর মহলে আসিত; মা সব কাণের মধ্যেও পুত্রের আহারের সময় তাহার কাছে বলিয়া তাহার খাওয়া দেখিতেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়াই দেবদত্ত বাহিরে যাইত—সেই স্বর সময় ব্যতীত দিবাগণে স্বামীর সহিত মাধুরীর প্রায় সাপাৎ হইত না। যৌবনে যখন স্বামিনীর জ্বর পরস্পরের সান্নিধ্যলাভের জন্ত ব্যাকুল হয়, তখন এতপ প্রাচীনগে অস্বাস্যসহিত দেবদত্তের কাছে তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু ব্যবসায়ী মাধুরী সেভাবে দেখিতে পারিত না—তাহার মনে, লজ্জাবতীর শিক্ষায় যে তাব ক্ষুরিত হইয়াছিল সে সেই—  
—“Cursed be the sickly forms that err from honest Nature's rule.” স্বামীর কোন কাণের ভারও তাহার উপর ছিল না। লজ্জাবতী আসিয়াই প্রথমতঃ প্রায় কাপড়ের আলমারী হইতে ভাতার ঘরের চাবি আদানার রি-ক্লক করিয়াছিল; আর লোহার সিন্দুকর চাবিও তাহারই বায়ে স্থান পাইয়াছিল। মাধুরীর শ্বশুরবাড়ীর ব্যবস্থা একেবারে অজ্ঞাপ। তাহার আপনার গহনার বাগ্ন হোথাখানার বহ

সিন্দুকে বদ্ধ হইয়াছিল—সাধারণ ব্যবহার্য গহনা সে যখন বাহা ব্যবহার না করিত তাহা তখনই শাওভীর ঘাস দাসী হারাণী শাওভীর কাছে জমা দিয়া আসিত। তাহার যখন বাহা প্রয়োজন, সে তখনই তাহা পাইলেও সে সর্বদা মনে করিত, তাহার স্বাধীনতা নাই। স্বাধীনতার যে মাত্রা থাকিতে পারে এবং শিক্ষা ও মান্যতার অপেক্ষা না রাখিয়াই যে স্বাধীনতা লাভ করা যায়, তাহা রক্ষা করা ও তাহাকে অন্যায় হইতে রক্ষা করা যে অনেক সময় দুঃসার্য হইতেও পারে, তাহা মাধুরীকে লজ্জাবতী বুঝায় নাই—সেও তাহা বুঝে নাই। সেই জন্ত লজ্জাবতীর উপদেশ স্বরণ করিয়া সে সর্বদাই কেমন যেন অপ্রসন্ন হইয়া থাকিত।

বাড়ীর অন্দরমহলের ঘরঙালাও যেন একটা রহৎ গোলকধাঁধার অংশ। সেই মহলটার সহিত তাহার পরিচয় হইবারও পূর্বে মহলটা সমাপ্ত আত্মীয়ায় ও কুটুম্বিকিতে যেন ভরিয়া গেল। কোথা হইতে কেন এই পত্নপালদলের আবির্ভাব হইল, কোথা মাধুরী প্রথমে বুঝিতেই পারিল না। শেষে কৌতূহলবশে সে কথা সে একদিন তাহার দাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে শাওভী তাহা শুনিয়া অপরাহে তাহার ঘরে আসিয়া তাহাকে বুঝাইয়া যাইলেন—“বোমা, এরা প্রায় সবসঙ্গেই এই পরিবারের ঘর সম্পর্কে আত্মীয় বা কুটুম্ব প্রথা। এরা আসেন, কারকর্মে সাহায্য করেন। তবে এঁদের বড় অভিমান, তাই সাবধান হয়ে এঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।”

শাওভীর কথা শুনিয়া কৌতূহলবশে মাধুরী এই নবাগতদিগের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ-সন্ধান প্ররুতা হইল। তাহার বাস দাসী যে বিয়ে তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিল না এবং শেষে সেই হারাণীকে ডাকিয়া আনি। তাহার কাছে মাধুরী জ্ঞানিল, ইহারা কেহ বা তাহার দাসাশুভ্রের ভাগিনেয়ের দৌহিত্রী, কেহ বা দাসাশুভ্রের পিসীমার কন্ডার পৌত্রের বধু—

ইত্যাদি। হারাণী বলিল, “বড়মহাশয়ের সম্বন্ধ—যেন কলমীর দল, একটা লতা ধরে টান—সারা পুরুরের দামে টান পড়বে।”

ইহারা কেবল কতদিন থাকিবেন জিজ্ঞাসা করায় হারাণী বলিল, “তাঁর কিছু ঠিক নেই; কেউবা বিজয়ার পরদিন, মার বিদায়ের পরই, কাপড় ছিটি বিদায় নিয়ে যাবেন, কেউবা ছুদশদিন পরে যাবেন।”

কাপড়ের যে ছোট পাহাড় রক্ষিত হইয়াছে, তাহার কাণে এইবার মাধুরী বুঝিল—সকলকে দিতে হইবে। কি অপব্যয়! লিজী তাহার সিঁদিমার কাছে গৃহিণীপনা শিখিয়াছিল। সে বলিয়াছে, তিনি কীরে কাপড় পুজার সময় দিয়া যাবেন, কেহ যদি একমাসের মধ্যে চলিয়া যায়, তবে কাপড়ের দাম মাইয়ানা হইতে কাটা যাইবে। ছেলেদের আসিদের যে সব চাপরাশী বাড়ীতে “বয়” সাজিয়া বাসন মাজা, জল আনা, ঘর সাফ রাখা—সব কাণ করে, তাহারা কখন “ঘরের চাকর” বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, স্বতরাং পুজার সময় তাহারা কাপড় পাইলেও চাদর পাইতে পারে না। লিজী, স্বামীর গৃহেও কতকটা সেইরূপ ব্যবস্থা পত্তন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মাধুরীর আপত্তিতে পারে নাই।

কথায় কথায় একদিন মাধুরী সে কথাটা দেবদত্তকে বলিল। শুনিয়া দেবদত্ত উত্তর দিল, “এ প্রথা যখন হ’য়েছিল, তখন এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল; টাকটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ত। এক এক জনের হাতে টাকা জমে বলে’ তাঁর প্রতিবাদে ঘুরেপে এক-একটা একাকারের দল উঠেছে। আমাদের দেশে যাঁতে তা’ না হয়, তাইই জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা হয়েছিল। ঘর না—আইবুড়ভাতের কথা; আত্মীয় কুটুম্ব সকলে কাপড় দেয়, সে কেবল একজনকে বোঝা দশজন বহে দেয়—সমবায় সমিতির মত সামাজিক ব্যবস্থা।

মাধুরী বলিল, “কিন্তু সে কাল ত আর নাই।”  
“তা বটে, তা এখন অনেক পুরান প্রথার অপ-  
ব্যবহার হচ্ছে; তবে এক দিনে সেগুলার সম্ভার



করা যায় না—সংহার না করে ক্রমে ক্রমে সংস্কারই করতে হবে।”

মাধুরী সকল দিকে এইরূপ বাহুলা লক্ষ্য করিত। লক্ষ্য চুলী কাটিয়া সারি সারি ভাতের হাঁড়ি বসান হয়—যেন জগদ্বায়েব ভোগের আয়োজন। কত লোক খাতিতে আসিবে, তাহা স্থির জাণিবার উপায় নাই; কিন্তু যে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকেই জলখাবার হইতে ভাত—পান পর্যন্ত যোগািতে হইবে। বড় বড় ডোলে ভরা ধৈ, চিড়া, মুড়কী; ধান্য ধান্য বসকরা ও গুড়ো মণ্ডা; নূতন কাপড়ের উপর কলাপাত পাকিয়া তাহাতে জুপাকার ভাত, গামলা গামলা তরকারী ও ভাইল—কোথাও সংকেপ নাই।

এই যে “দীপতাং চুত্বাতাং”—ইহাতে যে পরম আনন্দ আছে, তাহার উপভোগও শিক্ষাসাপেক্ষ। মহিলে পরের বাড়ীতেও ব্যয়ের বাহুল্য রূপের মনে ব্যথা বাজে কেন? এত বড় ব্যাপার মাধুরী আর কখন দেখে নাই। তাহার মাতা লোককে ধাওয়াইয়া ও দিয়া আনন্দ লাভ করিতেন সত্য, কিন্তু তাহার কাযের ক্ষেত্রে যেমন সর্জনও সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার ব্যয়ের মাত্রাও তখনই নির্দিষ্ট ছিল। মাধুরীর আশর্ষ লক্ষ্যবাহী তাহাও অপব্যয় বলিয়া মত প্রকাশ করিত—সে তাহার মামার বাড়ীর শিক্ষার ফলে।

জমিদারবাড়ীর পুজার আনন্দে গ্রাম যেন মাতিয়া উদ্ভিগাছিল। বাজের বিরাম ছিল না, বাড়ীর লোকের বিশ্রাম ছিল না, জনতার যোতে ভাঁটার টান দেখা বাহিত না। মাধুরীর মনে শিশুকাল সব শিশুকাল দৃষ্টি রাগিতে হইতেছিল; কিন্তু তাহার মন ছিল, পুজার আয়োজনের দিকে। তিনি মধ্যে মধ্যে মাধুরীকে অনাইয়া তাহাকে কাছে রাখিতেছিলেন, উদ্বেগ—সে দেখিয়া শিবিবে। কারণ, এ সবই তাহার কাম, সে শিবিয়া লইতে পারিলেই তাহার ছুটি হইবে।

কিন্তু শিবিয়ার প্রবৃত্তিই মাধুরীর ছিল না—অগ্রহ আসিবে কোথা হইতে? এ সব ব্যবস্থা সে যেন অন্তীত যুগের অবশেষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিল—

তাহার হাতে কমতা থাকিলে সে এসব পরিবর্তিত করিত। যে মানাভাব লইয়া লোক ধাতকের খেলার মাঠে পবিত্র করিয়া মনে করে, সে সভ্যতার বিস্তার-সাধন করিতেছে, মাধুরী মনে সেই ভাবেরই প্রশ্ন করিতেছিল।

সে যদি কিছুদিন লিজীর সহস্রাড়া হইয়া শান্তভীর কাছে শিক্ষা পাইত, আর দেবদত্ত যদি তাহার-কানে-পুতন এই সব পুরাতন আচারব্যবহার ব্যবহার স্বরূপ তাহাকে বুঝাইয়া দিত, তবে, কিংবদন্তি, ক্রমে তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হইত। কিন্তু, আপাততঃ তাহা হইল না। দেবদত্ত নম্রস্বভাব ও ধীর হইলেও বাল্য-কালাবধি যে হালচালের শিক্ষার শিক্তি তাহা জাতীয় ভাব বিকাশের পক্ষে অহরহ নধে—সে শিক্ষা অমারিগকে কুলজমাগত আচারব্যবহার কুসংস্কারের বলিয়া সে সকলের কারণ নির্ণয়বিমূখ করে এবং সমাজের পুরাতন ব্যবস্থা নিন্দনীয় বলিয়া সে সকলের বর্জনে উৎসাহী করে। শেষে যখন আমরা দুসারে আখাতের পর আখাতে ক্রিয়্যা শিবি, তখন তুল বুঝিতে পারি; কিন্তু তখন হয়ত বুঝিয়াও আর প্রতীকারের উপায় করিতে পারি না। দেবদত্তের সে বয়স ও সে স্রব্যাগ কখনও হয় নাই। তাই বর্তমান শিক্ষার শিক্তি দৃষ্টিগোচর সাধারণ নিয়মে সেও প্রাচীন প্রথা প্রতি আকর্ষিত ছিল না।

শান্তভী এবার বন্ধু কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আনিয়াছিলেন বাটে, কিন্তু একটা অসুস্থিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাহার সমস্ত ভাবিয়া দিল। পুজার প্রথমদিন বাড়ীতে আনন্দের ও বাজের আর বিরাম হইল না। চতুর্থমণ্ডলে স্তব্ধিত দেবীপ্রতিমা—গোলাপের আরবরমুজ বড় বড় ঝাড়ের কাছে পতিত হইয়া রবিকর ইল্লম্বরগের বর্শে বিলিষ্ট হইতেছে; মণ্ডপগৃহের বড় বড় পায় দেবদাকর পক্ষে মণ্ডিত ও পয়স্কুলে গতিত; সমুদ্রে প্রোঙ্গনের উপর চম্পাপ—মধ্যস্থলে বলির পত্বেবার্ণী বৃক্ষাষ্ট প্রোথিত, কয় দিন হইতে বড় বড় গাড়াগুলি মাঠান্ত ও ভীষণর কয়

হইতেছে—সেগুলি মণ্ডপের অগ্নিলে বহিয়াছে; ধূপ-তার পঞ্চামোদিত ধূমে বাতাস যে ঘরাক্রান্ত; ঢাক, ঢোল, কঁসার—যেন রণবাজ হীলীধ করিতেছে; রক্তধরধারী বাজকরা নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতেছে—ঢাকের কাকপক্ষুড়াও মতিহেছে। মধ্যে মধ্যে জনতার ভক্তিগরবদর্শকের গ্রহণ—“না! না!” সে অধরান শুনিয়া যেন পামণিরও পামণ-দ্রব পিচ্ছিত ও বিপ্লিত হইয়াছে—প্রতিমার যেন মনে সত্য সত্যই ঘেরের কোমলতা প্রকাশ পাইতেছে। বাজারার শিল্পী মুগ্ধ মুগ্ধ রিয়া এই দেবী-রচনার কি অসামান্য নৈপুণ্যই লাভ করিয়াছে! সেখ কি অসাধারণ ভাববাজক।

এত চাঁৎকার—এত বাজধ্বনি—এত ঢাকধা—ইহা-র দল ও বদল ভীষণের অভিযুক্তি, সে ভীজন বাজায়া হইতে অস্থির হইয়াছে, পত্নীগ্রামে কেবল তাহার গীত অবশেষ আছে—নগরে কিছুই নাই। মাধুরী ইমপুর্ষে কখন দুর্গাপুজা দেখে নাই; দেখিয়াছে ফেল বিদ্যুৎকরে বিন রাজপথে প্রতিমার মোভাযায়া। সে এই উৎসবের আনন্দ দ্রবয়ে গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিতে পারিল না। সে যেন ইংবাইয়া উঠিতেছিল।

শান্তগৃহে শক্তিপূজা—ভক্ত রক্তকে শক্তিপূজার ইচ্ছা বলিয়া বিবেচনা করেন। দেবদত্তের সময় যখন সমবয়সীর সহিত মাধুরী বারাদায় আসিয়া যহার জন্ত নিষ্কিষ্ট স্থানে বসিয়াছিল। ধূপধনার ধূমে চৌমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; প্রতিমাও কেবল কণ্ঠে লজিত হইতেছিল। ভক্তদিগের মনে হইতেছিল, এই স্বচ্ছন্দকারের মধ্যে দেবীর আবির্ভাব হইতেছে।

বলির সময় সমাগত হইল। জাগশিত বয়স্কানে গীত হইল; দুইজন লোক তাহাকে ধূপের আধারে গেলিয়া ছুই দিক হইতে উনিয়া ধরিয়া। কণ্ঠকার চৌমণ্ডপের অগ্নিদ হইতে একদানি রুহ-২ বজ্রা লইয়া যদিল। মাধুরী পার্শ্ববর্তিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ও কি হইল?” সে বিশিষ্টভায়ে তাহার মুখে চাহিয়া বলিল, “কেন, আপনি জানেন না? এবার বিদ্বান।”

ঢাকের বাজনা বাজিয়া উঠিল—“জয় মা!” বলিয়া কণ্ঠকার থকা উদ্বেগিত করিল।

মাধুরী আর কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাইল না।

## সপ্তম পত্রচ্ছেদ ১

### প্রত্যাবর্তন

“মাধুরী যাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিল, সে লক্ষ্য করিল, সহসা তাহার চকু মূরিত হইয়া গেল—সে ব্যস্ত হইয়া তাহাকে না ধরিলে মাধুরী পড়িয়া বাইত। আর সকলে তখন বলিদান দেখিতেছিল, মাধুরীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই। যে মাধুরীকে ধরিয়াছিল, সেই সকলকে সে কথা বলিল। তখন ব্যস্ত হইয়া কেহ জ্ঞানান্ত, কেহ পাখা আনিতে গেল; মাধুরীকে সেই স্থানেই শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল। আখিন মাস—শরতের বাতাস সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে শীতলপর্ণ হয়; কিন্তু মাধুরীর কপালে কিন্তু বিপ্লু যম্ভ।

মাধুরীর শান্তভীকে একজন হাইয়া সংবাব দিলেন—সে সময় ভীড় ঠেলিয়া হাইয়া বারান্দার মধ্যে সে কথা তাহার কর্ণগোচর করিতে একটু বিলম্ব হইল; তিনি তখন পূজার উপকরণ গুছাইতেছিলেন; শুনিয়া বলিলেন, “মা দুর্গা বাড়ীতে থাকিতে কোন ভয় নাই। আমি এটী মাঝিয়েছি যাচ্ছি। দেবুকে আর ডাকারকে খবর দাও, আর কোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।”

সংবাব পাইয়া দেবদত্ত ডাকারকে সঙ্গে লইয়া আপনার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল। গ্রামে জমিদারেরই প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার—তিনি জমিদারের বাড়ীতেই থাকিতেন। তাহার যখন আসিলেন, তখন উপস্থিত মহিলারা মাধুরীর মুখে ও চকুতে জলের কাপটা দিতেছেন। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, “ঘরে এত ভীড় কেন? কেবল জন দুই থাকুন।”

অনিচ্ছায় প্রায় সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে দালানে হাইয়া ভীড় করিলেন। ডাক্তার বলিলেন, “শেখি সট আছে? দেবদত্ত ডেমি টেবল হইতে একটা



শিশি আনিয়া দিল। ডাক্তারতাহার হ্রিপি খুলিলেই ল্যাভেণ্ডার-সিক্ত এমোনিয়ার গন্ধ ঘরে ছড়াইয়া পড়িল। ডাক্তার শিশিটা মাধুরীর নাকের কাছে লইলে সেই উগ্র গন্ধে মাধুরী বেন চমকিয়া উঠিল—চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ডাক্তার বলিলেন, “কিছু নয়, কেবল ‘শব্দ’ এমন হয়েছে।”

সেই সময় মাধুরীর শাভড়ী ব্যস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া মাথার উপর কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ডাক্তার বাবু কি বলছেন?” উত্তরটা ডাক্তার বাবুই দিলেন,—“মা, তুমি প’রেন না ও কেবল বা’ কখন দেখেন নি, তাই দেখে ‘শব্দ’—অর্থহীন কিনা মনে আচমকা একটা আঘাত পেয়ে এমন হয়েছে! বুঝকৈ মেরে বা’বে।”

শাভড়ী বধূর কপালে হাত দিলেন এবং চুল সিক্ত বুঝিয়া তাহাতে হাত দিয়াই বলিলেন, “ওমা, এবে তিজ্ঞ জব জব করছে! বিজ্ঞানও বে তিজ্ঞ পেছে! হারাণী!” হারাণী তাহার সঙ্গেই আসিয়াছিল; সে অঙ্গুর হইয়া আসিল। মা বলিলেন, “তোয়ালে দে ত। মুছিয়ে দিই। বিজ্ঞানটাও বদলাতে হবে।”

হারাণী আলনা হইতে একখানা টাশিণ তোয়ালে আনিয়া বলিল, “আমি মুছিয়ে দিছি।”

“না—আমাকে কে, বলিয়া মা আনি বধুর সিক্ত কেশ মুছাইয়া দিবার জন্ম কেশরাশি করবীমুক্ত করিতে করিতে বলিলেন, “আহা, বসরকার দিন; মা আমার কোথায় সাঙ্গসজ্জা করে ঠাকুরাল দর্শন করবেন—না, একি!”

ডাক্তার দেবদত্তকে বলিলেন, “ওগুধু কিছু দিতে হবে না। আমি তবে যাই।”

দেবদত্ত বলিল, “চলুন, আমিও যাই।”

মা দেবদত্তকে বলিলেন, “তুই সব ব্যবস্থা করে একটু পরেই আসি। তুই এলে তবে আমি উঠতে পারব—সব জিনিষ ছড়ান আছে, গুছাতে হবে।”

“আচ্ছা”—বলিয়া দেবদত্ত বাহিরে হইয়া গেল।

তখন মহিলারা আবার একে একে ঘরে আসিতে

লাগিলেন। মা বলিলেন, “চল, আমরা বাহিরে যাই। কাপড়খানা তিজ্ঞ পেছে—ছাড়তে হবে; বিজ্ঞানটাও বদলাতে হবে।”

তাঁহার্য বাহিরে হইয়া যাইলে স্বীরা মাধুরীকে তুলিয়া শয্যা পরিবর্তন করিয়া দিল—মাধুরী বস্ত্র পরিবর্তন করিল।

তত্পন বাহিরে মহিলারা এই অতিক্রান্ত ঘটনার শব্দর ভাবটা অন্তর্জিত করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন। মা বলিলেন, “কিছু নয়—ছেলেমাছ, কখনও বহির্দান দেখেনি তাই এমন হয়ে পড়েছিল। আমরাই তুল—আগে জিজ্ঞাসা করিনি। আমার এক পিসীমার অননই ছিল—বলির বাজনা বাজলেই তাঁর বক্ষ ধমক করত; তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে বোর বন্ধ করতেন।”

একজন বলিলেন, “সহরের মেয়ে, এধর চালচলন আলাদা।”

আলোচনাটা অঙ্গুর হইলে ক্রমে অপ্রিয় হইতে পারে বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী মা বলিলেন, “সহরের মেয়ে কি আলাদা উঠে পড়া হয়, ঠাকুরবাঁধী? এই বিভ্রাল বনে গেলেই বনবিড়াল হয়। সবই অভ্যাসের ফল। তবে কা’রও কা’রও কোন কোন জিনিষে কেমন ভয় থাকে। মনে সেই, আমার শাভড়ী চামর দেখলে নিউরে উঠতেন? ছেলেবেলায় কে তাঁর গায় চামর বুজিয়ে দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল।”

ঘরে বাইরা তিনি অহুসরণকারীদিগকে বলিলেন, “আমি ত এখন যেতে পারব না—তোমরা পূজার গোছ কর গে।”

অনেকেই বলিলেন, তাহার্য বধূরাতার কাছে থাকিতে পারেন। মা বলিলেন, “না। আমিই বসি। আহা, ছেলেমাছ, এদিনে আগে কখনও মা’র কাছছাড়া থাকে নি। নিশ্চয়ই মা’র কথা মনে পড়েছে। না—বোমা?”

কথাটা পূর্বে মাধুরীর মনে পড়িয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু এখন মনে পড়ায় বুকের মধ্যে যেন কণকর করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

মা বলিলেন, “আমি পূজার পর তোমাকে একবার ইচ্ছা দেখাইবোনের কাছে পাঠিয়ে দেব—দেখুই নিয়ে য়ে। দিনকতক মা’র কাছে থেক আসবে।”

তাহার পর মা বলিলেন, “দেখ, বোমা, তিজ্ঞ লুত আর বাধা হবে না; কিন্তু বসরকার দিন—গীতেরা, যখন উঠবে তখন এ কাপড় ছেড়ে ফেলে নুন শাড়িপুরে কাপড় পরো।” তিনি মাধুরীর খাল দৌকে বলিলেন, “শুধু বো’মার শাড়িপুরে কাপড় বা’র মর রাখি।”

মা মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাতিতে কি খাবে, মা?”

মাধুরী বলিল, “কিছু বা’ব না—খিদে নাই।”

মা বলিলেন, “সে কি কখনও হয়! আজকের দিনে দি উপায় করে থাকতে আছে? আমি দুধ আর দি পানিয়ে দেব। তুমি বলি দেখতে পার না—এ বদিন বলির আগেই ঘরে এসে থেক—হারাণী তোমাকে ঘাসে বলে দেবে।”

অল্পকণ পরে দেবদত্ত সবার মহল হইতে আসিলে মা জিজ্ঞাসা, “তুই এখানে থাক। আমি যাচ্ছি।”

দেবদত্ত বলিল, “বাহিরে এখনও অনেক তত্ত্বলোক ঘরেন।”

“দেওয়ানজী মশাই আসছেন ত?”

“হাঁ।”

“তবে তুই এখন আর ঘাসেন।”—বলিয়া মা চলিয়া

হইলেন।

দেবদত্ত মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কি গীতী দুর্বল বোধ হচ্ছে?”

মাধুরী প্রথমে কোন উত্তর দিল না; দেবদত্ত প্রশ্টিত হুগাতি করিলে বলিল—“না। কিন্তু—”

দেবদত্ত জিজ্ঞাসা করিল, “কিন্তু—কি?”

“আমি আর পূজার গুণিকে যেতে পারব না। কি মূর ব্যাপার—এ!” বলিয়া মাধুরী চক্ষু সজ্জিত করিল; যেন সে ছাগবলির সেই দৃশ্য সমুখে দেখিতে

দেবদত্ত বলিল, “আচ্ছা, তাই হবে। আমি ডাক্তার বাবুকে বলে দেব, তিনি বলবেন,—তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।”

“অমন ক’রে বলি দেওয়া কি ভাল?”

“তা ঠিক বলাতে পারি না—প্রথা চলে আসছে।

আমিও স্বেচ্ছা ভালবাসি তা না।”

“চলে আসছে বলেই কি চিরদিন চলবে? কেউ তাকে কোন পরিবর্তন করতে পারবে না?”

দেবদত্ত ভাবিতে লাগিল—এ কথা কোন উত্তর—সহজর সে দিতে পারিল না।

সম্ভবী, অষ্টমী, নবমী—কর্মদিনের উৎসব কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, মাধুরী তাহা জানিতে পারিল না। কেবল বাজধনি, জনতার উল্লাসবাত্তক রব—ত্রাক হাঁক—এই সকল কুনিয়া সে উৎসবের বিষয় অনুমান করিতে পারিল।

কলিকাতায় প্রথমণাথ মাধুরীর মূর্ত্তার সংবাদ পাইয়াছিল। সে সংবাদ পাইয়াই মাধুরী বাড়ীতে গিয়াছিল।

সব শুনিয়া মাধুরী বলিয়াছিল, “দাদা, তুমি সেখানে যাও; তাকে নিয়ে এস।” মাধুরীর শাভড়ীও সেই পরামর্শ বিরাহিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “মা’র কোলের মেয়ে, কখন মা ছেড়ে থাকে নি; এ সময় নিশ্চয়ই মা’র জ্ঞা ‘মন কেমন’ করেছে। তাঁর উপর গরম, গোলমাল—আর সকলের উপর বলিদান; তাই এমন হয়েছে। বাবা প্রমথ, তুমি গিয়ে তাকে নিয়ে এস—এনে মা’র কাছে নিয়ে যাও।” মাধুরী জিজ্ঞাসা

করায় প্রথমণাথ বলিয়াছিল, সে মা’কে সংবাদ দেয় নাই—তিনি জানিলে ব্যস্ত হইবেন। মাধুরীর শাভড়ী

মাদবীকে বলিয়াছিলেন, “ধুসে মেয়ে তোমার মা। সবাই যেন সাংসারে পদ্মপাতায় জলের মত ছিলেন।

অমন মাদনা থাকলেই এমন নির্লিপ্ত থাকা যায়।”

বিজ্ঞানদর্শনীর দিন প্রথমণাথ দেবদত্তের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পত্নীগাম—পূর্বে সংবাদ দিলে তবে

ষ্টেশনে যানবাহনের ব্যবস্থা থাকে। পৌছিয়াই সে মাধুরীর সংবাদ লইল—সে ভাল আছে। সে তপস্বী

কাজে বাইয়াও তাহাই দেখিল।



মাধুরীর শান্তভী বলিলেন, “হেলে মাছ—কেমন হয়ে পড়েছিল। তা’ সেই অবি আমি আর বলিদানের দিকে যেতে দিই নি।”

প্রমথনাথ পূর্বে মাধুরীর খত্তর বাড়ী দেখে নাই—দেখিয়া বুঝিল, বনিয়াদী বড়মহুয বটে! এ বাড়ীতে একাল এখনও সেকালকে—সোনার বাঙ্গালার সোনার কালকে ছান্ধুত করিতে পারে নাই। গোলাবাড়ীতে গোলাব পুর গোলা—নানাক্ষণ ধাত্তে পূর্ব; কোন্ বৎসর কোন্ গোলায় ধান রাধা হয়্যাছে, তাহা গোলায় গাজে লিখিত। বাহ, কলাই, মুগ, বহুদী, মটর—সবই খাস ফেজে উৎপন্ন হয়। তরকারীর অভাব নাই। গোশালায় পরমু যত্রে ও মেহে রক্তিত দুর্দভবী গাজী। অশ্বাশায়া অশ্ব। হস্তিশালায় হস্তী। সে কালের ব্যবস্থা—তত্ত্বাবধ পূজার সময় সমগ্র পরিবারের সারা বৎসরের ব্যবহার্য কাপড় দিয়া হিসাব করিয়া দাম, আর সঙ্গে সঙ্গে পর বৎসরের কাপড়ের করবাস ও অগ্নিম টাকু লইয়া বা। সবই যেন ব্যবলখনের আদর্শ দেখাইতেছে। সমগ্র গ্রাম যেন একটা বৃহৎ পরিবার, আর দেবদত্তরা সেই পরিবারের কর্তা—লোক আপদে বিপদে সম্পদে তাহাদেরই কাছে আইসে; জমিদারের বিপদ তাহারা আপনাদিগের বিপদ ও জমীদারের সম্পদ আপনাদিগের সম্পদ বলিয়া মনে করে।

প্রমথনাথের মনে হইল; সে যেন কোন পরীর ঐন্দ্র-জালিক দণ্ডের স্পর্শে একাল হইতে সেকালে—ইতিহাসপূর্ণগত কালে আসিয়া পড়িয়াছে। কালটি তাহার মন লাগিল না। এ যেন সেই ইতিহাস-পটিত পুরীসমাজ—বাবলুর, আগনারো অগ্নি সম্পূর্ণ ও সমষ্ট। বাঙ্গাল দেশেই যে এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ইত্যপূর্বে প্রমথনাথ কল্পনা করিতেও পারে নাই।

মহাশয় দেবীবরণ। গ্রামের মহিলারা যেন সব গৃহস্থ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিলেন। তখন শান্তভী আপন বাইয়া বধুকে তথায় আনিলেন—উৎকৃষ্ট বেশে

সদাঙ্গল্যারভূমিত। হইয়া মাধুরীকে আসিতে হইল। আর একবার মাধুরীকে চণ্ডীমণ্ডপে আসিতে হইয়াছিল—সে “শান্তিজল” লইবার জন্য। “শান্তিজল” লইবার সময় মা এতদিন দেবদত্তকে অঙ্কে লইয়া বসিলেন—যেন—“বসিলেন মা, হেমবরনী, হেরেশের উপর কোসে।” এবার তিনি পুত্রকে দক্ষিণ উত্তর লগে ও বধুকে বাম উত্তর লগে বসাইয়া “শান্তিজল” গ্রহণ করিলেন—যেন অগাধ শান্তি অমৃতত্ব করিলেন। দেবদত্ত তাহার একমাত্র সন্তান—খত্তরের বংশের প্রবীণ; তাহার পত্নী কি তাহার অন্ন আদরের?

তাহার আদর দেখিয়া প্রমথনাথ পরম আনন্দ অমৃতত্ব করিল; তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার অধিক আদর মাধুরী কখন আশা করিতেও পারে না। অপরূহা বিস্ময়নের ব্যবস্থা। বহুলোক এতিনা মণ্ডপ হইতে প্রাঙ্গনে নামাইল—তাহার পর বহন করিয়া নদীর ঘাটে গেল। দেবদত্তের সঙ্গে প্রমথনাথ ও ঘাটে গেল—সুসজ্জিত নৌকায় উঠিয়া বসিল। নদী-বন্ধে কত নৌকা! নৌকায় শ্রবণশাস্তিত কত লোক! কি বাজধ্বনি! নদীকূলে নবনরীর কি জনতা! নৌকায় নৌকায় গতির প্রতিযোগিতা হইতে লাগিল। এখনও বাঙ্গালীর বাহুতেও এত বল আছে!

ক্রমে দিনান্ত তখন মেঘের উপর নানাবর্ণ সৌর্য ও সুদীর্ঘ রক্তদাগরাজিত হইয়া প্রান্তরের পরপারে অধুত হইয়া গেল। গোঘৃষ্ণির আগমনে প্রতিমা দিল্পে বিদ্যুজ্বিত হইল। সানাই করুণ স্বরে “আলাপ” করিল—  
“এই যে ছিল কোথায় গেল

কমলদলবাসিনী?

গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর কি মিলনাদ! গ্রামের লোক তখন সকলেই জমীদার বাড়ীতে আসিল—প্রাঙ্গণ, আলিঙ্গন, আশীর্বাদ—পাত্রভেদে ব্যবহারভেদে হইতে লাগিল। প্রথাভঙ্গারে সিদ্ধির পাত্র আসিল—সেই পান করিল; কেহ বা স্পর্শমাত্র করিল। তাহার পর “মিষ্টমুখ” করিয়া যে বাহার গৃহে ফিরিলেন। এক বৎসরের মত মহোৎসবের অবসান হইল।

পরদিন প্রমথনাথ মাধুরীকে লইয়া বাইবার প্রস্তাব করিল। দেবদত্তের মাতা বলিলেন, “আমি বৌমাকে বোধি, পূজার পর পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এদমই নয়, রামেন লক্ষীপূজা; লক্ষীপূজা না হইলে গেলে আমি মা লক্ষীকে যেতে দেব না। এখন ত কোম অস্থব নাই।” প্রমথনাথের বিশ্বাস ছিল, লক্ষী পুণিমার দিনই লক্ষী-পূজা হইবে—তাহার আর চারি দিন মাত্র আছে মনে করিয়া সে বলিল, “তবে আমি ও চারদিন থেকে ওকে নিয়ে যাব কি?”

মা বলিলেন, “খাততেই হ’বে। বোনের বাড়ী এসেছ; ছুঁবিন থাক—সব দেখ। এখন কতবার আসতে হবে। বৌমার বাপ নাই, তুমি বড় ভাই—দেখবার লজ তোমার; দেবুকে তুমি ছোট ভাইয়ের মত দেখবে, পরামর্শ দেবে। কিন্তু, বাবা আমাদের এ শাস্তর বাড়ী—লক্ষীপূজা ত পুণিমার নয়—পূজা সেই গ্রামাপূজার সম্বন্ধে—আমাবস্তায়।”

“আমাবস্তায়! তার ত অনেক দেবী।”  
“হুজই বা ক’দিন দেবী?”  
“অপনিত জানেন, আমার বাড়ীতে দ্বিতীয় লোক নাই। মাধবী এসে সেখানে রয়েছে, তাই আসতে গেছে। মা চলে গেলেন; এখন সব কাজে সে ছাড়া চল না।”

মা বলিলেন, “বড় ভাল মেয়ে, যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষী। মুখ হাসি মেয়েই আছে; যেমন নয়, তেমনই মিষ্ট কথা। আশীর্বাদ করি, জন্মেরোগী হ’য়ে স্বপ্নে থাক।”  
“মা বলেন, মাধবী একদিন তাঁর কাছে একটা জিনিষ চায় নি।”

“বাব’ যেমন মন, তগবান তাঁর তেমনই করেন। গুর কোন অভাব ত তিনি রাখেন নি। সে ওর মনের গুণে।”  
দ্বির হইল, লক্ষীপূজার পর দেবদত্ত মাধুরীকে কলিকাতার লইয়া বাইবে এবং মাধুরী দিন কয়েক পুরীতে মা’র কাছে থাকিয়া আসিবে।

কিন্তু প্রমথনাথ সেই দিনই বাইবার অমুমতি পাইল না—তাহাকে আরও দুইদিন তথায় থাকিয়া আদর স্বত সন্তোষ করিতে হইল। শেষে তাহার বাইবার সময় মা তাহার সঙ্গে নানা একারের এত জিনিষ দিয়া দিলেন যে, সে যেন আজকালের বড়মহুয বাড়ীর প্রথম জঁটকাল তত্ত্ব।

মাধুরীর খত্তর বাড়ী দেখিয়া ও মা’র ব্যবহারে প্রমথ নাথ অত্যন্ত ক্রীত হইল এবং ভূমিনীকে ভাগ্যবতী বলিয়াই মনে করিল। বাইবার পূর্বে সে মাধুরীকে বলিল, “মা জিদ করে” স্তোর বিয়ে দিয়েছিলেন—মা’রই জিত হয়েছে; এঁরা চনৎকার লোক।”

মাধুরীর মন কিন্তু দাদার এই কথায় প্রকৃত হইল না। দাদা তাহাকে লইতে আসিলেও যে শান্তভী তাহাকে পাঠাইলেন না, ইহাতে সে দাদাকে ও আপনাকে অপমানিত মনে করিতে লাগিল এবং প্রমথনাথের প্রতি শান্তভীর ব্যবহার ক্রটি ও “বড় মাধুরী” সেবান বলিয়া বিবেচনা করিয়া আপনাই আগনার মনে কষ্ট পাইতে লাগিল।

প্রমথনাথ চলিয়া বাইবার পরে মাধুরীর মুখ যেন অন্ধকার হইয়া রহিল।

লক্ষীপূজার পরই মা “ভালদিন” দেখিয়া দেবদত্তের সঙ্গে মাধুরীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। (ক্রমশঃ)





মাধুরীর শাতভী বলিলেন, “ছেলে মাহু—কেমন হয়ে পড়েছিল। তা’ সেই অবধি আমি আর বলিদানের দিকে যেতেছি নি।”

প্রথমনাথ পূর্বে মাধুরীর স্বপ্নর বাড়ী দেখে নাই—দেখিয়া বুঝিল, বনিয়াদী বড়মায়াষ বটে! এ বাড়ীতে একাল এখনও সেকালের—সোনার বাঙ্গালার সোনার কালকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। গোলাবাড়ীতে গোলাব পুর গোলা—নানারূপ ধাতুে পূর্ণ; কোন্ বসন্তর কোন্ গোলাব ধান রাখা হয়তো, তাহা গোলাব গায়ে লিখিত। ধাতু, কলাই, মুগ, মুসুরী, মটর—সবই বাস ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়। তবকারীর অভাব নাই। গোশালায় পরম্ব যত্রে ও বেহে রক্তিত চুড়চুড়ী গাভী। অশালায় অব। হস্তিশালায় হস্তী। সে কালের ব্যবস্থা—তত্তব্য পূজার সময় সমগ্র পরিবারের সারা বৎসরের ব্যবহার্য কাপড় দিয়া হিসাব করিয়া দান, আর সঙ্গে সঙ্গে পর বৎসরের কাপড়ের ফরমাইশ ও অগ্রিম টাকু লইয়া যায়। সবই যেন বাবলখনের আদর্শ দেখাইতেছে। সমগ্র গ্রাম যেন একটা বৃহৎ পরিবার, আর দেবদত্তরা সেই পরিবারের রক্ত—লোক আপদে বিপদে সম্পদে তাহাদেরই কাছে আইসে; জমিদারের বিপদ তাহারা আপনাদিগের বিপদ ও জমিদারের সম্পদ আপনাদিগের সম্পদ বলিয়া মনে করে।

প্রথমনাথের মনে হইল; সে যেন কোন পরীর উল্ল-জালিক দণ্ডের স্পর্শে একাল হইতে সেকালে—ইতিহাসপৃষ্ঠাগত কালে আসিয়া পড়িয়াছে। কালটি তাহার মন্দ লাগিল না। এ যেন সেই ইতিহাস-পঠিত পরীসমাজ—স্বাবলম্বী, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ। বাঙ্গালা দেশেই যে এদৃশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ইহাপূর্বে প্রথমনাথ কর্তা করিতেও পারে নাই।

মদ্যকে দেবীরূপ। গ্রামের মহিলারা যেন সব গৃহস্থ করিয়া চতীমণ্ডপে আসিলেন। তখন শাতভী আপনি বাইরা বধুকে তথায় আনিলা—উৎকৃষ্ট বেশে

সর্বাঙ্গদারভূষিত। হইয়া মাধুরীকে আসিতে হইল। আর একবার মাধুরীকে চতীমণ্ডপে আসিতে হইয়াছিল—সে “শান্তিজল” লইবার জন্য। “শান্তিজল” লইবার

সময় মা এতদিন দেবদত্তকে সঙ্গে লইয়া বসিলেন। যেন—“বসিলেন মা, হেমবরণী, হেরেগের লয়ে কোলে।”

এবার তিনি পুত্রকে দক্ষিণ উত্তর উপর ও বধুকে বাম উত্তর উপর বসাইয়া “শান্তিজল” গ্রহণ করিলেন।—মনে অগাধ শান্তি অনুভব করিলেন। দেবদত্ত তাহার একমাত্র সন্তান—স্বত্বের বংশের প্রদীপ; তাহার পত্নী কি তাহার অন্ন আদরের?

তাহার আর দেখিয়া প্রথমনাথ পরম আনন্দ অনুভব করিল; তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার অধিক আর মাধুরী কখন আশা করিতেও পারে না।

অপরূপে নিসর্জনের ব্যবস্থা। বহুলোক প্রতিমা মণ্ডপ হইতে প্রান্তরে নানাইল—তাহার পর বহন করিয়া নদীর ঘাটে গেল। দেবদত্তের সঙ্গে প্রথমনাথও

ঘাটে গেল—মুগ্ধজিত নৌকায় উঠিয়া বসিল। নদী-বক্ষে কত নৌকা! নৌকায়-স্বপ্নেবসজ্জিত কত লোক! কি ব্যাঘ্রমনি! নদীকূলে নরনারীর কি জনতা! নৌকায় নৌকায় গতির প্রতিযোগিতা হইতে লাগিল।

এখনও বাঙ্গালীর বাহ্যতেও এত ভাল আছে।

ক্রমে দিনান্ত তখন মেঘের উপর নানাবর্ণ সেপিয়া ও মুচিয়া রক্তরাগরঞ্জিত হইয়া প্রান্তরের পরশরে অধঃ হইয়া গেল। গোখলির আগমনে প্রতিমা সকলে বিসর্জিত হইল। সানাই করুণ সুরে “আলাপ” করিল—

“এই যে ছিল কোথায় গেল

কমলদলবাসিনী?

গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর কি মিলিল! গ্রামের লোক তখন সকলেই জমিদার বাড়ীতে আসিল—প্রাণ, আলিঙ্গন, আশীর্বাদ—পাত্রভরে ব্যবহার্যদের হইতে লাগিল। প্রথামুসারে সিদ্ধির পাত্র আসিল—কেহ পান করিল; কেহ বা স্পর্শমাত্র করিল। তাহার পর “মিষ্টমুখ” করিয়া যে বাহার গৃহে ফিরিলেন। এও বৎসরের মত মহোৎসবের অবসান হইল।

পরদিন প্রথমনাথ মাধুরীকে লইয়া বাইবার প্রস্তাব করিল। দেবদত্তের মাতা বলিলেন, “আমি দৌনাকে বলেছি, পুজার পর পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এখনই নয়, সামান্য লাক্ষীপূজা; লক্ষীপূজা না হয়ে গেলে আমি মা লক্ষীকে যেতে দেব না। এখন ত কোন অস্থখ নাই।”

প্রথমনাথের বিশ্বাস ছিল, লক্ষী পূর্ণিমার দিনই লক্ষী-পূজা হইবে—তাহার আর চারি দিন মাত্র আছে মনে করিয়া সে বলিল, “তবে আমি ও চারদিন থেকে ওক নিয়ে যাব কি?”

মা বলিলেন, “ধাকতেই হবে। বোনের বাড়ী এসে; দু’দিন থাক—সব দেখ। এখন কতবার আসতে হবে! বোমার বাপ নাই, ভূমি বড় ভাই—দেখবার জর তোমার; বৈবকে ভূমি ছোট ভাইয়ের মত দেখবে, পরামর্শ দেবে। কিন্তু, বাবা আমাদের এ শাক্তর বাড়ী—লক্ষীপূজা পূর্ণিমায় নয়—পূজা সেই শ্রাদ্ধপূজার রাক্ষিতে—অমাবস্তায়।”

“অমাবস্তায়! তার ত অনেক দেরী!”

“হুই বা ক’দিন দেরী?”

“আপনিত জানেন, আমার বাড়ীতে দ্বিতীয় লোক নাই। মাদহী এসে সেখানে রয়েছে, তাই আসতে গিয়েছি। মা চলে গেলেন; এখন সব কাজে সে ছাড়া চলে না।”

মা বলিলেন, “বড় ভাল মেয়ে, যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষী। মুখ হাসি মেয়েই আছে; যেমন নম্র, তেমনি মিষ্ট কথা। আশীর্বাদ করি, জন্মএয়াস্বী হ’য়ে মুখে থাক।”

“মা বলেন, মাদহী একদিন তাঁর কাছে একটা জিনিষ চায় নি।”

“খা’র যেমন মন, তগবান তা’র তেমনই করেন। ওর কোন অভাব ত তিনি রাখেন নি। সে ওর মনের ওপরে।”

স্থির হইল, লক্ষীপূজার পর দেবদত্ত মাধুরীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে এবং মাধুরী দিন কয়েক পুরীতে মা’র কাছে থাকিয়া আসিবে।

কিন্তু প্রথমনাথ সেই দিনই বাইবার অমৃত্যু পাইল না—তাহাকে আরও দুইদিন তথায় থাকিয়া আরও বহু সম্ভোগ করিতে হইল। শেষে তাহার বাইবার সময় না তাহার সঙ্গে নানা প্রকারের এত জিনিষ দিয়া দিলেন যে, সে যেন আজকালের বড়মায়াষ বাড়ীর প্রথম জঁকাল তর।

মাধুরীর স্বপ্নর বাড়ী দেখিয়া ও মা’র ব্যবহারে প্রথম নাথ অত্যন্ত ক্রীত হইল এবং ভগিনীকে ভাগ্যবতী বলিয়াই মনে করিল। বাইবার পূর্বে সে মাধুরীকে বলিল, “মাজি কেরে” তোর বিয়ে দিয়েছিলাম—মা’রই জিত হয়েছে; এঁরা চমৎকার লোক।”

মাধুরীর মন কিন্তু দারার এই কথায় প্রকৃত হইল না। দারা তাহাকে লইতে আসিলও যে শাতভী তাহাকে পাঠাইলেন না, ইহাতে সে দারাকে ও আপনাকে অপমানিত মনে করিতে লাগিল এবং প্রথমনাথের প্রতি শাতভীর ব্যবহার ক্রটিম ও “বড় মাহুরী” দেখান বলিবেচনা করিয়া আপনাই আপনার মনে কষ্ট পাইতে লাগিল।

প্রথমনাথ চলিয়া যাইবার পরে মাধুরীর মন যেন অন্ধকার হইয়া রহিল।

লক্ষীপূজার পরই মা “ভালদিন” দেখিয়া দেবদত্তের সঙ্গে মাধুরীকে পিতালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। (কর্মস)







## শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

### প্রাদেশিকতা

বাঙালী আজ কোথাসে হয়ে পড়েছে প্রায় সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বীমার ব্যবসারে; এই কথাটাই শুধু এখানে সেখানে শুনতে পাই। একথা অস্বীকারও করা যায় না যে, আজ তিন চার বছর ধরে প্রাদেশিকতার একটা প্রবল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আরো সাধারণতঃ বিজ্ঞানোক্তির কথা মানি। বহু বিজ্ঞ লোকই এখন প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। আবার এমন বহু বিখ্যাত ব্যক্তিও আছেন যারা প্রাদেশিকতার বিরোধী। নানা মূর্খির নানা মত।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা হয়তো ভালই, কিন্তু বীমার ক্ষেত্রে ভাল কিনা, আর যদি ভালও হয়, তার সময় এসেছে কিনা, এইটাই বিশেষ তাৎপর্য বিষয়। একই দেশ ও একই জাতির মধ্যে এ প্রদেশ আর ও প্রদেশ নিয়ে একটা বিশেষ ভাব পোষণ করার দায়িত্ব এখন কিছু লাভ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে লাভের বদলে লোভসানও যথেষ্ট হ'তে পারে।

বাঙালীর মন ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে ঠানবার জন্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের “কামেনে ননসা বাচা” চেষ্টায়, আর কতকটা সময়ের স্রোত ও অবস্থার চাপে, বাঙালী আজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি সত্যিকার আন্তরিকতা, অশ্রমশীলতা ও দৃঢ়তা তার থাকে, তা হ'লে প্রাদেশিকতার দোহাই না দিলেও সে টিকে থাকবেই। কথা হ'তে পারে এই যে, অল্প প্রদেশের লোক যদি বাংলায় প্রতিযোগিতা স্বাক্ষর করে তবে বাঙালী যায় কোথায়? বিহারী, মাজেয়াহরী, ভাট্টার, বোম্বাইওয়াল, দিল্লীওয়াল প্রভৃতি বাংলায় এসে ব্যবসায় করে লক্ষপতি হয়, বাঙালী হয় না, এর মূল বাঙালীরই বিশেষ

কোন গলদ আছে, এবং এর প্রতিকার বাঙালী ছাড়া ভারতের অল্প লোকদের বদলি করা বোধ হয় নয়; প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার শক্তি অর্জন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে মনে হয়।

এটা বোধহয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, প্রাদেশিকতার ভাব সর্বত্রই হ'তে হ'তে এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাংলা দেশের মধ্যেও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে রীতিমত বাণিজ্যিকতা প্রায়ই হ'তে দেখা যায়। কলিকাতার বহু ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠানে “বঙ্গাল”-ের প্রতিপত্তি বেশী, এ নিয়ে “বাঙালী”রা অনেকেই যে মনোভাব পোষণ করেন, তাও যেমন বাঙালীর নয় আর “বঙ্গালরাও” অনেকেই প্রতিক্রিয়া হিসাবে “বাঙালীদের” প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে, তাও তেমনি অসঙ্গত। এই মনোভাব ব্যবসায়ক্ষেত্রে ছেড়ে বেলার নাঠেও যে মাশে মাশে অতি উৎকর্ষ তাই আত্মপ্রকাশ করে না, এ কথা জোর করে বলা যায় কি?

একই দেশে একটা প্রদেশ আর একটা প্রদেশকে বার দিয়ে বড় হবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তাতেই বড় হ'তে পারে ব'লে মনে হয় না। বাংলা দেশ উন্নত হ'লেই সারা ভারত উন্নত হয় না, তেমনি বোম্বাই বা পাঞ্জাব বড় হ'লে ভারতের বন্ধন-মুখল মোচন হয় না; যদিও বাংলা, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের উন্নতিও ভারতের উন্নতি। সর্ব-বিষয়েই এক প্রদেশের সঙ্গে অল্প প্রদেশের সহযোগিতা, আলান প্রদান ইত্যাদি দ্বারা জাতির একতা বোধ আসে। নতবা বিচ্ছিন্ন জাতির এ-পাড়া আর ও-পাড়া নিয়ে দল-দলির ভাব পোষণ করা অশোভন ও অসঙ্গতই মনে হয়। এমন কি করে, বোধ হয়, কোন ব্যবসায়, বিশেষ করে বীমার ব্যবসায় যে খুব উন্নত হ'তে পারে না, তাই

বাংলাচনা করব। যদি এ আলোচনা আনুষ্ঠানিক হয়, যার ফলপঙ্কতি কোনও কারণ থাকবে না; কিন্তু এই আলোচনা প্রাদেশিকতার প্রচারক বা পক্ষপাতীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ ব'লে যদি কেউ মনে করেন, তা হ'লে আমার চেয়ে বেশী দুঃখিত কেউই হবেন না।

একটা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা একটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক। বাঙালী প্রতিষ্ঠিত, বাঙালী পরিচালিত, বাংলার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কমিউনালিটি বোর্ড সাময়িক সেখত্র প্রবৃত্তি করেন, তা ভারতবাসীরাই ক্রয় করে।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রদেশও ক্রয় করে বেঙ্গল কমিউনালিটি বোর্ড এত বড় হ'তে গিয়েছে। যদি বোম্বাই আজ বলে যে, বাংলার জিনিষ সে কিনবে না, পাঞ্জাব বা যুক্তপ্রদেশও যদি এ ভাবেই পোষণ করে, তবে বেঙ্গল কমিউনালিটি এত বড় হয়ে বেশী দিন থাকতে পারবে। ভারতের কাগজখানার জিনিষ ইউরোপ বা আমেরিকা কিনতে আসছেও, কোন দিন আসবে ব'লে এখনও কোন আশাও তো পাওয়া যাচ্ছেনা। কাজেই দেওয়ানী বড় ব্যবসায় প্রাদেশিকতা দ্বারা চলে কি করে? যখননা জানেন যে, মাদ্রাস কমিউনালিটি এক সময়ে বাংলায় গিয়ে সিনেমাগুলো একচেটে করে রেখেছিলেন।

বাঙালীর নিউ থিয়েটার্স আজ শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতেই তাদের ব্যবসায় ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঠাণ্ডা অল্প প্রদেশেরও পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছেন। কিন্তু গোপালী অল্প প্রদেশও বহু আছে, তবু বাংলার বাইরেও নিউ থিয়েটার্সের এত প্রচার ও প্রতিপত্তি কেন? তাদের মিস সফলতার পূর্ণতা অথবা তাদের জিনিষের quality খয়ের জিনিষের qualityর চেয়ে চেঁচা ভাল। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় এই quality বস্তুটাই সবচেয়ে মূল্যবান নয়। Quality সবচেয়ে ভাল করতে পারলেই ব্যবসায়ের সর্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, শুধু প্রাদেশিকতার দোহাই দিলেই হয় না।

অল্প ব্যবসায়ের কথা না হয় ছেড়েই দেয়া যাক। বীমার বীমা ব্যবসায় প্রাদেশিকতা বজায় রাখতে বাঙালী খুব চালাক, অসঙ্গত। জীবন বীমার ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতার কোন স্থান নেই এবং থাকতে পারে না। আজ

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত এবং বাঙালী পরিচালিত অনেকগুলি জীবন বীমা কোম্পানী চলছে। বোম্বাই এই ব্যবসায়ের ভারতে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হ'লেও বাংলার কোম্পানীগুলো সেখানে থেকেও খুব বেশী পরিমাণ টাকার প্রস্তাব পায়। বাংলার কোন কোন কোম্পানী বোম্বাইয়েরও কয়েকটি কোম্পানীর প্রায় সমকক্ষ বলা যেতে পারে। প্রাদেশিকতার হাওয়া থাকলে বাংলার এই কোম্পানীগুলি এত বড় তো হ'তে পারতই না, অস্তিত্বই থাকত কিনা সন্দেহ।

গত তিন চার বছর ধরে বাংলার ও বাঙালীর হিন্দুস্থান কোম্পানী গড়ে প্রত্যেক বছরে প্রায় দু'কোটি টাকার নতুন বীমা পত্র দিয়েছে। নতুন বীমার পরিমাণ ধরলে ওরিয়েন্টালের পরেই হিন্দুস্থান, যদিও বীমার পরিমাণ বা টাকার পরিমাণ বা লভ্যাংশের বেশী হারই কোন কোম্পানীর শ্রেষ্ঠ বা উৎকর্ষের পরিচয় নয়। শুধু বাংলা দেশই কি হিন্দুস্থানকে এত টাকার প্রস্তাব দেয়? হিন্দুস্থান যে এত বড় হয়েছিল এর মূলে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশের সমর্থন, সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্য আছে কিনা? বোম্বাইয়ের বোম্বাই-ওয়ালাদের প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত সর্বোচ্চ কোম্পানী থাকতেও বোম্বাই হিন্দুস্থানে প্রতি বছরই বহু টাকার বীমা করে। প্রাদেশিকতা যদি সর্বত্রই দেখা দেয়, বীমা-প্রতিষ্ঠানের গক্ষে তার ফল শুভ হবে না।

বাংলার পুরাতন কোম্পানীগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে, নতুন কোম্পানীগুলির কথা ধরলেও দেখা যায় যে, লভ্যাংশ দিতে অক্ষম হ'য়েও, এই সব কোম্পানী বাংলার বাইরে থেকেই বীমার প্রস্তাব পাচ্ছে বেশী, আর এই জোরেরই তারা বেঁচে আছে।

বাঙালীর বীমা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা যখন সর্বাঙ্গ-সুন্দর হবে, তখন তার আদর সর্বত্রই আপনা-আপনিই হবে। শুধু বাঙালীকে দরকার। বাহ্যের কাছের আদর হয় শুধুমাত্র, প্রদেশ হিসাবে বা পাড়া হিসাবে নয় না। বীমা ব্যবসায়ের প্রাদেশিকতার যদি কোন যৌক্তিকতা থাকেও, তা হ'লেও একথা খুব জোর করেই বলা যায় যে, তার সময় এখনও আসে নি।



# প্রবন্ধ

## সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধি

ক্রীষ্ণরবিন্দ

বুদ্ধি-তরুর অতীত আধ্যাত্মের সন্ধান করা যথেষ্ট কাল স্তব্ধতা বুদ্ধিতরু সে বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে না এবং গোড়া থেকে সে মনে করে যে এক্ষণ করিতে যাওয়াটা তার 'অনধিকার-চর্চা' কারণ উচ্চস্তরের জ্ঞান ও শক্তির সম্মুখে সে সোজা হইয়া চলিতে বা দাঁড়াইতে সাহস পায় না। কিন্তু মানুষের অজ্ঞান কাজের ও চেষ্টনার স্তরে বুদ্ধির স্থান সর্বোচ্চ কারণ মানুষ বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণের থাকিয়া সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ করে, এমন কি সময়ে সময়ে তাহার বুদ্ধি অবুদ্ধির সীমায় নামিয়া আসে।

মানুষের প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগকে তখন বুদ্ধিপ্রদর্শিত জ্ঞান ও তাহার শাসন নামিয়া চলিতে হইবে। দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে, যেখানে জ্ঞান সীমাবদ্ধ সেই সমস্ত স্থানে বুদ্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য্য বলিয়া কাহারও মনে হইতে পারে, কিন্তু শেখাবুনি সে ধারণা ভাঙ্গিয়া যায়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশাল, তাহার শক্তি অসীম কিন্তু শেষে এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছান যায় যেখানে দেখা যায় যে বুদ্ধি আমাদের সবার অপর ছুঁইটা শক্তির মাঝে পড়িয়া গেছে, তখন সে মাত্র যথাস্থতার কাজ করে, একদিকে বুদ্ধি আলো দেখায়—যদিও সে প্রধান পদপ্রদর্শক নহে—আমাদের জীবনের জাবাবেগকে ও মানব অহংসন্ধান-প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে, অন্তরিকে প্রচ্ছন্ন অধ্যায় পৃথকের

অগ্রবৃত্ত হইয়া তাহার আগমনের পথ প্রস্তুত করে।

সৌন্দর্য্য-নীতির ক্ষেত্রে এই দুই শক্তি খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে। মানুষ স্বন্দরের পূজারী, এবং তাহার এই পূজা সৌন্দর্য্যবাদে পঙ্করচনা, চিত্রাঙ্কন ও স্বাভাৱ্য বিজ্ঞার মধ্য দিয়া পূর্ব পরিণতি লাভ করে, তাহার জীবনের ও প্রকৃতির সমস্ত কার্যের মধ্যে এই সৌন্দর্য্য-বোধ কাজ করে—অবশ্য 'স্বন্দর' কথাটিকে ইহার ব্যাপক ও প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে। স্বন্দরের সার্বজনীন উপলক্ষি আমাদের সমস্ত জীবন ও সহ্যকে স্বন্দর করা, ব্যক্তি বা সমাজের পূর্বতার জন্ম তাহা খুবই দরকার, কিন্তু মানুষ গোড়া থেকে বুদ্ধি দিয়া স্বন্দরের সন্ধান করে না, এই সৌন্দর্য্য-বোধ জীবনের সঙ্গে জড়িত, স্বন্দরের সৃষ্টি ও তাহাকে ভোগ করাটা মানুষের একটা আন্তরিকতাবোধের ও সৌন্দর্য্যবোধের রূপ।



ক্রীষ্ণরবিন্দ

আমাদের একটা সহজাত বুদ্ধি। আমাদের সবার বুদ্ধিহীনতার অবস্থায় এই বুদ্ধি ও ভাবাবেগ অনেকখানি অভঙ্গ ও অপূর্ণ থাকে; সেইজন্য তাদের সৃষ্টি ও গুণগ্রহণের মধ্যে অনেকখানি জড়তাব থাকে। এরকম হলে বুদ্ধি তাহারে বোধ ও অসম্পূর্ণতা দেয়াইয়া দেয়, জ্ঞান হান করে, সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞার প্রণালী বলিয়া দেয়, আমাদের

ভাগ—১০৪২]

ক্রীষ্ণরবিন্দ

প্রবন্ধ

রটিকে মার্জিত করিয়া ও যথাযথ জ্ঞান দ্বারা আমাদের না কেন তাহার শক্তির কখন অপব্যয় হয় না—কিন্তু ভগ্নপ্রাণিতা ও সৃষ্টিকে শুদ্ধ করে। আমরা যখন এইরূপে মনোশিত ও শিকিত হইতে চেষ্টা করি তখন এই বুদ্ধি শিল্পী ও তাহার গুণগ্রাহকের নীতি-শিক্ষক বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধি আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যবুদ্ধির স্রষ্টা না হইলেও ইহা আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য বিবেক ও বিচারবুদ্ধি জাগাইবার শক্তি দেয়। যে শক্তি আমাদের মধ্যে গুণ ও অনির্দিষ্ট ছিল, বিচারশক্তি তাহাকে সচেতন করিতে ও ভাবিতে শিক্ষা দেয়।

কিন্তু ইহা সর্বত্র সত্য নহে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও স্বন্দরের সন্ধানের পথে যখন যানিকটা অগ্রসর হওয়া যায় সেই অবস্থায় ইহা খুব সত্য। কিন্তু যখন উচ্চস্তরের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয় তখন সেই উচ্চস্তরের সৌন্দর্য্যের গুণগ্রহণ ও উপলব্ধির সময়ে বুদ্ধি অনেক পিছাইয়া পড়িয়া যায়; কাব্য বা শিল্পের মধ্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কখন বুদ্ধি নামিয়া চলে না। বুদ্ধি মানুষকে কবি বা শিল্পী করিতে পারে না, উপরের একটা শক্তি বা জ্ঞান মানুষকে স্রষ্টা করিয়া তোলে এবং সেই সৃষ্টির পক্ষান্তে একটা প্রেরণা ও দৃষ্টি থাকিলে সেই সৃষ্টি বিরাত হইয়া উঠে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্ম বুদ্ধির সাহায্য দরকার হইতে পারে—কিন্তু সেই সাহায্যের অধূলাতে সৌন্দর্য্যের শক্তি ও বৃষ্টির গভীরতার হ্রাস হয় এবং উপরের শক্তির দেব-তাব বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দেয় এবং সৃষ্টিকে নিম্নস্তরে আনিয়া দেয়। বুদ্ধির আধিপত্য যত বাড়িলে, সৃষ্টিও তত ক্ষয় হইবে। বুদ্ধি উচ্চস্তরের মনোবৃত্তি দিতে পারে, বৈদ্য সাহায্যে আরও উচ্চস্তরের মনোবৃত্তি লাভ সম্ভবপর কিন্তু প্রতিভাই প্রকৃত স্রষ্টা। এই প্রতিভার জন্ম অসীম্রিয় জগতে, তাহার স্বভাব ও ব্যক্তিগত সমস্তাই অসীম্রিয়। বুদ্ধিকে সঙ্গে লইলেও তাহার বৈদ্যতাব নষ্ট হয় না—তাহার শক্তি ও তাহার সৃষ্টি সৌন্দর্য্য বহুলায় বর্ধী হয়। বুদ্ধিতরুর মধ্যে থাকিয়া ও তাহার নিম্নাংশাব্যাহী যে শিল্পস্রষ্টা, তাহা খুব বড়দের হইতে পারে, কেন না প্রতিভা যতই কেন গভীরবদ্ধ হউক

না কেন তাহার শক্তির কখন অপব্যয় হয় না—কিন্তু বুদ্ধির সহায্যে যে কাজ তাহা গঠন মাত্র, সৃষ্টি নহে। তাহার মধ্যে যতই কেন শিল্পকৌশল থাকুক না কেন সেটা নিত্যস্রষ্ট ভাষাভাষা ও বাহিরের, অন্তরের সত্য তাহার মধ্যে জগৎ পরিগ্রহ করিতে পারে না। প্রত্যেক জাতির শিল্প ও সাহিত্য গঠনের একটা রূপ আসে। তখন সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের সীমানির্দেশের জন্ম একটা স্বল্প বুদ্ধি ও ক্রটির সৃষ্টি হয়। তাহা দ্বারা অনেক বড় বড় কাজ বা শিল্পস্রষ্ট হইলেও স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য্য তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয় না, যদিও সৌন্দর্য্যের তিতব-কার গভীর সত্য আবিষ্কার করা তাহারে লক্ষ্য ছিল না।

তাহারে উদ্দেশ্য ছিল একটা বুদ্ধিগত সৃষ্টি। সৌন্দর্য্যস্রষ্টার মধ্যে তখনানেকে, মানুষের জীবন বা প্রকৃতিকে না ফুটাইয়া বুদ্ধি দিয়া জীবনের ও প্রকৃতির সমালোচনাই তাহার কাজ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন বড় শিল্পী জিনিষের বাস্তবিক সত্যকে রূপ দিয়া স্রষ্ট হয় নাই; তব্বের পশ্চাতে জিনিষের যে আত্মা রহিয়াছে, সেই আত্মার প্রকাশেই তাহারে তৃপ্তি। বস্তুমধ্যগত আত্মাকে লইয়া বড় বড় শিল্পীর কাজ, তাহা বস্তুবাহক এই আত্মাকে বিশিষ্টরূপ বা ভাবের মধ্য-দ্বারা মূর্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাহিরের সৌন্দর্য্য, সামঞ্জস্য প্রভৃতি ছাড়া লোকচক্ষুর অগোচরে সৌন্দর্য্যের যে আত্মা আছে তাহা মানুষের তিতবকার কবি ও শিল্পীর নিকট প্রকাশিত হয়। কবি ও শিল্পী বিশ্ববস্তুর গূঢ় রহস্ত বৃত্তিতে পারিয়া নবস্রষ্ট রূপের মধ্যে তাহাকে মূর্ত করিয়া তোলেন।

বিচার ও কৃতসম্পন্ন টেকনিকের পূর্ণতা ও পরিভ্রতা বজায় রাখিয়া যে আঁট সৃষ্টি তাহাকে অনেকে ক্লাসিক্যাল আঁট বলেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় ঠিক নহে। প্রকৃত ক্লাসিক্যাল আঁট ও কবিতার উদ্দেশ্য, যা সার্বজনীন তাহাকে প্রকাশ করা ও সার্বজনীন সত্য ও স্বন্দরের নিকট ব্যক্তিগত প্রকাশকে সম্ভব করা, কিন্তু, রোমান্টিক আঁট ও কবিতার উদ্দেশ্য ঠিক বিপরীত।



তাহার উদ্দেশ্য বা সামাজ্যনীন ও যার উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত ক্লাসিক্যাল বা রোমান্টিক আর্ট গড়িয়া উঠে তাহাকে বাদ দিয়া বা পশ্চাতে রাখিয়া যা কিছু চমকপ্রদ বা বজ্রপাত তাহাকে প্রোখাজ দেওয়া। বস্তুতঃ সকল আর্টের মধ্যেই ক্লাসিক্যাল, রোমান্টিক ও বস্তুতাত্ত্বিক বিষয় আছে। এখন এই বাস্তবতা বলিতে বস্তুর বাহিরের রূপ ফুটানর কথাই বুঝিব; বস্তুর কর্মব্যতাকে প্রকাশ দিয়া তাহাকেই তাহার স্বরূপ বলিয়া বাড়াবাড়ি করিব না। কোন্ দরপের আর্ট সৃষ্টি হইল তাহার বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে কোন্ জিনিষকে প্রোখাজ দিয়া অপর সকলকে তাহার অধীন করিয়াছে। কিন্তু ক্লাসিক্যাল আর্ট বুদ্ধির পরিবর্তে উইট ও প্রেরণাকে প্রোখাজ দেয় বেশী। নিম্ন শ্রেণীর ক্লাসিক্যাল আর্ট ও মাহিতা—যাহাকে ক্লাসিক্যাল না বলিয়া চমকবেশী ক্লাসিক্যাল বলা চলে ও যাহা ক্লাসিক্যালের বাহিরের ধরণ ও পদ্ধতি নকল করে খুব, বড় দরের জিনিষ সৃষ্টি করিলেও তাহার শক্তি সামান্য। প্রায় শীঘ্রই তাহা মামুলি বাধারণ্য নিয়মতান্ত্রিক হইয়া পড়ে; প্রকৃত সৌন্দর্য্য, প্রাণ ও শক্তি তাহার থাকে না। সে মনে করে একটি পদ্ধতি বা কতকগুলি নিয়ম খনন মানা হইয়াছে তখন সমস্তই করা হইল। কিন্তু এক্ষণ করাতেরই সে আর্ট হইতে উঠি হইল, তাহা হইয়া পড়িল কারিগরের হাতের প্রাণহীন কাজ।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও তাহার রসগ্রহণের সময় যে বুদ্ধি বা স্রষ্টিক প্রোখাজ দেওয়া হয়, তাহা ধানিকটা মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; এবং এক্ষণ করাত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা মন্ত ভুল করা হয়। শিল্পকার বেশ ভাল করিয়া করিতে হইলে ভিতরের বিচারশক্তির উপর নির্ভর করিত হয়, সত্যের ও সন্দেহের নীতি অনুসারে সর্বদাই বাড়াই করিতে হয়, জিনিষকে সন্দেহ করিবার জন্ত। মনে ও প্রাণের মধ্যে যে সন্দেহের ঘূর্ণি গড়িয়া

উঠিয়াছে তাহাকে বাহিরের সন্দেহরূপে প্রকাশ করিতে হইলে তাহার মধ্যে থাকিবে একটা সামঞ্জস্য। রূপের সহিত ভাবের, ভাবের সহিত ভাবনার, স্বরূপ ও স্বভাবেবর একটা গভীর অচ্ছেদ্য মঞ্চ। যা কিছু অনাবশ্যক, বাস্তবিক বা চাকচিক্যময় এইরূপ সমস্ত জিনিষ ত্যাগ করিয়া বা পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য ও ভিতরের শক্তিকে ফুটাইতে সহায়তা করিলে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই বাড়াই কার্য বা সামঞ্জস্য যেন বিচার বুদ্ধির কাজ না হয়। সে শক্তি লুকাইয়া আছে সৃষ্টির মধ্যে, বস্তুর আপন সত্য ও স্বভাবেবর মধ্যে, সন্দেহ ও সামঞ্জস্যের অভ্যন্তরে, তাহাকে পাইবার জন্ত চাই ধ্যানদৃষ্টি, সর্বদা ভাগ করা কাজে ব্যস্ত মন দিয়া তাহাকে পাওয়া যায় না। সে শক্তি আসে উপর থেকে এবং যখন সে আসে তখন শিল্পীর সমস্ত বুদ্ধিকে সে একটা বিচার বুদ্ধির উপরে লইয়া যায়। সমস্ত বুদ্ধি তখন তাহারই ইঙ্গিত মানিয়া চলে কিন্তু যদি তাহার নিজেদের দাবীকে প্রাধান্য দিতে চায় ও নিয়ন্ত্রণের বুদ্ধি যদি বাধা দেয় তাহা হইলে সে শক্তি আর কার্যকরী থাকে না, তখন সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যায়; সেই সময়ে আত্ম সমালোচনা প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পী যদি সে সময়ে কোন নিয়ম বা বুদ্ধি দিয়া তাহার কাজের বেশ মশোমন করিতে চেষ্টা করে, তখন সে নিষ্ফল উপায় অবলম্বন করিয়াছে বলিতে হইবে। তখন তাহার দরপার স্বতন্ত্র সৃষ্টি সহজ বিচার বুদ্ধির (intuitive critical vision) দাব্য লগ্না ও তাহারই সাহায্যে তাহার হারাণ শক্তিকে ফিরাইয়া আনিয়া নবভাবে নতুন করিয়া কাজ আরম্ভ করা। অল্পপ্রাণিত হইয়া যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সেখানে বিচার বুদ্ধির কোন স্থান নাই।

১. শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development হইতে অনূদিত—অনুবাদক: শ্রীহালাল প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

## শ্রেষ্ঠাগ্রহ

শ্রীহরিশীল রায়

মৃদুবে বাড়িটা দেখেই ভূপতির সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ খেল গেলো। পলা-বন্ধ কোটের পকেটে কোটার প্রান্ত চুকিয়ে দিয়ে, স্ট্রাটিকেসটা শক্ত করে ধরলো। নিচের দরজা বন্ধ, ওপরকার জানালা খোলা বেধে ভূপতি ঘাড় উঁচু করে ডাকলো—  
—মামিমা—  
—তারপর কড়া নাড়তেই দরজা খোলা থুলে, গামছা-পরা স্মিলাঙ্কায় কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন ভুললো—  
—কাকে চাই?

—মামিমাকে, ভূপতি দ্বার ভোক গিলে নিলো:—  
এইটে বিধান বাবুর বাসা নয়?  
সি একধার কোণে উত্তর না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—  
ও দিদিমি গো-ও-ও-ও, তোমাদের কে কুইম এয়েচে, কোথেকে আসচে? বোকা? রংপুর থেকে? ও? বুকিতি—  
একটু বছর বোলার মেয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে থেমে গেলো, রেলিঙ-এর ওপর বুকের ভর রেখে ছাঁবার ছললো, টোটার ওপর একটু হাসি টেনে আনলো: এসো, ওপরে চলে এসো। ও না, এই জাখো এসেচে।

ভূপতি আগেই সে উঠে গেলো। নিতম্ব এবং কোটিতে নর্তকীর স্পন্দ শিল্প। ভূপতি অতকিছু বুঝলো না, আর এটা তার বুঝবার মতো বসন্তও নয়। মামিমার সঙ্গে সরু সড়ক ফালি বারান্দা ডিঙ্গিয়ে, রেলিঙের ওপরে চট্ট-এ ঘেরা রামাথর রেখে ভূপতি একটা ঘরের মৃদুবে এসে দাঁড়ালো। মীলিনা সমস্ত দেহভার ওপর একটা তরঙ্গ ভুলে দিয়ে মৃদুবে গতিতে ঘুরে চুকলো। ঘুমন্ত মায়ের মাথায় ঝাঁকি দিয়ে ডাকলো, মা, ভূপতি এসেচে।

ভূপতি দরজার ওপারেই থেমে গিয়েছিলো, তার মামিমাকে দেখে তার মনে নুকে একটু বল এলো।

এতক্ষণ সে যেন কত অপরিচিতর সঙ্গে আসছিলো, প্রত্যেক পদে তার ছিলো একটা পিছু যাবার টান। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর শ্রেষ্ঠাগ্রহের যবনিকা যেন হঠাৎ ওপরে উঠে গেলো, সমুখটা তার চোখে প্রাঞ্জল হয়ে জেগে উঠলো।

মামিমা তাকিয়েই যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন:—  
এসিসি? বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আর। থাক স্ট্রাটিকেস থাক ওদান্নেই। যা না মীলিনা, ওটা ঘরে নিয়ে রাখ।

বদিও এ মামিমার সঙ্গে তার বেশি মিলমিশ নেই, বেশি আখাডনা হয়নি জীবনে, তবুও ভূপতি তার মাকে বুইয়ে এই মামিমার ভেতর একটা মেয়ের সঙ্গতি আবিষ্কার করতে পেরে সর্দীতিত হয়ে উঠলো যেন। মামিমা স্কপা করে তার ভরণপোষণের তার বেছ্যায় আপন স্বন্ধে চাপিয়ে নিলেন, ভূপতিকে চিঠি লিখিয়ে আনিয় নিলেন রংপুর থেকে। হয়তো ভূপতি আকস্মিক এই স্নেহবাদের মামিমাকে নিজস্ব ভেবে বসলো।

প্রাণম করে মাথা তুলবার আগেই মামিমা তার মাথা স্পর্শ করে জিগপেস করলেন, কোন টেনে এলি?—  
—শিল্প নেলে। মেয়ের উপর রাস্তা পা ছটোকে ভূপতি ভেঙে দিলো। জানলা দিয়ে কাঠিকের একটু নরম রোদ তার পায়ের ওপর পড়ছে, মেহ-স্পর্শের মতো একটা ছন্দ যেন সে খুঁজে পেলো এই রোক্তুরের গায়ে।

বার্জিসের ছোঁয়াত লেগে মামিমার সামনে ছাঁটো ধাত নেই। টোঁটো চামড়ার মতো নরম হয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে; জিগপেস করলেন, কাকা অমৃত করলেন না তো? তা আর কেনই বা করবেন? তা, ওরিকে সব কুশল?



নীলিমা অকারণে ফিক্‌ ক'রে হেসে দিলো। যৌবন-স্পর্শে ও যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। গলায় একটা সফ মফটেন, হাতে মীনা করা জগার চড়ি গায়ে হাড্ডা একটু সোনার স্পর্শ, তার যৌবনের মতো কাহ্নিকের নরম রোদে কলম করে। মুখের হাসি ঠোঁটে রেখে বললো, সত্যি ভূপতি! কী ছেলোমামুষ, না মা? ঠিক মেয়েদায়ের মতো মুখখানা। চিবুকটা কী শক্ত উঃ,—নীলিমা নিতান্ত গুঁকির মতো খুঁপাত বসিয়ে ওঠে।

ভূপতি বাড় প্রায় মাটির সঙ্গে লাগিয়ে দিলো! লজ্জার কিংবা রোদে, এবং শ্রান্তিতে আগেলের মতো আরক্ত হয়ে উঠেছে তার গাল দুটো। নীলিমার হিকে তাকাত গিয়ে তার সমস্ত প্রাণ, বুকের হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে ধক্‌-ধক্‌ করে।

নীলিমা বললো, আমি তো ওর-চেয়ে বড়ো, না মা? সেই ইন্দিয়ারির বিয়ের সময় দেখেছিলাম মনে পড়ে। একটা পায়জামা প'রে গুণ-গুণ ক'রে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতো! মুগ্ধ করতে পারতো! অস্বাধীন, না মা? বেকর্ডের বত নতুন গান সব ওর কণ্ঠস্থ ছিলো।

মাসিমা বাধা বিলেন: তা তো হ'লো! ভাত আছে তো? যা নাবার বন্দোবস্ত ক'রে দে।

নীলিমা উঠে গেলো, চলে গেলো সে বাইরে। ভূপতি মাসিমার আদেশ মতো জামাছুলি খুলে ফেললো। নীলিমার দেওয়া ভেল দেখে, নীলিমার অস্থায়ী হয়ে চান ক'রে দিলো। কেয়ে দেখে একটু, বিশ্রামের প্রয়োজন সে মনে করছিলো কিন্তু নীলিমা, বসে যে নাকি ভূপতির বড়ো, আর বাঁকা নীলিমারই পরের বোনটি, বসে যে নাকি ভূপতির ছোটো, বাসার এক নতুন ঐতিহ্যকে পেয়ে তাকে উদ্ভাস ক'রে ভুলতে ছাড়লো না। তেতলার চিল কোঠায় তলো গায়ে সামান্য একটা লোকের পাকার মতন জায়গা তারা বানিয়ে নিয়েছে। ভূপতিকে নিয়ে চললো সেখানে। এখানে ত্রিপ্রহরের টুকটাকি বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পরম বন্ধকে নিয়ে সময় কাটে। বাবু, তাশ খেলার

একটা মাথা। বারো-তেরো বছর বয়সেই ব্রিজ নোট্‌স দেখবার জন্মে একখানা Sunday Statesman না হলেই তার চলে না; Brain-Ponic দিয়ে মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে নেয়। আর নীলিমা—বেশভুখা নিয়ে দিনের বেশির ভাগ সময় তার ঘায় কেটে, সে জাপে latest fashion এ গোড়ালীর কত কাজে গাউন নেবে আসবে। যদিও বলে রাখা ভালো, নীলিমা কাপড় ছেড়ে গাউন ধরেনি। ভূপতিকে তারা টেনে আনলো এখানে। এখানে তারা তাকে নিয়ে একটু দৃষ্টি করতে চায়। দেশের সংবাদাদি নিয়ে একথা-সেকথা থেকে নীলিমা তার গায়ে বাঁকা দিয়ে ব'ললো, ভূপতি তাস খেলা জানো? ভূপতি জানে না। কিন্তু নিজের এই অজ্ঞতা প্রকাশ করতে তার গা যেন হিম হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যা বেলায় গুম্বস্ত ভূপতিকে একা রেখে তারা নোবে এলো।

খা খুয়ে নীলিমা বেশভুখা ক'রে কপালে উজ্জল এবং পোল ক'রে লাল চুঁচুরের টিপ পরলো। নাকের ওপর সিন্ধুরের যে-গুঁড়ো প'ড়েছিলো। আদ্যনার সামনে ধাঁড়িয়ে মুছে নিলো। বাঁকাও বৈকালিক ঘানাচ্ছে একটা দাদা সিঙ্কের ফ্রক চড়ালে যদিও ফ্রক পরার বয়স আর তাঁর নেই। মাসিমার সেবিকে কোনো মেয়াল নেই। ঠিক এই সন্ধ্যায় রাঙা দিয়ে মেমসাহেবের তারা বাঁকা ইঙ্গুলে যায়। নীলিমা কিছুদিন থেকে যাওয়া বাদ দিয়েছে।

মাসিমা বললেন, বাবু, ভূপতি তেতলার একা গুম্বস্তে, ভয় পাবে। যা তো, আলোটা জ্বলে বেগে আর বাবু মুইচ টিপে নেমে যাচ্ছিলো, কিন্তু ভূপতি জেগে পড়িয়ে দেখে তাকে ডাকলো।

আজ রবিবার। আজ বরেন আসচে। নীলিমা দুনিয়ার সমস্ত প্রোভেন সামান্য একটা বুকের মধ্যে জড়ো ক'রেছে। বরেনের সঙ্গে তার বন্ধতা, সেই বন্ধতাকে চুপ একটা প্রতিষ্ঠা দান করা তার বৈশিষ্ট্য একটা কর্তব্য।

ভূপতি নিচে নেমে এসে দেখলো, পাশের ঘরে নীলিমা হেসে ফুটিপাটি হ'চ্ছে। বরেন চৌকীর ওপর গা গুলিয়ে হাঁটতে ছ'হাত দিয়ে ব'রে ছলছে।

ভূপতি তেতলার ঘরটিকে একা পেয়ে গিথছিলো; যদি আজ সন্ধ্যা নামে অস্বাভাবিক একাও থাকবে, যদি এক উজ্জল আলো সন্ধ্যাতার একা গুটে নেয়, দুই-এক টোটে জল দি। যে জাপেশিয়ের তার কোষে আলো ব'বে,—

নীলিমা ও বাবু হঠাৎ হেসে উঠলো, ভূপতির পারিপার্শ্বিক নৈস্কৃত্য থেকে জেগে উঠলো যেন পৈশাচিক ছুটি আঁরা, তেজে দিয়ে গেলো তার নৈতিক সানার আরাধনাকে।

নীলিমা বললো, লেখো! 'রবে'-তেই র'য়ে গেলে কেন? এগাও!

ভূপতির এই কবিত্ব দেখে বাবুর সমস্ত দেহ বিস্ময়ে উজ্জ্বলিত হ'য়ে ওঠে। হেসে সে বলে, ভূপতিদা! লেখো, ঘামলে যে!

ভূপতি কিছুক্ষণ থেমে থাকলো। করনার ছায়া এলো তার চোখের সীমায় ঘন হ'য়ে আছে, সমস্ত কথা হরতো তার কাণে যাচ্ছে না।

কলমের পেছনটা হ'বার কপালে চুকে সে লিখে ফেললো:

সে ভাসিবে আলোর বজায়।

নীলিমা হাসলো, বললো, দাও তো ভূপতি বাতাটা, মাঝে দেখিয়ে দিয়ে আসি! ও বাবা: আবার যে বিশেষ লজ্জাও দেবছি! দাঁড়াও, বরেনদা এই শনিবার দিন আসবেন ব'লেছেন, তাঁকে জাখাবো।

ভূপতি তখন কোনো কথাই কাণ দেয় নি। মনে মনে সে রচনা করেছে:

শিশুর অথর দাঁও বিধ বেলে কে হুঁমি নিচুয়?

এই ভরা ছিন্নহরে বাসিয়েনা আলোর শূন্য।

বাবু বললো, জানলাটা খুলেদি! দেখো, ভূপতিদা! ভূপতি কোনো কথাই জবাব দিলো না। সমুখে তার পরীক্ষা, ম্যাট্রিক পরীক্ষা। তার জন্মে কতটুকু প্রস্তুত সে হ'য়েছে জানা নেই। মেঘনাদবধ কাব্য

রচনা ক'রে গিয়েছেন যে কবি, এখন তিনিই তার পরীক্ষক। রবি ঠাকুরের 'মহাভা' তার শিক্ষক। এবং স্টিফেনসন, শেলি, কীটস তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেলির 'ব্রাউন্ড' তাঁর কাছে পিরামিড! ভূপতি বলে, মনে মনে বলে, ছাড়া একদিন যদি আসে, যেদিন সামান্য একটা শুকনোপাতার ওপর সে প'ড়ে ভুলতে পারবে একটি কবিতার মর্মের স্বপ্ন, আরো সে ভাবে একদিন যদি শেলি তার স্বপ্নের নামে এসে আশীর্বাদ ক'রে যায়। কীটস-এর মতো একটা আখ্যাত পেয়ে সে যদি আজ রাজেন্দ্র যুগকে বরণ ক'রে অমরত্ব পায়। তার পা তেঙে গেলে সে যদি বায়রণের মত কবিতা লিখতে পারে।

বাবু নিচে নেমে গেছে। হয়তো এই স্বপ্নবন্দার সে রাষ্ট্র করতে গেছে।

নীলিমা বললো, ভূপতি! ই'য়ে কি বলে—এই ভালোবাসার কবিতা লিখতে পারো? যেমন বরো? যাকগে পারো?

প্রথম কবিতা লিখতে আরম্ভ ক'রে ভূপতি সন্ধ্যা বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা, নদীর বর্ণনা এক কথায় শুধু যা লিখেছে সবই বর্ণনা সংক্রান্ত। তারপর এলো প্রেমের কবিতার যুগ। এনো তার সেই যুগ চলছে, একটু বাড় নেড়ে বললো—পারি। কেন দরকার?

নীলিমার ঠোঁটের মাঝ থেকে একটু হাসি ছিটকে বেরিয়ে এলো: হ্যাঁ, খুউউথ গোপনীয়, কিন্তু কাউকে ব'লে না, আমায় ছুঁয়ে বরেন! একটা চিঠি লিখলো, একটু যদি কবিতার টোঁচার দিতে পারি তবে—

ভূপতি একটু ভাবলো, আচ্ছা, এই ধরণের?

আমার চিঠির গায়ে শাটসময়

আমার মনের ভালোবাসা, প্রেম,

এবং একটু চুমো—

নীলিমার শাড়া চকচকে গাল রাঙা হয়ে উঠলো, বললো—অতটা নয়! চুমো-চুমো বাদ দিয়ে।

—বেশ,

তুমি তো জানোনা বন্ধু মাসিমা ডাকি,

জামি নাকো মোর কাছে আসিত পাখি কি।



নীলিমা বললো—ঠিক হ'লো না।

—তব, ভূপতি একটু ভাবলো :

অন্তরীক্ষে ভগবান থাকে, আর থাকে তুমি—

নীলিমা বললো—থাক থাক, আর এক দিন হবে।

ন—ওঁ বাচ্চার মধ্যে নেমে প'ড়েছে নীলিমায়া।

ভূপতি বলতি ক'রে মাথায় জল ঢালছে। ওঁটা তাদের বৈকালিক রান। আজ বরেন আসবে, এই বরেনের সঙ্গে নীলিমার মিলমিশ এবং বন্ধতা চ'লেছে।

নীলিমা তার পায়ের দিক থেকে কাপড় টেনে তুলে জল মিলভাচ্ছে। হঠাৎ ভূপতির কাছে প'ড়লো, বললো, ওটা কিসের দাগ, নীলিমা কি ?

নীলিমা বললো, অম্ম ভাই ! খেঁচী বলে নাকি ওকে।

ভূপতি বললো—বারে না ?

—সারে। বুচকিদানা বলে একটা ওগু আছে তাই দিয়ে তো ক'মেছে।

হঠাৎ ভূপতির মন খারাপ হয়ে উঠলো। বিশেষ এই রোগটিকে সে তিরহিলি ভর ক'রে আসতে।

ভূপতি কিছুক্ষণ নীলিমার চ্যান্টা মুখের দিকে একটা ভীজ দৃষ্টি রাখে। তার কোমল কবিত্তে সহসা একটা নির্ভর অখাত কে—বেন বসিয়ে দিলো। ভূপতির মুখের ওপর নেমে এলো অব্যবহার গভীর কালো ছায়া।

নীলিমা বোঁপা রসমতো শুকনো রেখে পা ধুয়ে নিলো। বাবু এনো চোঁচাবার ভেতর ইঁচড় পাঁচড় ক'রে সঁতার কাটবার চেষ্টা চালাচ্ছে। ভিজা মাথায় ধাঁড়িয়ে শিশু কবি হয়ত তার কবিতার ছন্দঃপংক্তির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ অঙ্গীল প্রস্তুত করছে মনে মনে। মুখ মোছা হ'লে নীলিমা ভূপতির হাতে গামছাটা এগিয়ে দিতে হাত বাড়ালো। ভূপতি বললো, থাক, গামছা লাগবে না। আমি আরো নাইবো যে।

নীলিমা ওপরে উঠে গেলো।

ভাঙ্গার বদন সন্ধ্যা হয়েজে তেতালার ঘর থেকে ভূপতি শুনেত পায় হারানিয়াদের একটা করণ মিনতি, তার ভেতর থেকে ক্রমে নীলিমার গলা ধরিয়ে আসে :

‘কত আর এ-মন্দির ঘর ছে প্রির রাবিব বুখিই—ই ই—’

এ-মন্দির যদিও তন্ময়তা আসে না, তথাপি ভূপতিক, কেন জানি না, কাণ খাড়া ক'রে রাখতে হয়। পানের স্পৃহী পাছে একটা বাহুড় উড়ে পড়ে। সেদিকে ভূপতির ক্রক্ষেপ নেই। ক্রমে ক্রমে গানের পর সুরিয়ে আসে, সুর হয়ে আসে স্তিমিত। মাসীমার গলায় স্বর তার ভেতর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখন : বরেন, যেয়োনা। মিলি মুখ ক'রে উঠে।

বীরে বীরে ভূপতি নিচে নামে। ও-ঘরে নেতে তার যেমন ইচ্ছা করে, সন্ধ্যা ছয় তার চেয়েও বেশি। নিভাও ঘুগি বাবু বরেনের কোলের মধ্যে বসে ছলছে। নীলিমা পা ভাঁজ ক'রে বাটের আর এক প্রান্তে ব'সে ব'লছে : কী-বে মাহুয়, বলি—রোজ সন্ধ্যার সময় আসবেন, তা না। দরজার পাশ থেকে ভূপতি ব'রে পড়ে। উঠে যায় ওপরে। সেখানদখ কাব্য নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে।

বরেন বললো : নতুন করালে নাকি ? রেবি ? একে কি পাটার্ণ বলে ?

নীলিমা উঠে আসে, একটু দূরে ব'সে হাত বাড়িয়ে জায় : এই তো পরও পড়িয়ে এলো।

খাবার হাতে মাসীমা ঘরে ঢুক পড়েন, নীলিমা হাতটা টেনে নিতে চেষ্টা করে। মাসীমা বলেন, বস তোরা, আমি যাচ্ছি। বাবু, তোর পড়াশুনা নেই ? যা ওপরে যা। ভূপতি আছে, বুখিয়ে দেবে এখন !

বাবু উঠে পড়ে। বরেন বলে, ভূপতি কে ?

নীলিমা বলে : আমার মাসতুলো ভাই ! এই তো ছুদিন হলো এলো এসেছে। স্মরণ কবিতা তোহে।

বাবু ভূপতির পিঠের ওপর হুক পড়েছে।

এমনি ক'রে দিন যায়, কোন ব্যত্যয় নেই।

ভূপতির লেখাপড়ার বন বসে না, সন্ধ্যা হ'লে সে চেয়ে থাকে বাবু কখন জাঁক কষতে আসবে। নীলিমাদিই বা আসবে কখন !

দু-বছর পরে :

বরেন তখন ভাগলপুরে প্রাক্টিস করছে। মাসীমার টাইফয়েড ফিবার। কলেজ কামাই ক'রে ভূপতিক ওউগ্রের প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রতে হ'চ্ছে। মাসীমার জীবনের আশা নাকি খুব কম। ডাক্তাররা তো তাই বলে। বড় ছেলেকে কাছে থেকে ক'রিয়ে, এ-পাশ ও পাশ ক'রে, বার কয়েক কড়িকাঠের পানে চেয়ে মাসীমা ব'ললেন : বরেনকে জানিয়েছিলাম আমার অন্তরের কথা। একটা টেলি পাঠা, বাবা। আর হজতো দ্বাধা হবে না। আজই বুঝি ?

বাবু আইস-ব্যাগ ধরে শিয়রে বসে আছে। ফ্রক ব'সে এখন তার শরীরে ডুরে শাটী উঠেছে। এক হাঁটুর ওপর একটা গাল রেখে ভূপতির চলা কোর দিকে লক্ষ্য করছে। ভূপতি তার মুখের পানে চেয়ে একটু হাসে।

নীলিমা ফুট-ফরমাস খাটে, ওপরে তুলে তার শরীরে ওন-ওন ক'রে পান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। ভূপতির মাথে হজতো কোনোখানে নিরাশায় সাক্ষাৎ হয় তা জানবার উপায় নেই—এতই গোপন।

একদিন বিকালে হঠাৎ বরেন সতাই এসে উপস্থিত হয়। নীলিমা অতি সাধারণ একটা আধময়লা কাপড় পরে ঘরে ঢুকতেই অন্তরঃপূর্ণ মাসীমা ধমক দিলেন ; নীলা, তোর কি একটু বুদ্ধি নেই ? পা ধুয়ে বোরা কাপড় পর। আলতা নেই নাকি ? এত বোকা কেন, ব'লে পাশ ফিরে শুলেন।

ডাক্তার বলে গেছে : বাঁচলে বড়ো জোর আর ছুদিন ! একটা চাপা বিবাদের স্বর বাড়ির অনাচ-নাচকে শুক ক'রে রেখেছে। গভীর রাতে।

ভূপতি ওদিককার টলে ব'সে চুপছিলো। বরেন শিয়রে ব'সে আইস-ব্যাগ ধ'রে আছে। নীলিমা পায়ের হাত বুলায়। মাসীমা পাশ ফিরে শুলেন হাত বাড়িয়ে ডাকলেন, নীলা, আর না কাছো আর। রাত কটা ? তোর হ'তে দেরি কতো ?

নীলিমা উঠে এলো। বরেন তার মুখের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো।

মাসীমা হাত বাড়িয়ে নীলিমার হাত ধরলেন, বরেনের হাত ধ'রে টানলেন, ব'ললেন, বরেন, বাবা (একটা দীর্ঘ নিশ্বাস) নীলিমা কে তোমার হাতে তুলে দিলুম। (বরেনের হাতে নীলিমার হাত সমর্পণ ক'রে) কথা দাও। শেষ ইচ্ছা আমার, ব'লো কথা দাও !

বরেন একটু খেমে উত্তর দিলো : বেশ তা-ই হবে। আগনার যা ইচ্ছা !

—কথা দিলে ? প্রতিশ্রুতি দিলে ? —হ্যাঁ !

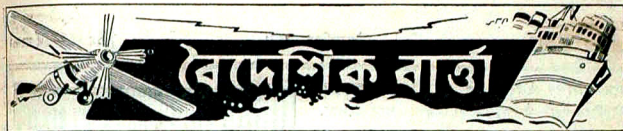
পরদিন থেকে মাসীমা স্বস্থ হ'তে চললেন। এবং একমাস পরে উঠে ব'ললেন, অগাধে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। ডাক্তারদের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল গেলো।

কয় মাসের বিবাহ স্থির করতে পেরে মাসীমার আনন্দ আর সীমা নেই। মেয়েকে একপ্রাণে স্বপ্না ব্যবসায়ী ক'রতে লেগে প্রথম দিকে সেজ্ঞামাই নাক সিঁটকাতো। কিন্তু এখন সে-কামাইও তাদের এত আন্তরিক হয়ে পড়েছে যে, সে বলে, কাজ ইঙ্গিল করতে গেলে হীনভায় কী দোষ ! অমন কয় মাসের সংস্কার ছোঁটানোতে শাওড়িকে তিনি একটু বড় রকমের certificate জ্ঞান। ভূপতি হাসে, বাবুর মাথে একটু কম মেশে।

তারপর হঠাৎ বরেন বিগড়ে ব'ললো। সংবাদ শুনে মাসীমা কড়া রকম একটা চিঠি লিখলেন, তুমি কি এ-কথা আগে জানতে না, বরেন, যে নীলিমার খেঁচী ? তুমি কেন তবে আমাকে আমার মৃত্যুসংবাদ কথা দিয়ে ? প্রতিশ্রুতি দিলে ? ভদ্রঘরের মেয়ের মান মর্যাদা রক্ষা করা কি ভদ্র সম্মানের কর্তব্য নয় ? তুমি কি ভুলে গেছ, তোমার হাতে আমি আমার নীলাকে সম্ভ্রান ক'রেছি ? শুধু মস্তুর দিয়েই কি বিবাহ, অন্তর দিয়ে কি নয় ? অমন কথার বৈতিক ক'রে না। এই মায়েই শুভদিন ঠিক করবো মনে থাকে যেন।

মায়ে বিয়ে হ'লো।





## ক্রীপ্রমোদ সেন

### ইটালীর লেলিহান জিহবা

মানব ইতিহাসে অন্ধকার যুগের পরেও বর্ধরতা লোপ পায় নি, শুধু সে সভ্যতার মুখোশ পরেছে। সে কালে পরাক্রান্ত রাজ্যরা দিখিজে যে বের হত, প্রাকৃতিক জাতিদের সর্বস্বাস্ত কবৃত, এবং একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করবার চেষ্টা করত। মাহমুদের হাজার

সাম্রাজ্যবাদের অবদান। এখন দেখছি আবার সাম্রাজ্যবাদের মূর্ত্যুজয়। ষোল্লশ ও উনিষাশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় শক্তিদের সাম্রাজ্যজ্ঞান গড়ে উঠেছিল ঘটনাচক্রে। কিন্তু বিশ শতাব্দীতে যে জাতিগুলো সাম্রাজ্যবৃত্ত হয়ে উঠেছে, তারা স্পষ্টই বলছে সাম্রাজ্য তাদের চাই।

বন্দৌ সাম্রাজ্যগুলারাই একটু চিন্তিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা'রা তাদের এই নবোত্তেজ দৃষ্ট-শিখাদের বিক্রমে বাধা দিতে একটুও সাহসী নয়। এই জন্মেই রুটেন ও ফ্রান্স ইটালীর মূখ্যবাদান দেখেও তা'র দম্ভাজি বোমাঘন হজম করছে; তা'র লালসাবাহি শাস্ত করার উপায় তা'দের নেই। ইটালীও এই দুটো পাণ্ডা শক্তির নানাভাব বুকেছে এবং এই জন্মেই মুসোলিনি বলতে সাহসী হয়েছে যে, সে পৃথিবীতে কা'দও তোয়াক্কা রাখে না, এবং যে শক্তি ইটালীর প্রতিকূলতা করবে তা'র বিরুদ্ধে ইটালীর বাহিনী অভিযান শুরু কর্তে পরামুখ হবে না।

মুসোলিনি জানে যে, ফ্রান্স পরাক্রান্তাবে তাকে সহায়তা করবেই। কারণ কয়েকমাস আগেই আল্ভিকার ভাণ্ডা নিয়ে ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে লেখাপড়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপে মোজীলী পর্যন্ত ইটালীর হাতে মেরে দিয়েছে। কিন্তু ওরিকে ফ্রান্সের কলের কামান জিগুটি বন্দর হয়ে আবিগিনিয়ায় চালান যাচ্ছে। এটা আবিগিনিয়ার সৌভাগ্য বলতে হবে, কারণ জাপানী ও ফরাসী অস্ত্রশস্ত্র না পেলে তা'কে বিনা দুর্ভেই ইটালীর পায়ের জুটিয়ে গড়তে হত। রুটেন এ সম্বন্ধে কায়দা-দুরন্ত। কাজেই রুটেন বলেছে ইটালী বা আবিগিনিয়া কাউকেই শত্রু বোঝা



মুসোলিনি

হাজার বছর অভিজ্ঞতার ফলেও সে নীতি একটু বলায় নি। এখনও মাহুম সেই আদিম প্রকৃতির দা। পরিবর্তন শুধু এইটুকু, যে, রাজার পরিবর্তে সাম্রাজ্য-অভিযান চালায় গণনাযকগণ। রাজা পেতেন শুধু বেতনলোভী সৈন্যগণ; গণনাযকগণ পারে সমগ্র জাতিকে প্ররুদ্ধ করত।

তাই আবার দেখছি বিগত মহাযুদ্ধের নিদারুণ বিঘনার পরেও সেই রক-রিষ্ট জাতিগুলোই আবার ফিরে জন্মে উঠেছে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত যাবতী অনলরক্ত ক্রেনেজিলম যে এ দুর্ভে হবে

—কখনই না। আমি চাই পাতিত্রতা এবং জ্ঞানীয়ে আপনাদের জীবনের ওপর দিয়ে প্রাণন ব'য়ে থাক।

বাকুও পাশেই ছিলো, বললো, আমার ভাসুর বই পড়ে কী গালাগালটাই বিলেন আপনাকে! ব'ললেন, সাহিত্য ছেলেমানুষি নয়। সাহিত্য সাধনা ছাড়া হয় না। কী যে ছাই-পাশ আপনি লেখেন! আর বাজারে আপনাদের নামে তো চি-চি পড়েছে—চরিত্রহীন ব'লে। তুপতি হেসে উঠলো—সৌভাগ্যের কথা। তোমাদের চরিত্র ত্রিক থাক, সেইটুকুই যেন আমার গরু হয়, বাকু! তা, বরেনবাবু ক'দিন হ'লো আত্মগোপন ক'রেছেন।

—এই বছর তিন! বাকু গা ছেড়ে দিয়ে প্রহ্লাদর দিলো।

—তোমার বর হয়তো আত্মপ্রকাশ ক'রেই আছেন? বাকু একথার উত্তর দিলো না।

তুপতি বললে গ্রামোফোন বাজায় কে?

—সলিলদা। বড়দের রাশ-ফেও! ছ'দিন পালের সংবাদ? সলিলদা আর নীলিমা কানীয়েব নতুন দুগ্ধ দেবতে গিয়েছে। কবে ফেরে টিক নেই।

পাঁচ বছর পরে। তুপতি কয়েকখানা উপভাস লিখে বাঙলা দেশে নাম কিনিচ্ছে। একটা উপভাসের নাম দিয়েছে: নীলাধরীর প্রেম-নীতিক। সেইটায় সে নীলিমার জীবন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত ক'রেছে। আর এই পাঁচ বছর হ'লো সে যেম-এ গোছে।

নীলিমার সাথে জাণা হ'তে সে সম্মোহণ করলো: এর নামে? আমাকে নিয়ে লেখা তোমার কি অম্মায় নয়, তুপতি?

—যথ! তুপতি যেন আকাশ থেকে পড়ে: আপনাকে নিয়ে?

—বুকেতে পারলে না? নীলাধরী মেয়েটা কে? সে কি আমি নই?

—তুপতি কিছুক্ষণ খেমে থাকে: তা হবে হয়তো! কিন্তু শেষের বিকে যেটুকু আছে তা-ক'র সম্পূর্ণ থাক কেন?

নীলিমা চোখ রাঙিয়ে উঠলো: তবু ঘরের মেয়েকে অপমান ক'রো না, তুপতি! আমিও কি তোমার উপভাসের নাস্তিকার নতো মটোর ড্রাইভারের সঙ্গে নৌকামিল পালাবো? এই ছুটি ভূমি ব'লতে চাও?





হবে না। কিন্তু ওরিক দশ বছরের ওপর ধরে যে ইটালীর শত্রুর কারখানাগুলো বন্ড করে চলেছে, সে সম্বন্ধে রুটেন অন্ধ। এ অবস্থাটা কেন দুই লাঙ্গিলার মুখে একজনকে লাগি না দেখা।

রুটেন ওরিক কবুলেও আর সব ইয়েরোগার জাতিরা ব্যবসারী জানে—আর দুইই তা'র ব্যবসারীর একটা পরম মরমুম। কাজেই তা'রা ইটালী ও আবিসিনিয়ার মধ্যে আপোষের চেয়ে একটা দুই পছন্দ করে। ইটালীও নানা দেশ থেকে খুব সদ কিন্ছে, এমন কি রুটেনের আফ্রিকার সাম্রাজ্য থেকেও। শোনা যায় যে গত মহাযুদ্ধের পেছনেও ব্যবসারীর ও স্বার্থেরদের চরিত্র ছিল। অবশ্য নিচর ব্যবসারী বুদ্ধিতে যুদ্ধ বাধান যায় না, যদিও আজকাল ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে যুদ্ধের মূল কারণ। জাতিগো সাম্রাজ্য আকাজ্য করেছিল একজর ব্যবসা চালাবে বলে; ইটালীও দেখ্ছে সাম্রাজ্য না বাড়ালে তা'র আর আয়ের পথ নেই। রুটেন ও ফ্রান্স পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্য পয়েছে, কাজেই ইটালীর লাঙ্গা মিটেবার একমাত্র ক্ষেত্র আবিসিনিয়া। তাই মুসোলিনি সমস্ত পণ করে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চালাবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

### রোমান জ্বরদন্তি

ইটালীর আবিসিনিয়া গ্রাসের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশটাকে শোষণ করা ও সেখানে একজর ব্যবসারের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। সম্ভাব্যালের গুণে জাপান আবিসিনিয়ার বাজার জুড়ে বসেছে; ফলে ইটালীর হয়েছে অবর্ণীয় গরজ-আলা। ব্যবসা প্রতিযোগিতা নিয়ে শুধর উর্কর চলে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন জাতি কোথাও ব্যবসার সুবিধা কর্ছে বলে অপর জাতি যে তা'র প্রতিবাদ করেছ এ রকম শোনা যায় নি। ইটালী তা'ও করছে। ইটালী জাপানকে শাসিয়েছে আবিসিনিয়ার ও রকম একচেটিয়া ব্যবসার চালবে না। এই জন্তেই আবিসিনিয়ার ব্যাপারে জাপানের অত মাথা ব্যাধ, এবং জাপানের দেশ-হিতৈষী সম ইটালীর কল্পিত অভিযানের বিরুদ্ধে যোরতর প্রতিবাদ করেছে।



আবিসিনিয় সম্রাটের একটা মিশ্র—তিনি “জুডার মিশ্র” নামে বিখ্যাত।

এ-রিক ঘরে মুসোলিনি জনসাধারণকে বোঝাচ্ছে যে, আবিসিনিয়ার সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'লে নয়া ইটালী আবার রোমক গৌরব ফিরে পাবে। রোমকমুষ্টি-গুলো মুসোলিনি আবার ফালাই কর্তে আরম্ভ করেছে এবং অজরূপ স্থপতি ও ভাস্কর্যের চর্চা আরম্ভ করেছে। বিলাতের “ম্যাক্সেটর গার্ডিয়ান” কাগজে প্রকাশ যে, দেশের লোককে কম থাইয়ে মুসোলিনি এই সব লোক-দেখান আড়ম্বর কর্ছে। যে অবস্থায় রোমক গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখন জগতের সে অবস্থা আছে কিনা তা' শক্তিমরিয়ায় মন্ত মুসোলিনির দেখাল নেই। ও দিক দেশের আর্থিক অবস্থাও যে বিশেষ সুবিধাজরক নয় তা' ইটালীয়ান মুদ্রার অবস্থা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। ফ্যাসিষ্ট-তর প্রতিষ্ঠার সময় মুসোলিনি জাতিকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল তা'র অধিকাংশই বাস্তবে পরিণত হয় নি। কাজেই মুসোলিনি দেখ্ছে সাম্রাজ্য গুঁড়ি না করলে আর দেশে সমৃদ্ধি আনা সম্ভব নয়।

রোমে বিজয়ী ফ্যাসিষ্ট দলের প্রবেশের পর থেকেই এই সাম্রাজ্যবাদের জুত মুসোলিনির খাড়ে চেপেছে। অনেকদিন আগেই মুসোলিনি পূজা ধরেছিল যে স্বর্গের নীচে ইটালীর স্থান চাই। এই স্বর্গের নীচেই হচ্ছে কুখ্যাসাগর। প্রাচীন কালে এই সাগরের তিন কুলেই রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে জিপোলি জয় করে উত্তর আফ্রিকা ইটালীর সাম্রাজ্যের

ভিত্তি স্থাপিত হয়। তা'র আগে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়ার হানা দিয়েছিল, কিন্তু সেবার তা'র এরকম দৃষ্টি হয়েছিল যে, সে আলা প্রশমিত করার জন্তেই এবং মুসোলিনি দুনিয়াকে উপেক্ষা করে অভিযান আরম্ভ করত দুর্গপ্রতিজ্ঞা হয়েছিল।

### মন্দের ভাল

খামরা আগেই বলেছি ফ্রান্স বা রুটেনের বর্ধমানের কোন সুবিধা নেই যে ইটালীর সাম্রাজ্য-অভিযানের দুনিবার গতি রোধ করে। কিন্তু রুটেন পছন্দ করে না যে ইটালী দাবারি তা'বে আবিসিনিয়া গ্রাস করে, যদিও



সুই খরাট-সুই হার প্রামুয়ল বোর—ইনি এমন ভারতের সমস্ত সমাধান করে ইয়ুরোপে দাবা চালাচ্ছে। টিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রি হার প্রামুয়ল হোর ইটালীর সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্যভাবে দরদ প্রকাশ করেছেন। রুটেনের আশঙ্কা যে ইটালী আবিসিনিয়ার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে টানা হারের জল নিয়ে নিজের কাজে লাগাতে পারে। এই স্বপ্ন থেকে নীলনদের একটা প্রাণের উৎপত্তি এবং সকলেই জানে এই নদই ফ্রান্স ও শিরের জন্মদায়ী। নীলনদ বেচাল হ'লে এই দুই দেশের ফ্রান্স ক্ষেত্রগুলো মক হয়ে যাবে এবং ওগানকার ফ্রান্স না গেলে ল্যাভাশায়ারের কলভলি বেচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কাজেই ফ্রান্সের সঙ্গে মিশে রুটেন শেষ চেষ্টা করছিল এবং ইটালীকে প্যারী বৈঠকে বসেছিল যে

আবিসিনিয়ার আর্থিক সাম্রাজ্য তা'র, অর্থাৎ সে দেশটাকে শোষণ কর্তে পারবে, কিন্তু ও'রিক নামে স্বাধীন রাখ্বেই হবে। মুসোলিনি এখন সাম্রাজ্যের স্বপ্নে মগ্ধ, কাজেই বলে, ‘ও সব হবে না, আমার সৈন্যরা আবিসিনিয়াকে মৃত্যুর মধ্যেই রাখ্বে। এক হিসাবে ইটালীই আবিসিনিয়ার উপকার কর্বে।

রুটেনের এখন ভয় হয়েছে ইটালী আবিসিনিয়ার জুড়ে বসলে সে হযত সেখানে আর কোনদিন সুযোগ সুবিধা পাবে না। তা'র ওপর রুটেনের চার পাঁচটা উপনিবেশ আবিসিনিয়ার ঘোষায়ে। ওরিক আবার ইটালী কোন দিন না দৃষ্ট দেয়। কিন্তু—সম্ভবের সাহায্যে রুটেন এর কি প্রতিকার কর'বে? সেই জন্তে সে সম্ভবের কলকাঠি না মেড়ে ও ইটালীর বিরুদ্ধে সম্ভবেরই নিয়ামাহারের কোন ব্যবস্থার চেষ্টা না কর্বে, নিজের ঝটিঙলো ভাল করে আত্মপ্লাতে আরম্ভ করেছে এবং মাষ্টার রুটিশ বণপণতে বহর সমবেত হয়েছে।

### আবিসিনিয়ার চরমগতি

ইয়েরোগারী শক্তিবর্গ আবিসিনিয়ার সঙ্গে বা ব্যবহার কর্ছে তা'তে সে খুবই মর্মহাত হয়েছ, কিন্তু সেও সাম্রাজ্যের সারঙ্গ এবং সম্ভব একান্তভাবে আশ্রয় করে আছে। সম্ভবের মূরদ কি জা জাপানের ও জাফিরি ব্যাপারে বেশ বোঝা যায়; সম্ভাব্য আবিসিনিয়াকে রক্ষা কর্বেই না, পরন্তু সে যদি একটু বেয়াড়াভাবে চলে তা হ'লে মুসোলিনি ভয় দেখিয়েছে তা'কে ত্যাগ করত ইটালী একটুও দ্বিধা বোধ কর্বে না।

কাজেই আবিসিনিয়া আত্মরক্ষার জন্তেও প্রস্তুত হচ্ছে। ইটালীর ফুলনা তা'র শক্তি খুবই কম, কিন্তু তা'র জনসাধারণের উৎসাহ অদম্য। পনের থেকে আশি বৎসর বয়স্ক সব পুরুষই যুদ্ধের জন্তে প্রস্তুত হয়েছে এবং যুদ্ধ যদি আরম্ভ হয় সম্রাট হাইনসে সোলানি সৈন্য-বাহিনীকে রণক্ষেত্রে পরিচালনা করবেন। কিছুকাল আগে নারীদেরও এক সভা হয়েছিল এবং তা'রা দেশ-





আবিসিনিয় সম্রাট হাইলে সেলাসি।

তাঁহার উক্তি : ভগবানই আমাদের “দুর্গ ও বন্দ”

রক্ষায় সকলকে উদ্ধৃত্ত করেছিল। রাজ্যী শাস্তির জন্ত ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করে মোলদিন উপবাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছেন যে শাস্তি চেষ্টা যদি একান্ত বার্থ হয় তা হলে তিনি সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত আত্মদান করবেন।

সোভাখোর বিষয় আবিসিনিয়ার প্রাকৃতিক দুর্ভেদ বর্ধ আছে। অরব্যাকীর্থ পার্শ্বতা প্রদেশে ইটালীয় বাহিনী শতৈঃ শতৈঃ অগ্নির হতে পারবে না। অবশ্য ইটালী টিক করেছে যে, প্রথম বাকায় বিমানবাহিনীর সাহায্যে কিস্তিভা করবে, কিন্তু ঐ রকম বেশে বিমান-পোতগুলোর গতিবিধি সহজ নয়। অনেক অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তি বলেন যে ইটালীর বন্দ্যবৃত্ত পাঞ্জীভুলোও বিশেষ কার্যকরী হবে না, এবং আবিসিনিয়গণ আত্ম-গোপন করে শত্রুকে স্রবিশ্রামত বিপর্যস্ত করার সুবিধা পাবে। দেশের জলবায়ু ইটালীয়গণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয় এবং ইতিমধ্যেই ইটালীর উপনিবেশদ্বয়ে বহু সৈন্য মীড়িত হয়ে অদেখে ফিরে আসতে বাধ্য হবে।

তরু যুদ্ধের বিজীবিকা যে কমবে না বলা বাহ্য্য, কারণ ইটালী খুব সম্ভব বিশ্বব্যাপ ব্যবহার করবে এবং আকাশ থেকে গোলাবর্ষণ করে আবিসিনিয়ার জনপদগুলি ধ্বংস করবে। আবিসিনিয়গণ প্রায়ই কুটীরে বাস করে এবং সহরের সংখ্যাও খুব কম। তা’রা বজ্রাহারী, পরিশ্রমী এবং সহিষ্ণু। কাজেই ইটালীয়গণ যে নিমিষের মধ্যে কেয়ামাত করবে তা’র সম্ভাবন্য কম।

মোটের ওপর মনে হয়, যুদ্ধ অনিবার্য এবং খুব দ্রুত এই মাস বা আগামী মাস থেকেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে। যুদ্ধ সম্পর্কে আমেরিকার আচরণ একান্ত হাত্পাশ। ঐ আমেরিকাই এককালে যুদ্ধনিবারণ চুক্তিতে অগ্রী হইয়াছিল, কিন্তু আবিসিনিয় সম্রাটের আবেদন আমেরিকা কর্তৃপাত করেনি পরন্তু আমেরিকার ব্যবস্থাপক পরিষদে আইন হয়েছে যে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত আমেরিকা, কোন যুদ্ধ বাধলে, নিরপেক্ষ থাকবে।

### জাম্বানীর প্রতীক্ষা

মুসোলিনি ইয়োরোপকে শাসিয়েছে যে, গুল যদি বেয়াদ্ভাভাবে চলে তা হলে ইটালী যে কোন ইয়োরোপের



জাম্বানিতে ইহুদি নিপাটনের একটি দৃষ্ট। নাজিবাহিনী জার্মান ঘরে জোর করিয়া দেওয়াল ভূগাম করিতেছে। শত্রুর মাজেও যুদ্ধ আরম্ভ করিতে দ্বিধা বোধ করবে না, এবং ফলে ইয়োরোপেও তাগুব আরম্ভ হবে এবং সেই সুযোগে হতভা জাতিগণ ঋষিভয়ে প্রবৃত্ত হতে পারে। এটা খুব সম্ভব জাম্বানীকে ইহুদি ক’রে বলা হয়েছে কারণ ইটালীর সন্দেহ যে সে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ মাতুলে সেই সুযোগে জাম্বানী ওল্লিয়ায় হানী দেবে।

এখন কি ইটালীও আক্রমণ করতে পারে। এই জন্তে ইটালী বহু যুদ্ধের সীমানা থেকে সৈন্য সরিয়ে জাম্বানীর সীমানায় মজুত করেছে।

জাম্বানী যে অত সৈন্য ও শস্ত্র বৃদ্ধি করেছে তা’রও স্মৃতি হচ্ছে। কিন্তু নাজিদের “যৌবন জলতরঙ্গ বোধিবে পরিত্রি হচ্ছে যুদ্ধ। সম্ভ্রতি সে সে-রকম মনোভাব কে?”

ব্যস্ত করছে না, এখন সে ইহুদী ও ক্যাথলিক দলনেই মেতে আছে। এ তাগুবে জাম্বানীর অর্থ-সুচিব বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ও বলেছেন এতে শিরবাসিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু নাজিদের “যৌবন জলতরঙ্গ বোধিবে পরিত্রি হচ্ছে যুদ্ধ। সম্ভ্রতি সে সে-রকম মনোভাব কে?”

## জামাষ্টনী

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

## বুলন-পুণিনা

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্পষ্টা উজ্জ্বল চাহে ছুঁইতে তখন  
অত্যাচার ভেঙ্গে ফেলে সীমার বাঁধন  
শব্দহীন শুদ্ধ ব্যোম তরঙ্গ নিধর  
ভয়ে হির নাহি নড়ে বিশ্ব চরাচর।  
সকল সৃষ্টির আঁবি করে বর স্রব  
বেদনা-চূর্ণিত বুক গুমরে কাতর  
অপমান লাঞ্ছনার বিড়ম্বনা ঢাকি’  
ক্লম স্ববিনিকা আসে অন্ধকার মাঝি’।  
বিলেক অশ্রুটাবাক ধর্ম কম্পমান  
বুদ্ধি, অস্ত্র অচেতন, মান অপমান,  
মাধু কাঁদে উদ্বেলিত আন্তের চাঁৎকার  
আঁহি জাহি নিকুপায় ডাকে বাববার  
নিঘিলের অশ্রু আর বেদনার তুপে  
জামাষ্টনী দ্বিতস্তস্ত আছে যুগ ব্যোপে।

অশ্রুত গিরির বব শ্রাবণের দ্বারা  
গোতদ্বতী মন্তগতি পাগলের পারা  
গুরু গুরু দেখা ডাকে দুর্ক দুর্ক বুক  
উতল বাদল বায়ে—শিহরল সুখ।  
বৃষ্টি জাতি মল্লিকা মালতীর মালা  
পেলব পরশদ্বিত প্রাণে আনে জালা।  
গুমস্ত জ্যোছনা যেন এলায়ে বসন  
দ্রথ নবনীত ভহু ছাড়ে চন্দ্রসান  
কমল কাননে বন্দী প্রতিদ্বন্দী হাসি  
হেরি শশী মনকেতে করে সুস্মারশি।  
কদমকেতকী রেণু পাগল হাওয়ায়  
মাতাল করেছে দ্বরা আশায় ক্রমায়  
অশ্রু-কম্প-পুলকের রোমাঞ্চ-বোলায়  
সারা বিশ্ব উলমল, সুলন দোলায়।



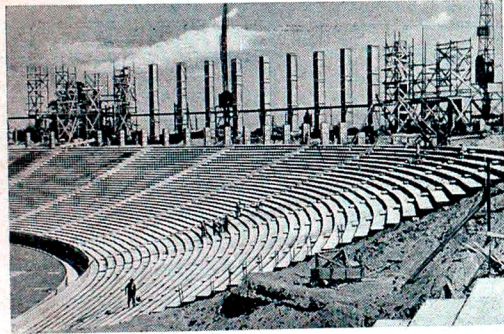


## শ্রীকৃপাচার্য্য

### অলিম্পিক প্রতিযোগীতা

১৯৩৬ সালে বার্লিনে যে অলিম্পিক প্রতিযোগীতা হবে কর্তৃপক্ষ তার সাফল্যের জন্ম সঙ্গপ্রকারেই চেষ্টা করছেন। গত অলিম্পিক প্রতিযোগীতা লস এঞ্জেলেসে

করবারও যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের যোগাযোগ স্থাপনও এই বিরাট উৎসবের অঙ্গ। অলিম্পিক স্টাডিয়ামের নিম্নের অংশ প্রায় শেষ হয়েছে। এর পরই উপরের কাজ শুরু হবে। উপর ও নীচের প্যানা-



রীতে কোন সঙ্গর্গ থাকবে না এবং এতে দর্শকদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। এক এক আশে ৪১টি করে সারি থাকবে। পার্শ্বে ছবি দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন কী বিরাট স্টাডিয়াম তৈরি হচ্ছে।

১৯৩৬ সালের ২০শে জুনর তেজর ধারা এই অলিম্পিক

হয়েছিল ১৯০২ সালে এবং প্রতিযোগীতার নিষ্ফল গভী ছিল-১৪টা। কিন্তু বার্লিনে মোট ১৯টি বিষয়ের প্রতিযোগীতা হবে। কিছুদিন আগেও বার্লিনের উপকণ্ঠে যে বিরাট কাজগা ওধু বন ও বিলে পরিপূর্ণ ছিল, ধীরে ধীরে তা একটা সুদৃশ্য সহরের পরিবর্তিত হচ্ছে। যে বিরাট স্থানবাণী অলিম্পিক স্টাডিয়াম হবে তা অনেক ছোট খাট সহরের চেয়ে কোনও আশে কম হবে না। স্টাডিয়ামে প্রয়োজনীয় জিনিস সবই থাকবে। ক্লাব, সেকান ভোজনালায় সবই। আমোদ উপভোগ

প্রতিযোগীতার যোগদানজ্ঞ, তাদের নাম অলিম্পিক অর্য়ানাইজিং কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। ১৬ই জুলাই-এর তেজর কোন প্রতিযোগী কোন বিষয় প্রতিযোগীতা করবেন তার বিস্তৃত বিবরণ অর্য়ানাইজিং কমিটির কাছে পৌছান চাই। নচেৎ অর্য়ানাইজিং কমিটির পক্ষে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়াবে। অনেকে এর মতোই মোটামুটি ভাবে তাদের নাম পাঠিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র যোগবা করয়েছ, ওখান থেকে ৩২৭জন প্রতিযোগী খুব সম্ভব বার্লিন

তার-১৩৪২]

শ্রীকৃপাচার্য্য

১৩৪২

অলিম্পিকে যোগদান করবে। জাপান বলছে ২৩০জন প্রতিযোগী সে পাঠাবে। সুইডেন থেকে ২২৫ জন, হাঙ্গেরী থেকে ২৪৮ জন, সুইজারল্যান্ড থেকে প্রায় ১০০ জন, পোলাও থেকে ১০০ জন, বুলগেরিয়া থেকে ৭৪ জন, গেক থেকে ৪২ জন, এবং ইষ্টনিয়া থেকে ৫৬ জন প্রতিযোগী বার্লিনে অলিম্পিক প্রতিযোগীতার যোগদান করবে মোটামুটি দেওয়া হয়েছে।

একশে প্রধান সমস্ত এই দাঁড়িয়েছে যে এক এক রাষ্ট্র কতজন করে প্রতিযোগী পাঠাতে সক্ষম। পূর্বেই বলেছি লস এঞ্জেলেস-এর চেয়ে বার্লিনের অলিম্পিকে পাঁচটি বিষয় অধিক থাকবে। এবং মোট ১৯টি বিষয়ের মধ্যে পুরুষদের জন্ম ৬৮টি একক (Individual) ও ৩০টি মিলিত (team-contest) প্রতিযোগীতার বিষয় থাকবে। মেয়েদের জন্ম ১২টি একক ও তিনটি মিলিত প্রতিযোগীতা থাকবে। মোটের উপর প্রতিযোগীতার বিষয় হল ১১৬টি। সুতরাং বিষয় নির্বাচন মত এক এক রাষ্ট্র কতজন করে প্রতিযোগী প্রেরণে সক্ষম তা নির্ণয় করা হবে। ধরন, যেমন মাতার, ঘোড়ায় চড়া, বর্শা, শৃঙ্গ ইত্যাদিতে তিনজন করে, তার উত্থাপনে দু'জন করে, সাইকেল চড়া, বল্লম ইত্যাদিতে একজন করে থাকবে। মোটের উপর দেখা যায়, যে, এক এক রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে ৩১৯ জন পুরুষ ও ৫২ জন মেয়ে প্রতিযোগী পাঠাতে পারে। তাছাড়া রিজার্ভ হিসেবেও প্রতিযোগী থানা খুবই দরকার। কতজন রিজার্ভ হিসেবে নেওয়া চলে অলিম্পিক কমিটি তাও নিয়ম করে দিয়েছেন। ফুটবল প্রতিযোগীতার ২২ জন অর্থাৎ দ্বিগুণ প্রতিযোগী নেওয়া যেতে পারে।

যে সব রাষ্ট্র যোগদান করবেন বলে ইচ্ছা জানিয়েছেন (এ পর্যন্ত ৪৮টি রাষ্ট্র থেকে সাজা পাওয়া গেছে) তাদের পূর্ব দল এক মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫০০ জন। কিন্তু পূর্ব দল নিয়ে আসা অনেকেই গক্ষেই হয়ত শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হয়ে উঠবে না, তবুও ৫০০০ জন প্রতিযোগী যে যোগদান করবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

বিচারকরা কী করবেন? তাই স্থির হয়েছে, চূড়ান্ত দল নির্ণয় জন্ম প্রথমতঃ ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া হবে। এতে পরে ছবি দেখে বিচারকের দল স্মৃতি শোধরান যাবে। তাছাড়া ইলেকট্রিকের সাহায্যও নেওয়া হবে।

### অট্রিয়া

অট্রিয়া ও জার্মানীর তেজর স্পোর্টিং মত নিয়ে খুবই গোলযোগ চলছে। আসছে বছর অট্রিয়া বার্লিনে অলিম্পিক প্রতিযোগীতার যোগদান করবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

### টেনিস

সমগ্র বিশ্বের ১৯২ টেনিস ষ্টার কে জানেন? তিনি হচ্ছেন রুটেনের মিঃ পেরী। কিন্তু টেনিস জগতে মিঃ পেরী খুব জনপ্রিয় নন। নিউ ইয়র্কের "লিটারারী ডিজেষ্ট" সম্প্রতি এ সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। মাথায় একরাশ কালো চুল, দীর্ঘ দেহ পেরী। সোনালী চুলের অধিকারী, যুক্তরাষ্ট্রের উদীয়মান খেলোয়াড় মিঃ ডোনাল্ড বাজ, এ চুরের মধ্যে মিঃ বাজই সকলের নিকট অধিক প্রিয়। শুধু উইম্বলডন খেলার জ্ঞান না থাকাতাই এই উদীয়মান বিশ্ব বর্ষীয় খেলোয়াড় উইম্বলডন প্রতিযোগীতার জয়ী হতে পারেন নি। কিন্তু এর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ২৯২ টেনিস ষ্টার মিঃ অটিনকে পরাজিত করে মিঃ বাজ সত্যিই এক চাক্কলোর সৃষ্টি করেছিলেন।

৬ ফুট ১ পাঁচ লম্বা, মাথায় সোনালী চুল সুগঠিত দেহ, ২৬৮ ইঞ্চি ওজন মিঃ বাজ যখন স্কুলের ছাত্র তখন তার আভার কাছেই টেনিস খেলা শিক্ষা করেন। তারপর নিজ অধ্যবসায় ও প্রতিভার জোরে আজ মিঃ বাজ যুক্তরাষ্ট্রের একজন নিকাচিত খেলোয়াড়। ওকল্যান্ডের এক খেলাটিং দোকানে তিনি চাক্করী করেন। খুব প্রিয় খেলা হচ্ছে কিন্তু বাজের বল।

### ভারতীয় হকিন্স

হকি খেলার ভারতীয় দল অজ্ঞে এবং নিউজিল্যান্ডে নিময়িত হয়ে ভারতীয় দল হকি খেলায় যে রেকর্ড সৃষ্টি



করেছে তাতে তার পূর্ণ পৌরষ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ভারতীয়দলের ক্রীড়া নৈপুণ্য আজ বিশ্ববাসী নূহ। সকলে মুগ্ধকণ্ঠে স্বীকার করছে সংগ্র পৃথিবীতে হকি খেলায় শ্রেষ্ঠ সেক্টর-ফরওয়ার্ড ধ্যানচাঁদ ও রূপ সিং দুই তাই।

নিউজিল্যান্ড সর্বশক্তি মোট ২৮টা খেলা হয়েছে। তার ভেতর ভারতীয় দলের পক্ষে ৩৫৩টি গোল ও বিপক্ষে ২৩টি গোল হয়েছে। ভারতীয় দলের রূপ সিংই একা ১৫৪টি ও ধ্যানচাঁদ ১৩৩টি গোল করেন।

ভারতীয় দল এখন ফিরবার পথে এবং সকলেই ভারতের মাটি স্পর্শ করবার জন্ত উদ্গ্রীব। ১৭ই আগস্ট মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলা “মোরটনবে” জাহাজ ধরে এরা ভারতে রওনা হয়েছেন।



এম

এবছর ক্রীকেট খেলা নিয়ে ইংলণ্ডে বহু ব্যক্তিগত ব্যক্তি হয়েছে এবং তার প্রধান কারণই হচ্ছে চতুর্থ টেষ্ট খেলাকে কেন্দ্র করে। মিঃ ওয়াটের পরিচালন নীতির তীব্র সমালোচনা আর বিস্তর সন্দেহই করেছেন। ক্রীকেট জগতে ইংলণ্ডের স্থান বহু উচ্চে। হবস্, স্টার্লিফ, হ্যামণ্ড, জার্নিন, আর্থার্স, প্রভৃতি খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ইংলণ্ডের ক্রীকেট দল সর্বশক্তি তার জয়যাত্রা উজ্জীন রেখে চলে এসেছে। কিন্তু সম্প্রতি এর বাতিল হতেছে। অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি সকলের কাছেই ইংলণ্ড ইদানীং পরাজিত হচ্ছে। এর কী কারণ হতে পারে তাই গবেষণা কর্তে বের “ম্যাকলটার”, “ওয়াচম্যান” প্রভৃতি পত্রিকা নব্বয় করেছেন পুরাতনকৈ আকৃষ্ট থাকলে এখন আর চলবেনা। নূতন খেলোয়াড় তৈরী করে তাদের স্থানো দিতে হবে। নাচেং ইংলণ্ডকে ক্রীকেট প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের যে কালিমা বহন কর্তে হচ্ছে তা কখনও ঘূরেনা।

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে চতুর্থ টেষ্ট খেলায় মিঃ ওয়াটের পরিচালন নীতিকে অনেক মনে করেন মিঃ ওয়াট ও এ বছর তাই করেছেন। চতুর্থ টেষ্ট খেলায় ফল হয়েছে “ডু”, কিন্তু মিঃ ওয়াট যদি “বোলিং” পরিবর্তন কর্তন, কিংবা ইনিংস আরও পূর্বে শেষ বলে ঘোষণা কর্তন

তাহলে হয়ত দক্ষিণ আফ্রিকার “ডু” করার স্থানো কখনও হত না। কারণ প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের রাই দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে বেশী ছিল।

স্বতরাং পঞ্চম টেষ্ট খেলার ফলাফলের জন্ত সকলেই উদ্গ্রীব ছিল। সিলেট কমিটি স্থির করলেন, যেই বোলিং হলে দক্ষিণ আফ্রিকা যথাস্থিতি কর্তে অধ

ধন বোলার পরিবর্তন করা হবে। তা ছাড়া খেলায় তিন দিনের। স্বতরাং রানও যাতে তাড়াহাড়ি হয় এমন ব্যাটসম্যানও নির্ধারিত করা হবে। পরিশেষে মিঃ ওয়াটই ক্যান্টন হলেন এবং দলে নির্ধারিত হলেন বেকওয়েল, মিচেল, হ্যামণ্ড, ব্রোয়াড, এমস্, নিকলস্, রবিন্স, ক্লে, রিড্ ও স্কোয়া। এদের ভেতর টেষ্ট খেলায় প্রায় সকলেই নরাগত এবং ফাট বোলার।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা জোর বোলিং হলেও কার্যকরাসে তাই তার শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম তাই প্রমাণ করলো। এত পরিবর্তন, এত হেঁচক, তবুও প্রথম ইনিংসে ভূতের রাগ হল যেটা ৪৮১। মি, মিচেল ২৬৬ রাণ্ড, ওয়াচম্যান ১১৭ রাণ্ড তোলে। তারপর ইংলণ্ড দল ব্যাট করে ৬ উইকেটে ৫৩৪ রাণ্ড তোলে। এখন আউট না হয়ে মোট ১৪৮ রাণ্ড করে। এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা ৬ উইকেটে ২৮৭ রাণ্ড করার পর খেলা শেষ হয়।

ইংলণ্ডের রিড্ ও ভোসের বোলিং চমৎকার হয়েছে। রবিন্সও মদ্য করে মি। এরা তিনজনেই ফাট বোলার। দক্ষিণ আফ্রিকার ড্যাটলন ও ভিনসেন্টের বোলিং ভাল হয়েছে।

### অস্ট্রেলিয়া টিম

বোয়াই ক্রিকেট কনটোল বোর্ডের সভায় অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট টিমের ১৯৩৫-৩৬ সালের ভারত ভ্রমণের নিম্নরূপ সূচিকা গৃহীত হয়েছে। বাঙ্গলার কোন সিদ্ধান্ত এখনও পাওয়া যায় নি বলে এবং কোয়ার্টার্স ক্রিকেট মাঠের ভাড়া এর সমাজ পরিবর্তন হলেও হতে পারে।

২৩শে অক্টোবর—কমোরিন জাহাজ বোয়েগে কলোথোতে অবতরণ। ২৫, ২৬ এবং ২৮শে অক্টোবর—মিল্ল দলের সঙ্গে খেলা। ৩০শে অক্টোবর চিক্সাল জাহাজ বোয়েগে কলোথো ত্যাগ। ১লা নবেম্বর বোয়াই ত্যাগ। ২রা তারিখ বোয়াই ত্যাগ করে ওরা রাজকোট পৌছবে। ৪টা—৬ই নবেম্বর পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে খেলা (রাজকোট)। ৮ই নবেম্বর

জামনগর পৌছবে। ৯ই, ১০ই—জামনগর দলের সাথে খেলা। ১৩ই করাচী পৌছবে। ১৪ই—১৭ই শিবপুর সঙ্গে খেলা। ১৭ই—করাচী ত্যাগ। ১৮ই—লাহোর পৌছবে। ২০শে—২১শে নবেম্বর দক্ষিণ পাকিস্তান ও অমৃতসরের মিলিত দলের সাথে খেলা। ২৩শ থেকে ২৪শে নবেম্বর—এন আই সি এর সঙ্গে খেলা (লাহোর)। ২৬শে—পাতিয়ালা পৌছবে। ২৭শে—২৯শে নবেম্বর রাজকোট জিমখানার সঙ্গে খেলা। সেখান থেকে ২রা ডিসেম্বর আজমীর পৌছবে। ৩রা—৫ই ডিসেম্বর বনাম রাজপুতানা ও মধ্যভারত দল। ৬ই—গুজরাট পৌছবে। ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর বনাম গুজরাট। ৯ই তারিখে পুণা পৌছবে। ১০ই—১২ই ডিসেম্বর বনাম মারাঠা। ১২ই বোয়াই যাত্রা। ১৪ই—১৬ই বনাম বোয়াই প্রেসিডেন্সী। ২০শে—২৩শে ডিসেম্বর বনাম ভারতীয় একাদশ দল (বোয়াই)। ২৫শে ডিসেম্বর কোলকাতায় পৌছবে। ২৭শে—২৯শে ডিসেম্বর বনাম বঙ্গদেশ ও আসাম। ৩০শে ডিসেম্বর—৩রা জানুয়ারী (১৯৩৬) বনাম ভারতীয় একাদশ। ৪টা জানুয়ারী কোলকাতা থেকে কাশী পৌছবে। ৫ই—৭ই জানুয়ারী বনাম ভিক্টোরিয়া একাদশ। ৮ই জানুয়ারী আগ্রা পৌছবে। ৯ই, ১০ই জানুয়ারী (অষ্টক দিন) বনাম যুক্তপ্রদেশ। ১০ই জানুয়ারী দিল্লী পৌছবে। ১১ই—১৩ই জানুয়ারী বনাম ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাব। ১৬ই—দিল্লী থেকে লাণপুর পৌছবে। ১৮ই—২০শে জানুয়ারী বনাম মধ্য প্রদেশ ও বেয়ার। ২২শে—সেকেন্দ্রাবাদ পৌছবে। ২৩শে—২৬শে জানুয়ারী বনাম মৈসুরের একাদশ। ২৮শে—সেকেন্দ্রাবাদ থেকে বাঙ্গালোর পৌছবে। ২৯শে—৩০শে জানুয়ারী বনাম মইশুর। ৩১শে—মাত্রা পৌছবে। ১লা—৩রা ফেব্রুয়ারী বনাম মাত্রা প্রেসিডেন্সী। ৭ই—১০ই ফেব্রুয়ারী বনাম ভারতীয় একাদশ (মাত্রা থেকে খেলা)। ১১ই—মাত্রা ত্যাগ। ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলোথো পৌছবে। ১৫ই বিয়া ১৬ই ফেব্রুয়ারী সিডনী অভিমুখে যাত্রা।

### ক্রীকেট

টেষ্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ী হয়ে “রাবার” পেয়েছে। মোট পাঁচটি খেলা হয়ে। তার ভেতর চারটি খেলায় ফল হয় ডু—আর একটিতে “আফ্রিকা ৩৫৬ রানে জয়ী হয়। তাই এ বছর “রাবার” পাবার সৌভাগ্য দক্ষিণ আফ্রিকারই হল।



## আমাদের কাব্য

শ্রীঅমূল্য রতন ভট্টাচার্য্য

মোলাপের পাণ্ডিভে সকলের সবিতা  
লিখিছে যেমন করে বর্ণের কবিতা,  
ছন্দ তাহার কাপে কিশলয়ে পত্রে,  
নদীজলে সাবলীল লহরীর ছত্রে,—  
অমনি সে হয়ত বা আমরাও কাঁপব  
ভেবেছিহু লিখি যদি আমাদের কাব্য।  
তাহারি দ্রুদাশা নিয়ে রোজই আমি প্রিয়া গো  
বোধনের স্তর সাধি বাঁধিখানি নিয়া গো।  
তোমারি ও হৃদয়ের তমিমার মিনারে  
যে ঘুমা'তে ছিল—সেই অন্তর নীনারে  
চুমিয়া জাগায়ছিহু;—প্রভাতের অলিরা  
চুমে ও যেমন করে দল খোলে কলিরা।  
আমার বাহুর মাকে কম্পিতা অকারণ  
করেছিহু অন্তর তব হৃদকম্পন।  
তোমার জয় বীণা, আমারি এ বেণুতে।  
একই সুর বেঁধেছিহু বনফুল বেণুতে।  
আয়োজনে কাটে রাত, প্রভাতের ধরণী  
সম্মুখে আঁকা তার বক্ষিমল্লরগি,—  
জাক দিল,—বাহিরিয়া আসিলাম আমিও,  
বলে এহু প্রিয়তমে কাল থেকে জানিও

স্বরূপ হবে আমাদের জীবনের কবিতা;—  
উভয়ের প্রেমে আঁকা একখানি ছবি তা'।

প্রভাতে করেছে নাকি সে রজনীগন্ধা,  
তুমি শুধু একাকিনী—হৃদয়ী সন্ধ্যা।  
স্তিমিত করিয়া আছ সূর্যের দীপটি,  
আবছায়ে দেখি শুধু সিঁদুরের টিপটি।  
আবার ফুটা'তে হবে কলিকারে গন্ধে,  
সুরেতে জাগা'তে হবে বাঁশরীর রঙ্গে;  
'ভালবাসি'—শ্রুতিতে সে আজো হবে সাধিয়া  
কপোলের তলে যুহ অশ্রু লিখা দিয়া।  
ডাকিয়া জাগা'তে হবে কুমারী অনচ্ছা  
রহস্যময়ী তুমি যে রমণী,—ধছা।  
পরদিন এসে দেখি আগেকার চিহ্ন  
কোথা আর কিছু নাই এক তুমি ভিন্ন।

জীবনের পরিচয় রহিল তা' স্বপনে,  
আজিকার চুম্বন আঁকিলাম গোপনে।  
কালও জানি ভূমিকার দুয়ারেই ভাবব—  
“অশেষের সুর নিয়ে আমাদের কাব্য।”



আমি সন্দর্ভে যে হৃদয়ী এ কথা পুঙ্কট অধীকার  
কোবোনা। কিন্তু “এইটু বেলুন” ছবিতে তাকে  
আরও হৃদয় দেখাচ্ছে।





ପ୍ରାଣ ମ ପ୍ରାଣେ ଓ ମୁଖେ ସ୍ବାସାନ୍ତି ଶୁଭେ ନାମ ଶୁଭେ ।      ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଦେ ନମଃ ।  
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଦେ ନମଃ ।      ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଦେ ନମଃ ।



1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------





‘কপাল’, ‘বুদ্ধা’—ইন্দ্রিকা দেবী ‘স্বপ্ন-পথের’ নায়কী ‘হিঁড়’ আবার  
হাঘার মায়ায় বরা কিয়েছেন। রাধার উদ্ ‘ছবি’ ‘গ্যামক’ এক প্রাণী-  
ইনি ‘সেভেচেন’ নাটিকা।

# কপ হাঘা

পরাগ পাল

এটা ১৯৩৫ সাল। আজ থেকে আমরা  
পনারো বছর পেছিয়ে যাব। তখন সে  
একটা যুগ ছিল; লোকে এমন ধারা ছায়া-  
চিত্রের ভক্ত হয়ে ওঠেনি। ‘সিনেমা ক্যান’  
কি ‘স্যানমেল’ এসব কথা আমাদের দেশের  
লোক এমন করে শোনেনি। সেই যুগের  
‘হাঘেরী’-র পাতা  
ফুলে দেখা যায় মেট্রী  
ক্রেসলার রোজ পঞ্চাশ-  
খান করে প্রেম পাত্র  
পাচ্ছেন, আর, শ্রীমতী  
সে বসনকে তখন  
পোন বুদ্ধ মন্ত্রী ‘বল’  
নাচবার জুছে  
জাক ছে না। সেই  
১৯২০ সালে, পুঁবি  
কেলসার তখন দেশ-



উপরের ছাড়াই মেয়েট  
হাঘেন, মামোগামের  
‘সেন্সেশন হাটার’  
চিত্রের অভিনয়ী।

মাগরের পারে

সেই সময়ের সব চেয়ে বড়  
রোমান্সের খবর হচ্ছে ‘লুইস হক’  
আর এডুইন স্টিলম্যান-এ। সেদিন  
আমরা খবর পেয়েছি যে তাঁরা

বোতা নাম—ও-দেশের লোকেরা, ছেলেদের আদর  
বসন্ত করতে কি তাদের নিয়ে মেলা করতে করতে  
বিদ্য কোন ছেলেকে ঢালাক বলতে গিয়ে তার নাম  
বলে ফেলত। সেই ববি কেলসাকে ছবিতে নামান  
কি ছিঁদর। পরিচালনা করছিলেন তিনি (“বি জ্যাক

স্বামী স্ত্রীতে এখনও বেচে আছেন, স্বামী এডুইন স্টিলম্যান  
এখনও স্ত্রীকে রোজ আদর করেন।  
লোকে বলে সেই সময়ে মিড্লেডু, ডেভিস-এর  
স্থান নিয়েছেন বেব ডেনিয়েলস; যাকে বর্ষে  
উদ্ভাবিকারী তাই। বৃষ্ণন, সেই পনারো বছর





উপরে : ঘর্মী ব্রিটিশের উদ্ভূত তারকা শেরী ডিফেন্ডেন—  
এক দশক একদমি সামাজিক ভিত্তি দেখা যায়  
বামে : বেটা ফারারসের সমুদ্র স্নান সবচেয়ে শুভ দশ।  
এর জন্মে নানারকম তার পোশাক আছে—যার  
সে পোশাকটি সে পর হয়েচে—সেইটাই কিন্তু  
তার সবচেয়ে পছন্দসই।

আগে বেব ডেনিয়েলস তার জায়গা দখল করেছিলেন। তার  
পর অনেক বছর ধরে বেব ডেনিয়েলস সেট মশের রাজত্ব  
অধিকার করে ছিলেন। একটা কথা বলে দেই, নিজেই  
ডেভিস্ হেরল্ড লয়েডের স্ত্রী হয়ে ছায়ার মায়া কাটান।

ম্যাক কেনেডি, আলিস্ জর্জি (এখন জেমস্ ব্রিগারে  
স্ত্রী), রিবি এ্যাডেল্টা, ডব্লিউ মে, আর মেদী মাইলস্ মিলটার—  
এঁদের দক্ষিণ দ্বীপের মাজুপরা ফ্যানাস ছিল।

জিমি বোভাস্ (উইলার ছেলে) তখন বাপের সঙ্গে “জেম্  
কল মি ভিড”-এ অভিনয় করে ভ্রমক নাম কিনেছিল।  
সে বছরের নাম-করা ছবি “রোমান্স”, এতে অভিনয় করে-  
ছিলেন ডব্লিউ কিনি, বেসিল সিডনি, নরমান ট্রেন্ট। আর  
“দি ডার্ক মিরর”-এতে ছিল ডব্লিউ ডেন্টন। আরো  
জুথানা ছবি “দি সিলভার হোর্ড” আর “দি ক্র্যাগার”—সেই  
বানায় ছিলো অলিভ টমাস।

আরো পাঁচ বছর পরে। অর্থাৎ দশ বছর আগে। সেই  
১৯২৫ সালে। তখন ছায়া-চিত্রের চমক আমাদের চোখে



উপরে : যুবকী আনা টেন, এর আশ্রয়ী আকর্ষণ থারী কুপারের  
বল্লভ গ্রাম পোজডাইনের “দি ওয়েডিং নাইট।” দক্ষিণে : নতুন নতুন  
হা-বেবের পোশাক পরে মেদী কারলিসলীজ টেনিস খেলা  
হচ্ছে একটা ‘হাবি’। ছবিখানা দেখলেই সেটা আশ্রয়ী বেশ  
অস্থান কোরতে পারবেন।

যা দিয়েছে অনেকখানি। সে সময়ে ক্যামেরা-সৌন্দর্য  
এখনকার চেয়ে একটু বিকির ছিল। সেই দশ বছর আগে  
যেযেদের কাল কুচ কুচে বিখ্যাত কাল আর বাপমীতে মেদা  
চোখ আর বাল বিখ্যাত বাপমী চুল এবং যার উচ্চতা হোত  
পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি ও ওজন হোত একশ বিশ পাউন্ড  
তিনিই হতেন ক্যামেরার চোখে সৌন্দর্যের রাণী। আর আজকের  
দিনে ক্যামেরা হল হবে যাদা রঙের চেয়ে ঘন রং ভালবাসে,  
তা হলেই হোক আর শ্রামাস্ত্রীই হোক। তখনকার দিনে  
দৃশ্যন মেয়ে পর্দার সন্দরী বলে নাম কিনেছিলেন—ক্রোয়েল  
জিড, থ্রেট মিসেস, মে এলিসন, করিন গ্রিফিথ, মিট লাভি,  
মেরি এন্ডার্স, বারবারা লা যার, পোলা নেগ্রী, মে ম্যাকডয় ও  
এলিস টেরী। এঁদের নিয়েই যত ‘ফ্যান-মেসে’র হাডো-হাডী।  
কত ব্যবসায়ার, কত ব্যাপারিয়ার, কত বোনদি ঘরের ছেলে  
জন্মবাসা পাবার জন্মে এঁদের দরজায় হানা দিতেন।

তাঁর পর মেদী গিকফোর্ডের দিন—বিশ্বের প্রিয়তমা তিনি,  
যে বছর তাঁর নাম। দোকানে, ড্রয়িং-রুমে, কলজের ছেলেদের  
পকেটে ধাক্কা তাঁর ছবি। মারা বিশ্ব যখন তাঁর দিকে







ডু স্টেটন শ্বেরের আত্মীয় অভিনেত্রী। ছবিতে অভিনয় করার কাজে শরীরের দিক ঐর নকশ দশ চেয়ে দেখি।

তাকিয়ে থাকত তিনি তখন ডগলাসের কোলে চড়ে বসতেন—‘ডাগিং’। সেই সময়ে একদিন আমেরিকা চমকে পেলো—সারা জগৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো ভয়ে, বিস্ময়ে। রোজ হাজারে হাজারে চিঠি পড়লো মেরীর বাড়ি, কাতারে কাতারে লোক ছুটলো তাঁর দরজায়। ব্যাপার কি?—মেরীকে নাকি চুরী ক’রে নিয়ে যাবে আর ছুটি হাজার ডলার গুণে সেই দম্ভাদের হাতে না দিতে পারলে তারা মেরীকে চিরজীবনের মত বন্দী করে রাখবে। উঃ! আমেরিকার সে কটা দিন কী বিশিষ্ট কাল! ব্যাপাস ডগলস। নইলে...

১৯২৮ সালে রিচার্ড ডিঙ্গ বাজী ফেলে বসল যে তার এক বছরের মধ্যেই বিয়ে হবে। রিচার্ড তার ক’নে খুজতে উঠে পড়ে লেগে পেলো কিন্তু খোঁজা যখন তার শেষ হোল, তখন দেখা গেল ১৯৩৩ সাল হয়ে গেছে। লোকে বলে বিয়ের পর উইনস্টেড কোর গলা জড়িয়ে ধরে ডিঙ্গ নাকি বলেছিল ‘তোমায় খুঁজতে আমার ছ-ছটা বছর কেটে গেছে’। খুঁজতে থাকে এতদিন লেগেছিল ডিঙ্গ কিন্তু তাকে ততদিন ধরে রাখতে পারেনি। এই মেরিন বুঝ এসেছে সে নাকি ভাঙ্চিনিয়া ওয়েবস্টারের পলায় মালা দিয়েছে।

“দি গাল” উইনস্টেড ইট, ডবিখানায় অভিনয় করেন গলিন ষ্টার্ক। তখনকার দিনে পর্দার বুকে অত মিঠাই মেয়ে একজনও



“দিগ্ ডে বাইক রাইডারে” জো. ই. রাউন সবাইকে খুব হাসিয়েছেন।

হয়নি। সে বছরের দশ চেয়ে ভাল বই ‘গালি অব দি স ডার্ট’-এ ক্যারোল ডেম্পটা আর ডব্লিউ সি ফিল্ডস নাথক-নারিগা জিলেন। ডগলাসের ‘জু কিউ গান অব জোরো’, “সী ইজ ফ্রেড”, “ব্রাচ সাইকোন” আরো একগাং বই “সাই উইল মো দি টাউন”। এই ছবিখানার রে জি জা লু ডে নি মেরিয়ন নি কান এং লিগিয়ান টাশম্যান, এই

তিন জনেই নেমেছিলেন। বেকিভাভ ডেনির নাম অনেক দিন জায়গার থেকে মুছে গেছে। আর লিগিয়ান টাশম্যান? তার কথা আজ কেন

জা নে। সেই লি লি গান টাশম্যান যার ছবি আজও এন্ডগু লোর বুকে আঁকা আছে। তার চলা, বলা, কথা কওয়া, চোখারার স্থিতি এত-মতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মত-বিন সে বাঁচবে তাকে মনে রাখবে! রাখবে!

“বেকি সাপ” ছবিখানাকে নিয়ে ওদেশে টৈ টৈ পড়ে গেছে। এমন ছবি নাকি আর হয়নি। নানান রঙের ছবি। লক লক মুদ্রা! ফাফাফের মত উড়বে। রঙে রঙে নাথকে

দেবে। দেশ বিদেশ থেকে মো... ভা, মাল আসছে তাকে গড়ে তুলতে। লোকজন কে নেই? কেনেল



গিলি ডামিটা, ফরাসী অভিনেত্রী। এর নাম আগে সবাই জানতেন—কিন্তু এখন একে সবাই চুপে গেছে।



পলি ওয়াট বিলুভের ডাউট অভিনেত্রী। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন তাই একে চুপ বন্ধ কোরে রেখেছেন।

ম্যাকগোগারনের মত এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন প্রডিউসার ক’জন আছে? তাকে ধার করে নিয়ে এসেছে। রবার্ট এন্ডগু জোন্স, তার মত ‘সেট ডিজাইন’ করতে আর রং ফলাতে পারে কে? সেও এসেছে। এই রবার্টই “লা কুকারাজা”-র ‘সেট ডিজাইন’ করেন আর রং ফলান। আগনারা নিশ্চয়ই জানেন ১৯৩৪ সালে “লা কুকারাজা” ‘একাডেমি’ প্রাইজ পেয়েছে। মিরিয়ম হপলিন্‌স্‌ এসেছে এতে তারা হয়ে। আর মোয়েল সারম্যান! জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছবিখানা পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু আর পারলেন না। ভগবান তাকে টেনে নিলেন। প্রথম যে দিন স্কটিং আরম্ভ হোল সেই দিনই তিনি অসুস্থ পড়লেন। এত অসুস্থ বাড়ল যে ‘সেটের’ ওপরেই তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো তবু স্কটিং বন্ধ করেন নি। ডাক্তাররা বললে তাঁর গলা সারম্যান; তাঁর বিশ্রাম চাই। কারো কথা তিনি কানে নিলেন না। কাজে লেগে রইলেন। এমন কি রাতে ঘুমোতে যেতেন না; আরাম কোরায় গুয়ে থাকতেন, আর, একজন লোক বেথেছিলেন তাকে গাণিয়ে দেবার জন্ত পাছে চুলের সঙ্গে কাশি এলে তাঁর দম আটকে যায়। কিন্তু তবু তাঁর মাথের জিনিষ শুধু তৈরী হওয়া আরম্ভ হোল, শেষ হলো না। তারপর তার নিয়েছেন কয়েক মাসালিয়েন। মাসালিয়েন চিত্র-কথা লেখক গ্রাফিস এডওয়ার্ড ফারাগো-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অন্তিমায়ী





জিম হুগস্ট 'কলোমিডা'র মেয়ে। নাচে-গানে  
ইনি সম-শারদিশী।

সব বল করে নিয়েছেন। সারমাসের চিত্রাধারার  
হায়া পর্যন্ত রাখেন। সেদিন তিনি ও হুগস্টি  
ডি একসঙ্গে ইন্সফুয়েন্সি জরি পড়েন। যাক, এখন  
সেের উঠেছেন আবার মেসোজমে কাজেও লেগেছেন।

হুগস্টেন ম্যামুলিয়েন খুব চমৎকার কথা বলেছেন।  
আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কখন ম্যামুলিয়েন হুগেন  
ক্যামেরাম্যান-স্টাইলিষ্টের। আর, আইজন শ্রেষ্ঠ পরি-  
চালকের মধ্যে তিনিও অন্যতম। ম্যামুলিয়েন বলেন—  
‘রং মাস্কেসের ভাব জাগায়। বাইরের রং মাস্কেসের মনের  
রং-ও বদলে দেয়। রং-এর বদলে মাস্কেসের মনও  
বদলে যায়।’ মাস্কেসের মনে নানান ভাবের কাজ করে।  
কতকগুলো রং আমাদের রীতি-নীতি ও মারিবে এসে  
কোন কোন জিনিষের কোন কোন রকম অর্থ করায়।

যেমন লাল মানে বিপদ ও আতঙ্ক; সবুজ  
মানে নিরাপদ, শান্তি।

যেমন লাল—রোহিত বর্ণ বোকার রক্ত,  
রাগ, রেব। নানান ছায়াপাতে নানান  
রেখায় নানান অর্থ করে কিন্তু সবসময়েই  
মাস্কেসের মনে উত্তেজনা এনে দেয়।

আর সবুজ—শান্তি! শান্তি! চির  
শান্ত! ধীর! স্থির—প্রকৃতি, তরু, তৃণ।

রং-কে ধীরে ধীরে ফলাতে হবে। যাতে  
ছায়াছবিতে দর্শকের চোখে ঝলকা না  
থায়—লোকের চোখে পীড়া না দেয়।  
গল্পের মনের অবস্থার সঙ্গে মাস্কেসের চোখে  
রং ধরতে হবে। তা নয়ত অবিকেলকের  
মত রং দিলে লোকের চোখে যন্ত্রণা স্বেচ্ছা-  
ছবি সহ্য করতে পারবে না—তারে না এং  
লাগবে না।

হেলোয়াডের অভাব হলিউডে—এই!

সেখানে কেউ ওস্তাদ ‘টেনিস’ খেলতে, কেউ  
ওস্তাদ ‘বেস্ বল’ খেলতে, কেউ ‘পিং পং’  
খেলতে আর কেউ ‘ডিপবাল্জী’ খেতে। পি-  
আরে খিগ কিন্তু ক্রিকেট খেলতে ওস্তাদ।

‘হার মত ক্রিকেট হেলোয়াড হলিউডে একজনও নেই।  
সেই বাঙ্গালী টেড খেলান টুল, ক্রীক লীল চোখ,  
বাঁশীর মত নাক, ‘আর ছ’ ‘মিট ছ’ ইকি লগা চেহারা  
দেখলে কেউ ভুল করবে না যে এ অরে খিগ নয়। খিগ  
হুগেন রাইটিন-এর এক ডাক্তারের ছেলে। লেখাপড়া  
শেখেন কেমব্রিজে। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত  
কেমব্রিজের হয়ে খেলেন। পর পর তিন বছর সাসেক্স-  
এর ক্যাপটেন ছিলেন। আর ইংল্যান্ডের হয়ে স্ট্রিট  
আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলায় ক্যাপটেন হয়ে যান।  
১৯৮২ সালে প্রথম স্ট্রিজে আসেন। ১৯৮৪ সালে প্রথম  
ছবিতে নামেন—‘সিডার অর রিভেস’ থেকে আরম্ভ করে  
একে একে অনেকগুলো বইয়ে। এর মধ্যে তাঁর জীবনের  
ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা; সে গুলো আমাদের



## আমার কি মনে হয়

<p>হলিউডের ‘তারকা’দের জীবন যাত্রার যারা জানতে চিত্রাঙ্গীদেবর অনেকই ভালবাসেন। তাই আমরা হলিউডের জীবন ‘তারকা’ রাক পেনেল ও জিম হারলোর জীবন- যাত্রার প্রণালী ও তাঁদের সাফল্যের ইতিহাস পাঠকগণকে উপহার দিচ্ছি। জিমিটা ‘আরে উপভোগ্য হবে এইজন্মে যে এই পরিচয়টা দিয়াছেন উভয় ‘তার’ পরস্পর স্বত্ব। বিখ্যাত ‘হলিউড’ পত্রিকার প্রথম ছবি বোয়ার্ড।—অনুবাদক।</p>			
<p>জিম হারলো সম্পর্কে —রাক পেনেল অনুবাদক : সামসের আজাদ</p>	৩ ৩ ৩	৩ ৩ ৩	<p>রাক পেনেল সম্পর্কে —জিম হারলো অনুবাদক : সামসের আজাদ</p>

আমার সব সময় মনে হয়—জিনের চলচ্চিত্রের মধ্যে  
মহী-মূলত ধরনের চেয়ে পুরুষালী ধরনই বেশী দেখা  
যায়। একথা প্রমাণ করবার জগে যথেষ্ট সুকি দামি  
বোঝাতে পারবো কিনা জানিনে, তবে আমি তা’  
অগ্রহ করি, যখন আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করি, তাঁর  
সঙ্গে মেলামেশা করি। কেউ যদি তাঁর সঙ্গে কথা

রাক পেনেল ছাড়া আমার আর কোন বন্ধ থাকতে  
পারে এ আমি কল্পনাও করতে পারিনে। একজন  
প্রকৃত বন্ধ হওয়ার জগে যে-সব গুণ থাকা দরকার  
রাকের মধ্যে তার সবই বর্তমান।  
রাক যে কত বড় মাস্কেস তা হলিউডের আধ-ভজন  
লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। মাস্কেস তাকে যা মনে



জিন হারলো সংখ্যক

রাক পেরল সংখ্যক

বলেন তা'হলে অতি সাধারণ ভাবে তাঁর সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেন। পুরুষ মানুষ যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, নারী হয়েও জিন সে সব বিষয়ের আলাপে যোগ দেন, এটা তাঁর অজ্ঞাত বিশেষত্ব। আর সেই জন্তই তাঁর আলাপ পুরুষদের মনেও একটা ছাপ এঁকে যায়।

ছবির পর্দায় তাঁকে দেখে আপনারা হতত ধারণা করেন নেন যে, তিনি সুব বসনমলে ও চটকদার গাউন পরে অপূরণ রূপ-সজ্জার রাষ্ট্রায় বেড়াতে বের হন। কিন্তু আপনাদের জ্ঞান যাবে তেজ, যখন আপনারা তাঁকে দেখেন, ষাঁটা-মোটা গাউন ও কোট পরা ব্রিজেস ষাঁটা অথবা খেলার পোশাক পরা এক সুর্ষিবাজ তরুণীজ্ঞে। তাঁকে দেখলে মনে হয়, নিজের সৌন্দর্য সধকে তিনি আদৌ সচেতন নন।

গল্ফ জিনের প্রিয় খেলা। মাছ ধরতেও তিনি দারুণ ওস্তাদ। দেশী কথায় তাঁকে পাকা 'সেজুড়ে' বলা যায়। আর ঘোড়ার চড়ার অবকাশ পেলে ত তিনি বিশ্বরক্ষাও মান ভুলে। এই সব খেলার যখন তিনি যোগ দেন, তখন একেবারে স্ননিশ্চিতরূপে ভুলে যান যে তিনি নারী। পুরুষদের পাশে পুরুষদের মত, পুরুষদের একজন হয়েই তিনি জীবনকে উপভোগ করেন। খেলার বিষয়ে তিনি মেয়েদের মধ্যে একাই এক 'ন' হয়ে বুদ্ধিমানের মত মুক্তি দিয়ে তর্ক বিতর্ক করেন।

কথাবার্ত্তা, কোন বিশেষ বিষয়ে, অথবা নারীদের বিষয় নিয়ে তর্কে জর্জী হবার জন্মে তিনি কোনো দিন তাঁর মধ্যে নারীর বৈশিষ্ট্য সূততে দেন না। অনেক নারীকেই দেখা গিয়েছে যে, তাঁরা তর্কে জিতবার জন্মে প্রায়ই নারীর বিশেষ অধিকারের আশ্রয় নিয়ে স্রবধি পেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, জিন নারী সম্প্রদায়কে এত ছোট করে ভাবেন নি কোনো দিন।

নিরপেক্ষতা ও স্পষ্টবাদিতা জিনের জীবনের অজ্ঞতম

করে, রাক তাঁর বহু উদ্ধে। তিনি নিজের সধকে কোন কথাই কারো সাথে বলেন না,—নিজেকে 'অতিসামান্য' হিসেবেও তিনি কোন দিন চিন্তা করেন না। গার্কোর মতো যে তাঁর স্বভাব, তা নয়। তবে তিনি অপূরণ সধকে জানবার জন্ম এত ব্যস্ত যে, নিজের সধকে বলবার সময়ই পান না।

অনেকগুলি ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার ফলে তাঁকে আমি চিনেছি—এবং আমার মনে হয় ভাল করে তাঁকে চিনবার এই-ই একমাত্র উপায়,—তাকে আরি তাঁর সধকে বা বসতি; আমার মত করে থাকা তাঁকে চিনেছেন তাঁরাও তাই বলনেন।

কয়েক বৎসর আগে আমরা একত্রে প্রথমে "সিঙ্গেট সিন্ধু" ছবি তুলি। "হেলস্‌ অজেল" এর পর আমার এইটাই প্রথম ছবি এবং রাকের প্রথম উল্লেখযোগ্য ছবি। সেই সময় হতে আমরা একত্রে "রেড ভার্ট", "হোন্ড ইওর যান", এবং বর্ত্তমানে "চায়না সিং" ছবিতে অভিনয় করি। রাক সধকে আমার মধ্য এই যে, তাঁকে আগে যে বসন সুর্ষিবাজ, দারুণ, সাবাসিধে নাহয়টা দেখেছিলাম, আজও তিনি ঠিক সে বসনটা আছেন।

তাঁর কাঁধি আজ জগৎ-জোড়া। এবং এই ব্যাতি বলতে গেলে হলিউডের বিশ্বয়! রাক প্রতি নারীর আদর্শ স্থানী, বন্ধু ও প্রণয়ীর প্রতীক। কিন্তু রাক তাঁর চোখের রঙ সধকে মতটা সচেতন, নিজের রূপ-গুণ সধকে ভুলটা সচেতন নন। তাঁর ব্যাতি তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন আনতে পারে নি।

দশবৎসর আগে যে লোকটিকে তিনি সহকর্মীরূপে সঙ্গে নিয়েছিলেন, তাকে তিনি আজও ছাড়েন নি। তাকে তিনি একজন বন্ধু ও সহকর্মী হিসেবেই মনে করেন। "আমি একজন ঠোর" এবং "একজন সহকর্মী মাত্র" এই চিন্তা কোন দিন তাঁর মনের কোণে উঁকি মারে না।

রাকের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গিয়েছে।



লোরাইন ব্রীজের নাম-ডাক দেই মতা; কিন্তু সঙ্গতি মেটানোর ইচ্ছিত্তে তার গানের থালা তুলে কণ্ঠস্বর চমকে শিখলেন। তারা কানাবুলা কোবতে লাগলেন এমন মিত্রে থালা নাকি পূব কম মেয়েরই আছে। তাই হাত ছাড়া হয়ে নারীর ভগ্নতে তারা তাকে রাকী করিয়ে চুক্তি-পত্র মই করিয়ে নেন। ইচ্ছিত্তে আমের কোবতে এসে অভিনয়ী-জীবন বরণ এই বোধ হয় আশ।









রাণী কবিচাঁদ প্রসন্ন-সিঙ্গা—সেজেজেন শ্রীমতা কাননবালা।  
রাধা চিত্রের আখ্যায়িকা "পুলক-সুন্দরী" চিত্রের একটি দৃশ্য।

জিন হারলো সখ্যক

স্বাক্ষর দেবুল সখ্যক

বৈশিষ্ট্য। নারীপুরুষ নির্বিশেষে খুব কম লোককেই আমি তাঁর মত স্পষ্ট কথা বলতে শুনেছি। তিনি যা ভাল মনে করেন তাই করেন, যা সত্য বলে বিবেচনা করেন, তাই বলেন। একদিনের কথা জানি—এক মহা-অভিনেত্রীকে তিনি এক অসাধারণ রকম সুবিধা দিয়েছিলেন। অভিনয়ের এক জায়গায় মহা-অভিনেত্রী গ্রিক মত কথা বলতে পারতেন না; জিন তা লক্ষ্য করেন। তার অসুবিধা বুঝতে পেরে তিনি বলেন, একদিন আমিও অখ্যাতনামা অভিনেত্রীদের একজন ছিলাম। তাদের বিপদ আমি বুঝতে পারি। তিনি তার সুবিধার জন্তে সেই কঠিন জায়গাটা এমন করে বহালিয়ে নিলেন যে, যেচারা অভিনেত্রীটাকে আর কষ্ট পোহাতে হয় নি।

আমি কখনো জিনকে রাগতে দেখিনি। এবং যে দীর্ঘদিন আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি তার মধ্যে তাঁকে বরমোজা নী না দেখাটা কি কম কথা? এটা সত্যিই তাঁর অশেষ গুণের পরিচায়ক। তাঁর মুখের হাসি আমি খুব কম সময়ই দেখিনি। তবে মাছর দেবতা নয়, শরীর তাদের রক্ত মাংসে গড়া। তাই দৈবাৎ কোন কোন সময় তাঁকে উদ্বেজিত দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্ত? মুহূর্তের মধ্যে উদ্বেজিত জিন যেন মাটির মাছর হয়ে যান। সাধারণতঃ জিন থাকেন যেন একবারে একটা নির্মূল মাছর।

জিন মুর্খিমতী আনন্দ। অনেক কষ্টজনক কাজই তিনি প্রকৃত ক্রীড়ামাদারী ভায়ে সহ করেন। একবার একটা ছবিতে একটি দৃষ্টে আমাকে জিনের নোজা পরা-ব কাজ করতে হয়। আমি অবশ্য একাজ খুব ভাঙ্খিলোর সঙ্গেই করেছিলাম, কিন্তু জিন তা সহ করতে পারেন নি। তিনি বলেন, যে কাজ করতে হবে মন দিয়েই করতে হবে। নয়ত অভিনয়ে ক্রটি থেকে যাবে। আর একবার "রেড ডাস্ট" (Red Dust) ছবির একটি দৃষ্টে জিনকে জলভরা একটা পিপের ডুবিয়ে রাখতে হয়। জলের পিপের মধ্যে একটা জায়গা

আগে আমরা যখন "সিক্রেট সিক্স" (Secret Six) চিত্রে অভিনয় করি তখন ছবি সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা আমরা লাভ করতে পারিনি। তাই অভিনয়ে বতটুকু সতর্কারিতা লাভ করতে পেরেছি, তাতেই আনন্দ পেয়েছি এবং যে খ্যাতি পেয়েছি তাকে সৌভাগ্য বলে মনে নিয়েছি। এবং তাইনিই আমাদের দিনগুলি হ'য়ে উঠেছে আনন্দ-উছল।

এখন কিন্তু স্কার্ফ আর সে স্কার্ফ নেই। অভিনয়ে তাঁর অংশ তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ছুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন। এক কথায়, অভিনয় তিনি আনন্দ পাবার জন্তে খেয়ালের বশে করেন না, অভিনয়কে তিনি এখন তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। এবং এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্তেই তাঁর আশ্রয় সাধনা।

স্কার্ফ একজন খাটি মাছর। আমাকে তিনি একজন বন্ধু ও ভূমির মত মনে করেন। অনেকের সঙ্গে মিশতে গেলে আপনি যে নারী, এই বোধটা প্রায়ই সচেতন হয়ে ওঠে। আপনার হয়ত নিতাই মনে হবে, "নাকটা বেশ চকচকে আছে ত?" "চুলগুলো হয় ত ঠিক নেই!" "টোটা ছুটে বেশ সোজা আছে ত?"

স্কার্ফের সঙ্গে মিশতে গেলে কোন দিন ও-সব কথা মনেই হবে না। আপনার নাকে পাউডার যদি নাই দেওয়া থাকে, পুরানো এক জোড়া চটাই যদি আপনি পরে থাকেন, কি আসে যায় তাতে? স্কার্ফের সঙ্গে যে কোন বেশে স্বচ্ছন্দে মেশা যায়। এটা হয়ত খুব তৃষ্ণ দৃষ্টান্ত, কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য চের। শুধু আমি কেন, আরো অনেক মহিলা স্কার্ফ সম্বন্ধে আমারই মতাবলম্বী। আমি মনে করি, স্কার্ফের এটা একটা মহৎ গুণ।

সরল মাছর এই স্কার্ফ। একটা নারীর সহিত সাধারণ ভ্রমতার জন্ত অপগের যা করে, স্কার্ফ তাই করেন। একটা সিগারেট জালিয়ে দওয়া, একটা চেয়ার আগিয়ে দেওয়া, এসব কাজ অল্প পুরুষের করেন নারীদের উপর অগ্রহই দেখিয়ে। স্কার্ফ কিন্তু ওগুলো অতি সাধারণভাবেই করে থাকেন। Chivalry



জিন হারলো সখের

রাক পেন্স সখের

মাহুলাকে জুইয়ে রাখা, ব্যাপারটা কম পৈশাচিক নয়! তবুও, আমার মনে হয়, জিন ওর জন্ম মোটেই বিরক্ত হন নি। যখন এই ধরনের দৃষ্টে অভিনয় করতে হয়, তখন আমি বড়ই বিরত হয়ে পড়ি। কিন্তু জিনের জ্যোতি-জন্ম-মূলত মনোবিজ্ঞানী আমাকে রক্ষা করে। এগুলো তাঁর কাকির সমাজ মতো অন্য। যদি দরকার হয় তা হ'লে এই সব ব্যাপারের পুনরাবিত্তন করতে পিছপাও হন না।

আর এক সময় তাঁর খুব ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়। আবার টিক এই সময়ই “চায়না সীজ” (China Seas) ছবির এমন একটা দৃশ্য তুলবার দরকার হয় যাতে জিনকে ভিজানোই ছিল আমার কাজ। যদিও আমি তাকে যথাসাধ্য ভিজাতে রূপনতা করিনি, তথাপি তিনি আমার উপর বিদ্মুদ্বাহ অসম্বদ্ধ হন নি। অবশ্য তিনি অসম্বদ্ধ না হলেও আমি জানি, ব্যাপারটা তাঁর সেই তথ্য বাস্তবের পক্ষে মোটেই খ্রীতিপ্রদ হয় নি। দেহ তাঁর খুবই বড় ছিল তাই রক্ষা, নয়ত সর্দির সে দাফা কাটাতে তাঁর বেশ কয়েকদিন সময় লাগত।

জিন-এর চরিত্রের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য তার স্পষ্ট-বাহিত্য—একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন ঘটনা বলা হয়নি। জিন সাধারণ স্পষ্টবাদী নন, তিনি অত্যন্ত কাঠোর ও নিতীক স্পষ্টবাদী। ফিল্মের ডায়েরির, প্রযোজক, সহ-অভিনেতা—সকলের সাথেই তাঁর সন-ব্যবহার। আমার যখন “সিক্রেট সিক্স” (Secret Six) ছবি তুলি, তখন বিখ্যাত অভিনেতা ওয়াশলে বেরী জিনের অভিনয়ের কোন কোন অংশের সমালোচনা করেছিলেন। জিন কিন্তু বিনা বিধায় তাঁর মূলের উপরই ক্রীত ভাবে তার উত্তর দিয়েছিলেন। এই ঘটনা যখন ঘটে, তখন জিনের অভিনয়ের খ্যাতি এতটা ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু তবুও ওয়াশলে বেরী জিনের এই স্পষ্টবাদিতার সম্বন্ধেই হয়েছিলেন। এবং আমার মনে হয়, সেইদিন থেকেই তাঁরা পরস্পর বন্ধ-ভাবাপন্ন হন।

দেখাবার জন্ম তিনি আদৌ ব্যস্ত নন। রাকের ছবিতো তাঁর এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, এ অনেক মহিলাই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন। এটাও তাঁর কৃত-কার্যভার অত্যন্ত সোপান।

রাক অত্যন্ত সুবিত্যক; নিজের চেয়ে অপরো সুবিধার দিকে তাঁর থাকে প্রবণ দৃষ্টি। একবার আমাদের একটা ছবির জন্ম যখন রিহার্সাল হচ্ছিল, সেই সময় একটা ছত্র আমার কাছে যেন বাধ বাধে ঠেকে। আমার অভিনয়ের সঙ্গে সেটা টিক খাপ খাচ্ছিল না। রাক তা লক্ষ্য করেন। তিনি প্রায় নাবার বলেন, জিন যদি লাইনটা ওরকমভাবে উচ্চারণ না করে এই রকম উচ্চারণ করেন ত কেমন হয়? তারপর তিনি ব্যাপারটাই একটা সু-সমাধান করে দেন।

আমার মনে হয়, অভিনয়ে নিজের সাফল্য তিনি যতটা চান, আমার সাফল্যও তিনি সমানভাবে চান। রাক তা লক্ষ্য করেন। তিনি প্রায় নাবার বলেন, জিন যদি লাইনটা ওরকমভাবে উচ্চারণ না করে এই রকম উচ্চারণ করেন ত কেমন হয়? তারপর তিনি ব্যাপারটাই একটা সু-সমাধান করে দেন।

রাক স্মৃতিবাজ ও সুরসিক। অবশ্য সব সময় রসিকতার কথা লিখে প্রকাশ করা যায় না, কারো পুনরাবৃত্তিতে রসিকতা ফুটে ওঠে না। আমরা যোজা সম্পর্কে পুঁথি আলোচনা করি, কারণ যোজা চড়ে আমি খুব ভালবাসি, আর রাকও একজন পাগা পোলে। খেলোয়াড়।

রাক সব কিছুই ভালবাসেন এবং সকল শ্রেণীর লোককেই তিনি ভালবাসেন। সব লোকের উচ্চাকাঙ্খার কথা, তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী; তাদের অভিযোগ রাক মন দিয়ে শোনেন। প্রায়ই তিনি ছোট ছোট অভিনেতাদের সঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করেন। আমাদের বর্তমান ছবি “চায়না সীজ”-এ (China Seas) অনেকগুলি প্রাচ্য দেশীয় লোক কার করেছিল। রাক তাদের সাথে বিশেষ বেশ আন

জিন হারলো সখের

রাক পেন্স সখের

জিন তাঁর অন্তরে কখনো রাগ পুষে রাখেন না। হিসাব বলে কোন কিছু তাঁর অন্তরে স্থান পায় না। তাঁর যদি অগড়া করবার থাকে, যদি কিছু বলবার থাকে, ওখনই তা করেন বা বলেন; তারপর সব ভুলে যান। আমিও তাই চাই।

আমাদের প্রথম ছবির কথা ভুলতে পারিনে। সে সময়ের কথা আমার মনের দ্বারের সব সময়ই আঘাত হানবে। জিন “হেলুম এঞ্জেল”-এ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করার পর আমার উন্নতির পথে তিনি হলেন অত্যন্ত সহায়। আমার কৃতকার্যতার জন্ম তিনিই দায়ী অথচ কোনো দিন তিনি জানতে দেন নি যে আমার চেয়ে তাঁর স্বভাবই বেশী।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমরা ছিলাম একেবারে অজ্ঞ। তাই আমরা সব সময় চেষ্টা করতাম পরস্পরকে শুধরে নেওয়ার জন্ম; যাতে করে লোক জানতে না পারে যে আমরা এ বিষয়ে কত কাঁচা। আমার মনে আছে, জিন প্রতিটা দৃশ্য অভিনয়ের পর আমার জিজ্ঞাসা করতেন—“আমার অভিনয় টিক হচ্ছে ত?”

আমিও তাঁকে এই রকমভাবে জিজ্ঞাসা করতাম। জান লাভের জন্ম আর সংশোধনের জন্ম আমরা পরস্পরকে দারুণ সমালোচনা করতাম। তখন কেউ আমাদের ব্যাপারে দৃষ্টি সিত না, কারণ আমাদের খ্যাতি তখন সীমাবদ্ধ। লক্ষ লক্ষ লোকের দর্শনীয়দের মধ্যে আমাদের স্থান তখনো হয়নি। তবুও আমার পক্ষে বা বিপরীতে যে কোন সমালোচনা তাঁর কানে পড়ুক না কেন, তা আমাকে তিনি না শুনিতে ছাড়তেন না। তিনি জানতেন যে, উন্নতির এটা অত্যন্ত উপায়।

আমরা প্রায়ই কৌতুকহলে টিক করতাম যে আমরা বিখ্যাত হতে পারলে কি করতাম। জিন কিন্তু আমার এই প্রশ্ন ভালবাসতেন না, কারণ তিনি প্রসিদ্ধি চান নি কোনোদিন। বিখ্যাত হওয়ার আগেও ‘ট্রার’ হওয়ার শাখা, জনসাধারণের বাহবা লাভ অথবা আত্মপূর্ণ জীবন, এসব ছিল জিনের কাছে অর্থহীন। তিনি এই

পেতেন। তারাও রাককে দেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলত—“ভেলি নাইট মান” (Vely Nice Man!)। তাদের একজন কাঠের এক মজার গোলক ধাঁধা তৈরী করে তাকে উপহার দেয়।

আমাদের দল সব সময় ছোট ছোট অভিনেতা, শ্রমিক, কর্মচারী, নর্তকী, সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। আর এরকম ব্যবহার না করলেও কাজ করা যায় না। রাক প্রত্যেকের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন এবং সকলের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে যে এত সদয় ব্যবহার করতে পারে, একজন বন্ধুর সাথে তার ব্যবহার যে কত মধুর হবে, তা সহজেই বুঝতে পারেন।

রাক নির্ভরযোগ্য। এও তাঁর বন্ধুত্বের একটা বড় পরিচয়। আমার মনে হয়, বড় বড় সমস্যা হোক না কেন, তিনি অতি সহজে তার একটা সমাধান করতে পারেন। গোলামাল হুটি করা বা বিরক্ত হওয়া তাঁর স্বভাবের বাইরে। যে কোন ঘটনাকে তিনি সরল ভাবে দেখেন এবং কি করতে হবে না হবে তা অতি সহজেই ঠিক করে ফেলেন। তর্ক তিনি করেন না। বলতাম

তিনি চিন্তা করেন এবং কখনো অর্থহীন কথা বলেন না। রাক একজন চমৎকার অভিনেতা, এবং এইটা তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। কারণ যিনি যে ব্যবসায়ই অবলম্বন করুন না কেন, তাতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করাই তাঁর পক্ষে সর্বাঙ্গিক বড় কৃতকার্যতা। একজন সহ-অভিনেত্রী হিসেবে আমি এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারিনে। রাক প্রতি নাটকে আমার একপ্রকারে ভূমিকাশ্রিত করতেন যে, সব সময়ই আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হয়। এক কথায় তাঁর হাতে আমরা আটক থাকতে

হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, “চায়না সীজ”-এর একটা দৃশ্য আছে খুব ভাবাবহ ও চমকপ্রদ। এই দৃশ্যে অভিনয় করা খুবই দুঃসাধ্য। কিন্তু রাকের সহায়তা ও শিক্ষার ভূমিকাশ্রিত আমার পক্ষে সহজ হয়ে গিয়েছিল।



জিন হারলো সংখ্যক

ক্রাক খেলল সংখ্যক

টুকু চান, যে, যে-টুকু কাজ তিনি করছেন, সেটুকু ফেনা নিখুঁত ভাবেই করতে পারেন। এবং সেইটা পারলেই তিনি সফল।

আমার মনে হয় জিন হলিউডের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান (Comedienne); এবং তিনি এই ধরনের অভিনয়ে আরও নাম করতে পারবেন। তাঁর “বম্ব-শেল” (Bomb-shell) ছবির অভিনয়ে যে কৃতিত্ব তিনি ফুটিয়েছেন হলিউডের কয়জন ‘গার’ তা পারেন? আমি আশা করি, তাঁকে এই ধরনের ছবি তুলবার আরো সুযোগ দেওয়া হবে।

জিন চিত্রশীল ও সুবিবেচক। প্রতিদিন সকালে তাঁর ড্রেসিং হলে বহু তরঙ্গী বাজীর ভীড় জমে। তিনি কোনো দিন তাদের বাব গিরে চা, কাফি খান না। সকলকে নিয়ে দল বেঁধে যাওয়াতেই তাঁর অপার তৃষ্ণ।

এই রকম ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট বিষয় দ্বারা তিনি মানুষের মন কিনে রেখেছেন। প্রতিটা সহ-অভিনেত্রী তাঁকে প্রভা করে, তাঁকে ভালবাসে।

ছোট অভিনেত্রীদের মধ্য হাতেই তিনি এই উপরে উঠেছেন, তাই বলে পুরানো সঙ্গীদের তিনি ছুলতে পারেন নি। অখ্যাতিমানা অভিনেতাদের ভীড়ের মধ্যে তিনি গিয়ে হযত হঠাৎ পরিচিত মুখ দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন—“এই এডি, এই জ্যান্টে!”

জিনের উৎসাহ অস্বাভাবিক। এক রকম উৎসাহী মাথায় ঘুব কই জন্মায়। অথচ তিনি শিশুর মত সরল। “বম্ব-শেল” ছবির একজন সহ-অভিনেত্রী বালক তাঁকে একটা খরগোশ উপহার দেয়। তিনি এটাকে পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে, বহুমূল্য সামগ্রী উপহার পেলেও লোকে এত খুশী হয় না।

আমরা একই সময় আমাদের সাধনা আরম্ভ করি, এবং কম বেশী প্রায় একই রকম তাতে সিদ্ধান্ত করি। এইটাই হ’ল আমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ বন্ধন। এখন আমরা সেই পুরাতন সৌন্দর্যের যুগে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করতে পারি না। অল্প কথায়, আমাদের শিক্ষা

আমি যত লোকের সঙ্গে আলাপ করেছি তাতে আমি বুঝতে পেরেছি, ক্রাকের মানের দৃঢ়তা অপরিণীয়া। আপনি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন তখন এটা হয়ত আপনার চোখে ধরা পড়বে। তিনি জানান তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর গতি কোন দিকে। চিন্তার দৃঢ়তা আছে বলেই তিনি তাঁর গতি পথ ছাড়েন না কোনো দিন।

আমি দেখেছি, যে ছবিবিকার অভিনয় করা তাঁর ভাল লাগে না, সেটাকেও সাক্ষ্য অর্জনের জন্ত তিনি বিগুন প্রশ্রয় করছেন। হঠাৎ কারণে অকারণে তিনি কাজ ছাড়েন না। এক কথায়, তিনি শুধু সুসময়ের বন্ধু নন।

যাক, আমি এত কথা যে বলবুম, এর সব কথা হয়ত সম্পাদক মহাশয়ের কাছে ভাল লাগবে না, কারণ, তিনি হয়ত মনে করে বসবেন যে, আমি ক্রাকের অতিরিক্ত প্রশংসা করেছি। কিন্তু দ্বারা আমাকে জানান, তাঁরা এ-ও জানেন যে, যা আমি সত্য বলে মনগ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, তাই বলি। এবং আমার আমি বলছি, ক্রাক সকল দিক দিয়ে চমৎকার!

জিন হারলো সংখ্যক

একই স্থলে আরম্ভ হয়, একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিৎৎ একই ছবিতে খ্যাতির পথে হয় আমাদের যাত্রারম্ভ। যত এর মধ্যে আমি অল্প মহিলার সাথে মিশে অভিনয় করেছি এবং তিনিও অল্প অভিনেতার সঙ্গে একর অভিনয় করেছেন।

সম্ভবতঃ আমার এই প্রশংসা-বাণীর ফলে সাধারণের ধারণা-অনুসারে আমি জিনের তত্ত্ব-শ্রেণীভুক্ত হব। হ্যাঁ, আমি তাই। এবং আমার মনে হয় জিনকে যারা জানে তারা প্রত্যেকে আমার কথা সমর্থন করবে; কিন্তু সম্ভবতঃ আমি যা বলেছি, তারাও তাই বলবে।

# সম্প্রদায়

**রাজনীতির** পথ্য লৌহবর্ষ। নহে—অনন্তকাল বরা একই ভাবে থাকিতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পন্থারও পরিবর্তন

করিতে হইবে—একথা সর্বব্যবহার্য সঙ্গত। তাই কংগ্রেসের তরফ হইতে মন্ত্রি গ্রহণ করা হইবে কিনা বাঙ্গলায় পুনরায় এই সমস্ত নুতন করিয়া দেখা দিয়াছে বলিয়া এর

বিস্তৃত হয়—যে অবস্থায় কংগ্রেস মন্ত্রি-গ্রহণের বিরোধী হইয়াছিল বাঙ্গলায় সে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কি? প্রস্তাবিত শাসন-সংস্থার

বঙ্গলার কোনো রাজনৈতিক অধিকার বা শক্তি বাড়িয়াছে কি? বাড়ি তো নাই—বরং সাম্প্রদায়িক

বীটোয়ারা দ্বারা তাহা সর্ব ও ক্ষুদ্র হইয়াছে। অবশ্য, কথা উঠিতে পারে যে সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা সম্বন্ধে

কংগ্রেসের নীতি তো না-গ্রহণ-না-বর্জন। কিন্তু না-গ্রহণ তো বটে। এ অবস্থায় মন্ত্রি-গ্রহণের অর্থ কি সাম্প্রদায়িক

বীটোয়ারাকে স্বীকার করিয়া লওয়া নয়? থাকলহ তো বহু হইয়াছে। অতীতেই তাহার কুফল

নিশ্চিত হইয়া যায় নাই—এখনও তাহার ক্ষেত্র বিস্তৃত। অতএব ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পদলালুপতা

যোগ করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রি গ্রহণের বিরোধিতা করিলে কংগ্রেসের স্বাভাব্য অন্তঃস্থ থাকিবে।

**প্রস্তাবিত** শাসন সংস্থার যে ভাবে নির্বাচক-বর্জীর নীতি নির্দেশের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা হইতেই আর এক প্রমাণ পাওয়া যায় যে বাঙ্গলার শক্তি ও

অধিকার পূর্ণাঙ্গাঙ্গ ক্ষুদ্র হইয়াছে কিনা। সম্ভ্রান্ত বঙ্গীয় বায়্যাপক সভায় নীমা-নির্দেশক কমিটি (Delimitation Committee) সম্বন্ধে যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে তাহাতে

ও একাধিক রূপ ছিল, এই নীমা নির্দেশের ফলে তাহা ব্যাহত ও বঞ্চিত হইয়া কাউন্সিলের মধ্যে নানা দলের

সৃষ্টি করিবে মাত্র। অবশ্য নীমা-নির্দেশক কমিটি শেষ পর্যন্ত বাঙ্গলার জনমতের এই প্রতিবাদ কি ভাবে

গ্রহণ করিবেন বলা যায় না। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় এমতকর্তব্য মনে বিশেষ আশা পোষণ না

করাই বোধহয় ভাল। **বাঙ্গলায়**, বিশেষতঃ পশ্চিম বাঙ্গলায় প্রলয়-প্রাণন উপস্থিত হইয়াছে। রুটির অভাবে, খাদ্যভাবে

যাহারা তিলে তিলে মরিতেছিল তাহারা—বর্জনান ও হুগলী জেলার সেই

সকল ভাগ্যবান গ্রামবাসীদের অধিকাংশই—ধনে প্রাণে মারা গেল। কিন্তু যাহারা

রাহিল তাহাদের হুগে দুর্দশা অবর্ণনীয়। এইসব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় এ দেশের লোকের বেন

মুঠাই স্বাভাবিক—জীবনই তাহাদের পক্ষে ব্যতিক্রম। বহু দুঃখেই একথা বলিতে হইতেছে। কারণ

কতকাল হইয়া গেল ইহারতো কোনো প্রীকার হইল না! ক্ষুদ্র দেশ হইয়াও, কিই বা তার অর্থ বা জনসংখ্যা? কিন্তু সে অবশীর্ণায় সমুদ্রকে বীধ বাধিয়া ঘুরে রাখিয়াছে।

কিন্তু ১৯১৩ আর ১৯৩৫—বাঙ্গলার দামোদরের প্রলয়োচ্ছ্বাসের গতিক্রম করার কোনো ব্যবস্থা হইল না!

জনসাধারণ আত্মদের সেবার যথাসাধ্য করিতেছে ও করিবে। কিন্তু অবস্থাব্যবস্থায় যে দেশে সকলেই আর্থ ও দুঃশ্রেণীতে পরিণত হইতেছে—বিশেষতঃ

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী—সেখানে কে কাহাকে দেখিবে?

**ত্রিশস্তি** বৈঠক বার্ষ হইল। বুটেনের প্রস্তাবে এবং

দুপ্পারের সমর্থনে যে একটি ক্ষীণ সন্ধিস্থল বুনিবার চেষ্টা

হইতেছিল ইতালীর এক মাথা বাঁকুনিতে তাহা অকার্য



হিন্ন হইল। এখন শেষ আশা সোপেঁখরের প্রথমে রাষ্ট্রসম্মেলন আশোপে চেষ্টা। কিন্তু ইতিপূর্বে এইরূপ ব্যাপারে—অর্থায় যেখানে দুইপক্ষের মধ্যে এক পক্ষ প্রবল ও আর এক পক্ষ দুর্বল—রাষ্ট্রসম্মেলন আশোপে-চেষ্টা চিরদিনই ব্যর্থ হইয়াছে। অতএব এক্ষেত্রেও বিশেষ সফলতার আশা না রাখাই ভাল। এবং তাহা হইলে অস্ত্রোত্তেবে একটা বৃহৎ সম্ভাবনা আশা করা যাইতে পারে।

ব্যাপারটা যদি শুধু আভিসিনিয়াকে লইয়া হইত তাহা হইলে ইউরোপীয় কোন শক্তির বোধহয় কালা হাবসীর জঙ্ক এত মাথা ঘামাইত না; শেষপর্যন্ত ভূমধ্য সাগরের অধিকার লইয়া রুটেন ও ফ্রান্সের সহিত ইতালীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রবল। মুসোলিনী'র যখন সাম্রাজ্যলিপ্সা জাগিয়াছে তখন সে কি সহজে নিরস্ত হইবে? কে জানে, আভিসিনিয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার একটা প্রলয়ঙ্কর ইউরোপীয় মহাসমরের ঘটনা হইতেছে বোধ হয়।

এই প্রসঙ্গে ঘটনার স্রুত পট-পরিবর্তন হইতেছে। রুটেন নিজের শক্তি ও চূড়তা দেখাইয়া খাঁটা অগ্লেহাইতে বাস্তব হওয়ায় ইটালীর স্তর নরম হইয়াছে। মুসোলিনী বলিতেছে যে, রুটেনের সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই তবে তাহার বিস্তৃতি আর্থিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে সে তাহা কিছুতেই সম্মত করিবেন এবং সে অবস্থায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হউক ইতালী সহজেই তাহার সম্মুখীন হইবে।

**কলিকাতায়** নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলন হইয়া গেল। দেশে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা, প্রচার ও প্রসার যতই বাড়িতেছে এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তাও ততই অস্বীকৃত হইবে। আইনের নাগপাশে জড়িত থাকিয়া সংবাদপত্র পরিচালনার বাধা, বিপত্তি ও ভয় যে কত সে বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা হইয়াছে। এই বাহিরের বাধার আলোচনা নানা সংবাদপত্রে ও

ব্যক্তি বিশেষের মারফত প্রায়ই হইয়া থাকে। অতএব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলোচনা হইয়াছে সংবাদপত্র পরিচালনার ভিতরের বাধার। সংবাদপত্রের সেক্টর স্বরূপ যে সব বৃত্তিজীবী সাংবাদিক প্রাণপণে সাংবাদিক পরিচালনা করেন, তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হইয়াছে। ইহার ফলে যদি সেবিক কিছু প্রতীকার আশ্বস্ত হয় তাহা হইলেই এই সম্মেলনের সার্থকতা হইবে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে—ইউরোপে যেভাবে ভারতের সম্মান হানির চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রতীকার ব্যবস্থা করা। শ্রীকৃষ্ণ স্বভাচন্দ্র বহু অধিকার সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমাদের মনে হয় তিনি ইউরোপে থাকিতে থাকিতে ভারতে ও ইউরোপে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাহাদের পরস্পরের যোগাযোগ এবং সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপ্রণালী যদি গড়িয়া উঠে তাহা হইলে দেশের একটা মর্যাদা কল্যাণ হয়।

ভূমধ্যের বিষয় কংগ্রেসের ড্যানিং কমিটি এবং বিহারের জুজব তেনন উপসমিতি করিতে পারিলেন না। তাহার যখন এ ভার গ্রহণ করিলেন না, তখন সাংবাদিক সম্মেলনের কার্যকারী সমিতি হইতে ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না কি?

**“একে একে নিবিছে দেউটা”।** হুগলী জেলার কৃতী সন্তান, বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের অল্পমত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি স্তার দেবপ্রসাদ সর্দারিকারী ৭৬ বৎসর পরমোচ্চ স্তার দেবপ্রসাদ সর্দারিকারী করিয়াছেন। শিক্ষা, অর্থ, সমাজ সাক্ষাদিক দিয়াই তাঁর জীবন ছিল পূর্ণ ও সার্থক এবং তাঁর দীর্ঘজীবন তিনি লাভ করিয়াছিলেন সামান্যিক বর্ষের প্রাণশয্যাগত হইবার পূর্বে পর্যন্ত তাহার সম্মান্য তিনি করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেবিক দিয়া স্তার পূর্ণ হওয়ায় তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখ হয় কেবল এই ভাবি

কে, যে-যুগের প্রতীক ও সাক্ষ্য হিসাবে তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাহার তিরোদানে উনবিংশ শতাব্দীর



স্তার দেবপ্রসাদ সর্দারিকারী

যাহার সেই একজন বিশিষ্ট সাক্ষ্য চলিয়া গেল। সে যুগের ঐতিহ্য, সে যুগের শিল্পী, সে যুগের ভক্ততা জন্মে বিরল হইয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নাহে, জটিল বাহ্যিক নাইতেছেন তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে, এমন নবীনদের আবির্ভাব বিশেষ চোখে পড়েন না। সেইজন্য ৭৬ বৎসর বয়সে স্তার দেবপ্রসাদের স্ত্রী হইলেও তাহার অতীত বিশেষ করিয়া মনকে পীড়া দে।

শিশুর ক্ষেত্রে তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে যথেষ্ট কৃত্রিম দেখিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংক্যান্সেলার রূপেও তিনি নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন করেন। রাজনীতিকক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুরেন্দ্র

নাথের শিষ্য। কলিকাতার বাঙ্গালী এটর্নী ফার্মের মধ্যে তাহার ফার্মের নামও সবিশেষ ব্যাপ্ত। বাঙ্গালী লেখক ও বক্তা হিসাবেও তাহার যথেষ্ট ব্যাপ্তি ছিল। “ভারতবর্ষের” পৃষ্ঠায় যখন তাহার প্রথম স্তম্ভ-কাহিনী বাহির হয় তখন সকলেই তাহা সাগ্রহে পাঠ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সদস্য। আমরা তাহার শোকসম্বন্ধে পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

**সম্প্রতি** “তেজ” পত্রিকায় শ্রীকৃষ্ণ স্বভাচন্দ্র বহু বর্তমানে গণপরিষদ আন্দোলনের অর্থোক্তিকতা সম্বন্ধে যে স্পষ্টীকৃত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক গণপরিষদ বন্ধুরা দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই ভবিয়া দেখা উচিত। তিনি বলেন যেখানে দেশের কোনো যোগ্য প্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠান নাই, সেইখানেই গণপরিষদ আন্দোলন করা হইয়া থাকে। ভারতে যখন কংগ্রেসের মত স্তম্ভং প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে—যে কংগ্রেস গত অর্ধশতাব্দী হইতে যোগ্যতার সহিত দেশের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি পরিচালিত করিয়া আসিতেছে—তখন গণপরিষদ আন্দোলন করা চুপ। নবীর স্বরূপ তিনি শুধু ইউরোপের ইতিহাস হইতে নয়—ভারতেও ১৯২৮ সালের সর্বদল সম্মেলনের ফলাফল হইতে—ইহার বার্ষিক প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। আমাদেরও মনে হয় বর্তমানে গণপরিষদ আন্দোলন করিতে গেলে কংগ্রেসের শক্তিকে বর্ধক করা হইবে। অতএব আশা করি, প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্য শ্রীকৃষ্ণ বহুর মতামত বিবেচনা করিয়া তাহাদের দাবী ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবস্থিত হইবেন।

**আকস্মিক** দৈব চূড়্যাগের কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণতঃ নিত্যানৈমিত্তিক জীবন দেখিতে গেলে বাঙ্গালার পল্লী আজিও যে তিমিরের কালও সেই তিমিরের। পল্লীর যশস্বী কৃষির উন্নতি, পল্লীবাণীস্বরের শিক্ষা ও স্বাধোন্নতি সম্বন্ধে



উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনায়ে বলিয়াতো মনে হয় না।  
কেমন করিয়াই বা হইবে। সরকারই বলিয়া থাকেন  
যে বাঙ্গলার জনসাধারণের মধ্যে এখনও শতকরা ৯৫  
জন গ্রামে বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে ৮৫ জন কৃষিকর্ম  
অথবা ১৯৩০-৩৪ সালের বাঙ্গলার কৃষির উন্নতিকল্পে  
সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে কৃষি বিভাগের  
জন্ম উক্ত বৎসরে মাত্র ১৮১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ  
হইয়াছিল। ইহা কি দুঃখের সমুদ্রে সাহায্যের পাশ  
অর্থ্য নহে?

কুণ্ড তাহাই নহে যে ভাবে এই টাকাটা ব্যয়ের  
ব্যবস্থা হইতেছে, এবারকার দুর্ভিক্ষের বিবেচনায়  
তাহা কি পরিবর্তিত হওয়া উচিত নহে। অর্থ্য  
কৃষিক্ষেত্র বিষয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ না করিয়া  
যদি এতদিন চলিয়া থাকে তো আর একবৎসরও  
চলিতে পারে। এই দুর্ভিক্ষ ও প্রলয় প্রাবনের হাত  
হইতে রক্ষা করা উচিত। নতুবা কৃষককুল ধ্বংস হইলে  
কৃষি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্ম থাকিবে  
কাহার?

সম্প্রতি ভারত সরকার প্রদত্ত পল্লী উন্নয়নের জন্ম  
১ কোটি টাকার মধ্যে বাঙলার প্রাপ্য ১৬ লক্ষ টাকা যে  
ভাবে ব্যয়িত হইবে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় বিতর্ক  
হইয়া গেল। স্বাধীনতা অধিকাংশ সন্তোষের মত অগ্রাহ্য  
করিয়া সরকার তরফই জয়লাভ করিয়াছেন। অর্থ্য  
পানীয় জল বা এইরূপ একটা মুখ্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না  
হইয়া ওই টাকা চার পাঁচ দফায় ব্যয়িত হইবে। দুর্ভিক্ষে  
এবং প্রলয় পানীয় জলের অভাবে দেশের লোক যখন

মরে, তখন বেতার, ব্রতচারী, বয়েজকাউন্ট কি আরও  
ছুই চারদিন অপেক্ষা করিতে পারিত না! প্রথমতঃ  
বাঙলা যে টাকা পাইল তাহা হিসাব করিলে যথ্য  
পিত্ত ১০ ছুই পয়সা করিয়া পড়ে, তাও আবার তাহার  
অব্যবহিত প্রয়োজনে লাগিবে না! শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার  
বসু তাই তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তার জন  
উদ্দেশ্যে “প্রকৃতই অর্থবটনের ব্যবস্থা করিতেছেন, ন  
তামাসা করিতেছেন তাহা বুঝা শক্ত।”

উচ্চ ইংরাজী বিজ্ঞালয়ের সংখ্যা হ্রাস করিয়া,  
অধিকাংশ পল্লী অঞ্চল হইতে উচ্চ ইংরাজী বিজ্ঞালয় তুলিয়া  
দিয়া গভর্ণমেন্ট যে ভাবে শিক্ষা সংস্কার ও নির্যাস  
শিক্ষা-সংস্কার তাহা সমর্থন করিতে পারি  
না। বাঙলায় প্রায় এক শতাব্দীর চেষ্টায় যে শিক্ষার  
প্রচার ও প্রসার হইয়াছে, আমাদের মনে হয় এইরূপ  
করিলে তাহার গতি ব্যাহত হইবে। সত্যই বৈশি  
শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে, যির  
তাহার উপায় শিক্ষার প্রসার বন্ধ করা নহে। পৃথিবীর  
সর্বত্রই এখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি  
নহে, কিন্তু কোথাও তো এক্ষণ অদ্বুত প্রস্তাব হয় নাই।  
বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে বিজ্ঞালয়ের সংখ্যা কমান  
পল্লীতে শিক্ষা প্রসারের বিশেষ ক্ষতি হইবে, অত  
সেই যাহানে শিক্ষার একান্ত দরকার। শিক্ষিত দ্বারা  
হইতে এক্ষণ শিক্ষা সংকোচের তীব্র ও সন্দিগ্ধ  
প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন।



শিল্পী :  
শ্রীহরিশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শুকুপ্তলা

মুদ্রণ :  
মেঘাদী প্রেস

## চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদপট—নবম শতাব্দীতে নির্মিত এককর খমের ‘বৈদ্য’ মন্দির গায়ে—প্রস্তর খোদিত, প্রাকৃতিক কামলের উপর অঙ্গার বর্ণ  
লাগিত ছিল। এমনই কত রকমের ইকোণ চিত্র এতদকার মন্দিরের গায়ে দর্শককে বিস্তৃত করে।

ত্রিবিধ চিত্র—পার্শ্ব ও পার্শ্ব-সারথি। বুদ্ধগোত্র পার্শ্ব-সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দীপ্তার বাণী শুনাইতেছেন।

পি, ১০ বি, হাফরা রোডের “মেঘাদী প্রেসে” শ্রীমদশচন্দ্র দত্তের কর্তৃক মুদ্রিত ও  
২, রামময় রোড হইতে প্রকাশিত।